ল্যাডস্টন, ফাস্ট কিন্তু কলম থামালেন না—জেলের ভয়েও না। তবে আপটন সিনক্লেয়ার ভুললেন তাঁর জীবনবেদ। বিশ্বের মুক্তিকামী গণপ্রতিনিধির প্রশংসায় উত্তরে তিনি তাড়াতাড়ি সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিলেন যে মাকিন গণতন্ত্রকেই তিনি শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র বলে মানেন, তিনি স্বীকার করেন যে আটলান্টিক চুক্তি "বিশ্বশান্তির" জন্যই। এই হ'ল আজকের সিনক্লেয়ার।

তবু, বিশ্বের শোষিত লাঞ্ছিত পদানত জনগণের প্রতি অকৃত্রিম দরদ-বশত যে সাহিত্য তিনি পূর্বে সৃষ্টি করেছেন, তা অমর হ'য়েই থাকবে। তাঁর জঙ্গল্, অইল, মিলেনিয়াম, ব্রাসচেক প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্ব সাহিত্যে যে স্থান পেয়েছে, সে স্থান হ'তে তারা কোন দিন চ্যুত হবে না।

শুদ্ধোধন সেন

ভ্রম সংশোধন

পৃ ৫০৯, পাদটীকা—আছে "ইউরিপিস পরে…" হবে—"ইউরিপিসের মত প্রেমিকরা পরে…"।

জঙ্গল

প্রথম অধ্যায়

অনুষ্ঠান শেষ হ'ল বেলা চারটেয়। গাড়ীগুলি আসতে আরম্ভ করেছে। মেয়ারিজা বার্ক্‌ৎসাইন্‌স্‌কাস-এর উৎসাহ-আধিক্যে একটী ভীড়ের সৃষ্টি হ'য়েছে, সারাটা রাস্তা ঐ একই ভীড় চলেছে গাড়ীগুলির পিছু পিছু। মেয়ারিজার বিশাল স্কন্ধে ভার পড়েছে অনুষ্ঠানটির পরিচালনার, শুধু পরিচালনা নয়, পরিচালনা করতে হবে যতখানি সম্ভব দেশীয় রীতি-পদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী। সারাটা দিন ওর এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই, অবিরত ছুটোছুটি করছে, সামনে যে-কেউ পড়ছে তাকেই ধমক দিচ্ছে। গলায় ওর শক্তি আছে, ধমকের শব্দও তাই হ'চ্ছে গুরুগম্ভীর। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে তো চলবে না! মেয়ারিজার মতই সকলকে খাটতে হবে। সকলের শেষে ও গীর্জা হ'তে বের হ'ল, কিন্তু ভোজের হোটেলে সকলের আগে ওকে পৌঁছতেই হবে। কোচম্যানকে হুকুম দিল—জোরসে হাঁকাও। কিন্তু গাড়োয়ান মশায়ের নিজের ইচ্ছা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে; কাজেই গাড়ী চলতে লাগল তারই খুশীমত। গাড়ীর জানালা দিয়ে মাথা বের করে, মেয়ারিজা গাড়োয়ানকে তার (গাড়োয়ানের) পরিচয় প্রথমে লিথুয়ানিয়ান ভাষায় জানিয়ে

দিলে; গাড়োয়ান হাঁ করে চেয়ে রইল, কিন্তু বুঝল না কিছুই। একই পরিচয় সমানে চেঁচিয়ে মেয়ারিজ্জা জানায় পোল ভাষায়; তখন গাড়োয়ানের বোধগম্য হয়। দু'জনের মধ্যেকার দূরত্ব এবং নিজের উচ্চ আসনটা দেখে নিয়ে গাড়োয়ান আত্মসমর্থন করে; উচ্চতাটা নিরাপদ কাজেই জবাবও সমানে দিয়ে যায়, অন্ততঃ চেষ্টা করে। চুপ করে শোনবার পাত্র এরা নয়; অ্যাশল্যাণ্ড অ্যাবেনিউএর সমস্তটা পথ চলে ঐ বচসা। রাস্তার ছোঁড়ারা মজা পায়। চ্যাচাতে চ্যাচাতে ওরাও ধরে গাড়ীর সঙ্গ।

এমন একটা দল সঙ্গে জুটে যাবে আগে জানলে মেয়ারিজ্জা পথে শান্ত থাকত; ইতিমধ্যে, ও আসবার আগেই, দরজার সামনে এর চেয়েও বড় একটি ভীড়ের সৃষ্টি হ'য়েছে। বাদ্যভাণ্ডের কুস্তী শুরু হ'য়ে গেছে। দু'খানা ব্যারাক দূর হ'তে শোনা যায় "ব্রুম্ ব্রুম্" শব্দে ঢাক বাজছে, তার সঙ্গে চাঁ চাঁ শব্দে সুর ধরেছে জুটো বেহালা বা ঐ ধরণের কোন একটা তারের যন্ত্র। মোট কথা গীতবাদ্যের রীতিমত একটা মল্লযুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেছে। ভীড়ও আরম্ভ হ'য়েছে দু'খানা ব্যারাক আগে হ'তে। অবস্থা বেগতিক। গাড়োয়ানের পূর্বপুরুষের পরিচয়টা আপাততঃ স্থগিত রেখে চলন্ত গাড়ী হ'তে মেয়ারিজ্জা লাফিয়ে নেমে পড়ে; ভীড় ঠেলে ঠেলে পথ করে চলে ভোজঘরের দিকে। ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বলে—"এইক্! এইক্! উজদার কাইদুরিস্!"—কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর! এর কাছে ঐক্যবাদ্যের লড়াই-ও যেন কিন্নরীর সংগীত হ'য়ে যায়।

"জে গ্র্যাইকৎস্নাস্, প্যাসিলিক্স্মিনিমাস্ দরজাজ্। বাইনাজ্। গুনাপ্সাস্। মদ্য, পানীয়। সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়।"—এ সব সাইনবোর্ডমাত্র, লিথুয়ানিয় ভাষায় লেখা ভোজঘরের বিভিন্ন স্থানে ঝোলানো।

স্থানটা কারখানা অঞ্চলের পিছনের দিক; ঘরটা শ্রমিকদের হোটেলের খিড়কীর দিকের একটা হল ঘর। অল্প কথায় স্থানটার আসল পরিচয় এই-ই কিন্তু হৈ হল্লার মধ্যেও বিষন্নতার সুরটা থেকেই যায়। আজ ছোট্ট ওনা লুকোস্ত্সাইটের জীবনের চরম আনন্দের দিন—শান্ত নির্দোষ ওনার বিয়ের ভোজ। আরও পাঁচটা সুখী মেয়ের মত সে-ও তো ভগবানেরই সৃষ্টি। তার বিয়ের ভোজ চলেছে কারখানাগুলোর পিছন দিকের অপরিচ্ছন্ন হোটেলের খিড়কী ঘরে।

একটা দরজার মাঝখানে ও দাঁড়িয়ে আছে; ওর তদারক করছে মেয়ারিজা—সম্বন্ধে ওর দিদি। ভীড় ঠেলে ঠেলে ওনা তখনও পরিশ্রান্ত, হাঁপাচ্ছে; তবু মনের খুশীতে বাইরেটা যেন বিকল হ'য়ে পড়তে চায়, দেখলে মায়া হয়। চোখ দুটী বিস্ময়ে ভরা, পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপছে। সাধারণতঃ ওর মুখ ফ্যাকাসে, কিন্তু আজ সে ব্রীড়াবনতা কুলবধূ—ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। পরণে স্বচ্ছ মস্লিন, রঙিন নয়, সাদা; স্বচ্ছ শক্ত সাদা একটা ওড়না কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। ওড়নায় এঁটে দেওয়া হ'য়েছে কাগজের পাঁচটা গোলাপ ফুল, তাদের পাশে পাশে সাজিয়ে দেওয়া হ'য়েছে চকচকে-সবুজ গোলাপ পাতা। হাতে সাদা সূতি দস্তানা, বিব্রত বোধ করলেই ওগুলোকে মুচড়ে চটকে প্রকৃতস্থ থাকবার চেষ্টা করে। সবটা মিলে ওর সহ্যাতীত হ'য়ে গেছে যেন—মুখের চেহারায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে আবেগের বেদনা,—সারা দেহটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ওনা এই ষোলয় পড়েছে, বাড়ন্ত মেয়ে নয়; বয়সের চেয়ে ছোটই দেখায়।—ওর বরের নাম ইউরঘিস। ইউরঘিসের বক্ষ বিশাল, স্কন্ধ বিস্তৃত, হাত দু'খানি দীর্ঘ, শক্তিমান। বিয়ের জন্য নতুন কুচকুচে-কাল রঙের পোশাক পরেছে, বাটন হোলে এঁটেছে সাদা একটা গোলাপ।

ওনার চোখ নীল, রঙ ফর্সা। আর ইউরঘিসের চোখ কাল, ভ্রূ

ঘন, চুল কাল এবং কুঞ্চিত—ছোট ছোট বৃত্তে কানের নীচে পর্যন্ত ঝুলে আছে। ঠিক জুড়ি বলা যায় না, বিয়ে ওদের বেমানান। গোমাংসের পাক্কা তিনমণী একটা খণ্ড অনায়াসে নির্ভাবনায় ইউরঘিস বয়ে নিয়ে যেতে পারে—পা একটুও কাঁপবে না। কিন্তু আজ একান্ত দুর্বলের মত ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে এক কোণে ও দাঁড়িয়ে আছে; ঠোঁট বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে; বন্ধুবর্গের অভিনন্দনের উত্তর দেবার আগে বার বার ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছে।

ক্রমশঃ রবাহূত ও আমন্ত্রিতদের মধ্যে একটু পার্থক্যের সৃষ্টি করা গেল—এরা একদিকে ওরা একদিকে, তা নয়। তবে কাজ চলে যায়। যখন হ'তে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, তখন হ'তে শুরু হ'য়েছে ভীড়েরও, দরজার সামনে পাশে ঘরের কোণে "দর্শক"বৃন্দ জমেই চলেছে। কোন "দর্শক" খুব কাছাকাছি এসে গেল, তাহ'লে আর উপায় কী? তার ওপর যদি তার মুখখানা দেখে খুব ক্ষুধার্ত বলে মনে হয়, তাহ'লে সেও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়, খাবার দেওয়া হয়। বেসেলিজার সামাজিক রীতি অনুযায়ী কোন অতিথিকে না-খাইয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ওরা সেই লিথুয়ানিয়ার বনের লোক হ'লেও, এটা লিথুয়ানিয়ার বেসেলিজা নয়, শিকাগোর কারখানা অঞ্চলের বস্তী, অধিবাসীর সংখ্যা আড়াই লক্ষের মত। এখানে বনের আচার-পদ্ধতি অনুযায়ী চলা কঠিন। তবু ওরা সাধ্যমত অতিথি অভ্যাগতকে স্বাগত জানায়। পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেমেয়ে এমন কি কুকুর বেড়াল পর্যন্ত কোন রকমে ভোজের কাছাকাছি পৌছতে পারলে, কিছু খাবার পাচ্ছেই; শুষ্ক মুখে অপমানিত হয়ে কাউকেই ফিরতে হচ্ছে না। পোশাকী শিষ্টাচারটা এখানে উহ্য; এই অবধি টুপি পরে আসতে পারা যাবে, কোটটা হবে অমুক ধরণের, চলতে হবে এই ভাবে, বসতে হবে ঐ ভাবে ওখানে, এমন সব শিষ্টাচার ওরা মানে না। যে যা পেরেছে

পরে এসেছে, যখন যেখানে খুশী ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, যখন ইচ্ছা খাচ্ছে, বিলিতি ভোজসভার নিয়মকানুনের বালাই ওদের নেই। রীতিমাফিক গান বাজনা বক্তৃতা অবশ্য হবে ; কিন্তু রীতিমাফিক স্থিরভাবে শুনতে কেউ বাধ্য নয় ; খুশীমত সকলেই গান গাইতে পারে, কথা কইতে পারে, অন্যের গান বাজনা বা কথাবার্তা শুনতে কেউ বাধ্য নয়। ফলে সৃষ্টি হ'য়েছে, সাহিত্যিক ভাষায়, অদ্ভুত এক শব্দ-বৈচিত্র্যের ; চলতি ভাষায় এর নাম হট্টগোলই ; শব্দ-বৈচিত্র্যই হ'ক আর হট্টগোলই হ'ক, কেউই, অবশ্য শিশুরা বাদে, কোন অসুবিধা বোধ করছে না। শিশুরা সমাগত নরনারীর সংখ্যার প্রায় সমান ; সরবে তারা অসুবিধার প্রতিবাদ করে। কোণের বিছানায় বা বাইরের গাড়ীতে তিনচারটিকে একসঙ্গে শুইয়ে দেওয়া হ'য়েছে, জাগলে তিনচারটি মিলে একসঙ্গে জাগছে, ঘুমুলে একসঙ্গেই ঘুমুচ্ছে। ওরই মধ্যে যারা হাঁটি-পা-পা'র পর্যায়ে উন্নীত, তারা কিন্তু বড় ছোট কারও হট্টগোলে যোগ না দিয়ে একান্তভাবে মন দিয়েছে খাবার দিকে।

ঘরখানা প্রায় হাত কুড়ি লম্বা। দেওয়ালগুলি চুণকাম করা, সাদা ; ওদেশী রীতি অনুযায়ী দেওয়ালে কাগজের একটা আস্তরণ আশা করা যায়, এখানে ওসব কিছু নেই। একখানা ক্যালেণ্ডার, একখানা ঘোড়ার ছবি আর একখানা রঙচটা পারিবারিক ছবি ছাড়া দেওয়ালগুলো ফাঁকা। হোটেলের দিকে একটা দরজা ; ওখানটায় কতকগুলো বখাটে বেওয়ারিশ নিষ্কর্মা মাঝবয়সী ছেলেমেয়ে ভীড় জমিয়েই রেখেছে ; দোর দিয়ে আর একটা ঘর দেখা যায় ; ওটা ভাঁড়ার ও মদ-বিতরণ-কেন্দ্র—বার্। বারের অধিষ্ঠাতা উচ্চপদাধিষ্ঠিতের মত মহাগম্ভীর ; পোশাক ময়লা হ'ক, সাদা ; গোঁফ জোড়া মোম দিয়ে মাজা, কপালের একপাশে মোম দিয়ে বসান কৃষ্ণকেশের একটি বৃত্ত। ঘরটার এদিকে খান দুই টেবিলে কতকগুলো ডিশ্, গেলাস ; কোন

কোনটায় কিছু কিছু মাংস-রুটি আছে—সবই ঠাণ্ডা। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কারও ক্ষিধে পেলে, ঐ ঠাণ্ডা রুটি-মাংসের খানিকটা উদরস্থ করে নিচ্ছে। একটা টেবিলের শীর্ষদেশে বসে' উপবিষ্টা; তার সামনে ইফেল টাওয়ারের আকৃতিতে গড়া একখানি সাদা কেক, কেক দিয়ে গড়া কতকগুলি গোলাপফুল ও দুটি বিস্তৃতপক্ষ বাচ্ছা দেবদূত টাওয়ারের পাশে পাশে লাগানো, সমস্তটার ওপর বহু বর্ণের মিছরির টুকরো ছড়ানো। বারের ও দিকটায় রান্নার আয়োজন—অনেকগুলি হাঁড়ি ডেকৃচি হ'তে বাষ্প উঠছে, বহু বৃদ্ধা যুবতী একসঙ্গে কাজ, চেঁচামেচি ও ছুটোছুটি করছে। বাঁ দিকের কোণে টেবিল দিয়ে বানান উচ্চ একটা বেদী; সেখানে তিন জন বাদক সবিক্রমে সঙ্গীত সৃষ্টির চেষ্টা করছে, বোধ হয় অভ্যাগতদের মোহিত করবার জন্যই! কণ্ঠসম্বল শিশুরাও ঐক্যতান ধরেছে। বাঁ দিকের মাঝামাঝি একটা জানালা খোলা আছে—সেদিক দিয়ে চেয়ে আছে যত ইতরে জনাঃ, ওখানে দাঁড়িয়েই ওরা রূপ রস গন্ধ উপভোগ করছে।

সহসা সবাষ্প হাঁড়ি ডেকৃচিগুলি এগুতে থাকে। হাঁড়ি ডেকৃচির পাশ দিয়ে চাইলে দেখা যাবে এলজ্‌বিয়েটাকে। এলজ্‌বিয়েটা ওনার মাসী; পুরো নাম টেটা এলজ্‌বিয়েটা, তাকে মাসী এলজ্‌বিয়েটা বলে। বিরাট ডেকৃচি ক'রে ও আনছে হাঁসের স্ট্যু। ওর পিছনে কোট্‌না, বিরাট হাঁড়ির ভারে কোনক্রমে টলতে টলতে এগুচ্ছে। তার খানিকটা পিছনে ঠাকুমা ম্যাজাউস্ক্‌স্কিয়েন প্রায় তার সমান উঁচু একটা হাঁড়িতে সেদ্ধ আলু আনছে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে জমে ওঠে ভোজ্যের সম্ভার—শূকরমাংস, ভাত, কপির টক, চীনেবাদামের বিস্কিট, ঝোল, ভাজা, দুধ, সফেন বিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। উপবিষ্টদের পিছনেই বার, যে কোন মদ চাইলেই পাওয়া যাবে, আবার দাম পর্যন্ত লাগবে না। "এইকস্‌ৎ! গ্রেইকস্‌তিউয়া!" হেঁকে ওঠে মেয়ারিজা বার্কস্তাইস্কাস্। বলেই ও

কাজে লেগে যায়। না লাগলে চলবে কেন? তখনও উনুনে যে একগাদা খাবার চাপান আছে। এখন খাইয়ে না দিলে সব নষ্ট হবে।

হাসি হল্লা টীকাটিপ্পনি রসিকতা ফষ্টেমির মধ্যে অভ্যাগতরা আসন গ্রহণ করে। ভোজ শুরু হ'য়ে যায়। অল্পবয়স্করা, প্রায়-যুবক হ'লেও, এতক্ষণ এক কোণে ঠাসাঠাসি ক'রে অপেক্ষা করছিল; এতক্ষণে বড়-ছোটর মর্যাদাবোধ একটু ঢিলে হ'তে ওরা চপল হাস্যে এগিয়ে আসে। সসঙ্কোচে ইউরঘিস তখনও তার কোণটুকুতে দাঁড়িয়ে। বড়দের সস্নেহ ধমকাধমকিতে এগিয়ে আসে কিন্তু বসতে চায় না। আরও খানিকটা হাসাহাসির পর কনে'র ডান দিকটায় ওর জন্য নির্দিষ্ট আসনে তেমনি সঙ্কুচিতভাবে বসে পড়ে। ওদের দু'জনের দু'পাশে বসল দুজন নিত-কনে'; এদের গলায় কাগজের মালা—পদমর্যাদার চিহ্ন। তারপর অনির্দিষ্টভাবে অন্যান্য আমন্ত্রিত বুড়োবুড়ী যুবকযুবতী ছেলেমেয়ে যে-যেখানে পেয়েছে, বসে পড়েছে। বারের—অর্থাৎ মদ্য-বিতরণ-কেন্দ্রের অধ্যক্ষকে পর্যন্ত এই হাসিহল্লার ছোঁয়াচ লাগে;—হ্যাঁ দিতে পারে এক ডিস হাঁসের স্ট্যু। এই ভোজ, অত মদ, নাগাদ সন্ধ্যা ঘুঁষোঘুষি একটু আধটু হওয়া বিচিত্র নয়, তাই এরই মধ্যে একজন কনষ্টেবল এদিকটায় নজর রেখেছিল। মারপিট তো এখন নেই, কাজেই ও-ও একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে, দক্ষিণ হস্তের কাজ শুরু হ'য়ে যায়। বড়রা গান গল্প হাসিতে মত্ত, হাত বা মুখের কাজ একটু ফাঁক পড়লেই গলা ছেড়ে চেঁচায়; শিশুরা অবিশ্রান্ত কান্নায় নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলকে সজাগ রাখবার চেষ্টা করে। কর্ণপটাহ-বিদারী এই হট্টগোল ছাড়িয়ে ওঠে মেয়ারিজার হুকুমের আওয়াজ—বাজাও, বাজাও! বাজনদাররা টাকা নেবে, মাগ্‌না তো নয়। কাজেই—

এখন কীভাবে এই তিনজন সঙ্গীতবিদের বর্ণনা শুরু করা যায়! প্রথম হ'তে ওরা ঐখানে দাঁড়িয়ে পাগলের প্রচেষ্টায় বাজিয়ে

চলেছে—গান, হ'ক, গল্প হ'ক, পাঠ হ'ক, ঘরে যাই হ'ক, ঐক্যতানকে সুর মেলাতে হবে তার সঙ্গে, তবে না ঐক্যতান। গান! সঙ্গীত! যা-তা কথা তো নয়, সঙ্গীত! এরই গুণে-না কারখানার নোংরা এই বস্তী অঞ্চল অমন পরীর দেশে, বিস্ময়-বিতানে, স্বর্গীয় গন্ধর্বলোকে পরিণত হ'য়েছে!

বাদ্যকারত্রয়ের নেতাকে বলা যায় গানে-পাওয়া মানুষ, মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র। বেহালায় তার বেসুরো, ছড়ে রঞ্জন নেই, কিন্তু তাতে কী! ওর হাতে ভর করেছেন সাক্ষাৎ মা সরস্বতী! তবে বাজানোর ভঙ্গীটা গানে-পাওয়ার মত নয়, ভূতে পাওয়ার মত, তাও একটা ভূতের কেরামতি বলে' মনে হয় না, গণ্ডায় গণ্ডায় ভূত যেন ওকে পেয়ে বসেছে। চোখ বুজলে মনে হয় ভূতগুলো ওর চার-পাশে তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করেছে। ওর চুল হ'য়ে উঠেছে খাড়া, চোখ দুটো ঠেলে বে'রিয়ে আসছে, তবু ভূতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও বাজিয়ে চলেছে।

ওর নাম ট্যামোস্তু সিয়াস কুস্‌ৎস্লইকা। উৎসাহ ওর অসীম। সারাদিন কারখানায় কসাই বিভাগে কাজ করার পর সারা রাত্রি জেগে জেগে ও বেহালা বাজান শিখেছে, কারও কাছে নয়, নিজেই। এখন এ তল্লাটে ও পাকা বাজিয়ে। পাকা বাজিয়ের যোগ্য পোশাক জোগাড় করেছে। লাল দাঁড়ি-টানা সাদা শার্ট, তার ওপর বুকঢাকা একখণ্ড কাপড়, তাতে সোনালী জরী দিয়ে আঁকা ঘোড়ার ক্ষুরের নাল, রঙটা এখন অবশ্য আর সোনালী নেই, এককালে ছিল; নীলের ওপর হলুদে দাঁড়ি-টানা মিলিটারি প্যাণ্ট—এইটেই ওর পদমর্যাদার চিহ্ন; ঐক্যতান সঙ্ঘের নেতা ও, মিলিটারী প্যাণ্ট সাজে ওকেই। মানুষটা বেঁটে খাটো, পাঁচ ফুটের বেশী হবে না; প্যাণ্টটা তা বলে' ঢিলেঢালা নয়, হাঁটু হ'তে ইঞ্চি চারেক নীচে নেমেছে। বেমানান বলে কে!

কিন্তু বিস্ময় লাগে, এমন লাগসই প্যাণ্ট জোগাড় করল কোথা হ'তে! তবে এই দৃশ্য ও আবহাওয়ার মধ্যে ওর প্যাণ্ট দেখবার সময় আছে কার?

রাগরাগিনীর উদ্দীপনায় ও ডগমগ করছে। সুরে তালে লয়ে কখনও পা ঠোকে, কখনও মাথা নাড়ে, সুরের আবেগে শরীরটা কখনও সামনে পিছনে, কখনও ডাইনে বাঁয়ে দোলে, বিশেষ কড়ি বা কোমলে ভ্রূ দুটী যায় কুঁচকে, চোখ দুটী পিট্‌পিট্ করে, তরতর ক'রে নড়ে ওঠে ঠোঁট দুটো—নিঃশব্দ বোলের অভিব্যক্তি! অনাহারক্লিষ্ট মুখখানা ছোট্ট কোঁচকানো, অন্যসময় দেখলে মায়া হবে হয়তো, কিন্তু এখন ওর মুখের দিকে চাইলে না হেসে থাকা যায় না। নিজেরটা হ'লেই তো হয় না, ঐক্যতান এটা। মা বাগ্‌দেবীর হ'য়ে ও সঙ্গীদের আবেদন জানায় নিবেদন করে, কখন মাথার ইঙ্গিতে, ~~কখন~~ হাতের, কখন চোখের, কখন বা বেহালা হ'তে 'উস্তাদী' হাতখানা তুলে দেয় এক খোঁচা—বাজাও, বাজাও।

অন্য দুটী ট্যামোস্তসিয়াসের যোগ্য হ'লেই হল! দ্বিতীয় বেহালা-ওয়ালা জাতে স্লোবাক, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, দেহ লম্বাচওড়া—মুখের ভাবখানা দেখলে মনে পড়ে যায় দীর্ঘ পর্যটনের পর অতিক্লান্ত অশ্বতরের শান্ত মুখভাবখানির কথা—কোনও অভিযোগ নেই; চাবুক পড়লে গতির দিক হ'তে সাড় হয়তো দেয়, কিন্তু সে না চলারই সামিল। তৃতীয় ব্যক্তিটী বিশেষরকম মোটা, একেবারে গোলগাল, ন্যাকামী ভাবভুব, বাজায় আকাশের দিকে চেয়ে, দৃষ্টিতে সীমাহীন কামনার আকুতি যেন মাখান। ওর ভাবে ভঙ্গীতে নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ততা সুস্পষ্ট। কী সুর কী তাল কী গৎ বাজছে তার সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধই নেই। ঢাকটার ওপর ধাঁই ধাঁই করে পিটে যাওয়া ওর কাজ। কোথায় কী হ'চ্ছে, কে কী বাজাচ্ছে না-বাজাচ্ছে দেখবার দরকারটা

কী! বিকেল চারটে হ'তে ভোর চারটে পর্যন্ত বাজাতে হবে। ঘণ্টা পিছু এক ডলার ক'রে তিন জনের যৌথ মজুরী, ভাগ ওর নিশ্চয় আছে প্রতি ঘণ্টার প্রতিটী ডলারে। ফাঁকি তো দিতে পারে না।

মিনিট পাঁচেক হ'ল ভোজনপর্ব শুরু হ'য়েছে। হঠাৎ ট্যামোস্ত্ সিয়াস কুস্ত্ স্লেইকার মনে হ'ল কর্তব্যে অবহেলা হ'য়ে গেল। উত্তেজিতভাবে ও ভোজনরতদের দিকে এগোয়—আনন্দ দিতে হবে তো! উত্তেজনায় ওর নাক ফুলে উঠেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত—হয়তো ওর ভূতগুলো ওকে তাড়িয়ে আনছে। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ইশারায় সঙ্গীদের এগোবার আহ্বান জানায়, কিন্তু তারাও তো তখন মসগুল! মারে বেহালার এক এক খোঁচা। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বেহালাদার এগোয়। আমাদের ঢাকধারী ব্যালেনটিনাবাইকৎসিয়া ক্রম ক্রম ক'রে এক একবার ঢাক বাজায় আর ঢাকের পাশে পাশে পা ফেলে এক পা ক'রে এগোয়; মধ্যে ঝোলান ঢাকের পাশে পাশে পা ফেলে। তিনজনেই ভোজনরতদের কাছে উপস্থিত হ'লে কুস্ত্ স্লেইকাকে একখানা টুল দেওয়া হয়। তারই ওপর দাঁড়ায় ও সঙ্গীতবিদ্যার পূর্ণগৌরবে। দৃশ্যটীর অধিনায়ক এখন ও। বাজনা না শুনে আর উপায় নেই; গানে গল্পে হাস্যে একটু ঢিলে পড়ে যায়, তবে বন্ধ একেবারে হয় না! কোন সুরের সঙ্গে ওর বেহালার সম্বন্ধ নেই; বেহালার স্বর দুটী, কখন কুঁ-উঁ, কখনও গ্যাঁ-ঙঁ-উঁ। শ্রোতাদের কেউ এতে বিরক্ত নয়, আনন্দের কসুরও এতে হ'চ্ছে না। হ'লে চলবেই বা কেন? এই তো ওদের জীবন। বিকট নোংরা, উৎকট দুর্গন্ধ, কর্কশ কানকাটা আওয়াজ, অন্ধকার স্যাঁৎ-সেঁতে ঘর ওদের চিরসঙ্গী। মনের সুকুমারবৃত্তিগুলো কবে মরে ভূত হ'য়ে গেছে, ওরাই জানে না। তবু ওরা মানুষ, আনন্দ ওদের চাই। এই সব মালমসলা হ'তেই ওরা যোগাড় করে আনন্দের উপাদান, এই সবের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করতে চায় ওদের আত্মার স্বরূপ। এইটেই

ওদের আত্মার প্রকাশভঙ্গী—বেসামাল স্ফূর্তি, বেজায় জোরে কথা কওয়া হাসা বা গান গাওয়া, দুঃখ পেলে ওরা ইনিয়ে বিনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে, রাগ হ'লে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ক্ষেপে ওঠে, বিদ্রোহ করে—সমস্ত কিছুর মধ্যে 'অতি' দিয়ে ওরা পূরিয়ে নিতে চায় ওদের না থাকার একান্তটা। এ গান, এ ঐক্যতান ওদেরই সঙ্গীত, ওদের ঘরোয়া জিনিস। এ গানই বাহু বাড়িয়ে ওদের ডেকে নেই, এরই আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ ক'রে ওরা সুখ পায়। এই সবের আবেশেই ওরা ভুলে যায় এই শিকাগো শহর, এর নোংরা হোটেল, এর জঘন্য বস্তী—মনের চোখে ভেসে ওঠে কোন সুদূরে ফেলে-আসা ওদের তুহিনাবৃত পাহাড়, দিগন্তবিস্তৃত হরিৎ বন আর প্রান্তর, রৌদ্রকরোজ্জ্বল খরতোয়া নদী। দেশের মাটির ভালবাসা, বাল্যের স্মৃতি জেগে ওঠে এই সঙ্গীতেরই সুরে, মনের পটে ভেসে ওঠে হারানো প্রেম, ফেলে-আসা বন্ধুত্ব, বেঁচে ওঠে আবার হারানো সুখ-দুঃখের হাসি-কান্না। বুকের বোঝাটা খুব বেশী ভারী বোধ হ'লে ওরা চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দেয়, নয় আবিষ্টভাবে টেবিল বাজিয়ে তাল দেয়। কারও হয়তো মনে পড়ে যায় বিস্মৃত-প্রায় গানের একটা কলি, অমনি লাফিয়ে উঠে সে সেই গানখানি বাজাবার ফরমায়েশ দেয়। ট্যামোস্তসিয়াসের চোখ হ'য়ে ওঠে উজ্জ্বল, চেঁচিয়ে প্রেরণা দেয় সাথীদের—সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'য়ে যায় মত্ততার মহাপ্রকাশ। স্মৃতির আবেগ আর ধরে রাখা যায় না, সকলে একসঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরে, আনন্দে কেউ কেউ কেঁদে ফেলে। কেউ কেউ আবার লাফিয়ে উঠে মাথা নেড়ে পা ঠুকে সঙ্গত করে। অপরিচিত কেউ এদের এ অবস্থায় দেখলে ভাববে, এদের সকলকেই ভূতে পেয়েছে। 'উচ্চস্তরের' মানুষ যা-ই ভাবুক, ওদের ভূতে পায়নি, পাগলও ওরা হয়নি। আনন্দে মেয়েরা কাঁদছে। ওরই মধ্যে একজনের মনে পড়ে যায় অতি পুরাতন একখানা

বিবাহ-সঙ্গীত—তাতে আছে কনে'র সৌন্দর্যের ও ভবিষ্যদ্ভূত আনন্দের বর্ণনা। ফরমায়েশ হ'য়ে যায়। মহাসঙ্গীতের উত্তেজনায় ট্যামোস্ত্‌সিয়াস কুসংস্কারেইকা আত্মহারা হ'য়ে অভ্যাগতদের ঠেলতে ঠেলতে একেবারে কনে'র কাছে হাজির হয়। অভ্যাগতরাও উত্তেজিত, তারাও এগোয়—ভীড় করে ওকে ঘিরে, ট্যামোস্ত্‌সিয়াসের ছড়ের খোঁচা লাগে দু'পাশের লোককে। ট্যামোস্ত্‌সিয়াস হাঁক ছেড়ে ডাকে ওর সাথীদের। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর অপর দু'জনেও এগোয়; ঢাকের বাজনা কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হ'য়ে যায়। ওরা পথ দেয়। তিনজনে দাঁড়ায় কনে'র ডান পাশে। প্রাণগলানো সুরে ট্যামোস্ত্‌সিয়াস বাজিয়ে চলে প্রেমের গান।

ওনার উত্তেজনার অন্ত নেই; ওর খাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেছে। মেরিজা মধ্যে মধ্যে চিমটি কেটে ওকে খেয়াল করিয়ে দেয়, দিদির মন রাখবার জন্য একটু আধটু কিছু আনমনে মুখে তোলে, কিন্তু সমস্ত সময়টা চেয়ে থাকে ভয়ে বিস্ময়ে মাথা চোখ দুটী তুলে। এলজ্‌বিয়েটাও উসখুস করে, কানে কানে ফিস ফিস করে বলে—খা-া-া! ওর বোনেরা করে একই অনুরোধ। কিন্তু সব অনুরোধ, সব সাবধানী কথা ডুবে যায় গানের সুরে। সুর বাজে এখানে শ্রোতার মনে। দূর লিথুয়ানিয়ার বনপ্রান্তের গ্রাম; সেই পরিবেশ। দৃষ্টিহারা চোখে ওনা চেয়ে থাকে; চোখ হ'তে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল। মুছতে ওর লজ্জা করে, না মুছে-ও থাকতে পারে না। মাথা নেড়ে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে জলের ফোঁটা—দেখে, ইউরগিস ওরই দিকে চেয়ে আছে; গাল হ'য়ে ওঠে লাল। আপন সাফল্যে ট্যামোস্ত্‌সিয়াস যেন পাগল হ'য়ে যায়। ওনার আরও কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়। ওনার মুখ হয় টকটকে লাল। না পারে আর বসে থাকতে, না পারে পালাতে।

আচম্বিতে মেয়ারিজাকে গানে পেয়ে বসে। ওনা বেঁচে যায়। কোন একটা গানে প্রেমিক-প্রেমিকার বিদায় বর্ণনা আছে; মেয়ারিজা শুনতে চায় সেই গানখানা। বাদকদের কেউই ও গান জানে না। মেয়ারিজা এগিয়ে যায় ওদের শিখিয়ে দিতে। মেয়ারিজা বেঁটে, সমর্থ। কারখানার যে বিভাগটায় মাংস টিনে পোরে, ও কাজ করে সেই বিভাগে। সাত সের ওজনের এক একটা মাংসের তাল তুলে ওকে টিনে পুরতে হয়। স্লাবীয় চেহারার গঠন-পদ্ধতি অনুযায়ী ওরও মুখাবয়ব চওড়া, গাল দুটো ফুলো ফুলো। ওর খোলা মুখ দেখলে মন খুব খুশী হয় না, মনে পড়ে যায় ঘোড়ার মুখের আদল। এখন পরা ছিল একটা ফ্লানেল শার্ট, বাহু পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে নেয়; শক্ত গোল দুটী বাহু দেখা যায়। হাতে ছিল একখানা হাতা, তাই দিয়ে ও তাল দেয় টেবিলের ওপর—গলা ছেড়ে গান ধরে, সুরে নয় গর্জনে; সে স্বরের বর্ণনা করা কঠিন, ঘরের হাওয়াটা ফেটে ফেটে যাচ্ছে বললে, হয়তো সে স্বরের খানিকটা আন্দাজ করা যাবে। বাজনদারেরা তালে তালে মেলাবার চেষ্টা করে, মেলান আর হয় না, চেষ্টা করাই হয়; কিন্তু তাতে কারও যায়-আসে না। গানবাজনা চলে লিথুয়ানিয় ভাষায়: প্রেমিক বিলাপ করছে।

মেয়ারিজার কণ্ঠে প্রেমিকের বিলাপ শোনায় যুদ্ধ ঘোষণার মত; বাজনদারদের তাল রাখবার চেষ্টাটার তুলনা করা যায় হাতুড়ী ঠোকা বা বৈঠা চালানর সঙ্গে।

যাক শেষ পর্যন্ত গান শেষ হ'ল। এবার বক্তৃতার পালা। অ্যান্টেনাস বক্তৃতা দেবে, ইউরগিসের বাবা ডেডে অ্যান্টেনাস। ওকে ওরা বলে অ্যানটনি দাদু। বয়স বছর ষাটেক; কিন্তু দেখলে মনে হয় আশী পার হ'য়ে গেছে। এই ছ'মাস হ'ল অ্যামেরিকা এসেছে; এরই মধ্যে শরীর পড়ে' গেছে। জোয়ান বয়সে একটা সুতোর কলে কাজ

করত : নিশ্বাসের সঙ্গে তুলোর ফুঁসো ঢুকে ঢুকে কাস ধরে যায়। কাজ ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায় বনের পাশে নিজেদের গ্রামটীতে। সেখানকার আবহাওয়ায় অল্পদিনেই রোগ সেরে যায়। কারখানার যে বিভাগটায় অম্লরস দিয়ে মাংস দীর্ঘ দিন রাখবার ব্যবস্থা করা হয়, অ্যামেরিকা এসে ও কাজ নিয়েছে সেই বিভাগটায়। ওদের বিভাগ দিনরাত হ'য়ে থাকে ঠাণ্ডা, মেঝেয় কাদাজল থিক থিক করছেই। সারাটা দিন ওরই মধ্যে বসে বসে কাজ করে' আবার সেই পুরোনো কাসের রোগ দেখা দিয়েছে। কাসের ধমক এলে দু'হাতে মুঠো করে' মাথার চুল ধরে' খক্ খক্ করে একটানা কাসে। মুখখানা কেমন বিকৃত হ'য়ে যায়। কাসির বেগটা কেটে যাবার অনেকক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হয়।

বেসেলিজায় বক্তৃতা করা কারও বিশেষ আসত না। তাই ওরা সেখানে কোন বই হ'তে সময় উপযোগী খানিকটা অংশ মুখস্থ করে অনুষ্ঠানাদিতে বক্তৃতা দিত। যৌবনকালে অ্যানটনি ওরফে ডেডে অ্যাণ্টানাস্ ওদের চাষাভূষো সমাজে পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিল। বন্ধু-বান্ধবের প্রেমপত্র পর্যন্ত লিখে দিত। এখনও সব কিছু ভুলে যায় নি। আজকের জন্য অভিনন্দন ও আশিসের একখানা মৌলিক অভিনন্দন রচনা করে' রেখেছে; এই বক্তৃতাটীও অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। ছেলে-মেয়েরা ঘরের ফাঁকা জায়গাটুকুতে লাফাচ্ছিল এতক্ষণ; ওরাও নিঃশব্দে দাদুর বক্তৃতা শুনতে এগিয়ে আসে। বক্তৃতা চলে, মেয়েরা কাঁদে, চোখ মোছে। বক্তৃতাটী বড় করুণ, অ্যাণ্টানাস কেমন ভাবে যেন অনুভব করে বসুন্ধরায় থাকার দিন তার শেষ হ'য়ে এসেছে; এই সব অনুভূতিই ও বলেছে সরলভাবে সোজা কথায়।

কথাগুলি শ্রোতৃবর্গের অন্তর স্পর্শ করে। বক্তৃতা শেষ হ'লে দেখা গেল প্রায় সকলেরই চোখে জল। স্বদেশবাসী জোকুবাস শেদ্বিলাস এখানে হ্যালষ্টিড ষ্ট্রীটে ছোটখাট একখানা মিঠায়ের দোকান খুলেছে।

আজ সেও নিমন্ত্রিত। বক্তৃতার ভাবে ভাষায় ওর অন্তরও ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিল। সান্ত্বনার দুটো কথা না বলে ও পারে না। ও বক্তৃতা দেয়: আজ অবস্থা যত খারাপ বোধ হচ্ছে, তত খারাপ থাকবে না, হয়তো ওদের ভালই হবে। এটুকু বলেই ও থামে না; সকলকে একটু হাসাতে চায়। বর কনেকে আশীর্বাদ করে, অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা জানায়। পরিবেশটা যেন একটু হালকা হয়। নবদম্পতির জীবনের খুঁটিনাটি তুলে ভবিষ্যদ্বাণী করে—ইউরঘিস-ওনার জীবন সুখেরই হবে। নববিবাহিতদের দৈনন্দিন জীবনের রাগবিরাগের কথা শুনতে শুনতে যুবক-যুবতীরা হাসতে আরম্ভ করে। ওনার মুখ লজ্জায় ভীষণ লাল হয়ে ওঠে। জোকুবাসের বৌ বলে স্বামীর আমার "পোয়েটিস্ক্কা রেভিনতুরে" অর্থাৎ কিনা "কবি কল্পনা" আছে। আছে হয়তো।

আমন্ত্রিতদের প্রধান কাজ এখন সম্পন্নপ্রায়; আনুষ্ঠানিক কোন কিছুর আর বিশেষ বাকী নেই। কাজেই একজন দু'জন করে' উঠতে আরম্ভ করে। পুরুষদের কেউ কেউ "বারে" হাজির হয়, অন্যরা ছোট ছোট দলে এখানে ওখানে জমা হয়, চলে গল্প, হালকা গান। প্রতি দলই নিজেদের গানে মশগুল, অন্য দল গাইছে না-গাইছে, কার-ও অসুবিধা হ'চ্ছে কিনা দেখবার কেউ প্রয়োজন বোধ করছে না, বাজনা অবশ্য বাজছে, তবে গানের সঙ্গে বাজনার মিল রাখবার পরোয়া কেউ করে না। সকলেই যেন একটু চঞ্চল; দেখলে বোধ হয় কোন মতলব আছে এদের। খানিকটা পরে দেখা গেল ঠিক তাই। দশসেরী পনের সেরী খানেওয়ালাদের খাওয়া শেষ হ'য়েছে কি হয়নি, হুড়োহুড়ি শুরু হ'য়ে গেল ভোজের "ভগ্নাবশেষ" সরাবার। বাক্স ও চেয়ারগুলো সরিয়ে দেওয়া হ'ল কোণের দিকে, দেওয়ালের পাশে কাৎ করা হ'ল টেবিলগুলো, আরম্ভ হ'ল সন্ধ্যার প্রধান অনুষ্ঠান। রসদ অর্থাৎ খানিকটা বীয়ার গিলে

কুস্তস্লেইকা ফিরে গেল ওর বেদীতে ; জনমণ্ডলীর ওপর দিয়ে দৃষ্টি ফিরে গেল একবার; বেহালার পাশটায় ঠক করে' একটা ঠোকা মেরে সযত্নে বেহালার শিরটা দিয়ে স্পর্শ করে নিজের চিবুক—আবেশে চোখ বুজে আসে। এসব প্রস্তাবনার স্থচনা! দেহটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে পাক দিয়ে বেশ কায়দামাফিক অভিবাদন জানিয়েই ও টেনে দেয় বেহালার ছড়! চোখ বন্ধই থাকে। বাজে ওয়াল্টজ নাচের স্থর। ও আর মাটিতে নেই, উড়ে চলেছে স্থরলোকের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় বেহালাদার হয়তো ওর গতিপথ ঠিক করতে পারছিল না, বেওকুফের মত খানিকক্ষণ হাঁ-করে চেয়ে রইল। হাজার হ'লেও সাগরেদ, ধরতে কতক্ষণ! ও-ও ছড় চালিয়ে দিলে। ওস্তাদের গতিপথ ধরতে ঢাকধারীর আরও খানিকটা সময় লাগল; তার পরই শুরু হ'ল ক্রম, ক্রম, ক্রম।

জোড়ে জোড়ে সব ভাগ হ'য়ে যায়, ঘর হ'য়ে ওঠে চঞ্চল। সম্ভবতঃ এদের কেউই ওয়াল্টজ নাচের কায়দাকান্থন জানে না, কিন্তু তাতে কী? গান আছে বাজনা আছে. ওরা নাচে—যেমন খুশী নাচছে, মুখে চলছে আগের মতই গান। ওরই মধ্যে যাদের বয়স কম, আজকালকার ফ্যাসন অনুযায়ী "তুইপদ" নাচটা চালাচ্ছে। বয়স্করা নাচে অদ্ভুত জটিল দেশীয় নাচ, দেশের জিনিস ওরা ছাড়তে চায় না ; ওরা নাচে মহাগম্ভীর মুখে, যেন অতি পবিত্র কোন কাজ করছে। আবার কয়েকটী জোড় নাচানাচির দিকে নেই, জুড়িকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে খালি বাজনার তালে এবং পরিবেশের গুণে ওদের পায়ে আসছে গতি, তাতেই ওরা খুশী। এই দলের মধ্যে আছে জোকুবাস স্তেদ্বিলাস আর ওর স্ত্রী লুসিজা। দু'জনে মিলে মিঠায়ের দোকান চালায়, যত বেচে তত খায়। দু'জনেই সমান মোটা, নাচা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ঘরের মাঝ-খানটীতে দু'জনে দু'জনকে ধরে রেখেছে বাহুর বাঁধনে, অন্যদের নাচের [illegible] ওরা মনের আনন্দে দোলে, দু'জনেই আনন্দে আত্মহারা, দাঁতহীন

মুখদুটী হাসিতে উদ্ভাসিত—মুখ কেন সারা দেহই ওদের হাসছে, গন্ধর্বলোক হ'তে দুটীতে যেন এই মাত্র নেমে এসেছে।

প্রৌঢ় প্রৌঢ়া বৃদ্ধ বৃদ্ধারা দেশী পোশাকের কিছু চিহ্ন পরে এসেছে; নিজেদের উৎসব; পরবেনা কেন? পুরোপুরি দেশী পোশাক কারও নেই, কেউ একটা জরিদার ফতুয়া পরেছে শার্টের ওপর, কারও হাতে বহুরঙে রঙান একখানা রুমাল, কেউ বা পরেছে দেশী ধাঁচে কাটা কোট, হাতা ঢিলে ঢিলে, বুকের দু'পাশে পোশাকী বোতামের সারি। যুবক-যুবতীরা এসবের মধ্যে নেই। ইংরেজী বলতে শিখেছে, এদেশী পোশাকের ওপর ওদের ঝোঁক বেশী; চেষ্টা ক'রে দেশী সব কিছু বাদ [illegible] মেয়েরা দোকানের তৈরী পোশাক কিনে পরেছে, অনেককে মানিয়েছেও যে[illegible] দেখতে খাসা লাগছে, যুবকরাও দোকান হতে তৈরী পোশাক কিনে পরেছে, দেখে মনে হয় মার্কিণ কেরাণী; তবে খাস মার্কিণ যুবক ঘরের মধ্যে পর্যন্ত টুপি পরে আসত না, এরা ঘরের ভেতর পর্যন্ত শুধু আসেনি, সারাক্ষণ টুপি পরেই আছে। যুবক-যুবতীদের নাচ দেশীও নয়, এদেশীও নয়, এক এক জুড়ি এক এক রকম নেচে চলেছে—চেষ্টাটা এদেশীর অনুকরণের। কোন জুড়ি পরস্পরকে সজোরে চেপে ধরে আছে, আবার কোন জুড়ি নিজেদের মধ্যে একটু ফাঁ[illegible] রেখেছে। কেউ শক্ত করে হাত বাড়িয়ে রেখেছে, কেউ আলগা[illegible]বে হাত ঝুলিয়ে রেখেছে। কেউ লাফায় তিড়িং তিড়িং করে, কেউ ভেসে যাওয়ার মত পা ঘসে ঘসে এগিয়ে যায়, কোন জুড়ি মহা-গম্ভীর হ'য়ে ধীরে ধীরে পা ওঠায় নামায়। কোন জুড়ি সবেগে সহাস্যে চলাচল করে ঘরের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত. অন্য জুড়ি সামনে পড়লে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়। ভীতু জুড়িরা ভয় পায়, এরা সাড়া দেয় "মুস্তোক্। কাস্ য়িরা?" কিছুক্ষণ পর পর যে নূতন নূতন লোক নিয়ে জুড়ি তৈরী হবে, এ ব্যবস্থা এখানে অচল। একবার যে জুড়ি তৈরী

হ'য়েছে তার আর ভাঙ্গাগড়া নেই; সারাটা সন্ধ্যা শুরুতে তৈরী জুড়িরাই নাচছে। যেমন, অ্যালেনা জ্যাসাইভাইতের বিয়ের কথা চলছে জুয়োৎসাস্ র‍্যাকৎসিয়াসের সঙ্গে, দুটিতে যে জুড়ি গড়েছে, তা আর ওরা সারা সন্ধ্যা ভাঙে নি। এই সান্ধ্যসমাগমে "সুন্দরী" পদে নির্বাচিতা হয়েছে অ্যালেনা; সত্যিই ওর রূপ আছে, কিন্তু মাটি করেছে ওর দেমাক আর গরম। একটা সাদা শার্ট-ব্লাউজ পরেছে, ওতেই হয়তো ওর অর্ধেক হপ্তার মাইনে খরচ হ'য়েছে; নাচছে কিন্তু সমস্তক্ষণটা, ঘাঘরার একটি পাশ আলতুভাবে তুলে ধরে আছে—উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের চালচলন হ'তে এটুকু নকল করেছে। জুয়োৎসাস্ ডারহামের গাড়ী চালায়, মোটা রোজ[illegible], [illegible] কম, ভাবখানা তাই কেউ-কেটা কেউ-কেটা! সারা সন্ধ্যা ও টুপিটা মাথার একপাশে ক্যাৎ করে' হেলিয়ে রেখেছে, মুখের কোণে সিগারেটের তো কামাই নেই! জাড্‌বাইগা মার্সিনকাসও কম সুন্দরী নয়, তবে ওর রূপের বড়াই নেই, শান্তশিষ্ট নরম মেয়ে। অ্যালেনার মত ও-ও কারখানায় টিনে রঙ মাখায়। কিন্তু অমন সাদা শার্ট-ব্লাউজ কেনবার পয়সা ওর নেই; বাড়িতে বৃদ্ধা অকর্মণ্য মা, দুটি ছোট বোন, ওই রোজগারটুকু ভরসা, চালিয়াতি করা ওর চলেনা। চুলের যত্নও তেমন—মাথার ওপর সব চুলক'টি জড়িয়ে একটা ঝুঁটি বেঁধে রেখেছে; নইলে অমন ঘন কাল একরাশ চুল, অমন কাল চোখ, একটু যদি ও নজর দিতে পেত, ওর কাছে কী তা'হলে আর কেউ লাগত, পোশাকও ওর তেমনি, নিজের হাতে তৈরী একটা শার্ট-ব্লাউজ; পাঁচ বছর ধরে সব উৎসবে সব ভোজকাজে ঐটেই ও পরছে, একটু ছোট হ'য়ে গেছে, মানায়ও না ঠিক; ও কিন্তু ওসব গ্রাহ্য করেনা। আজও ওদিকে খেয়াল নেই; সকলের মত ও-ও নাচছে, নাচছে ওর মিকোলাসের সঙ্গে। মিকোলাসের চেহারা বিরাট, জাড্‌বাইগার গড়ন ছোট পাতলা। মিকোলাসের দৃঢ়

বাছুর বেড়ের মধ্যে ও প্রায় হারিয়ে গেছে। ঐভাবেই জাড্‌বাইগা নাচছে, সারা সন্ধ্যা নাচবে ঐভাবে; বাঁচার আনন্দে আজীবনই হয়তো ঐভাবে নাচবে ও। এ জুড়িটীকে দেখলে হাসি পাবে হয়তো, কিন্তু ওদের জীবন-কথা জানলে মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে যাবে। পাঁচ বছর আগে প্রথম ওদের বিয়ের কথা হয়, পাকাপাকি হ'য়ে প্রস্তাব এখনও আছে, কিন্তু উপায় নেই। মিকোলাসের বাপ পাঁড় মাতাল, দিনরাত মদ গেলে। সংসারে অনেকগুলি মুখ, কিন্তু রোজগেরে একা ঐ মিকোলাস। তবু কোন রকমে হয়তো এতদিন ও একটা ব্যবস্থা করে ফেলত; দক্ষ শ্রমিক ও, ওর মজুরী খুব কম নয়। দু'দুবার দুটো দুর্ঘটনা হ'য়ে ওদের স্বপ্ন সার্থক হ'তে দেয়নি। মিকোলাস হাড় হতে গোমাংস চেঁচে তোলে। হাড়, হাত, ছুরি সবই পিছল হ'য়ে থাকে, তাই কাজটা বিপজ্জনক। তার ওপর পিস্‌ ওয়ার্ক (এতে রোজ হিসাবে মজুরী দেওয়া হয়না; একজন মজদুর যতখানি কাজ করে তারই মূল্য অনুযায়ী মজুরী দেওয়ার প্রথাকে বলে পিস ওয়ার্ক; এ প্রথা অভাবগ্রস্ত মজদুরদের বেশী মজুরীতে প্রলুব্ধ করে তার সমস্ত শক্তি নিঙ্‌ড়ে নেয়। তাকে আর মানুষ রাখেনা, কলে পরিণত করে; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তার কর্ম-ক্ষমতা খতম হ'য়ে যায়) হ'লে বা বিয়ে করবার জন্য টাকা জমাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে যে বেগে কাজ করতে হয় তাতে একাজ আরও বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে। হাত হড়কে গিয়ে বাঁট হতে ফলার ওপর পড়ে, অমনি খানিকটা কেটে যায়। এ কাটা এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক নয়; কিন্তু সামান্য ক্ষতটুকু বিষিয়ে ওঠে; তখন অবস্থা হয় বিপজ্জনক। গত তিন বৎসরে মিকোলাসের দু'বার হাত কেটেছে। দু'বারই ঘা বিষিয়ে ও শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ে—প্রথমবার মাস তিন, দ্বিতীয় বার সাত মাসের কাছাকাছি বিছানায় পড়েছিল। রুগ্ন অবস্থায় মাইনে তো পায়ই না, চাকরীও যায়। সারবার পর হপ্তা ছয়

ধরে প্রতিদিন ভোর ছটা হ'তে এক হাঁটু বরফের মধ্যে কারখানার ফটকে হাজিরা দিয়ে চাকরীর উমেদারী করতে পারলে আবার চাকরী জুটতে পারে, জোটেও। টাকা ও জমাবে কোথা হ'তে? বিদ্বান বিদ্বান সংখ্যাতাত্ত্বিকরা হিসেব করে' দেখিয়ে দিয়েছেন হাড়-চাঁচা মজদুররা ঘণ্টায় চল্লিশ সেণ্ট্ করে' মজুরী পায় (কাজেই স্বর্গসুখে থাকে!)! তাঁরা পণ্ডিত, হিসেব দেখেন, মজুরদের হাতগুলোর দিকে চেয়ে দেখেন না।

ট্যামোস্ত্‌সিয়াস সবান্ধবে মধ্যে মধ্যে থেমে যায়—দম না নিলে পারবে কেন? বাজনা থামার সঙ্গে সঙ্গে নর্তক নর্তকীরাও থেমে যায়—শান্তভাবে আবার বাজনা শুরু হওয়ার অপেক্ষা করে। ওরা কেউ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে বলে' মনে হয় না; হ'লেও উপায় নেই, বসবে কোথায়? বাদক-নেতার উৎসাহ নাচিয়েদেরই সমান, মিনিটখানেক বিশ্রাম নিয়েই ও আবার ছড় টানে, সঙ্গী দু'জনে ঘোরতর প্রতিবাদ করে, কিন্তু নেতার নির্দেশ! মুখ প্রতিবাদ করলেও হাত কাজ করে' চলে।

এবার আরম্ভ হ'ল একটা নতুন নাচ; ওদের দেশী লিথুয়ানিয়ার নাচ এটা। বরফের ওপর দিয়ে স্কেট করার অনুকরণ। এর ভঙ্গী অত্যন্ত জটিল। আধুনিকরা অনেকে তাই ওয়াল্টজের জের টেনে চলতে লাগল। শেষটায় সকলে একই নাচে একসঙ্গে যোগ দিলে! নাচ বলতে হাতে হাত লাগিয়ে বোঁ বোঁ করে' ঘুরপাক খাওয়া। এ নৃত্যের আকর্ষণ রোধ করা যায় না। বয়স কমবেশী যাই হ'ক যোগ দেয় সকলেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত জায়গাটায় সৃষ্টি হয় বহুবর্ণের অনেকগুলি ঘূর্ণির। সকল দৃশ্য সকল বর্ণনা ছাড়িয়ে যায় এই নৃত্যের পরিচালক ট্যামোস্ত্‌সিয়াস কুস্ত্‌স্লেইকা। নির্মমভাবে ও ছড় টেনে চলে, বেহালার প্রতিবাদের অন্ত নেই—শব্দ

ওঠে ক্যাঁউ-কৌঁ-ঈঁ-ঈঁ কোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ! প্রতিবাদ নিষ্ফল, ট্যামোস্ত্‌সিয়াস নির্মম, ক্ষমা নেই। কপাল স্বেদাক্ত, আগ্রহে ও ঝুঁকে পড়েছে—ভঙ্গী দেখলে মনে পড়ে সাইক্ল্‌ রেসের শেষ কয়েক গজ পার হবার চেষ্টা। যে কোন ইঞ্জিন পড়ে' গেলে যে ভাবে ঝক্‌ ঝক্‌ করে, ওরও শরীরটা তেমনি যেন লাফায় আর কাঁপে; ডান হাতখানা দেখা যায় না, বোধ হয় নীল একটা কিছু মহাবেগে ঘুরছে।

সুরের শেষ টানটায় জোর একটা ঝাঁকানি দিয়ে ও হাত দুটো ওপরে সযত্নে ছড়িয়ে দেয়—চমৎকার লাগে দেখতে; উদ্দীপনারও শেষ হ'য়ে গেছে, টলতে টলতে ও পিছিয়ে যায়, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়! নাচিয়েদের নাচ থেমে যায়, উল্লসিত আওয়াজ করে ওরা; ও একা একা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দম নেয়।

নাচের পর বীয়ার পাবে সকলেই, বাজিয়েরাও বাদ যাবে না। বীয়ার আর বিশ্রাম চলবে কিছুক্ষণ। তারপর আরম্ভ হবে এ সন্ধ্যার সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান, অ্যাকৃৎসিয়াভিমাস—একরকম নাচ, ওদের দেশী নাচ; একবার আরম্ভ হ'লে এ নাচ শেষ হ'তে তিন চার ঘণ্টা লাগে; এর রকমফের নেই, একইভাবে তিন চার ঘণ্টা ধরে চলে। সব নাচিয়ে হাত ধরাধরি করে' করে বিরাট একটা বৃত্ত, বাজনার তালে তালে বৃত্তটা ঘুরতে আরম্ভ করে; কেন্দ্রে দাঁড়ায় নব-বধূ; এক একজন করে' পুরুষ বৃত্ত হ'তে কেন্দ্রে গিয়ে কনে'র সঙ্গে নাচে; কনে'র সঙ্গে নাচবার কথা কয়েক মিনিট, কিন্তু অত বাঁধাধরা নিয়ম কেউ মানে না, যতক্ষণ খুশী নেচে নেয়। নাচটার মধ্যে সব চেয়ে স্ফূর্তির অংশ এইটেই। নাচের সঙ্গে গান চলে, চলে হাসি। নাচ শেষ হ'লে পুরুষটী বেরিয়ে আসে কেন্দ্রের বাইরে, সেখানে টেটে এলজ্‌বিয়েটা টুপি ধরে' দাঁড়িয়ে আছে; নিজ নিজ সাধ্যমত এবং কনে'র সঙ্গে নাচবার সৌভাগ্যটার যে যা মূল্য ধরে ওই

টুপিটায় ফেলে দেয়, এক হ'তে পাঁচ ডলার, যার যা সাধ্য। এইভাবে আমন্ত্রিত অভ্যাগতরা আনন্দানুষ্ঠানের খরচ তুলে দেবে, এইটেই রীতি; শুধু খরচ তুলে দেওয়া নয়, উপযুক্ত অতিথি হ'লে ভাল টাকা ওঠে যাতে করে' নবদম্পতি অঋণী জীবন আরম্ভ করতে পারে।

ভাবতে ভয় লাগে; কী খরচ এই আনন্দ অনুষ্ঠানের। দু'শো ডলারের বেশী তো নিশ্চয়, তিনশোও হ'তে পারে। এ ঘরে আজ যারা উপস্থিত তাদের অনেকেরই বাৎসরিক আয় তিনশো ডলার নয়। সক্ষম সুস্থদেহ শক্তিশালী পুরুষ এদের অনেকেই, ভোর ছ'টা হ'তে রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত এরা দিনের পর দিন খেটে যায়, এক রবিবার হ'তে আরেক রবিবার পর্যন্ত সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে পায় না, বরফের মত ঠাণ্ডা ঘরে এক আঙ্গুল উঁচু হ'য়ে জল দাঁড়িয়ে থাকে, তাতেই দাঁড়িয়ে খাটে বার চৌদ্দ ঘণ্টা করে', তবু ওরা বছরে তিনশো ডলার রোজগার করতে পারে না। ছোট ছোট ছেলে, বছর দশেক বয়স হ'য়েছে কি হয়নি, মাথায় হয়তো দু'হাত-ও উঁচু নয়, ওদের মিথ্যে বয়েস লিখিয়ে কাজে ঢোকান হ'য়েছে; বড়দের মত ওরাও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেটে যায়—কিন্তু ওদের আয় বছরে তিনশো ডলার তো দূরের কথা, তিনশোর অর্ধেক কি তিনশোর তিন ভাগের এক ভাগও হয় না। আর সেই তিনশো ডলার খরচ হবে এক সন্ধ্যায়, একটী অনুষ্ঠানের জন্য, হ'ক না বিয়ের উৎসব, তবু এটা সাজ্ঘাতিক! একজনের নিজের বিয়ের জন্য একজনের ট্যাঁক হ'তেই হ'ক, আর সকলের জন্য বিভিন্ন সময়ে সকলের পকেট হ'তেই হ'ক, ফলাফল ওদের কাছে একই—ভয়ানক।

এই ভাবে খরচ করা বেওকুফি, অমিতব্যয়িতা, আজীবন দুঃখভোগের সূচনা; কিন্তু তবু জীবনের এই একটী সন্ধ্যা কত আনন্দের, কত সুখের। এরা গরীব, আস্তে আস্তে এরা জীবনের

সব কিছুই ছেড়েছে—কিন্তু বেসেলিজা ওরা ছাড়তে পারে না, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' আছে এই অনুষ্ঠানটুকুকে। বেসেলিজাও ত্যাগ করা মানে জীবনযুদ্ধে শুধু পরাজিত হওয়া নয়, পরাজয়কে স্বীকার করে' নেওয়া। কখনও না-কখন পরাজিত হয় সকলেই, কিন্তু ক'জন মানুষ পরাজয়কে স্বীকার করে' নেয়? কত যুগ ধরে' চলে আসছে এই বেসেলিজা, পুরুষানুক্রমে, উত্তরাধিকার সূত্রে ওরা এর অনুষ্ঠান করে' চলেছে—এ যেন শুধু একটী দিন শেকল ভেঙ্গে আকাশে পাখা মেলবার ভরসায়, শুধু একটী দিন নীল আকাশে ভেসে যাবার আনন্দের জন্য, সূর্যের আলোকধারায় মাত্র একটী দিন নাইতে পারার শর্তে, আজীবন গুহার অন্ধকারে বন্দী থাকা, আজীবন আঁধারের ছায়া চোখের ওপর নাচতে দেখা। জীবনটাকে স্রোতের বুকে বুদ্বুদ বলে অনুভব করবার জন্য, যাদুকরের সোনার গোলা নিয়ে খেলা করার মত জীবনটাকে খেলনা বলে' ভাবতে পারার জন্য, হ'ক না সে শুধু এক দিনের তরে, তবু তারই আশ্বাসে সহ্য করা যায় জীবনের সব গ্লানি, সব দুঃখ, সব দুর্দশা। জীবনটা মূল্যবান, খুবই মহার্ঘ; কিন্তু একটী মাত্র চুমুকে অতি দামী মদ শেষ করে' ফেলার মধ্যেও একটা আনন্দ, একটা সার্থকতা, একটা আত্মপ্রসাদ তো আছে। হ'ক ক্ষণিক, এই ক্ষণিকের মধ্যেই মানুষ নিজেকে দেখতে পায় জীবনের অধীশ্বররূপে। এর মূল্য তো কম নয়; এরই স্মৃতি নিয়ে ও ফিরে যেতে পারে ওর জীবনভরা লাঙ্গল টানায়; একটানা নিরানন্দ নীরস ঘানির চক্রপথে।

ওদিকে কোণের ঘরে টেটে এলজবিয়টা ও ডেডে অ্যান্টেনাস ফিস ফিস করে' আলোচনা করছে, ভাবনায় চিন্তায় ওদের মুখ অন্ধকার। বেসেলিজা উৎসব যার বাড়িতেই হ'ক, এর খরচ বইবে সমাজের সকলেই। এটা ওদের সমাজের অলিখিত অনুশাসন।

প্রত্যেকেই জানে, শুধু জানে নয়, খুব ভাল ভাবে জানে, উৎসবের খরচ হিসেবে কাকে কত দিতে হবে; অংশ যাই হ'ক, ওরা দেবার চেষ্টা করে নিজের ভাগের চেয়ে বেশী; বেশী দিতে পারাটাই গৌরবের। এসব প্রথা, সামাজিক সমবায় চালু আছে ওদের দেশে।

কিন্তু এটা বিদেশ; এখানকার আবহাওয়ায় যেন বিষ আছে। যুবকরা কেমন যেন হ'য়ে গেছে। দেশের যুবকদের চেয়ে ওরা আমোদ-আহ্লাদ, নাচগান, খানাপিনা হয়তো বেশীই করে, কিন্তু টুপিটিতে কিছু দেবার নাম করে না। দেওয়াটা আইন নয়, সামাজিক প্রথা; না দিলে, একান্তে বসে নিন্দে করা যায়, কিন্তু কিছু বলা যায় না। আজকের উৎসবান্তে একজন আরেকজনের টুপি ফেলে দিয়েছে জানালার বাইরে, তারপর দু'জনেই ছুটে গেছে টুপি আনতে! কেউ-ই আর ফেরে নি। হাসিমুখে ফাঁকি দেবার চমৎকার কৌশল। আবার বার চৌদ্দজন মিলে সদর্পে চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়, আশান্বিত ভাবে চাইলে উপহাসের হাসি হাসতে ওদের বাধে না। এসব তবু কোন রকমে সহ্য করা যায়। আর একদল আছে, নাচের পর বারে গিয়ে প্রাণের আনন্দে মদ খায়, পড়ে যাবার মত অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মদ টেনে চলে। যাবার সময় ভাব দেখায়, ভাগের টাকা ও দিয়ে দিয়েছে, বা এই মিনিট খানেকের জন্য বাইরে যাচ্ছে, এখনই ফিরবে; কিন্তু যে বেরোয় ফেরার নাম আর সে করে না।

ব্যাপারটা চলেছে এই ভাবে। পরিবারের সকলেই চিন্তায় অস্থির। এত মেহনত ওরা করে চলেছে, ভবিষ্যতে যাতে ওরা একটু দাঁড়াতে পারে, কিন্তু টাকা বেরিয়ে গেল এই ভাবে। ওনা একটি পাশে চুপ করে' দাঁড়িয়েছিল, নতুন বিয়ের আনন্দ উবে গেছে; চোখে ওর বিভীষিকা। দফাওয়ারিভাবে বিল-(ধারের ফর্দ)গুলোর চিন্তা সারাদিন বিব্রত করেছে, এখন দেহ শ্রান্ত, কিন্তু—কিন্তু আতঙ্কে মন চঞ্চল, চুপ

করে দাঁড়িয়েও শান্তি নেই। দফাওয়ারি ভাবে কতবার যে ও বিল-গুলো জুড়েছে!—হলের জন্য পনের ডলার লাগবে, সাতাইশ ডলার লাগবে হাঁস বাবদ, বাজিয়েদের বার ডলার, গীর্জার আচার-অনুষ্ঠানের জন্য দিতে হবে পাঁচ ডলার, তবু তো কুমারী মায়ের আশিসের জন্য কিছুই দিতে হবে না—ফর্দের যেন শেষ নেই। এসবের তবু একটা সীমা আছে, এর পর মদের ফর্দ আসবে গ্রেইকৎস্নাসের কাছে হ'তে। আগে হ'তে মদওয়ালারা কত খরচ হ'তে পারে তার আঁচ পর্যন্ত দেবে না। ভোজ শেষ হ'লে মাথা চুলকোতে চুলকোতে এসে বলবে, আগাম হিসেবটা কম করে' ধরা হয়েছিল, আমি অবশ্য খরচ কম রাখবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিনি, কিন্তু আপনাদের আমন্ত্রিতরা যে প্রত্যেকেই মাতাল হবার মত করে' মদ খেলেন! আমি কী করব, বলুন। মুখে যত বন্ধুত্বই দেখাক, নির্মমভাবে ও ঠকাবেই। আধ গেলাস আধ গেলাস করে' মদ পরিবেশন করে পূরো গেলাসের দাম আদায় করবে, বায়না নেবার সময় হয়তো বিশেষ এক রকম মদের কথা হ'ল, দেবার সময় সে মদ না দিয়ে দেবে সাক্ষাৎ বিষ। প্রতিবাদ করে' কোন ফল হবে না। প্রতিবাদ করলে ও মদ দেওয়াই বন্ধ করবে, ফলে সমস্ত উৎসবটা পণ্ড হ'য়ে যাবে। আইন আদালতের সাহায্য নিতে যাওয়াও অর্থহীন, ওর ভগবানের কাছে করলে হয়তো বেশী ফল হবে। মদওয়ালার সঙ্গে এ অঞ্চলের রাজনীতিওয়ালাদের আঁতের সম্বন্ধ। মদওয়ালার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেলেই কী ভাবে যে কী হ'য়ে যায় এরা বুঝে উঠতে পারে না। একবার যে ওপথে গেছে সেই জানে কী বিপজ্জনক ব্যাপার ঐ আইন আদালত। তার চেয়ে মদওয়ালা যা চায় দিয়ে দেওয়া, শুধু দিয়ে দেওয়া নয়, দিয়ে মুখটী বুঁজে থাকা ঢের ভাল।

অভ্যাগতদেরই কয়েকজন সাহায্য করে' অনুষ্ঠানটাকে সুষ্ঠু করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এই ক'জনের অবস্থা-ই হ'য়ে উঠল সব চেয়ে

করুণ। বুড়ো জ্যাকুবাস দিয়েছে পাঁচ ডলার। অথচ ওর অবস্থা সবাই জানে। ক'মাস ধরে দোকানঘরের ভাড়া বাকী পড়ে ছিল, দোকান বন্ধক রেখে দেনা শোধ করেছে। বুড়ী অ্যানিয়েল সাধ্যের বাড়া করেছে; বয়স হ'য়েছে, বিধবা, সম্বলের মধ্যে চারপাঁচটী ছেলেমেয়ে আর বাতের রোগ; এমনিতেই রোগে অভাবে জেরবার হ'য়ে থাকে। কয়েকটা মুরগী আছে আর হ্যালস্টেড ষ্ট্রীটের দোকানীদের কাপড় কাচে, কাপড় কাচার মজুরীর হার না বলাই ভাল, বললে মানুষ ভিরমি খাবে। তবু ঐ মজুরী হ'তে সংসার চালিয়ে, মুরগীর ডিম আর বাচ্ছা বেচে কয়েক মাস ধরে কিছু জমিয়েছিল, তার সমস্তটাই ও লৌকিকতা হিসেবে এই বিয়েতে দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, দিন গুজরান্ বটে! ছেলেগুলো সমস্ত দিন ময়লার গাদা ঘেঁটে মুরগী-গুলোর জন্য চারা অর্থাৎ পোকামাকড় বা পচা খাবার খুঁজছে; বড় শহর, মুরগী ছেড়ে দেওয়া যায় না, দিলে হারায়, চুরি যায়। মুরগীর খাবার খালি ওরাই খোঁজেনা, আরও অমন কত ছেলেমেয়ে যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিযোগিতা বেশী হ'লে ওরা রাস্তার পাশের নালার ধারে ধারে পোকা খুঁজে বেড়ায়, তাও আবার [illegible]র চেয়ে বড় ছেলেরা কেড়ে নেয়। তাই অ্যানিয়েলও ছেলেদের পিছন পিছন যায় প্যাহারা দেবার জন্য। অ্যানিয়েল টাকা দিয়ে ওর মুরগীর দাম কষে না। এদের দাম ওর মনে। বিনি-খরচায় এগুলো হ'তে আয় হয়। শুধু কি তাই—জগতে ও সকলের চেয়ে ছোট, জগৎ ওকে ঠকিয়েছে, কিন্তু এই মুরগীগুলির ও মালিক, এরা ওকে ঠকায় না। প্রতিটী ঘণ্টা ও জীবগুলোকে চোখে চোখে রাখে, রাত্রেও পাহারায় বিরাম দেয় না—প্যাঁচার মত রাত্রির অন্ধকারেও মুরগীগুলোকে দেখতে পায়। একবার একটা মুরগী চুরি যায়, আবার এক মাস যেতে না-যেতে আর এক বার চুরির চেষ্টা

ধরা পড়ে। তারপর হ'তে পাহারার ওর বিরাম ছিলনা। বিয়েতে ওর দেওয়া অর্থের পরিমাণ হয়তো সামান্য, কিন্তু তার মূল্য তো কম নয়। এতখানি ও দিতে পারল কৃতজ্ঞতাবশে। একবার ওর বাড়ি-ভাড়া বাকী পড়ে। এর পরিণাম ভীষণ। ওকে বাড়ি হ'তে বের করে' দিত। সে সময় কিছু টাকা ধার দিয়ে এলজবিয়েটা ওকে বাঁচিয়েছিল। কয়েকদিন পরেই অবশ্য ও ধার শোধ করেছিল; কিন্তু সেই দুঃসময়ে এলজবিয়েটা যা করেছিল, সে কথা আজও ও ভুলতে পারেনি।

বিলাপ চলছে, বন্ধুবর্গ প্রায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অপরাধীরা আবার একটানা বিলাপের মধ্যে হ'তে ... গুলি ধরবার কৌতূহল নিয়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—এইটেই হ'য়ে উঠেছে সবচেয়ে অসহ্য, মহাত্মা মহাপুরুষ না হ'লে কেউ এ ব্যবহার সহ্য করতে পারে না। কারও কাছে শুনে ইউরঘিসও এসে হাজির হয়েছে; কাঁদতে কাঁদতে মেয়েরা ওকে বিপদের কথা জানায়। বিরাট ভ্রূ দুটো ওর কুঁচকে যায়, চোখ দুটো মাঝে মাঝে ঝক ঝক ক'রে ওঠে; হাতের মুঠো দুটো শক্ত হ'য়ে ওঠে; তীক্ষ্ণ চোখ দুটো সকলের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে আসে, হয়তো হতভাগাগুলোকে দু'চার ঘা লাগিয়েও দিত। কিন্তু মনে হ'ল, কী হবে? যত ঘুষিই ও মারুক ধারের পয়সা একটীও কমবে না। তা ছাড়া ও চায় ওনাকে, ওর চাওয়া ও পেয়েছে; লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় এখন মাথা গরম ক'রে দুর্নাম ছাড়া আর কিছু তো আসবে না। ওর মুখ হয় স্বাভাবিক, মুঠি দুটো ঢিলে হ'য়ে যায়। শান্তভাবে বলে, "যা হবার হয়েছে, কেঁদে কী হবে টেটে এলজবিয়েটা?" ওনা ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তার চোখে তখনও বিভীষিকা। আরও শান্ত মিষ্টিভাবে ইউরঘিস ওকে সান্ত্বনা দেয়, "ভয় কি মণি! ধারে আমরা মরব না। যা হ'ক ক'রে শোধ দেব। আরও খাটব আমি।" ঐ এক কথা ইউরঘিসের! যত বড় সমস্যাই হ'ক ইউরঘিস সোজা সমাধান ক'রে

দেয়—"আরও খাটব আমি।" ওর এ ধরণের কথায় ওনা অভ্যস্ত। লিথুয়ানিয়ায় একজন অফিসার ওর পাস নিয়ে নেয়. তখন পাস না থাকার অপরাধ দেখিয়ে আর একজন অফিসার ওকে গ্রেফ্‌তার করে; তারপর দু'জনে মিলে ওর আর-যা সম্বল ছিল তাকে তিন ভাগ ক'রে এক ভাগ নিয়ে নেয়; তখন ও বলেছিল, আমি আরও খাটব। নিউ ইয়র্কে জুটল এক দালাল; মিষ্টিমুখো লোক, মিষ্টি কথায় ওদের বশ ক'রে একরকম বন্দী ক'রেই রেখেছিল; ঘরভাড়া হ'তে শুরু ক'রে সব জিনিষেরই দাম নিত গলাকাটা দরে. চড়া দাম না দিলে সে ওদের খেতে দিত না; সেই বিপদের দিনেও ইউরঘিস বলেছিল, আমি আরও খাটব। এই আর এক বার। তবু ওনার বড় ভাল লাগে। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে ও। বড় বড় মেয়েদের মত ওরও স্বামী আছে। ভারী ভাল লাগে। স্বামীর মত স্বামী, সব মুশকিলের আসান করতে পারে এক কথায়,—এত সাহস, এত শক্তি, এত বড়।

বাচ্ছা সেবাষ্টিজোনাসটা তখনও কাঁদছিল; ধমকে ওরা ওকে চুপ করিয়ে দেয়। বাজন্দারদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবার জন্য ওদের আনা হয়নি, হ্যাঁ! বাজনা বাজে; আবার নাচ শুরু হ'য়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে কেটে পড়েছে অনেকেই। যারা আছে তাদের বেশীর ভাগই নিজের নিজের দেয় ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে, দেবার লোক আর বেশী নেই। নাচও অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ হ'য়ে গেল।

উৎসবটা কেমন বিষণ্ণতার মধ্যে শেষ হয়; ওরা চায় ভেতরে যাই থাক উৎসবটা চাঙ্গা থাক। আবার এলোমেলো ভাবে নাচ শুরু হয়। নাচিয়েদের ক্লান্তি এসে গেছে, পা চলে না, ঢালতে ঢালতে মদ হ'য়ে উঠেছে আকণ্ঠ, শরীর সোজা থাকতে চায় না। মনও বিরস। রাত্রি দুপুর হ'য়ে গেছে। নাচ আর জমে না। তবু ওরা নাচে।

আনন্দ নেই, স্ফূর্তি নেই, আধঘুমন্ত অবস্থায় উৎসব করতে হবে বলে' নাচে ; পাকের পর পাক দেয়, লাফায়, পা চালায় ; নাচ হয়। মেয়ে-পুরুষে জড়াজড়ি ক'রে নাচছে কিন্তু আধ ঘণ্টা ধরে' হয়তো কেউ কারও মুখের দিকেই চাইছে না। কোন কোন যুগল-মূর্তি নাচ ছেড়ে কোণ আশ্রয় করেছে। যারা খুব বেশী মদ খেয়েছে, তারা না নাচছে না বসছে, টহল মারছে ঘরের একদিক হ'তে আর একদিক—ধাক্কা লাগছে সজীব নির্জীব সর্ব বস্তুর সঙ্গে, ক্ষতি তাতে কারও নেই—নাচিয়েদের দৃষ্টি শূন্য, মন অর্ধঘুমন্ত। দেওয়ালের পাশে পাশে ছোট ছোট এক একটী দল বসে' গেছে, প্রত্যেকটী দল গলা ছেড়ে আলাদা আলাদা গান গাইছে। রাত্রি বাড়ে তার সঙ্গে বাড়ে মাতলামোর রকমফের, বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীদের মধ্যে। কেউ কেউ টলতে টলতে চলে, মুখ হাসি হাসি ; চলতে চলতে কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগল, অমনি দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে শুরু হ'ল ফোঁস ফোঁস কান্না, কান্নার মধ্যে দিয়ে অসংলগ্ন প্রলাপ। কেউ কেউ টলছে ঠিকই, কিন্তু ধাক্কা লাগলেই লাগছে মারামারি — অন্য মাতালরা এগিয়ে এসে ওদের ছাড়ায় ; অর্থাৎ নিজেরাও লেগে যায়। মোটা কনষ্টেবলটার যেন চৈতন্য হ'ল— হাত বাড়িয়ে একবার খুঁজে দেখলে বেটনটা ঠিক আছে কিনা। রাতদুপুরের এই মারামারি, ভাল ভাবে একবার লাগলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে ; তখন হয়তো আবার সব পুলিশ ডাকতে হবে। ঠিক করলে তার আগেই ওর সহজ দাওয়াই ছাড়বে—দাওয়াইটা আর কিছু না, যে ঝগড়া করছে তারই মাথা ফাটিয়ে দাও ; সময় থাকতে কাজে লাগলে বেশী মাথাও ফাটাতে হবে না। কারখানার পিছনদিকের বস্তী অঞ্চল, এখানে ক'টা মাথা ফাটল না-ফাটল তার বিশেষ হিসেব কেউ রাখে না, যাদের ফাটে তারাও না। সারাটা দিন জন্তু-জানোয়ারের মাথা ফাটিয়ে ফাটিয়ে

ও ব্যাপারটাকে এরা গা-সওয়া ক'রে নিয়েছে, বন্ধু বান্ধব ঘরের আত্মীয় পরিজন সকলেরই ওপর ওরা হাত পাকায়। সব সময় নয়, সময় বিশেষে, মাঝে মাঝে। মাথা ফাটান কাজটা সুখের নয়, আধুনিক পদ্ধতিতে তো বিরক্তিকর; অথচ সংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্য সমাজের পক্ষে এটা প্রয়োজনীয়; তাই একাজ যারা অসংকোচে করতে পারে অভিনন্দন তাদের জানাতেই হয়।

কিন্তু আজ রাত্রে মারামারি আর বাধতে পায় না—ইউরঘিস এদিকটায় কড়া নজর রেখেছে, কনষ্টেবলের চাইতে ঢের বেশী সাবধান হ'য়ে আছে ও। ইউরঘিসও মদ খেয়েছে প্রচুর; খাবে না কেন? খাক আর না খাক, দাম সেই দিতেই হবে, একটি পয়সাও কম হবে না, খেয়ে যতখানি উস্থল করা যায়! কিন্তু মদ ও যতই খাক, মাতাল হয় না, মেজাজ ও গরম করে না। আর একটু হ'লেই একটা মারপিট বেধে যেত, গণ্ডগোলটার গোড়ায় ছিল মেয়ারিজা। ঘণ্টা দুই আগে ও ঠিক ক'রে ফেলেছিল, কোণের বেদীটায় সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী আবির্ভূতা না হন, তাঁর পার্থিব প্রতীকগুলো নিজেদের অস্তিত্ব জানাতে বাধ্য—অবিরত জানাতে হবে। মদে ও তখন চুর; ঠিক ক'রে ফেলে হাত আর গলার জোরে ওদের অস্তিত্ব ও প্রমাণ ক'রে দেবে। এগোচ্ছিলও—হঠাৎ কানে গেল, এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মূল্য বলে অনেকেই কিছু দেয় নি। উঃ, এমনি শয়তান সব! মারামারির আগে খানিকটা গালাগাল দিয়ে মানুষ গরম হ'য়ে নেয়। সেটাকে যুদ্ধের প্রস্তাবনা বলা চলে। কিন্তু মেয়ারিজার ধাতে ও সব কিছু নেই। ঝাঁ ক'রে কাছাকাছি দুটো শয়তানের কোটের কলার ধরে মারলে একটা হাঁচকা টান। প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলেই প্রতিপক্ষ রণঘোষণা করলে। কিন্তু কনষ্টেবল এসে পাকড়ে নিয়ে গেল ওদেরই; লোকটা বিবেচক। আর বিজয়িনী মেয়ারিজা দাঁড়িয়ে রইল দুটী ছিন্ন কোটের কলার উঁচিয়ে।

মারধোর হৈ হৈ-এর জন্য বাদ্যভাণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল ; কিন্তু সে আর কতক্ষণ ? মিনিট খানেক কি বড় জোর মিনিট দুয়ের জন্য। তারপরই আবার আরম্ভ হয় আগের সুর। পাক্কা আধ ঘণ্টা ধরে এই সুরটাই বাজছে। এটা ওদের দিশী সুর নয়, এদেশী, মার্কিণী। রাস্তায় শুনে শিখেছে। গানটার কথা প্রায় সকলেই জানে—অন্ততঃ প্রথম লাইনটা। সেইটেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুনগুনিয়ে ওরা বার বার গায়—আগের মধুর নিদাঘ দিনে—আগের মধুর নিদাঘ দিনে—আগের মধুর নিদাঘ দিনে—আগের মধুর নিদাঘ দিনে ! এতে কী সম্মোহন আছে, কি জানি। বাজিয়ে গাইয়ে সকলেই যেন অভিভূত হ'য়ে সুরটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। থামছে না ওরা, থামতে পারছে না। রাত তিনটে বেজে গেছে। সমস্ত স্ফূর্তি নিঃশেষ ক'রে ওরা নেচেছে, যত শক্তি ছিল, মদে যতখানি বেশী শক্তি দিতে পারে তাও ফুরিয়েছে। থামবার শক্তিও যেন ফুরিয়ে গেছে, থামবার কথা ভাবতে পর্যন্ত ওরা কেউ পারছে না। অথচ ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় ওদের প্রত্যেককে হাজিরা দিতে হবে ডারহাম বা ব্রাউন বা জোন্সের কারখানায়। এক মিনিট দেরী হ'লে এক ঘণ্টার মাইনে কাটা যাবে। প্রতি সকালে ভুখাদল প্যাকিং কারখানাগুলোর ফটকে ফটকে বেলা আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজের আশায় বসে থাকে। যাদের বেশী দেরী হ'য়ে যায় তারাও যোগ দেয় ঐ ভুখাদলে। সাতটার হাজ্‌রে হ'তে কেউ বাদ যাবে না, ব্যতিক্রম নেই এর। এই যে ছোট্ট ওনা, ও-ও এদেরই মধ্যে। বিয়ের রাত্রির পরের দিনটার জন্য, অর্থাৎ একটা সোমবারের ও ছুটি চেয়েছিল, বিনা মজুরীর ছুটি, তাও মঞ্জুর হয়নি। হুকুম মাফিক যে কোন কাজ করতে যে অসংখ্য লোক প্রস্তুত, ছুটি নিলে চলবে কেন ? ছুটি চাও, একেবারে ছুটি নাও।

মূর্চ্ছা যাবার মত অবস্থা হ'য়ে উঠেছে ওনার—মদের গন্ধে ঘরের

হাওয়া ভারী হ'য়ে উঠেছে, সইতে পারছে না। নিজে অবশ্য ও এক ফোঁটা মদও খায়নি। কিন্তু তা হ'লে কী হবে? ঘরের অন্যান্য প্রত্যেকটী মানুষ মদের পিপে হ'য়ে বসে আছে; খালি নিশ্বাসে নয়, প্রত্যেকটী লোকের প্রত্যেকটী লোমকূপ হ'তে ভক্ ভক্ ক'রে বের হচ্ছে মদের গন্ধ। কেউ চেয়ারে, কেউ মেঝেয়, কেউ কোণে বুঁদ হ'য়ে পড়ে আছে, ফুটুস ফুটুস ক'রে নিশ্বাস পড়ছে, কাছে যায় কার সাধ্য! ইউরঘিস মাঝে মাঝে ক্ষুধাতুর দৃষ্টিতে ওনার দিকে চাইছে—লজ্জা ভুলে গেছে ও অনেকক্ষণ। তবু ঘরে এতগুলি মানুষ। দোরে একটা গাড়ী আসবার কথা। ইউরঘিস বার বার দোরের দিকে চায়, অপেক্ষা করে। গাড়ী কিন্তু আসে না, আর ও অপেক্ষা করবে না। সোজা গিয়ে ওনার সামনে দাঁড়ায়, বেচারা কাঁপে, মুখ হ'য়ে যায় বিবর্ণ। ওনার গায়ে তার শালখানা প্রথমে জড়িয়ে দিয়ে তার ওপর ইউরঘিস পরিয়ে দেয় নিজের কোটটা। ওদের বাড়িটা খান দুই ব্যারাকের পরেই। এটুকু পথের জন্য ইউরঘিস গাড়ীর তোয়াক্কা করে না।

বিদায় দেবে কে? প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। খালি এলজ্-বিয়েটা আর মেয়ারিজা একটু ফুঁপিয়ে কাঁদে। ইউরঘিস ওনাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে। নিস্তব্ধ রাত্রি, পূব আকাশে তারাগুলো ম্লান হ'য়ে আসছে। ওনা চুপচাপ ইউরঘিসের কাঁধে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। ও ঘুমিয়ে গেছে, না মূর্চ্ছা গেছে ইউর-ঘিস বুঝতে পারে না। দোরের সামনে এসে ওনাকে বাঁ হাতে ধরে ও তালা খোলে, ওনা তখন ওর মুখের দিকে চেয়ে। আদর ক'রে ইউরঘিস বলে, আজ আর তুমি ব্রাউনের কারখানায় যাবে না, মণি!

সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওনা বলে, না না, তা হ'লে আমাদের সব মাটি হ'য়ে যাবে। আমরা ধ্বংস হ'য়ে যাব।

আহা, আমার ওপর সব ছেড়ে দাও না, আমার ওপর ছেড়ে দাও। আরও বেশী টাকা রোজগার করব, আরও বেশী খাটব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাজ আবার কঠিন হয়! ইউরঘিস হেসে উড়িয়ে দেয়, কাজ আবার কঠিন হয়! বয়স কম, গায়ে জোর আছে। কাজকে কাজ বলেই ওর মনে হয় না। এ অঞ্চলের পুরোনো মজদুররা বলে, এই শহরেরই ডকে কারখানায় খাটতে খাটতে কত লোক জন্মের মত ভেঙ্গে পড়েছে, কেমন-ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, শুনতে শুনতে মানুষের মাথা ঝিম ঝিম করে, কিন্তু ইউরঘিস হাসে। মাস তিনেক হ'ল ও এখানে এসেছে, বয়স কম—একটি দৈত্য বিশেষ। ওর মধ্যে যেন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্য আছে। মেহনতে মানুষ ভেঙ্গে পড়ে! ওর মগজে কথাটা ভাল ক'রে ঢোকে না। বলে, তোমাদের মত মানুষ, তোমাদের মত প্যাঁকাটিরা ভেঙ্গে পড়বে। পিঠ দেখেছ আমার, চওড়া পিঠ?

ইউরঘিস যেন কিশোর, গ্রাম্য কিশোর। প্রাণসম্পদে, শক্তিতে, উৎসাহে সর্বদা চঞ্চল। মালিকরা এই ধরণের মজদুর চায়, এই ধরণের অসংখ্য লোক পায় না বলে' ওদের অনুযোগের অন্ত নেই। কোথাও যেতে বল, দৌড়ে যাবে। কিছু করবার না থাকলে, নাচবে-কুদবে, খেলবে, অকারণে খানিকটা হয়তো দৌড়োদৌড়ি করবে, শক্তির প্রাচুর্য বসে বা শুয়ে থাকতে ওকে দেয় না। হয়তো ও একসারি মজদুরের মধ্যে কাজ করছে, তারা পুরোনো লোক, ধীরে সুস্থে হাত যতটুকু না চালালে নয় ওরা ততটুকু চালায়, ওর কিন্তু মনে হয় লোকগুলো সব ঢীমে আলসে, ও হ'য়ে ওঠে চঞ্চল, অস্থির। বহু লোকের মধ্যে তাই সহজেই

ওকে চোখে পড়ে। এখানে আসার ঠিক পরের দিন আরও অনেকের মত ও-ও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রাউন এণ্ড কোম্পানীর "কেন্দ্রীয় সময় দপ্তরের" সামনে; দিনের পর দিন ওখানে কত লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও চাকরি পায় না; ওকে কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী দাঁড়াতে হয়নি। ভিড়ের মধ্যে হ'তে ওকে মালিকদের একজন ডেকে নিয়েছিল। এই ব্যাপারটা নিয়ে আজও ওর গর্বের অন্ত নেই; কোন কোন মজদুর বলে মজদুরের জীবন বড় দুঃখের, প্রথম দিনের ঘটনাটা উল্লেখ ক'রে ও তাদের উপহাস করে—হিম্মত থাকলে কাজের অভাব, না দুঃখ! ওরা বোঝায়, ঐ ভিড়ের মধ্যে এমন লোকও দাঁড়িয়েছিল যারা দু'তিন মাস দাঁড়িয়ে থেকেও একটা কাজ পায়নি। কাকে বোঝাবে ও জবাব দেয়, কিন্তু কেমন লোক, তা দেখ! স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নে ড় ডিগডিগ করছে, অকম্মা, অপদার্থ, মদ খেয়ে খেয়ে ফতুর হ'য়ে আছে সব দিক হ'তে, এখন টাকা চায় আরও মদ গেলবার জন্য! নতে চাও, এমনি বাহু নিয়ে—বলতে বলতে মুঠি বদ্ধ ক'রে হাত দুটো তুলে ধরে, দুটি হাতের পেশীগুলি নাচতে থাকে—এমনি দুটো হাত থাকতে আমার উপোস করতে হবে, না এমন হাতের কদর ওরা বুঝবে না?

ওরা জবাব দেয়, গ্রাম হ'তে, অজ পাড়াগাঁ হ'তে এসেছ কিনা, তাই! কথাটা সত্যি। শহুরে হওয়া তো দূরের কথা, মাঝারি বা বড় শহর ও এর আগে দেখেনি পর্যন্ত। ওর বাবা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদার বাবা, তার বাবা, তার বাবা, গল্পে ওরা যতদূর পর্যন্ত শুনেছে, ততদূর পর্যন্ত ওদের সকলেই লিথুয়ানিয়ার ব্রেলোবিকংস বা রাজবনে বাস ক'রে আসছে। ও-ই প্রথম বের হয়েছে বাইরের জগতে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে, ওনাকে নিজের করবার সম্পদ অর্জন করতে। কয়েক লক্ষ বিঘে জমির ওপর লিথুয়ানিয়ার "রাজবন", সংরক্ষিত এই বনটিতে অভিজাতরা শিকার করেন। বেশী কিষাণকে

এখানে থাকতে দেওয়া হয় না। পূর্বপুরুষের আমল হ'তে জঙ্গলের মধ্যে বিঘে আঠারো জমি অ্যাণ্টেনাস রুদকসরা ভোগ ক'রে আসছে। এইটুকুর ওপর ওর পূর্বপুরুষরা, ও নিজে, ওর ছেলেপুলে সবাই মানুষ হ'য়েছে। ইউরঘিসরা দুই ভাই, এক বোন। ইউরঘিস ছোট। ওর বড়ভাইকে সৈন্যদলে ভর্তি হ'তে বাধ্য করা হয়—সে বছর দশ আগেকার কথা; তারপর সে মরেছে না বেঁচে আছে জানা যায়নি। বোনটার বিয়ে হ'য়েছিল ঐ বনেরই এক কিষাণের ছেলের সঙ্গে। এই জামাইয়ের কাছে জমিজমা বেচে অ্যাণ্টেনাস ছেলের সঙ্গে আমেরিকা এসেছে।

বছর দেড় আগেকার কথা। ওদের গ্রাম হ'তে প্রায় একশো মাইল দূরে একটা মেলা বসেছিল। মেলাটায় দূরদূরান্তরের চাষীরা ঘোড়া বেচতে আসে। ইউরঘিস-ও বাপের দুটো ঘোড়া বেচতে গিয়েছিল। এখানেই ওর চোখোচোখি হ'ল ওনার সঙ্গে। বরাবরই ও মেয়েদের সম্বন্ধে উদাসীন, বিয়ের কথা কখনও ভাবেনি। বিয়ের কথা উঠলেই বলেছে, দিব্যি আছি, ফাঁদে পড়া কেন বাবার! কিন্তু এ কী! বার ছয় ওনার সঙ্গে চোখ মিলতেই ও বিব্রত হ'য়ে উঠল, মুখখানা হ'য়ে গেল লাল টকটকে। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ক'রে, সোজা গিয়ে ওনার মা বাপের কাছে প্রস্তাব করলে, এই ঘোড়া দুটোর বদলে মেয়ে বেচবে তোমরা?—বৌ হবে আমার। ওনার বাপ যেন পাহাড়—অচল অটল! "কচি মেয়ে, ওর কি এখন বিয়ের বয়স হ'য়েছে? আমাদের অবস্থা ভাল। ওভাবে আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে না।" ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ইউরঘিস বাড়ী ফিরল। ঠিক করলে, দিনরাত খাটব, তা হ'লেই সব ভুলে যাব। ফসল কাটা হ'য়ে গেল। হাতে কাজ নেই, কিন্তু মনের বিশ্রাম নেই। ভোলা অত সহজ নয়। ওনাদের বাড়ী চৌদ্দ দিনের পথ। তাই সই। ও চলল।

আশাতীত সৌভাগ্য! ওনার বাপ মারা গেছে, ঋণের দায়ে সম্পত্তি বাঁধা পড়েছে; ওনা আর আকাশের চাঁদ নয়, হাতের কাছের জিনিসটি। বাড়িতে ওনার সংমা টেটে (মাসী) এলজবিয়েটা লুকোস্তসাইটা, ওনা আর বিভিন্ন বয়সের ছ'টি সং-ভাইবোন; ওনার ভাই জোনাস আছে, ভগ্নস্বাস্থ্য, শুকিয়ে গেছে, আগে খামারে খাটত। তবু ইউরঘিসের মনে হয়েছিল এরা একটা কেউকেটা; ওর বাস বনে, বন হ'তে সদ্য আসছিল, চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। ওনা লিখতে পড়তে জানে; খালি কি লিখতে পড়তেই জানে, আরও কত কী জানে, ইউরঘিস সে সবের কিছুই জানে না। আর এখন? ক্ষেত খামার সব বিকিয়ে গেছে, বাড়িও বাঁধা পড়েছে; দুনিয়ায় ওদের এখন সম্বল সাতশ' রুবল্। এর তিন গুণ অন্ততঃ আজ ওদের থাকত; কিন্তু এক ভাগ গেছে আদালতে, তাতেও যখন জজ সাহেবের রায় ওদের বিরুদ্ধে যাবার মত হ'ল, ওরা আরও এক ভাগ ছেড়ে দিলে। মামলার গহ্বরে ঢুকে গেল চৌদ্দ শো।

বিয়ে ক'রে এদের ছেড়ে ওনা চলে যেতে পারত কিন্তু গেল না; সংমা হ'লেও এলজবিয়েটাকে ও ভালবাসে, এদের ছেড়ে যেতে চায় না। একদিন জোনাস বললে, আমেরিকা গেলে হয়— আমেরিকায় তার এক বন্ধু নাকি বড়লোক হ'য়ে গেছে। ইউরঘিসও আমেরিকার নাম শুনেছে; তার সঙ্গে শুনেছে, আমেরিকায় নাকি দিন তিন রুবল্ ক'রে রোজগার করা যায়। কথাটা এখন মনে পড়ে যায়। রোজগার আমেরিকায় হ'লেও খরচের হিসেবটা ও করে এখানকার দরে। উঃ, কত টাকা যে বেঁচে যাবে! বিয়ে করা তো হবেই, ফাঁকতালে বড়লোক পর্যন্ত হ'য়ে যাবে। আমেরিকা! শুনেছে, সেখানে সব মানুষই স্বাধীন, ধনী হ'ক গরীব হ'ক নিজের ইচ্ছামত চলবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। সেখানে নাকি সরকারী

অফিসাররা কলম দিয়ে গরীবের ট্যাঁক কাটে না, জমিদারের হুকুম-মাফিক সেখানে নাকি সেপাই হ'তে হয় না। ধনী হ'ক গরীব হ'ক নিজের খুশীমত চলবার অধিকার সকলেরই আছে। জোনাস বলে, সাধ্যমত ও নিজে খাটবে, বাড়ীর মেয়েরা এবং তার সঙ্গে দরকার হ'লে ছেলেরাও একটু আধটু খাটবে, তা হ'লেই চলে যাবে। আমেরিকায় সংসার চালাবার আবার ভাবনা! ইউরঘিস তো খাটবেই। আমেরিকা! যুবকযুবতী প্রেমিকপ্রেমিকার স্বপ্নের দেশ। অভাব শুধু জাহাজের ভাড়াটার; সেটুকু যদি কোনও রকমে জুটে যায়, ব্যস্—তা হ'লেই ভাববার আর কিছু থাকবে না।

ঠিক হ'ল আগামী বসন্তকালে ওরা যাত্রা করবে। ইতিমধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইউরঘিস নিজেকে এক ঠিকেদারের কাছে বিক্রী করলে; ওর মত আরও কত লোক—দল বেঁধে ওরা চলল বাড়ী হ'তে প্রায় চারশো মাইল দূরে স্মোলেন্স্ক্ রেলপথে কাজ করতে। সে এক ভয়াবহ বিশ্রী অভিজ্ঞতা! কর্তৃপক্ষের নোংরামি আর নিষ্ঠুরতা তো আছেই, তার ওপর অতি পরিশ্রম, অল্প অপর্যাপ্ত আহার। ইউরঘিস কিন্তু দমল না; স্বাস্থ্যও ওর পড়ল না। চুক্তিশেষে ফিরে এল; মজুরী হ'তে বাঁচিয়ে আশী রুবল্ সেলাই ক'রে নিয়ে এল কোটের ভেতরে। চুক্তির সময়টা ও মদ খায়নি, মারপিট করেনি, হুকুমমত খেটে গেছে নিঃশব্দে আর ভেবেছে ওনার কথা। কখনো কখনো ও অবশ্য রেগেছে সঙ্গীসাথীদের ওপর, যার ওপর রেগেছে তার অবস্থা হ'য়েছে কাহিল। চুক্তি শেষ হ'ল, সকলের সঙ্গে ইউরঘিসও মজুরী পেলে। কিন্তু কোম্পানীর সুচতুর ব্যবস্থায় খোলা থাকে জুয়ার আড্ডা, পচুই-এর ভাটিখানা; প্রলোভন ছাড়াও এ দু'টিতে টাকা ওড়াতে মজদুরদের বাধ্য করা হয় গায়ের জোরে। নইলে এটাকে মূলধন ক'রে মজদুররা স্বাধীনভাবে বাঁচবার চেষ্টা করবে,

কোম্পানীর কাছে এ ব্যবস্থা একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। ইউরঘিস কিন্তু খরচ করবে না কিছুতেই। কোম্পানীর দালালরা ওকে খুন করবার চেষ্টা করে। ঘোরা পথ, কখনও অপথ আশ্রয় ক'রে ও লুকিয়ে লুকিয়ে পালায় বাড়ির দিকে। পথে চাষাদের ক্ষেতে খামারে খাটে, খাইখরচ আর থাকবার একটু আস্তানা তাই হ'তেই উঠে যায়। আধজাগা হ'য়ে ও ঘুমোয়, নইলে কোটের ভেতর সেলাই করা টাকা লুঠ হ'য়ে যেতে পারে।

গ্রীষ্মকালে ওরা আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করলে। শেষ মুহূর্তে ওদের সঙ্গ নিলে মেয়ারিজা বার্কংসাইনস্কাস। সম্পর্কে ওনার বোন। ছোটবেলায় মা বাপ মারা যায়; তখন হ'তে ও কাজ করছিল ভিলনার এক সচ্ছল চাষী ঘরে। চাষী এতদিন নিয়মমত ওকে উঠতে বসতে ঠেঙিয়ে এসেছে। সয়ে যাওয়া ছাড়া বেচারার উপায় ছিল না। বিশ বছর বয়স হ'ল। মেয়ারিজা ঠিক করলে, মুখ বুজে আর মার খাবে না। ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিন মারমুখো মনিবের ঘাড়ে; মরতে মরতে মনিব কোম রকমে বেঁচে গেল। মেয়ারিজারও চাকরি খতম হ'ল।

দলে সব সমেত লোক হ'ল বারোজন, পাঁচজন বড়, ছ'জন বাচ্ছা—আর ওনা, ত্ব' দলেরই খানিকটা, বড়ও বলা যা , ছোটদের দলে ফেললে ক্ষতি হয় না। আমেরিকার কোন্ এক কোম্পানীর দালাল জাহাজে ওদের দেখাশোনার ভার নিলে। এত বড় বন্ধু! জাহাজের কর্মচারীদের যোগসাজসে বন্ধুই পাতল ওদের পকেট কাটার ফাঁদ। নড়তে চড়তে টাকা খরচ হ'য়ে যায়। ঐ টাকা ক'টিই ওদের সম্বল; প্রাণপণে ওরা টাকা আঁকড়ে থাকে। প্রতিপক্ষ আইন দেখায়, টাকা বের করতেই হয়; নিউ ইয়র্কেও একই অবস্থা। নূতন দেশ, নূতন তার ধরণ-ধারণ। এর কিছুই ওরা জানে না। নীল উর্দি পরে যে কোন লোক ওদের নিয়ে যায় যে কোন হোটেলে। খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হয়। এ

রকম লোক ছাড়া তো কেউ নেই এদেশে ওদের সাহায্য করবার। হোটেল হ'তে বেরুবার সময় খরচের ফর্দ দেখে চোখ হয়ে যায় ছানাবড়া। আইন আছে হোটেলের দোরে দামের তালিকা টাঙাতে হবে, কিন্তু লিথুয়ানিয় ভাষায় টাঙাতে হবে এমন আইন নেই।

জোনাসের বন্ধু অবস্থা ফিরিয়েছে শিকাগোর কারখানা অঞ্চলে। ওরাও যাবে সেই শিকাগো। ঐ এক শব্দ শিকাগো ছাড়া এ দেশের আর কোন কথা ওরা জানে না। শিকাগো পৌঁছবার আগে জানবার দরকারও বিশেষ নেই। এক জায়গায় এসে গাড়ীওয়ালাদের নির্দেশে হুড়মুড় ক'রে ওরা গাড়ী হ'তে নেমে পড়ে। নামল ওরা শিকাগোর ডীয়ারবর্ণ ষ্ট্রীটে। দুধারে বড় বড় কালো কালো বাড়ী চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। তাজ্জব বনে যায় ওরা। বেওকুফের মত এদিক ওদিক চায়। এসে গেছে কিনা বুঝতে পারে না। শিকাগো বললে একটা দিক কেউ আর দেখিয়ে দেয় না। লোক দেখলেই ওরা বলে ওঠে, শিকাগো। ওদের প্রশ্নে কেউ বিব্রত বোধ করে—কী জবাব দেবে ভেবে পায় না, কেউ হাসে, কেউ বা কোন জবাব না দিয়ে চলে যায়। এমন বিপদেও পড়ে মানুষ!

অসহায় জীব ক'টিকে দেখলে মায়া হয়। সরকারী উর্দিপরা মানুষ দেখলেই ভয়ে ওদের প্রাণ কাঠ হ'য়ে যায়, পুলিস দেখলেও গলি-ঘুঁজি ধরে। সমস্ত দিনটা শহরময় ঘুরে ঘুরে কাটল, একটু রাত্রে লোক চলাচল একটু কম হ'লে ওরা একটা গাড়ীবারান্দার নীচে জড়সড় হ'য়ে গা এলিয়ে দেয়। তাতেও কি রক্ষা আছে। একটুক্ষণ যেতে-না-যেতেই পুলিস এসে ওদের থানায় ধরে নিয়ে যায়। সারাটা রাত্রি সেখানে পড়ে থাকে। সকালে একজন দোভাষী জোটে। ওদের আবার একটা গাড়ীতে পোরা হয়। আনন্দের আর ওদের সীমা থাকে না—

গাঁটের পয়সা আর খরচ করতে হ'ল না! নূতন একটা কথাও শেখে—কারখানার মাঠ।

গাড়ীর জানালা দিয়ে ওরা বাইরে চেয়ে থাকে। যে রাস্তা দিয়ে ওদের গাড়ী ছুটেছে তার যেন আর শেষ নেই—ওরা জানে না যে, চৌত্রিশ মাইল ধরে এই রাস্তাটায় ওদের গাড়ী ছুটবে। পথের দু'ধারে বরাবর চলেছে ছোট ছোট খাঁচার মত দোতলা কাঠের বাড়ী, মধ্যে মধ্যে দু'একটা গলি বেরিয়েছে, সেগুলোতেও দেখা যায় ঐ একই ধরণের বাড়ী চলে গেছে বহুদূর পর্যন্ত, কদর্য, নোংরা ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়ীগুলো দেখতে দেখতে চোখ মন ক্লান্ত হ'য়ে যায়। অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে তো চলেছেই। কোথাও পাহাড় বা হ্রদ তো দূরের কথা একটা টিপি বা পুকুর পর্যন্ত চোখে পড়বে না—খালি ঐ নোংরা বিশ্রী দোতলা কাঠের বাড়ী আর বাড়ী। মাঝে মাঝে দু'একটা সাঁকো, তাদের নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে নালার মত সংকীর্ণ এবং নালার মত পচা জলওয়ালা কাঁদর (বা অতি ছোট নদী)। কিন্তু এদের পাড়গুলো বন্দরের বড় নদীর পাড়ের মত বাঁধানো, পুলের ওপর দিয়ে বিজলী রেল আছে, মালভরা গাড়ীগুলো এপার ওপার করছে। ইঞ্জিনওয়ালা রেলগাড়ীও আছে—ধোঁয়ায়, শব্দে আশপাশকে আরও কদর্য ক'রে তুলছে। কখনও বা দেখা যায় বিরাট একটা কারখানা—অনেকখানি জায়গা নিয়ে নীচু নোংরা বিশ্রী কতকগুলো বাড়ী, জানালার যেন গোণাগুণতি নেই; বাড়ীগুলোর মধ্যে হ'তে মাথা তুলেছে বহু চিমনি—ধোঁয়ায় আকাশ কালো হ'য়ে যাচ্ছে, মাটিও স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলছে। পুল বা কারখানা দৃশ্যবৈচিত্র্য মাত্র, সেগুলো পার হ'লেই আবার চলে সেই খাঁচার মত কাঠের বাড়ীর সারি।

গাড়ী ছুটে চলেছে, ওরা উপলব্ধি করে প্রকৃতি এবং আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। ওদের মনে হয়, আকাশটা অবিরত যেন বেশী ক'রে

কালিয়ে যাচ্ছে ; মনে হয়, এখানকার ঘাসগুলো তত সবুজ নয় ; সব কিছুই যেন বিবর্ণ, কুরূপ, ঘিঞ্জি। মাঠ বা মাটি যেটুকু দেখা যায়, তার কোথাও উর্বরতার লেশমাত্র নেই, পোড়া মাটির মত লালচে ; প্রকৃতি বলে' যেন এখানে কিছুই নেই, যা আছে সেটুকু বর্ণে রূপে বিভীষিকা, নয়। গাড়ী এগোয়। ধোঁয়া ক্রমশঃ বাড়ে। ধোঁয়ার সঙ্গে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসে। গন্ধটা ভাল লাগা উচিত, কি নয়, ওরা ঠিক বুঝতে পারে না। খালি বোঝে, এটা অজানা অদ্ভুত একটা গন্ধ। গন্ধটায় অসুখ করবে কিনা তাও ওরা জানে না। গাড়ী এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে গন্ধের তীব্রতা বাড়ে ; ওরা বোঝে, গন্ধের উৎসস্থলের, জন্মস্থানের কাছে ওরা যাচ্ছে ; বোঝে, গন্ধটার জন্মস্থানে পৌছবার জন্যই ওরা সেই সুদূর লিথুয়ানিয়া হ'তে আসছে। গন্ধটা এখন ভীষণ তীব্র হ'য়ে উঠেছে ; শুধু ঘ্রাণ নয়, এখন যেন আস্বাদ পর্যন্ত নেওয়া যায়। তাই বা কেন, গন্ধে বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে, ইচ্ছে করলে হাতে নেওয়া পর্যন্ত যায় যেন। গন্ধটার প্রকৃতি নিয়ে ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়, কেউ বলে এটা প্রাকৃতিক, হৃদ্য ; কেউ বলে এটি সদ্য ওঠা পচা গন্ধ, নাক জ্বালা করে এতে। কেউ আনন্দে শুধু নাক দিয়ে নয়, মুখ দিয়েও গন্ধটা টেনে নেয়, কেউ আবার নাকে রুমাল দেয়। গন্ধটার প্রকৃতি নিয়ে বিস্ময়ের তখনও তাদের শেষ হয়নি, আলোচনাও চলছে এমন সময় সশব্দে গাড়ী থামল। বাইরের হেঁচকা টানে দোর খুলে গেল, একটি কর্কশ গলার আওয়াজ হ'ল, "কারখানার মাঠ"।

সেখানেই একটা চৌমাথার কোণে ঠাসাঠাসি ওরা দাড়িয়ে থাকে। পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে, তার দু'পাশে কালো ইঁটের বাড়ী, বাড়ীগুলোর মাথা হ'তে উঠেছে সারি সারি চিমনি, ধোঁয়াও উঠেছে সারি সারি ; পরিমাণ দেখে মনে হয়, ভূগর্ভের আদিম আগুন হ'তে অপরিমিত ধোঁয়া উঠছে ; ধোঁয়ার স্রোতের শেষ আর হয় না।

এখনই শেষ হবে হবে আশা ক'রে চেয়ে থাকলে, চোখ ক্লান্ত হ'য়ে যায়, ধোঁয়া ওঠার শেষ হয় না। পাকিয়ে পাকিয়ে অপরিমিত ধোঁয়ার কুণ্ডলী আলাদা আলাদা হ'য়ে উঠছে, চলছে, সব ক'টি ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিশে আকাশের বুকে তৈরী হ'চ্ছে ধোঁয়ার একটা বিরাট নদী ; নদীটা বয়ে চলেছে দৃষ্টিসীমানার বাইরে ; কিন্তু মাথার ওপরের, আশপাশের ধোঁয়া তাতে শেষ হচ্ছে না। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়াও যাওয়া-আসা করছে ; দৃষ্টিপথ ক'রে রেখেছে অস্বচ্ছ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দলটার খেয়াল হয় অদ্ভুত একটা শব্দ সম্বন্ধে। এও, গন্ধটার মত, যেন প্রাকৃতিক। হাজার হাজার ছোট ছোট শব্দ মিলে অস্পষ্ট নামহীন একটা শব্দ অবিরত হ'য়ে চলেছে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এটা বোঝা যায় না, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বোঝা যায় কী যেন একটা শব্দে মন বিরক্ত হ'চ্ছে, অন্ততঃ কী যেন একটা শব্দে মন আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকছে। বনের বসন্ত সমারোহে যেন কোটি কোটি মৌমাছি গুঞ্জন শুরু ক'রে দিয়েছে, শীতান্তের বনের পত্রমর্মর, এ যেন পৃথিবীর নিজের গতির শব্দ। অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে থাকলে বোঝা যায়, এটা হাজার হাজার গরু মহিষ ছাগল ভেড়া শূয়ারের ডাকের দূরাগত মিলিত শব্দ।

শব্দ গন্ধের অনুসরণ করবার ইচ্ছে হয় ওদের, কিন্তু এই বিদেশ বিভুঁই-এ ওসব বিলাস করবার সময় কই? এদিকে আবার রাস্তার পুলিসের নজর পড়েছে ওদের ওপর। ওরা আর দাঁড়ায় না, চলতে শুরু করে, যেখানে হ'ক যে চুলোয় হ'ক, তবু চলতে হবে, দাঁড়ালে চলবে না। বেলা হ'য়েছে অনেকখানি, এখনও কারও পেটে একটা দানা পড়া তো দূরের কথা, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত এখনও কারও মুখে পড়েনি। ছেলেগুলো ক্ষিধেয় গুঁই গুঁই শুরু ক'রে দিয়েছে। খানিকটা গিয়েই জোনাস উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। সকলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ;

ব্যাপার কী! উল্লাস, না ভয়? উল্লসিত জোনাস একটা দোকানের নামফলক দেখায়। লেখা আছে—কে, স্তেদ্বিলাস, মিঠায়ের দোকান। জোনাস দৌড়ে দোকানে ঢুকে পড়ে। টেটে এলজবিয়েটার মনে পড়ে যায়, দেশে এই স্তেদ্বিলাসের সম্বন্ধেই গল্প প্রচলিত; এই নাকি আমেরিকা এসে অবিশ্বাস্যরকম ধনী হ'য়েছে। এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারে, অতুল বৈভবের উদ্ভব মিঠায়ের এই দোকানটুকু হ'তে। মোটা একটা লোক জোনাসের হাত ধরে বেরিয়ে এল দোকান হ'তে। এতদিন পরে দেশ হ'তে দেশোয়ালী "ভাই" এসেছে, স্তেদ্বিলাসের আনন্দের আর সীমা নেই, হাসিতে ও জায়গাটুকু মুখরিত ক'রে তোলে। এরা যেন হাতে স্বর্গ পায়।

মহানন্দের মধ্যে দীর্ঘ যাত্রার অন্ত হ'ল। পরিবার দুটির লোকেরা এ ওর গলা ধ'রে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে লাগল—দেশের লোকের সঙ্গে দেখা। স্তেদ্বিলাসরা নিজেদের জেলার লোক অনেকদিন দেখেনি, আনন্দ তাই আত্মীয়মিলনের মত। দুপুর গড়াতে গড়াতে এরা আজীবনের সৌহার্দ্যের বন্ধনে বাঁধা পড়ে। কথার আর শেষ হয় না। আমেরিকার সভ্যতা নতুন ধরণের—এ সভ্যতার খানাখন্দ স্তেদ্বিলাসের নখদর্পণে, এর ধাঁধাগুলো ওর কছে খোলা চিঠির সামিল। কখন কীভাবে চলতে হবে ও ওদের বুঝিয়ে দেয়। এ সবের থেকেও যা জরুরী—ওরা এখন কী করবে—সেও ও বলতে পারে। ওদের ও নিয়ে যায় পনি এনিয়েল জুকিয়েনের কাছে। কারখানার মাঠের ওদিকটায় জুকিয়েন বুড়ীর একটা বোর্ডিং হাউসের মত আছে—ঘর-দোরের অবস্থা বলবার নত নয়, কিন্তু গরীবের শোনবার, যাচাই করবারই বা কী আছে! টেটে এলজবিয়েটা বলে উঠল, বাড়তি দুটো পয়সা খরচ করাও আমাদের পক্ষে এখন কষ্টকর। বাব্বাঃ যা খরচ এদেশে! সস্তা হলেই হ'ল, কেমন ঘর দেখার দরকার নেই আমাদের। ওরা

শুনে এসেছিল আমেরিকা দেশটায় রোজগার হয় খুবই চড়া হারে, ক'দিনের অভিজ্ঞতা হ'তে ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছে আমেরিকা দেশটায় খরচ হয় আরও চড়া হারে। আমেরিকার গরীবের সঙ্গে অন্য দেশের গরীবের কোন তফাৎই নেই, একই হাল। একটা রাত্রির ধাক্কাতেই ইউরঘিসের ঐশ্বর্যের স্বপ্ন চূর্ণ হ'য়ে গেল। আয় ও ব্যয়ের হার দুটো সমান চড়া হ'লেও তত দুঃখ ওরা পেত না—ওরা রোজগার করবে লিথুয়ানিয়ার হারে, কিন্তু খরচ করতে হ'চ্ছে আমেরিকার হারে—মনে হয় দুনিয়া বড় নিষ্ঠুর! গত দুটো দিন খরচে খরচে ওদের প্রাণান্ত হ'য়ে গেছে, একরকম উপোস করেই দুটো দিন কেটেছে; খাবে কী? কোন জিনিসে হাত দেবার জো আছে! রেলে আসতে যে কোন জিনিসের দর করেছে, গলাকাটা তারই দর। অত দাম দিয়ে মানুষ কিছু কিনতে পারে, না খেতে পারে?

তবু জুকিয়েন বুড়ীর ঘরগুলো দেখে ওদের দম বন্ধ হ'য়ে আসে। দেশে তো নয়ই, আসবার পথেও কোথাও ওরা এমন ঘরে মানুষ বাস করতে দেখেনি। আসতে আসতে অবশ্য কাঠের দোতলা বাড়ীর সারিগুলো দেখেছে, কিন্তু তার অন্দর যে এমন ওরা কল্পনাও করেনি। জুকিয়েন কারখানার পিছন দিকে ঐধরণের একটা বাড়ীর চারখানা "ঘরের" একখানা ফ্ল্যাট নিয়ে বোর্ডিং হাউস খুলেছে—তাও আবার একটা বোর্ডিং হাউস নয়, প্রতিখানি ঘর নিয়ে এক একখানা বোর্ডিং হাউস। বোর্ডিং হাউসগুলিতে লিথুয়ানিয়ান, পোল, শ্লোভাক, বোহেমিয়ান প্রভৃতি বিদেশীরা এসে আস্তানা নেয়। এই ধরণের আরও বোর্ডিং হাউস আছে, কোনটা ব্যক্তিগত, কোনটা-বা যৌথ 'কারবার'। এক একটা ঘরে সাধারণতঃ ছ'-সাত জনকে থাকতে হয়। তবে সাধারণতঃ কথাটা এখানে অসাধারণত্বে পৌঁছেছে—অধিকাংশ সময়ই এক একটায় চৌদ্দ-পনেরো জন এবং এক একটা ফ্ল্যাটে পঞ্চাশ-ষাট জন ক'রে মানুষকে

বাস করতে হয়। বিছানাপত্রের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়। মেঝেতেই লাগালাগি হ'য়ে বিছানা পড়ে যায় সারি সারি। একই বিছানায় হয়তো দু'জন লোক থাকে, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের দেখাও হয় না—একজন কাজ করে দিনে শোয় রাত্রে, অন্যজন কাজ করে রাত্রে শোয় দিনে। কোন কোন বোর্ডিং হাউস রাতে এবং দিনে দু' দফায় ঘরগুলো ভাড়া দেয়। যে দফা শেষ হয় তার বিছানাগুলো কোণায় টিপোনো থাকে। এক এক বাড়ীওয়ালা আবার বিছানা অর্থাৎ খড় পোরা চটের চ্যাপ্‌টা থলে রাখে—দুটো শিফ্‌টে একই বিছানা ভাড়া দিয়ে দু'পয়সা আসে।

জুকিয়েন বুড়ীর মুখচোখ আশ্চর্যরকম পাকানো-গুটোনো—সবটা যেন জমাট বাঁধতে চায়; ওর জীবনটাও হয়তো চায় খালি জমাতে। ওর বোর্ডিঙের সামনেটা দিয়ে ঢোকে কার সাধ্য—জঞ্জালে নোংরায় স্তূপাকার! পিছনটি দিয়ে ঢোকা যায় কষ্টেসৃষ্টে, কিন্তু সেখানে সিঁড়ির পাশে ও খাড়া করেছে রাজ্যের যত তক্তা—এটা ওর হাঁস-মুরগীর ঘর; দু'পয়সা এতে হ'তেও আসে। তাছাড়া মুরগীগুলোকে ঘরে ঘরে ছেড়ে দিলে তারা পোকামাকড় ধরে খায়। ঘরও তাতে সাফ থাকে, ওদেরও আহার জোটে। বোর্ডিংবাসীরা হয়তো সাফ থাকার দিকটা ভাবে, বুড়ী ভাবে মুরগী চারার কথা—নিঃখরচায় মুরগী পোষা; ঘরে ঘরে পোকামাকড় তো কম নেই। অনেকদিন হ'তেই বুড়ী কোন কিছু সাফসুতরা রাখার খেয়াল ছেড়ে দিয়েছে। না ছেড়ে উপায় কি? অমন বাত হ'লে কি কেউ ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে বেড়াতে পারে। সাফসুতরা! বাতের যন্ত্রণা উঠলে বেচারা হপ্তাভোর ঘরের কোণে পুঁটুলি হ'য়ে পড়ে থাকে। একবার অমনি পড়েছিল ও; সে সুযোগে জন পাঁচেক ভাড়াটে একগাদা বাকী ফেলে রেখে প্যাকিং শহর ছেড়ে ভাগল কোন গাঁ মুল্লুকে। ভাগবার তো

আর ভাড়া লাগে না, রাতের অন্ধকারে মালগাড়ীতে বসলেই হ'ল— একটা ঘুম, না একটা রাজ্য পার। এমন সব ভাড়াটের জন্য ঘরদোর সব সাফ কর!

ইউরঘিসদের অভ্যর্থনা হ'ল এই আস্তানায়। এর হ'তে ভাল কিছু জোটবার ভরসা নেই একরত্তি। জুকিয়েন বুড়ী নিজের ও তিনটি ছেলেমেয়ের থাকবার জন্য একখানা ঘর রেখেছে—এটা আর ভাড়া দেয় নি। এই ঘরেরই একটা কোণে নবাগত মেয়ে ও ছেলেরা থাকতে পারে—বুড়ীর তাতে আপত্তি নেই। বিছানা? পুরোনো জিনিসের দোকানে প্রচুর পাওয়া যায়, কাল ওরা কিনে নিলেই পারবে। আর দরকারই বা কি এত এখন বিছানার? যা গরম! বারান্দায় তো সবাই পড়ে আছে! ওরাও থাকবে।

এরা কথাটি কয় না। পরিবারের সকলে একটু নিরালা পেলে, ইউরঘিস সকলকে সান্ত্বনা দেয়, কাল একটা কাজ নেব আমি; জোনাসও পেয়ে যেতে পারে একটা কাজ। তখন নিজেরাই একটা একানে' বাড়ী ভাড়া নেব।

বিকেলের দিকে ওনাকে সঙ্গে নিয়ে ইউরঘিস বের হ'ল পথেতে। নতুন দেশে এসেছে, এইটিই এখন দেশ হ'য়ে উঠবে, জেনেশুনে না নিলে চলবে কেন? ওরা চলে—দুপাশে খালি খাঁচার মত কুলি-ব্যারাক, শেষ নেই, গোণাগুন্তি নেই যেন। অনেকক্ষণ হাঁটার পর ওরা ফাঁকা জায়গার সাক্ষাৎ পায়; তাজ্জব হ'য়ে যায় ওরা—এখানেও তাহ'লে ফাঁকা জায়গা থাকে, মালিকরা দেখতে পায় নি নাকি! এবড়ো-খেবড়ো খোলা জায়গা খানিকটা। ময়লা বিবর্ণ ঝোপঝাড়ে ভর্তি; নানারকম ময়লা জঞ্জাল, টিনের খালি কৌটোর ওপর গজিয়ে উঠেছে এগুলো। কিন্তু তারই মধ্যে খেলছে অসংখ্য ছেলেমেয়ে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কাছাকাছি কোথাও বিরাট একটা ইস্কুল আছে, তারই ছুটি হওয়ায়

এরা খেলতে বেরিয়েছে। একটু খেয়াল করলে, জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায় এ তল্লাটে কোথাও ইস্কুলের নাম পর্যন্ত নেই। এরা এই সব কুলি-ব্যারাকের ছেলেমেয়ে। বিস্ময়কর এদের বিপুল সংখ্যা! এদের জ্বালায় গাড়ীঘোড়ার একটু জোরে যাবার জো নেই।

গাড়ীঘোড়া এসব রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে পারে না তার আর একটা কারণ, পথগুলোর পরিসর ও প্রকৃতি। এগুলোকে পথ না বলে, ছোটখাটো এক একটা ভূভাগ বললে বোধ হয় বেশী ঠিক হয়। নেই কী পথে? পাহাড়, প্রান্তর, নদী, নালা, হ্রদ—সব কিছু! কোথাও স্তূপীকৃত জঞ্জাল, কোথাও বাড়ীর নালী হ'তে বয়ে আসছে জলের স্রোত। কোথাও মধ্যের খানাখন্দে পচা দুর্গন্ধ সবুজ জল জমে আছে —তাতে ছেলেমেয়েগুলো মনের আনন্দে ঝাঁপাই জুড়ছে, কাদায় ল্যাপটা-লেপটি করছে। কোথাও তারা পথের মধ্যে গর্ত খুঁড়ছে অজ্ঞাত ধনের সন্ধানে। সব কিছুকে ছেয়ে আছে, সত্যি সত্যি ছেয়ে আছে, মাছি; মাছিতে মাছিতে আকাশ কালো বাতাস কালো মাটি কালো! আর সকলের ওপর ভূতুড়ে ওই দুর্গন্ধ! দুনিয়ার যত জীব সব যেন মরেছে এই চুলোয় এসে! খানিকক্ষণের মধ্যে নাকে জ্বালা ধরে। নবাগতরা এর কারণ জিজ্ঞাসা না ক'রে পারে না। অভিজ্ঞরা উত্তর দেয়, জায়গাটা যে "তৈরী"; শহরের যত জঞ্জাল সব টিপিয়ে টিপিয়ে তৈরী হ'য়েছে এই অঞ্চলটা। বছর কয়েক বাদে গন্ধটা আপনা হ'তে কেটে যাবে—ওরা আশ্বাস দেয়। অনুযোগ করে, তবে বেশী গরম পড়লে, কি একটু বৃষ্টি হ'লে মাছির জ্বালায় তিষ্ঠনো যায় না। নবাগতরা হয়তো মন্তব্য করে, কিন্তু এ যে অস্বাস্থ্যকর! ওরা জবাব দেয়—কী আর করা যায়! বেশ কিছুদিন আছে যারা, তাদের মন্তব্য আরও ভাল—কে জানে!

বেড়াতে বেড়াতে ওরা দু'জনে একটা জায়গায় এসে বিস্ময়ে নির্বাক

হ'য়ে যায়, চোখ হয় বড় বড়—এখানে একটা "স্থান তৈরী" হচ্ছে।
বিরাট একটা খানা—দুটো বড় বড় ব্যারাকবাড়ী তার মধ্যে ঢুকে
যেতে পারে। খানাটাকে পরিণত করা হচ্ছে জায়গায়। সার সার
ময়লার, ডেবরিসের, জঞ্জালের, মরা জন্তুজানোয়ারের গাড়ী সুর সুর
ক'রে খানাটার মধ্যে ঢুকছে। হ্যাঁ, দুর্গন্ধ বটে একখানা! সেখানে
টেঁকা তো দূরের কথা, ভদ্র ভাষায় সেটা বর্ণনা পর্যন্ত করা যায় না।
এরই মধ্যে ভোর হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগুণতি নোংরা ছেলেমেয়ে ময়লা
ঘাঁটছে; কী ওরা খোঁজে বা কী পায়, ওরাই জানে। মাঝে মাঝে
কারখানা হ'তে বাবুরা আসেন "ঢেপাই"-এর কাজ দেখতে। ওঁরা
আশ্চর্য হ'য়ে যান ছোঁড়াছুঁড়িগুলোর নোংরামো দেখে; অবাক হ'য়ে
ওঁরা ভাবেন, ময়লার মধ্যে হ'তে খাবারের টুকরো খুঁটে ছোঁড়াছুঁড়ি-
গুলো নিজেরাই খায়, না হাঁস-মুরগীর জন্য বাড়ী নিয়ে যায়। ভাবার
বেশী আর ওঁরা এগোন না; কে আবার দেখতে যায়! খাওয়াও
অসম্ভব নয় ওদের পক্ষে, যা নোংরা!

এই খানাটার একটু দূরে সার সার ইঁটের পাঁজা জ্বলে তাদের
চিমনিগুলো হ'তে উঠছে দুর্গন্ধের মতই অবিশ্রান্ত ও অপর্যাপ্ত ধোঁয়া।
নবাগত এরা মার্কিন বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারে না, কী সুন্দর
ব্যবস্থা! গর্ত ক'রে মাটি নিয়ে ইঁট গড়ে' নিলে, তারপর জঞ্জাল দিয়ে
গর্তটা বুজিয়ে সেখানে বাড়ী তৈরী হ'ল। এমন নইলে টাকা হয়!

ইঁটের পাঁজা ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে দেখা যায় দীঘির মত
বিরাট একটা খাল। কাব্যের দীঘির মত জল থৈ থৈ করছে এতে;
তবে জলটা নীল নয়, সবুজ। এখনও এটাকে জায়গাতে "তৈরী" করা
শুরু হয় নি; কিন্তু দুর্গন্ধ তা' বলে খুব কম নয়। শীতকালে জলটা
জমে বরফ হয়; খালের মালিকরা বরফ কাটিয়ে চালান দেন শহরে;
শহরবাসীরা এই বরফ কেনে খাবার বীজাণুমুক্ত রাখবার জন্য। শুনতে

শুনতে ইউরঘিস এদের বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ হ'য়ে ওঠে। খবরের কাগজ ও পড়ে না; খাদ্যে (বা ময়লা জলে) বীজাণু থাকার কথা ও জানে না। ও ভাবে, উঃ এমন নইলে কি টাকা হয় কারও!

সূর্য ঢলে' পড়ে পশ্চিম আকাশে; আকাশ আর আকাশের নীচেটা রক্তের মত লাল হ'য়ে ওঠে। বাড়ীগুলো, কাটাছেঁড়া ময়লা মাঠটা, দূরের কারখানা সবকিছু ঝলমল করে অস্তগামী সূর্যের রক্তালোকে। ইউরঘিস বা ওনা সূর্যাস্ত বা আকাশের শোভা দেখছিল না, দেখছিল দূরের কারখানাগুলো। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সব কিছু মিলে। সারি সারি চিমনি হ'তে বয়ে যায় দুনিয়া পার হ'য়ে ধোঁয়ার নদী। সেখানটায় আকাশে চলে রঙের লীলা, মাতামাতি—লাল, কালো, ধূসর, বাদামী, নারঙ্গী। ইউরঘিসের মনও রঙীন হ'য়ে উঠে। কারখানা ওর কাছে মানবীয় শক্তির সুন্দর প্রকাশ! কত বুদ্ধি কত সংগঠন-শক্তি থাকলে তবে মানুষ গড়ে তুলতে পারে হাজার হাজার মানুষ পোষবার মত এমন একটা কারখানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা দেখে।

ক্রমে অন্ধকারে ডুবে যায় কারখানা, কারখানার নগর, কুলি-ব্যারাক, মাঠ, খালখন্দ। ওনার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে পুলকিত ইউরঘিস বলে, "কাল আমি ওখানে কাজ নেব, ওনা!"

তৃতীয় অধ্যায়

জোকুবাস স্তেদ্‌বিলাস মিঠাই-এর দোকানের মালিক। এই সূত্রে বহু লোকের সঙ্গেই তার জানাশোনা—বন্ধুত্বও বলা যায়। তার এমনি একজন বন্ধু এক কন্‌ষ্টেবল। রাজপুরুষ নয়, ডারহামের কর্মচারী।

তাই খালি পাহারা না দিয়ে দরকার মত মজদুরও সংগ্রহ করে। বন্ধুর ক্ষমতার গৌরবে স্তেদ্‌বিলাসও গর্বিত; বলে' বেড়ায়, ইচ্ছে করলেই আমি ডারহামের কারখানায় লোক ঢুকিয়ে দিতে পারি। কাল পর্যন্ত ইচ্ছে করবার প্রয়োজন হয়নি। অনেক আলোচনার পর ঠিক হ'ল, বুড়ো অ্যান্টেনাস ও জোনাসকে সে বন্ধুর মারফৎ কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। ইউরঘিসের নিজের ক্ষমতার ওপর যথেষ্ট ভরসা আছে, নিজেই কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে বলে' ওর ধারণা, কারও সাহায্যের তোয়াক্কা ও করে না।

ধারণা ওর মিথ্যে নয়। ব্রাউনের কারখানার ফটকের সামনে ওকে উমেদারদের সঙ্গে আধ ঘণ্টার বেশী অপেক্ষা করতে হয় নি। ওর সুগঠিত লম্বা-চওড়া পেশীবহুল দেহ দেখে মনিবদের একজন ইশারায় ডাকে। অল্প ও আসল কথায় কয়েকটা প্রশ্নোত্তর চলে; যেমন:—

"ইংরেজী জান?"

"না, লিট-উয়ানিয়।"

"কাজ?"

"হ্যাঁ" (মাথা নেড়ে)।

"এখানে আগে কাজ করেছ?"

"বুঝলাম না।"

প্রবলভাবে হাত মাথা নেড়ে মালিক বোঝাবার চেষ্টা করে, ততোধিক জোরে মাথা নেড়ে ইউরঘিস তার না-বোঝা বোঝায়।

এইভাবে চোখ মুখ মাথা হাত শরীর নেড়ে কতকগুলো প্রশ্ন ও উত্তরের পর ইউরঘিসের কাজ ঠিক হয়ে যায়। ওই যে ফটকটা দেখা যাচ্ছে না, ওখানে ওকে আসতে হবে কাল সকাল সাতটায়।

বাড়ীর দিকে ফিরে ইউরঘিস। হঠাৎ খেয়াল হয় ওর, ও বিজয়ী, ভীষণভাবে বিজয়ী। খুশীতে চেঁচিয়ে লাফিয়ে দৌড় দেয় ও বাড়ীর

দিকে। কাজ পেয়েছে ও! কাজ! মাটিতে তখন আর ওর পা নেই, বাড়ী আসে ঝড়ের বেগে। ওর দাপাদাপিতে অন্যান্য ভাড়াটিয়া বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। কাজ পেয়ে রাজা হ'য়েছে! ওরা তো কাজ হ'তেই ফিরেছে—লাফালাফি! এখন একটু ঘুমুতে পেলে বাঁচে।

ইতিমধ্যে জোকুবাস গিয়েছিল তার পুলিস-বন্ধুর কাছে; পুলিস-বন্ধু আশা দিয়েছে—চাকরি হবে। আজ বাড়ীতে আনন্দের সীমা নেই। আজ আর কোন কাজ নেই। কাজেই ঠিক হয়, জোকুবাস তার দেশোয়ালী-বন্ধুদের প্যাকিং টাউনের দৃশ্য দেখাতে নিয়ে যাবে। দোকানের ভার পড়ে লুসিজার ওপর। দল বেঁধে ওরা বেরিয়ে পড়ে। জোকুবাসের ভাবখানা হয় গ্রাম্য জমিদারের মত—অভ্যাগতদের যেন নিজের বাগবাগিচা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে' ও এখানকারই অধিবাসী। ওর চোখের সামনে গড়ে' উঠেছে এখানকার এ সব বিস্ময়; কাজেই এ সবের মধ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে বেশ গৌরব বোধ করে। জমিজায়গা, বাড়ীঘর, কলকারখানার মালিক অন্য লোক হ'তে পারে কিন্তু চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মালিক তো জোকুবাস—সেখানে না বলে কে?

কারখানার দিকের পথ ধরে' ওরা চলেছে, লোকজন গাড়ীঘোড়ার যাওয়া-আসার বিরাম নেই। সকাল গড়িয়ে ততক্ষণে একটু বেলা হ'য়েছে, কারখানাগুলিতে তখন কাজের বান ডেকেছে। কেরানী প্রতিলেখক টাইপিষ্ট্ প্রভৃতিদের মত একটু উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীরা ঢালা জলের মত গল গল ক'রে তখন কারখানায় ঢুকছে। মেয়ে-মজুরদের নিয়ে যাবার জন্য দু'খানা ঘোড়ায় টানা বাস দাঁড়িয়ে আছে; ঠাসাঠাসি ক'রে ভরতি হতেই সে দুটো জোরে বেরিয়ে যায়। কোথায় যেন বহু গরু-ভেড়া একত্র করা হ'য়েছে; দূরাগত সমুদ্র-গর্জনের মত শোনা যায় এদের মিলিত নিনাদ। বিস্ময় ওদের বাঁধ মানে না; ছোট ছোট

ছেলেমেয়ে যে-আগ্রহ নিয়ে সার্কাসের জন্তুজানোয়ার দেখতে যায়, ওরাও ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে চলে কারখানার জানোয়ার দেখতে—দু'টোর মধ্যে তফাৎ যে খুব বেশী আছে তা নয়। রেলপথ পার হ'য়ে ওরা আর একটা সড়কে হাজির হয়। পথের দু'ধারে জন্তুভরা সারি সারি খাটাল। ওদের ইচ্ছে, সারাদিন ধরে' ওরা প্রত্যেকটা দেখে। জোকুবাস্ ওদের দাঁড়াতে দেয় না; সিঁড়ি দেওয়া কোথায় একটা মাচা আছে, সেখান হ'তে সব কিছু নাকি চমৎকার দেখা যাবে। সত্যিই তাই! প্রত্যেকটা খাটালের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে কতটুকুই বা দেখা যেত। মাচা হ'তে সমস্ত জায়গাটা একেবারে ছবির মত দেখা যায়। বিস্ময়ে ওদের দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। দেখে দেখে দেখা যেন আর শেষ হয় না।

কারখানাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানটাকে বলা যায় এদের "উঠান"; উঠানটা লম্বায় আধ ক্রোশ, দৈর্ঘ্যেও প্রায় তাই; এই বিরাট প্রাঙ্গণের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে আছে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া ছোট ছোট অসংখ্য খাটাল—খাটালগুলো তৈরী করা হ'য়েছে উত্তর হ'তে দক্ষিণে; যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর খালি খাটাল আর খাটাল। প্রতিটি খাটাল জানোয়ারে ঠাসা; এত জানোয়ার দুনিয়ায় ছিল বা আছে কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে! গরু!—তাই বা কত রকমের! লাল, কালো, সাদা, হলদে! বুড়ো গরু, জোয়ান গরু; সরল চক্ষু কোমল দেহ দুধেল গাই, পাশে হিংস্র টেক্সাস ষাঁড়, গাঁক গাঁক ক'রে হাঁক ছাড়ছে বিরাট বলদ, তার পাশেই কাঁপছে ঘণ্টাখানেক আগে জন্মেছে এমন সব বাছুর; কেউ হামলায়, কেউ গর্জায়। সে এক এলাহী ব্যাপার! দুনিয়ার যত গোয়াল যেন একত্র করা হ'য়েছে; আওয়াজে কানে ভোঁ বাজে! এগুলোকে গোনা? সর্বনাশ! খাটালগুলো গুনতেই তো দিন কেটে যাবে। কোথাও কোথাও খাটালের পাশে পাশে সরু সরু এক-একটা

গলি চলে গেছে; গলিগুলো শেষ হ'য়েছে এক-একটা ফটকের সামনে। জোকুবাস্ জানায় এরকম ফটকই আছ পঁচিশ হাজার। কয়েকদিন আগে জোকুবাস্ এই ধরণের সংখ্যা আর হিসাব পড়েছে একখানা খবরের কাগজে। এখন গেঁয়ো এই অভ্যাগতদের সামনে বুক ফুলিয়ে ও আওড়ে চলে বিরাট সংখ্যাগুলো; এক-একটা সংখ্যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগতদের চোখগুলো হ'য়ে ওঠে গোলাকার, কখনো-বা তারা উল্লাসে হুল্লোড় ক'রে ওঠে। গর্বে আনন্দে জোকুবাস্ মৃদু মৃদু হাসে। ইউরঘিস্ও এ আনন্দের অংশীদার; কারণ সে এই কারবারেই একটা চাকরি পেয়েছে, এই বিরাট যন্ত্রের সেও একটা অংশ—যত ক্ষুদ্রই হ'ক, অংশ তো বটে!

গলিগুলো দিয়ে ঘোড়া ছোটায় বুটপরা সব ঘোড়সওয়ার—প্রত্যেকের হাতে চাবুক! দূর হ'তে তারা পরস্পরকে ডাকে, গরু ডাকিয়ে যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদেরও ডাকে; এদের কেউ গরু-ছাগলের ব্যবসাদার, কেউ ব্যাপারী—দূরদূরান্তরের রাষ্ট্র হ'তে নিজের নিজের পণ্য ডাকাতে ডাকাতে নিয়ে এসেছে। এদেরই মধ্যে স্থানীয় দালাল, ঠিকেদার, বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ খদ্দের—সবাই আছে। "থোক থোক" গরু ডাকিয়ে নিয়ে যায় ব্যাপারীরা, দালাল ফড়ে খদ্দের প্রভৃতিরা কোথাও কোথাও তাদের থামিয়ে অল্প কথায় দরদস্তুর করে; চাবুকটা নামলেই বুঝতে হবে, এক "থোক" কেনা হ'য়ে গেল; ব্যাপারটা লেখা হ'য়ে যায় তার টোকবইয়ে—এমনি আরও কয়েকশত কেনাকাটার হিসেব টোকা হ'য়ে গেছে ওতে সকাল হ'তে। গরুগুলোকে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে একই দিকে। জোকুবাস্ দেখায়, উই দূরে—ওরা দেখতে পায় না—একটা ওজনের কল—হাজার হাজার সের জিনিস একসঙ্গে ওজন হ'য়ে যায়, ওজনের পরিমাণটাও লেখা হ'য়ে আপনাআপনি উঠে পড়ে কলের মাথায়। ওরা দাঁড়িয়েছিল

পূবদিকের প্রবেশপথের কাছাকাছি; এরই পাশ দিয়ে গেছে রেলপথ; জানোয়ার-ভর্তি গাড়ীগুলো আসছে এই দিক দিয়ে; ক্রমে সব খাটালই পূর্ণ হ'য়ে যায়; সারা রাত ধরে' এই কাণ্ডকারখানা চলছে; আজ রাত্রির মধ্যেই খাটালগুলো খালি হ'য়ে যাবে; আবার কাল ভরে দেওয়া হবে, আবার চলবে এই কাণ্ড।

টেটা এলজ্‌বিয়েটা জিজ্ঞেস করে, "কী হবে এই জানোয়ারগুলোর?"

জোকুবাস্‌ বলে, "আজ রাত্রে ওদের মারা কাটা শেষ হ'য়ে যাবে। প্যাকিং হাউসের ওদিকে আরও রেল লাইন আছে—সেই পথের গাড়ীতে যাবে ওদের মাংস।"

ওদের প্রদর্শক অর্থাৎ জোকুবাস্‌ জানায়, এই আঙিনাটায় যে রেল লাইন আছে তার দৈর্ঘ্য আড়াই শো মাইল। এখানে গরু আছে দশ হাজার, শূয়ারও দশ হাজার, হাজার পাঁচ ভেড়া—অর্থাৎ আশী লাখ হ'তে এক কোটি পর্যন্ত জন্তুকে এখানে প্রতিবৎসর খাদ্যে পরিণত করা হয়। খাটালে দাঁড়িয়ে-থাকা জানোয়ারগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে অন্যদের কারখানার দিকে এগিয়ে যেতে, তারপর একে একে তাদেরও পালা আসে; তারাও এগিয়ে যায় খাটালের পাশ হ'তে ওঠা দশ হাত চওড়া উঁচু পথটা ধরে' কারখানার ভেতর—অবিচ্ছিন্ন একটা স্রোত! মৃত্যুর মুখে সব এগিয়ে চলেছে, মনে কোন সন্দেহ নেই, দ্বন্দ্ব নেই, আশঙ্কা পর্যন্ত নেই, নির্দ্বন্দ্ব একটা মৃত্যু-দরিয়া, দেখতে দেখতে মনটা কেমন তিক্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু আমাদের অভ্যাগত বন্ধু ক'টি কবি নয়, এ দৃশ্যকে মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে উপমিত করবার কল্পনা ওদের মনে আসে না, ওরা খালি ভাবে কী কার্যদক্ষতা এই সব যান্ত্রিকের, কী চমৎকার ব্যবস্থা এই সব কিছুর মধ্যে। জানোয়ার নিয়ে যাবার পথগুলো ঢালু সিঁড়ির মত উঠে গেছে পাশাপাশি ইমারতগুলোর একেবারে মাথা পর্যন্ত; কারখানা আছে সব ইমারতের মধ্যে; শূয়োরগুলো উঠে

যায় এই পথ বেয়ে, জোকুবাস্ বোঝায়, নিজেদেরই শক্তিতে; তারপর শূয়োরকে শূকরমাংসে পরিণত করবার জন্য যেসব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন তা সম্পন্ন হয় ওদের নিজের নিজের দেহের ওজনে।

"এখানে কিছু নষ্ট করা হয় না," জোকুবাস্ জানায়। যথারীতি ওরা নির্বাক বিস্ময়ে ওর ব্যাখ্যা শোনে। বিজ্ঞের হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত ক'রে বলে, শূয়োরের ডাক ছাড়া আর সব কিছুকেই এখানে কাজে লাগানো হয়"; আশা করে উক্তিটাকে ওর নিজস্ব বলেই ধরে' নেবে এই সব গেঁয়ো সঙ্গী। ব্রাউন কোম্পানীর খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ঘাসের চাষ করা হ'য়েছে—সারা প্যাকিং টাউনে ঐটুকুই প্রাকৃতিক হরিৎ শোভার প্রতিনিধি। ঠিক সেই রকম এই নীরস যন্ত্রালয়ে একমাত্র রসিকতা ঐ উক্তিটা—এখানকার সকলেরই রসিকতার মূলধন এটা।

খাটাল দেখা শেষ হ'লে ওরা দেখতে চলে আঙিনাটার কেন্দ্রস্থানীয় ইমারতগুলি। ইট দিয়ে তৈরী এগুলি; সারা প্যাকিং টাউনের অজস্র ধোঁয়ার অসংখ্য প্রলেপ পড়েছে এদের দেওয়ালগুলোর ওপর, তার ওপর ঝুলছে হাজার হাজার বস্তুর হাজার হাজার বিজ্ঞাপন; এ সব দেখলে নবাগতের মনে হবে, সে তার জীবনের সব যন্ত্রণার উৎপাদনালয়ে এসেছে। এখানে যেসব পণ্য উৎপাদিত হয় তাদেরই আশ্চর্য-কারিতার বিজ্ঞাপন দেখে এসেছে সে ট্রেনে মোটরে যেতে সমস্ত পথে, পত্র-পত্রিকা দেখতে গেলেও এই সব বিজ্ঞাপনের হাত হ'তে অব্যাহতি নেই, তারপর ডগ্‌ডগে রঙের চলচলে ছবির আজীবন জ্বালানো বিজ্ঞাপন প্রতিটি পথের মোড়ে তো আছেই। এখানেই তৈরী হয় "ব্রাউনের রাজকীয় শূকরমাংস", "ব্রাউনের মশলাযুক্ত গোমাংস", "ব্রাউনের অমৃতোপম পক্ক মাংস"! এখানেই তৈরী হয় ডারহামের বিভিন্ন ভোজনের উপযোগী বিভিন্ন ধরণের শূকর ও গোমাংস—কম

একেবারে প্রস্তুত, টিনে ভরা, বিস্ময়কর তাদের মান। তার ওপর আছে "ডারহামের অতুলনীয় সার"।

ডারহাম কোম্পানীর একটা ইমারতে ঢুকে এরা দেখে ওদের আগে আরও দর্শক এসেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কোম্পানীর নিযুক্ত একজন প্রদর্শক ওদের নিয়ে চলল ইমারতটার বিভিন্ন স্থান দেখাতে; অতিথি-অভ্যাগতদের কারখানা দেখাবার জন্য কোম্পানী হ'তে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে, কারণ তাতেও বিজ্ঞাপনের কাজ হ'য়ে যায়। কিন্তু ফিসফিসিয়ে জোকুবাস্ জানিয়ে দেয় যে মালিকরা সব কিছু দেখায় না, যেটুকু দেখালে নিজেদের নাম বাড়বে সেইটুকুই দেখায়।

পাঁচ ছ' তলা ইমারত; বাইরে দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে; সেই সিঁড়ি বেয়ে ওরাও একেবারে মাথায় ওঠে ইমারতের; খাটাল হ'তে জানোয়ারদের জন্য রাস্তাগুলোও উঠেছে এই এতদূর পর্যন্ত; এখনও চলছে সেই জন্তু-স্রোত, ধীরভাবে তারা ঠেলে ঠেলে ওপরে চলেছে। এ রাস্তাটা শূয়োরদের। চূড়ার কাছাকাছি মাচার মত একটা ছাদ আছে; উদ্দেশ্য—জন্তুরা এখানে খানিকটা জিরিয়ে নেবে তারপর স্রোত চলবে একটা ঘরের দিকে, সেখানে হ'তে আর কোন শূয়োরের প্রত্যাবর্তন নেই।

লম্বা ফালি মত ঘর একখানা; দেওয়ালের সঙ্গে থাক থাক ক'রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কতকগুলো তক্তা, অতিথি-অভ্যাগত এলে বসবেন। ঘরটার অপর প্রান্তে আছে লোহার বিরাট একটা চাকা—বেড়াটাই হবে বোধ হয় হাত পনেরো; পরিধিতে মাঝে মাঝে একটা ক'রে বালা লাগান আছে। চাকার দু'পাশেই অতি সংকীর্ণ একটু ক'রে স্থান ক'রে দেওয়া; শূয়োরদের খাটাল হ'তে ভ্রমণের শেষ সীমা এই সংকীর্ণ জায়গা দুটি; শূয়োরগুলোর মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকার এক নিগ্রো—পেশীপুষ্ট বুক ও বাহু সম্পূর্ণ অনাবৃত। কয়েক মিনিটের

জন্য নীচে কোথায় পরিষ্কার করা হ'চ্ছে তাই চাকাটার আবর্তন কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ আছে, নিগ্রোটাও কয়েক মিনিটের বিশ্রাম পেয়েছে। কিন্তু কতক্ষণই বা? অল্পক্ষণ পরেই চাকাটা আবার ঘুরতে লাগল ওরই বাহুর জোরে। হাতে সরু সরু শেকল নিয়ে আরও কতকগুলো লোক দাঁড়িয়েছিল; এরা শেকলের একপ্রান্ত দিয়ে নিকটতম শূয়োরটার পা বেঁধে দেয়, অন্য প্রান্তটা আটকে দেয় ঘূর্ণায়মান চাকাটার সঙ্গে। চাকা ঘোরে—হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খেয়ে শূয়োরটা উঠে যায় চাকার আবর্তনের সঙ্গে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অতি ভয়ানক একটি আর্ত তীক্ষ্ণ শব্দে কান ফেটে যাবার উপক্রম হয়! দর্শকরা আতঙ্কে আঁতকে ওঠে, মেয়েরা বিবর্ণ মুখে এলিয়ে পড়ে; আর্তনাদটার ঠিক পরেই ওঠে আরও তীক্ষ্ণ, আরও তীব্র, বেদনাক্ত একটা আর্তনাদ—এ মহাযাত্রা একবার শুরু করলে আর প্রত্যাবর্তন নেই। চাকাটার ওপর দিকে আছে ছোট একখানা গাড়ী, শূয়োরটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেখানে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু হ'য়ে যাচ্ছে নীচের দিকে; ইতিমধ্যে আর একখানা গাড়ী এসে সেখানে লেগেছে, আর একটা শূয়োর পড়েছে সেখানে, চাকা ঘোরার সাথে সাথে গাড়ী আসে, শূয়োর পড়ে তার মধ্যে ঠিক আবর্তনের মতই অবিরাম অবিচ্ছিন্ন, ক্রম অনুযায়ী উঠে থাকে দু'টো ক'রে শূয়োর —প্রত্যেকের একটা ক'রে পা বাঁধা, অন্য ঠ্যাঙগুলো ওরা আকাশ-মুখো ছোঁড়ে আর্তনাদ সহকারে অব্যাহতি লাভের জন্য, কিন্তু সে দু' এক মুহূর্তের ব্যাপার, তারপরই চলমান গাড়ী, আবার বিভ্রান্ত জীবের আর্তনাদ। শব্দ ক্রমে কর্ণপটাহের পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে ওঠে; মনে হয় এই ঘরটুকুর মধ্যে এত আওয়াজ আর ধরবে না, হয় দেওয়াল ভেঙ্গে পড়বে, নয় উড়ে যাবে এর আচ্ছাদন আওয়াজের চোটে। কেউ আস্তে কেউ জোরে, কেউ মৃত্যুযন্ত্রণায় কেউ বিভ্রান্তিতে আর্তনাদ

ক'য়ে ওঠে। হঠাৎ এক-একবার সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হ'য়ে যায়। তারপরই শব্দ ওঠে সহস্রগুণ বর্ধিত ভাবে, ক্রমে কান যেন অবসন্ন হ'য়ে আসে। দর্শকদের মধ্যে পুরুষদের স্নায়ু-শক্তি ভেঙ্গে আসে—পরস্পরের দিকে চেয়ে তারা বোকার মত হাসে, মেয়েরা আত্মহারার মত দাঁড়িয়ে ওঠে, ওদের হাতগুলো অজান্তে মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে যায়, অশ্রু গড়ায় গণ্ড বেয়ে, হৃদয়ের সমস্ত রক্ত ঠেলে উঠে আসে মুখের দিকে।

এদিকে বা এদের যাই হ'ক, নীচের মেঝেয় কার্যরত লোকগুলো নিজেদের কাজ ঠিকই ক'রে চলে—ওখানে হৃদয়, অন্তর, অশ্রু, আওয়াজ কারও কোন আবেদন নেই; চাকা ঘোরে, শূয়োর আসে, ওরা কাজ করে—ঘূর্ণ্যমান চাকার সঙ্গে গতির সমতা রেখে ওরা হাত চালায়, হাতে হাতে একখানা ক'রে ছোরা, দ্রুত ওরা বসিয়ে দেয় হাতের কাছে আসা শূয়োরের গলায়—তীব্র আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে হৃদয়ের তাজা রক্ত, পর পর এমনি প্রায় একশো আহত শূয়োর ঝোলে; তারপর হঠাৎ আর একটা ঝাঁকানি খেয়ে নিমেষের মধ্যে তারা গিয়ে পড়ে ফুটন্ত জলের বিরাট একটা ডেকচির মধ্যে।

প্রতিটি কাজ চলে যন্ত্রের মত কী কঠোর নিয়মানুগতার সঙ্গে—দর্শকেরও চিন্তাশক্তি লুপ্ত হ'য়ে গিয়ে একমাত্র বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ ছাড়া যেন আর কিছু সচেতন থাকে না। যন্ত্র সাহায্যে, ফলিত গণিত প্রয়োগে শূকরমাংস উৎপাদন! তবুও অতি কঠোরহৃদয় লোক, যে জীবনে শুধু লাভ আর লোকসানই বুঝেছে, সেও মনে হয় এখানে দাঁড়িয়ে এই শূয়োরগুলোর কথা না ভেবে পারবে না—এত নির্দোষ এরা, মানুষকে এত বিশ্বাস ক'রে এরা এগিয়ে এসেছিল! তাদের অর্থহীন আর্তনাদময় প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যাচারক্লিষ্ট মানুষের সরব প্রতিবাদের পার্থক্য কোথায়! ওদের অধিকারের গণ্ডি ওরা ছাড়িয়ে যায়নি! এ শাস্তি ভোগ করবার মত কোন অপরাধই তো ওরা করেনি। যায়ের ওপর

মুনের ছিটের মত এই নৈর্ব্যক্তিক হত্যালীলার মধ্যে হৃদয়ের কোন স্থান নেই, জৈব ধর্মের কোন পরিচয় নেই, খাদ্যের "প্রয়োজনে" মানুষ যে অপরাধ করছে তার জন্য তার একফোঁটা চোখের জল দিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল—যন্ত্রের কাছে তার স্থান নেই। নবাগত, অতিথি-অভ্যাগতদের কেউ কেউ হয়তো এদের জন্য দু'এক ফোঁটা অশ্রুপাত করে, কিন্তু সেটুকু দেখবার জন্যও তো মুহূর্তেকের সময় নেই হৃদয়হীন এই যান্ত্রিকতার! পৃথিবীর গর্ভের অন্ধকার গর্তে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেন অবিরাম এক মহাপাতকের অনুষ্ঠান হ'য়ে চলেছে—কেউ জানছে না, দেখছে না, স্মরণ রাখবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

এ দৃশ্য বেশীক্ষণ ধরে' দেখলে দার্শনিক না হ'য়ে কেউই পারে না—মনে আসে কতশত উপমা, কানে ভেসে আসে বিশ্বের সকল অত্যাচারিতের কাতর ক্রন্দন। এমন কথা কি আশা করা যাবে, বিশ্বাস করা যাবে যে, এই দুনিয়ার বাইরে কি ভেতরে কোথাও শূকরদের একটা স্বর্গ আছে, সেখানে পৌঁছতে পারলে এদের সকল যন্ত্রণার অবসান হবে বা হ'তে পারে? এদের প্রত্যেকের কেউ কালো, কেউ ধলো, কেউ বাদামী, কেউ-বা মিশেলী রঙের; কেউ ছোট কেউ বড়, কেউ বাচ্চা কেউ বুড়ো, কেউ রোগা কেউ মোটা, কেউ নরম প্রকৃতির কেউ আবার হিংস্র; এদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব ছিল, ছিল নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের একটা একাগ্র বাসনা; প্রত্যেকেরই ছিল আত্মবিশ্বাস, ছিল স্বাভিমান, আত্মগৌরব। আস্থা রেখে বিশ্বাস ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নিজের কাজে, তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছে যে এই সমগ্র সময়টা ওদের মাথার ওপর আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে এই বিপদের, দুর্ভাগ্যের নিশ্ছিদ্র কালো মেঘ। হঠাৎ সে দুর্ভাগ্য ছোঁ মেরে ওদের উঠিয়ে নেয় একে একে। এ শমনের কাছে বিচার বিরাম বা ক্ষমার কোন স্থান নেই—এদের প্রতিবাদ, এদের আর্তনাদ কোন কিছুরই মূল্য

নেই, গুরুত্ব নেই তার কাছে; এর নিষ্ঠুর ইচ্ছাশক্তি অনায়াসে সম্পাদিত হ'য়ে যায় এদের ওপর—যেন এদের ইচ্ছার, এদের অনুভূতির কোন অস্তিত্বই নেই; এদের গলা কেটে দিয়ে যান্ত্রিকতার এ শমন উপভোগ করে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি। এও কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে এ শূকরগুলির কোন দেবতা নেই? এমন দেবতা যার কাছে এদের শূকর-জন্মের মূল্য আছে, এদের করুণ অর্থহীন আর্তনাদের আবেদন আছে যার কাছে? এমন দেবতা কি কেউ নেই যে এদের কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দেবে, জীবনপথে ঠিকভাবে চলেছে বলে' এদের পুরস্কৃত করবে, বুঝিয়ে দেবে এ আত্মদানের মহিমা—নেই কি এমন কোন দেবতা, নেই? হয়তো এই ধরণের কোন চিন্তা আমাদের বন্ধু ইউরঘিসের মনে ঝিলিক মেরে যাচ্ছিল। অন্যদের সঙ্গে যেতে যেতে ও বলে, "ভগবান, ভাগ্যিস আমায় শূয়োর করোনি!"

ডেকচি হ'তে শূয়োরদেহগুলো তোলা হ'চ্ছে যন্ত্রসাহায্যে; সেখান হ'তে সেগুলো একে একে চলে যাচ্ছে দোতলায়। যাবার পথে পড়ছে আর একটা যন্ত্রের খপ্পরে; অদ্ভুত যন্ত্র! তাতে চাঁচবার জন্য অনেকগুলো ছুরি আছে, যন্ত্রটা শূয়োরদেহের আকার অনুযায়ী নিজেকে ছোট বড় ক'রে নিচ্ছে; তারপর যন্ত্রের অপর প্রান্ত দিয়ে দেহটি বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন তাতে একটা রোঁয়াও থাকছে না। ওখান হ'তে বেরিয়ে পড়ছে তারে ঝোলান আর একটা গাড়ীতে, গাড়ীটা চলেছে সরু একটা গলির মত জায়গা দিয়ে; গলির দু'পাশে উঁচু ক'রে মাচা বাঁধা। দু'দিকেই ছুরি হাতে কতকগুলো লোক বসে আছে; প্রত্যেকে চলমান দেহটির বিশেষ একটি ক'রে স্থানে আঘাত করছে—কে কোন্ অঙ্গে আঘাত করবে তাও নির্দিষ্ট; একজন একটা ঠ্যাঙের বাইরেটায় মারছে, পরবর্তী জন মারছে সেই ঠ্যাঙটির ভেতর দিকটায়; কারও একটানে গলাটা ভালভাবে চিরে যাচ্ছে; কেউ দ্রুত দু'টো আঘাতে মাথাটা ধড়

হ'তে আলাদা করে দিচ্ছে। মাথাটা মেঝের মধ্যে কাটা একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে; আর একজনের একটানে পেট চিরে যাচ্ছে; আর একজন সেটাকে আরেকটু ফাঁক ক'রে দিচ্ছে; পরবর্তী করাত দিয়ে খুলে দিচ্ছে বুকের জোড়; এইভাবে একজন নাড়ীভুঁড়ি ঢিলে ক'রে দিচ্ছে, তার পরবর্তী সেগুলোকে টেনে বের করছে—সেগুলো মেঝের গর্ত দিয়ে নীচে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া বাইরের এপিঠ, ওপিঠ, পিঠ, ভেতর চাঁচবার জন্য, পরিষ্কার করবার জন্য আলাদা আলাদা লোক আছে। এ ঘরটার নীচের দিকে চাইলে দেখা যাবে, একশো গজ জায়গা জুড়ে শূকরদেহ ঝুলছে; গজপ্রতি একজন লোক; তারা ভূতে-পাওয়ার মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে হাত চালাচ্ছে। এই মহাযাত্রার অন্তে আছে শৈত্যঘর—সেখানে দেহগুলো চলে যাচ্ছে একই প্রথায়। এখানে এগুলিকে রাখা হবে চব্বিশ ঘণ্টা; ক্রমশঃ সেখানে এগুলি বরফের মত জমতে থাকবে—কোন নবাগতকে এখানে ঢুকিয়ে দিলে হাজার হাজার হিমশীতল ঝোলান শূকরদেহের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে—এটি শূকরদেহের অরণ্য বিশেষ।

এ ঘরটায় ঢোকবার দোরে একজন সরকারী পরীক্ষক বসে থাকেন; প্রতিটি দেহের গলার গ্রন্থি পরীক্ষা ক'রে দেখছেন জন্তুটির যক্ষ্মা ছিল কি না! দেহগুলি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁরও দ্রুত হাত চালাবার কথা; ফলে, অন্যান্য শ্রমিকদের মত তাঁরও প্রাণান্তকর পরিশ্রম হবার কথা। আসলে কিন্তু তাঁকে দেখে তা মনে হয় না; কোন দেহ পরীক্ষিত না হয়ে চলে গেলে তিনি শঙ্কিত হবেন, এমনও মনে হয় না তাঁকে দেখে। তেমন আলাপী কেউ এলে তিনি শূকর-গণের যক্ষ্মার ভীষণতা ব্যাখ্যা ক'রে অমন পাঁচ-দশ মিনিট কাটিয়ে দিতে পারেন। এমন অকৃতজ্ঞ শ্রোতা কে থাকবে যে, এমন ব্যাখ্যার পরও তাঁর কর্তব্যের ত্রুটির জন্য কিছু মনে করবে বা কোথাও লাগাবে; কথার

মধ্যে বার-চৌদ্দটি শূয়োর হয়তো তাঁর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের পরনে নীল উর্দি (সরকার প্রদত্ত পোশাক), পেতলের চকচকে বোতাম—তাঁর উপস্থিতিতে সমস্ত স্থানটার ওপর কর্তৃত্বের একটা ছাপ পড়েছে—শুধু কর্তৃত্বের নয়, ডারহামের পণ্যসমূহের ওপর সরকারী অনুমোদনেরও ছাপ পড়ে যাচ্ছে স্রেফ তাঁর উপস্থিতির জন্যই।

অন্যান্যদের সঙ্গে ইউরঘিস্‌ও বিস্ময়ে হাঁ ক'রে এগিয়ে চলে। লিথুয়ানিয়ার জঙ্গলে সে নিজেই শূয়োরের চামড়া ছাড়িয়েছে; কিন্তু একটা শূয়োরের চামড়া ছাড়ান এবং অন্যান্য কাজের জন্য যে শতাধিক লোককে হাত লাগাতে হয়, এ তার কল্পনারও অতীত ছিল। এর সব কিছুই লাগে ওর চমৎকার। বিভিন্ন কক্ষের দেওয়ালে মজুরদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে নির্দেশনামা টাঙান আছে সাইন বোর্ডের আকারে। জোকুবাস্ এগুলো ওদের জন্য অনুবাদ ক'রে দেয়, অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে কটু মন্তব্য করে—ও সব লেখাই থাকে! পচা মাংস বা নাড়ীভুঁড়ির "চিকিৎসা" হয় একটা ঘরে, খেদবিলাস ওদের সেখানে নিয়ে যেতে চায়। ইউরঘিসের ভাল লাগে না ওর এ সব মন্তব্য, স্বভাবই নিন্দুক, কোন কিছুই যেন ভাল নয়।

ওখান হ'তে ওরা চলে তার নীচের তলায়। এখানে বহু প্রকারের বাতিল মাংস কাজে লাগান হচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে কাজে লাগাবার পর এই পচা নাড়ীভুঁড়িগুলোকে বাতিল বা ফালতু বলে কে? অসহ্য দুর্গন্ধ, তারই মধ্যে মেয়ে-পুরুষ কর্মচারীরা কাজ করছে। আমাদের দর্শকরা এই উৎকট দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারে না, দম বন্ধ হ'য়ে আসে; হাঁপাতে হাঁপাতে সে ঘর ছেড়ে ওরা পালায়! এখান হ'তে ওরা চলল যেখানে হাড়-চাঁচা চামড়া-ছোলা মাংসের টুকরোগুলোকে কাজে লাগান হ'চ্ছে। বাষ্পের সাহায্যে এই সব পচা মাংসের চর্বিটুকু বের ক'রে নিয়ে সাবান তৈরীর কাজে লাগান হয়। চর্বি বা বসা

নিঙ্‌ড়ান পচা মাংসগুলো আবর্জনা হয় না, "কাজে" লাগে। ইউরষিস্‌রা এখানেও টিকতে পারল না—দুর্গন্ধ যেন জমাট হ'য়ে আছে ঘরখানায়। অন্যান্য জায়গায় ওরা ঘোরে। আর একটা ঘরে ঠাণ্ডাঘর হ'তে আনা শূকরদেহগুলো কাটা হ'চ্ছে। কর্মীদের একদল হ'চ্ছে "বিভাজক"; এরা নাকি অত্যন্ত দক্ষ কর্মী—দিন দু' তিন ডলার পর্যন্ত এদের অনেকে উপার্জন করে। বড় বড় ছোরা নিয়ে এরা দাঁড়িয়ে আছে, কাছে একটা ক'রে দেহ আসছে আর ঠিক যন্ত্রের মত মাপ করা হাতে একটা চোপ বসিয়ে দিচ্ছে, অমনি দেহটা দু'খণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে; আর একদলও এমনি দক্ষ, এরা "খণ্ডকার"; বিরাট দৈত্যাকার দেহ এদের, দু'পাশে দু'জন ক'রে ক্ষুদ্রকায় কর্মী দাঁড়িয়ে—খণ্ডিত দেহটিকে তারা তুলে ধরছে আর সে মাপ-করা একটা চোপে বুক কি কোমরটিকে ঠিক সমানভাবে দু'ভাগ ক'রে দিচ্ছে। একবারের বেশী ঘা দিতে হচ্ছে না, নীচের কাঠেও চোট লাগছে না। কিন্তু কোমর বা বুক বা পেটী একই লোক কাটছে না—বিভিন্ন লোক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অংশ কাটছে। কাটবার জায়গায় ঠিক নীচের মেঝেয় একটা ক'রে ফুটো আছে, তাই দিয়ে কাটা বিভিন্ন অংশ গলিয়ে যাচ্ছে নীচের তলায়। সেই নীচের তলাটায়ও যেতে কোন বাধা নেই। এখানে কোথাও বড় বড় ডেকচি বসান আছে এক-একটা ধূম্রাগারে, সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় ভর্তি করা হচ্ছে, লোহার দরজা বন্ধ করলেই ঘর হ'য়ে যাচ্ছে নিশ্ছিদ্র সিন্দুক; কোথাও বুক ও গর্দানের মাংস দিয়ে নোনা মাংস তৈরী করা হচ্ছে, কোথাও চলেছে প্যাকিং—লেবেল সাঁটা, সেলাই করা, বাক্সে ভরা; সব কিছুর জন্যই আলাদা আলাদা ডিপার্ট্‌। এই সব ডিপার্ট্‌ হ'তে ভর্তি ভর্তি প্যাকিং বাক্স উঠছে লরিতে, সেখান হ'তে সেগুলো চলেছে রেলে চড়তে।—এই হ'ল একেবারে নীচের তলা, ঘর হ'তে বের না হ'লে সেটা বুঝতে পারা যায় না।

রাস্তার ওপাশের ইমারতটায় চলছে গোমাংস তৈরীর বহু প্রকারের কাণ্ডকারখানা। এখানে ঘণ্টায় চার হ'তে পাঁচশো গাই-বলদ-বাছুর-ষাঁড় গোমাংস হ'য়ে যাচ্ছে। যা কিছু কাজ একতলাতেই হ'চ্ছে। আগেকার কারখানাটার মত দেহগুলো এক লাইনে কর্মীদের কাছে সরে আসছে না। পনেরো-কুড়িটা লাইনে দেহগুলো ঝুলছে, কর্মীরাই সরে সরে চলেছে এক লাইন হ'তে আর এক লাইনে। প্রত্যেককেই প্রতিটি লাইনে যেতে হচ্ছে। প্রত্যেকের হাত-পা চলেছে অত্যন্ত দ্রুত। এখানে দাঁড়ালে তবেই বোঝা যায় কী অদ্ভুত কর্মচাঞ্চল্য মানুষের। বিরাট একটা হল, সার সার মানুষগুলো ছুটে চলেছে; একটু উঁচুতে দর্শকদের জন্য মাচার মত বারান্দা লাগান—দেখতে এতটুকু অসুবিধা নেই।

হলটার প্রবেশপথের পাশ দিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত একটা ঝোলান্ত বারান্দা। গরুগুলোকে ডাণ্ডা মেরে এখানে তোলা হ'চ্ছে, ডাণ্ডায় বিজলী লাগান আছে—আঘাতের থেকে বিজলীর ধাক্কায় ওরা লাফিয়ে ওঠে। বারান্দাটার প্রান্তের দিকে আছে পনেরো-কুড়িটি খাঁচার মত ঘর—গরুর ঠিক মাপ মত। একটি ক'রে গরু ঢুকছে আর দরজা বন্ধ হচ্ছে, নড়বার আর একটু জায়গা পর্যন্ত থাকছে না। মাথার ওপর ঝুলছে বিদ্যুতচালিত বেশ কয়েক মণ ওজনের একটা হাতুড়ি; হাতুড়ি নিয়ে তৈরী আছে ধাক্কাদার; গরুটা খাঁচা টোপকে পালাবার চেষ্টা করতেই দুম্ ক'রে এসে পড়ছে হাতুড়িটা ঠিক মাথার ওপর। গরুটা পড়ে' প্রাণপণ শক্তিতে পা ছোঁড়ে। ধাক্কাদার একটা চাবি টেপে, খাঁচার একটা পাঁচির ওপরে ওঠে, গরুটা পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গড়িয়ে যায় হত্যামঞ্চের ওপর। এখানে কয়েকটা রশি ঝুলছে, তারই এক-একটা ঠ্যাঙে বেঁধে আর একটা চাবি টেপা হয়, অমনি দেহটা এক ঝাঁকানিতে ওপরে উঠে যায়, শূন্যে ঝুলতে থাকে। মিনিট দু'এর

মধ্যে পনের কুড়িটা খাঁচা থেকে পনের কুড়িটা ক'রে গোরু হত্যামঞ্চের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। আগের দলটার সজ্জা অর্থাৎ চামড়া ছাড়ান প্রভৃতি কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এ একটা দেখবার মত জিনিষ; জীবনে ভোলা যায় না। প্রত্যেকটি কাজ কি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এর তুলনা চলতে পারে মাত্র ফুটবল খেলার সঙ্গে—দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি, কিন্তু কারও এতটুকু ভুল হবার উপায় নেই। প্রত্যেকের কাজকে একটা উচ্চাঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেওয়া হ'য়েছে, ঝুলন্ত দেহের ওপর বেশী হ'লে চারটে আর কমের দিকে দু'টোর বেশী চোট কাউকে বসাতে হয় না; তাও যেখানে খুশী নয়, প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট অংগের বিশেষ একটা অংশ ঠিক করা আছে, সেইটুকুতে দুটো কি চারটে চোট মেরেই সে এগিয়ে যাচ্ছে পরের দেহটার দিকে। প্রথম আসছে "কসাই", এর কাজ রক্তমোক্ষণ; এত দ্রুত হাত চালায় যে হাত বা ছোরা দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু একটা ঝলক; উজ্জ্বল তাজা রক্ত স্রোতের মত গড়িয়ে পড়ে মেঝের ওপর; মেঝের ওপর ফুটো আছে, তারই মধ্যে দিয়ে রক্তটার গড়িয়ে যাবার কথা, কিন্তু সবটা যায় না। মেঝের ওপর আধ ইঞ্চি পুরু হ'য়ে জমে থাকে। কতকগুলো লোক ঠেলে ঠেলে জমাট রক্তটাকে গর্তের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দেবার অবিরাম চেষ্টা করছে; কিন্তু রক্ত ঝরছেও তো অবিরাম —আধ ইঞ্চি জমাট রক্ত-ও থাকছেই। মেঝেটা নিশ্চয়ই খুব পেছল হ'য়ে আছে কিন্তু লোকগুলোর চলন দেখে তা মনে হয় না।

কয়েক মিনিট ধরে' রক্ত ঝরে, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হয় না; রক্ত ঝরে' গেছে এমন দেহও তো আছে। রক্ত ঝরা শেষ হ'লে দেহটা নামান হয়, তখন আসে 'মাথার জন'; দুটো কি বড় জোর তিনটে চোপে সে মাথাটা আলাদা ক'রে দিচ্ছে। এর পর আসে 'মেঝের জন,' দ্রুত একটা টানে সে চামড়ার খানিকটা চিরে দেয়। মেঝের জন আছে জন

হয়। এদের সকলের টানা হ'লেই দেখা যাবে চামড়া চেরার কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হ'য়ে গেছে। দেহটা তখন আবার ঝোলান হয়। চামড়া ছাড়ান শেষ হ'য়ে যায়। আসে চামড়া পরীক্ষক—পরীক্ষা করে চামড়ার কোন অংশ বেখাপ্পা ধরণে কাটা হ'য়ে গেছে কিনা। চামড়াটা জড়ান হ'য়ে যায়, তারপর উধাও হয় মেঝের একটা অবশ্যম্ভাবী গর্ত দিয়ে। এবার দেহটার ভ্রমণ শুরু হয়। বহু কাজ, বহু লোক—কেউ পেট চেরে, কেউ নাড়ীভুঁড়ি বের করে, কেউ বুক চেরে, কেউ বের করে ফুস্‌ফুস প্রভৃতি; কেউ ধড়ের ভেতরটা চেঁচে ছুলে দেয়। আর এক দল তৈরী হ'য়ে আছে ফুটন্ত গরম জলের নল নিয়ে, ধড়টা সামনে আসতেই ওরা নলের মুখ খুলে দেয়, ফুটন্ত জলে দেহের ভেতর বাইরে সমানভাবে ধুয়ে যায়, তারপর ঠ্যাঙগুলো আলাদা ক'রে নেওয়া হয়। এবার শূকরদেহের মত গোদেহও চলে ঠাণ্ডাঘরে; শূকরদেহের মত গোদেহও নির্দিষ্ট কাল এখানে ঝুলবে।

সেখানেও যায় দর্শকরা। কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ঝুলছে দেহগুলো, প্রতিটিতে ক্রমিক সংখ্যা ও অন্যান্য পার্থক্যের একটা ক'রে লেবেল আঁটা আছে—কককগুলোতে আবার পবিত্রতার লেবেল আঁটা আছে—এগুলিকে বিশেষভাবে হত্যা করা হয়েছে যাতে নৈষ্ঠিকদের খেতে আপত্তি না থাকে। প্রতিটী লেবেলে সরকারী পরীক্ষকের দস্তখৎ আছে। আমাদের বিদেশী দর্শকরা দেখতে চলে মেঝের মধ্যে দিয়ে অন্তর্হিত মাংসের টুকরা রক্ত প্রভৃতি নিয়ে কী করা হচ্ছে। একই প্রকারে ধূমকক্ষ, সেদ্ধখানা, লোণা মাংস তৈরীর কারখানা, প্যাক করা, টিনে ভরা, লরিতে তোলা—কিছুক্ষণ আগের গরুগুলি বিশ্ব-সভ্যতার ভোজ্যরূপে ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর চতুর্দিকে। দর্শকরা এবার বেরিয়ে আসে, কিন্তু দেখার কৌতূহল তখনও শেষ হয়নি। ওরা ঘুরে ঘুরে দেখে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের ইমারতগুলোর গোলকধাঁধা। এ ব্যবসায়ে যা-কিছুর প্রয়োজন তার প্রায় সবই

ডারহাম কোম্পানী নিজেরা তৈরী ক'রে নেয়। বাষ্পতৈরীর কারখানা, বিদ্যুৎকারখানা, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, পিপে, প্যাকিং বাক্স তৈরীর কারখানা প্রভৃতি একটার পর একটা বাড়ীতে বসান আছে। চর্বিকে কাজে লাগিয়ে সাবান তৈরী, সাবানের বাক্স টিন প্রভৃতি তৈরীরও কতকগুলো কারখানা আছে। শূয়োরকুঁচি হ'তে বুরুশ প্রভৃতি তৈরীর জন্য কারখানা আছে। আরেকটা ইমারতে চামড়া শুকানো, পাকা করা প্রভৃতির কাজ চলছে। একটা কারখানায় মাথা ও ঠ্যাঙ প্রভৃতি গলিয়ে শিরিষ আটা তৈরী হচ্ছে। হাড় এবং অন্যান্য টুকরোটাকরা গুঁড়িয়ে সার তৈরী হচ্ছে একটা কারখানায়। ডারহামের ব্যবসায়ে জঞ্জাল বলে কিছু নেই। শিঙ থেকে বোতাম, চিরুনি, নকল গজদন্ত, হেয়ারপিন প্রভৃতি তৈরী হয়, বড় বড় হাড় হ'তে তৈরী হয় ছুরি, ছোরার বাঁট এবং পাইপের মুখ। ক্ষুর গলিয়েও শিরিষ বের করা হয়, কিন্তু তার আগে ক্ষুরের শক্ত অংশ কেটে বোতাম, হেয়ারপিন প্রভৃতি তৈরী ক'রে নেওয়া হয়। টুকরো হাড়, কাটাছাঁটা চামড়া প্রভৃতি হ'তে তৈরী হয় জুতোর কালি, হাড়ের তেল, জিলেটিন, অনুপ্রভক ও হাড়ের কালি। "কুঞ্চিতকেশ" কারখানা, অর্থাৎ গোরুর লোমকে এখানে কাজে লাগান হয়। ভেড়ার চামড়া হ'তে লোম তোলবার জন্য আছে "পশমনিষ্কাশক" কারখানা। শূয়োরের যকৃৎ হ'তে পেপসিন ও রক্ত হ'তে আলবুমেন তৈরী হয়। পচা আঁতরি হ'তে তৈরী হয় বেহালার তার। যে অংশটা হ'তে আর কিছুই করা যাচ্ছে না, সেটাকে একটা ট্যাঙ্কে ভিজিয়ে রেখে চর্বির বা তেলের যা একটু থাকে তাই বের ক'রে নিয়ে বাকী অংশটাকে সারে পরিণত করে ওরা। বিভিন্ন ইমারতের মধ্যে রেল লাইন, মোটর পথ, এবং দোতলা তিনতলার মধ্যে সংযোগ আছে। এক পুরুষ কি তার কিছু আগে এই কারখানা স্থাপিত হয়েছে; তখন হ'তে এ পর্যন্ত আড়াই হাজার কোটি

জন্তু নাকি মাংসে পরিণত হ'য়েছে। ছোট বড় এ সব কারখানা একটা ব্যবসায় কোম্পানীরই অংশ; জোকুবাস্ ওদের বোঝায়, এক হিসাবে এত পুঁজি ও এত শ্রমিকের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এরা খাটায় ত্রিশ হাজার শ্রমিক, এই অঞ্চলের আড়াই লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল এবং পরোক্ষ-ভাবে এর ওপর নির্ভর করে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ। এর উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর প্রতিটী সভ্যদেশে রপ্তানী হয়, এবং আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয় তিন কোটি মানুষের।

হাঁ ক'রে শোনে আমাদের বন্ধুরা এই সমস্ত তত্ত্ব—মানুষ যে এত বড় বিরাট ব্যাপক কাণ্ডকারখানা করতে পারে—এ ওদের পক্ষে বিশ্বাস করা মুশকিল হ'য়ে ওঠে! এত বড় কাণ্ড যারা করতে পারে ইউরঘিসের কাছে তারা ভগবানেরই তুল্য; তাদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা মস্করা [illegible] কি তাদের তীব্র সমালোচনা করা ওর পছন্দ হয় না; জোকুবাস্‌টা[illegible] যায় নাস্তিক বলে মনে হয় ওর। এ তো একটা জগৎ সংসার, সে[illegible]ার আইন-কানুনের ওপর কথা কয় কে? এও তো তাই, এর আইন-কানুনের ওপর কি সাধারণ মানুষ কথা কইতে পারে! এখানে যা আছে তাতেই মানুষের খুশী হওয়া উচিত, যা করতে ব[illegible] এরা, তাই করা উচিত; তার ওপর আবার কথা কেন? এখানে কাজ পাওয়া, এর কর্ম-চাঞ্চল্যের অংশীদার হওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদে পাওয়া সৌভাগ্য বলে ওর মনে হয়; আলো বাতাসের জন্য যেমন মানুষের ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এখানে কাজ পেলে এখানকার কর্তাদের কাছে ঠিক সেই রকম কৃতজ্ঞ থাকা উচিত বলে ওর মনে হয়। কাজ পাবার আগে কারখানাটা দেখলে ও হয়তো ঘাবড়ে যেত; দেখবার আগে কাজ পেয়েছে বলে নিজেকে ও ভাগ্যবান মনে করে। ও কাজ পেয়েছে, এখন এরই একটা অংশ, বাজে লোক নয়। কী ভাবে যেন ও অনুভব

করে এই বিরাট কারখানাটা ওকে নিজের রক্ষণাধীনে টেনে নিয়েছে, যার মালিক এত বড় একটা কারখানা তার মঙ্গলের জন্য দুনিয়ায় আর কারও চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। এত নির্দোষ, এত সরল ও বেচারী! জানে না যে ও ব্রাউন কোম্পানীর শ্রমিক। ব্রাউন ডারহামে সাপে নেউলে সম্বন্ধ; দেশের আইন অনুযায়ীই এক অন্যকে ধ্বংস করতে বাধ্য—নইলে শাস্তি নিতে হবে জরিমানা, জেল।

চতুর্থ অধ্যায়

পরদিন ঠিক সকাল সাতটায় ইউরঘিস্ কাজে যোগ দেবার জন্য কারখানার ফটকে হাজির; কিন্তু ফটকে অপেক্ষা করতে হল প্রায় দু'টী ঘণ্টা। নিয়োগকারী অফিসারটী ওকে নিয়োগ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল বটে, কিন্তু নিয়োগ করবার জন্য যে সব কাগজপত্র লেখালেখি করা দরকার তার কিছুই করে নি; ফলে, ওর দাবীর কথা কেউ শোনে না, ও দাঁড়িয়ে থাকে চুপটী করে। ঘণ্টা দুই পর এক জন মজদুরের দরকার পড়ায় অফিসারটী বাইরে এল; ইউরঘিস্ চোখে পড়ে গেল। দেখেই গড় গড় ক'রে অভ্যস্ত কতকগুলো গালাগাল উগলে গেল লোকটা; ইউরঘিস্ তার এক বিন্দু বিসর্গও বুঝল না; কাজেই কোন প্রতিবাদ-ও সে করল না। অফিসারটী ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়; কিছুদূর গিয়ে তারই নির্দেশে বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে সঙ্গে আনা মজদুরের জামাকাপড় পরে' নেয়; অফিসার ওকে কাজে লাগিয়ে দেয় "হত্যামঞ্চে"। কাজ ওর খুবই সহজ; শিখতে মিনিট কয়েকের বেশী লাগে না। একটী মজদুর ওর আগে আগে চলবে জন্তুর পেট হ'তে নাড়ীভুঁড়ি টানতে টানতে, ওর কাজ হচ্ছে সেগুলো ডাঁটিওয়ালা একটা ঝাঁটা দিয়ে

ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে একটা গর্তে ফেলা। ও আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথমদল পশু এসে গেল; ফলে, না পেল ও কোন দিকে চেয়ে দেখবার সময়, না হ'ল কারও সঙ্গে একটা কথা কইবার ফুর্সৎ। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়তে হ'ল। গ্রীষ্মকালের অতি গরম দিন এটা; পায়ের নীচে তাজা গরম রক্ত; গন্ধে দম আটকে আসে; ইউরঘিসের কিন্তু এসব কিছুতেই যেন আসে যায় না। ওর সমগ্র দেহ আনন্দে নৃত্য করছে—কাজ পেয়েছে ও, কাজ! ও চাকরি করছে, টাকা রোজগার করছে। সমস্তদিন ধরে ও মনে মনে হিসাব করে। রূপকথার মত অবিশ্বাস্য রকমের মোটা মাইনে ওর—ঘণ্টায় সাড়ে সতের সেণ্ট্। এ দিনটা কাজ ছিল বেশী; সন্ধ্যা প্রায় সাতটা পর্যন্ত ওকে কাজ করতে হ'ল। ছুটির পর একরকম ছুটতে ছুটতে বাড়ী গিয়ে ও সকলকে খবর দেয়, একদিনে—মাত্র একদিনে ও রোজগার করেছে প্রায় দেড় ডলার।

বাড়ীতেও সুসংবাদের প্রাচুর্য; এত সুসংবাদ যে, ছোটখাট একটা উৎসবেরই অনুষ্ঠান করে ফেলে ওরা। জেদবিলাসের বন্ধু কনষ্টেবলীর সঙ্গে ওনাস কয়েকটী জায়গায় চাকরির উমেদারী করতে গিয়েছিল; একটা কারখানায় কথা পেয়েছে যে, আসছে হপ্তার গোড়া দিকেই ও একটা চাকরি পেতে পারে। ইউরঘিসের সৌভাগ্যে হিংসেয় ফেটে মরছিল মেয়ারিজ্জা বার্কৎসাইন্‌স্কাস্; শক্তিশালী বাহু দুটী আর অতি কষ্টে শেখা "কাজ" শব্দটী ছাড়া ওর অন্য কোন সম্বল নেই; তাই নিয়েই ও বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে; ওর হ'য়ে একটা কথা বলে দেবার কেউ নেই, তা না থাক, নিজের ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস; যেখানেই একটু কার্যব্যস্ততা দেখে, যে বাড়ীটাকে কারখানা বলে মনে হয়, সেখানেই ও একবার করে' ঢু মারে কাজের খোঁজে। কয়েকটা কারখানা গালাগাল দিতে দিতে ওকে বের ক'রে দেয়; দানব মানব যাই হ'ক, ভয়ডর ওর কাউকেই নেই, গালাগালকে ও থোরাই পরওয়া করে।

যাকে সামনে পায়—সে অভ্যাগত আগন্তুক, কি ওরই মত মজুর শ্রেণীর কেউ, কি ম্যানেজার মালিক শ্রেণীর কাউকে সামনে পেলে তাকেই ও জিজ্ঞাসা করে "কাজ আছে, কাজ?" মালিক ম্যানেজাররা কেউ কেউ ওকে পাগল ভাবে, চেয়ে থাকে ওর দিকে অবাক হ'য়ে। শেষ পর্যন্ত ওর চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ যায় না; ওরই মধ্যে একটা ছোট কারখানায় কয়েক কুড়ি মেয়ে বিরাট লম্বা একটা টেবিলের দু'পাশে বসে 'তৈরী' গোমাংস টিনে পুরছে; ঘরের পর ঘর ও পার হ'য়ে যায়; এক এক জায়গায় এক এক ধরণের কাজ চলছে; সকলের শেষের ঘরখানায় টিনগুলোতে রঙ ও লেবেল লাগান হচ্ছে; এখানকার "প্রধানার" সঙ্গে ওর দেখা হ'য়ে যায়। প্রধানার যেন ওকে ভাল লাগে, কেন ভাল লাগে তা অবশ্য মেয়ারিজা তখন বুঝতে পারে না; পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল এই ভাল লাগার কারণটা—কোন মেয়ের বোকা-বোকা সরল মুখ আর ঘোড়ার মত শক্তিশালী পেশী থাকলে, সে মেয়েকে প্রধানার ভালই লাগে। সেদিনই কিন্তু প্রধানা ওকে কথা দেয় না; বলে, কাল বোধ হয় কাজের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব—কাজ না হ'ক টিন রঙান কাজটা শেখবার একটা সুযোগ অন্ততঃ বটে। টিন রঙান দক্ষ শ্রমিকের কাজ; এর দৈনিক মাইনে দু'ডলার পর্যন্ত হ'তে পারে। বিজয়ী সর্বররাজের সোল্লাস প্রত্যাবর্তনের মত হৈ হৈ করতে করতে বাসায় ফেরে ও; ঘরে দাপাদাপি শুরু করে ছোট মেয়ের মত; ওর দাপা-দাপিতে কচিটা চেঁচাতে শুরু করে চোখ বুঁজে।

বাড়ীসুদ্ধ এতখানি সৌভাগ্য প্রায় আশা করা যায় না! একজন ছাড়া সকলেরই কাজ হ'য়ে গেছে। ইউরঘিসের দৃঢ় অভিমত, টেটা এলজবিয়েটা বাড়ীর কাজকর্ম করবে, ওনা তাকে টুকিটাকি সাহায্য করবে; ওনাকে ও বাইরে কাজ করতে দেবে না; বলে, সে রকম পুরুষ ও নয়, বাইরে যে-সব মেয়ে কাজ করে ওনা তাদের মত নয়। ওর

মত মরদ একটা সংসার চালাতে না পারলে, সে যে বড় তাজ্জব কথা হবে; তার ওপর একা নয় ও, ওকে সাহায্য করতে জোনাস আছে, মেয়ারিজ্জা আছে। ছোটদের কাজে যাবার কথাও ও সইতে পারে না। শুনেছে আমেরিকায় বিনে মাইনের পাঠশালা আছে; বলে, সেখানে ওরা পড়তে থাক। পুরুতঠাকুরেরা যে এসব পাঠশালের বিরোধী তখনও তা ইউরঘিস্ জানত না। ও চায় এরা, অন্ততঃ ষ্ট্যানিসলোবাস, ইংরেজী বলতে শিখুক, দক্ষ শ্রমিক হ'য়ে গড়ে উঠুক। স্তেদবিলাসের বড় ছেলের বয়স এই সবে বার; এরই মধ্যে কারখানায় কাজ করা তার এক বছর হ'য়ে গেল। ষ্ট্যানিসলোবাস তো তবু তের বছরের, হ'ক না কেন বয়সের অনুপাতে একটু বেঁটে খাটো—তবু তের তো বটে। ইউরঘিস কিন্তু গোঁ ধরেই থাকে, খালি ষ্ট্যানিসলোবাস নয়, ওরা কেউ কাজ করতে যাবে না, লেখাপড়া শিখবে।

কাজেই কাজ হতে বাকী রইল শুধু ডেডে অ্যাণ্টেনা। ইউরঘিস চায় এ বয়সে ও-ও একটু বিশ্রাম করুক; কিন্তু অবস্থা চাপে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে পারে না। বুড়োও বসে খেতে রাজী নয়; ওর ধারণা, যে কোন জোয়ানের মতই জোর আছে এখনও ওর গায়ে। আর আর সকলের মত সেও আশায় ভরা বুক নিয়ে আমেরিকা এসেছিল; আর আজ নিজের কাছেই ও একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যার কাছেই ইউরঘিস্ বুড়োর কথা তোলে, সেই বলে, এ প্যাকিংটাউনে বুড়োদের জন্য কাজ খুঁজে কোন লাভ নেই, তাতে শুধু শুধু সময় আর সামর্থ্য নষ্ট হবে। স্তেদবিলাস জানিয়ে দেয়, নতুন বুড়ো ভর্তি করবে! ওদেরই ওখানে কাজ করতে করতে যারা বুড়িয়ে গেল তাদেরই তাড়িয়ে দিচ্ছে, নতুন বুড়ো ভর্তি করবে! খালি কি এদেরই এই রীত?! হুঁ, আমেরিকার যেখানে যাবে সেখানেই এই। তবু ইউরঘিস্‌কে সন্তুষ্ট করবার জন্য কনষ্টেবল বন্ধুকে একবার সে বলেছিল; কর্তৃপক্ষের অংশ

কনষ্টেবল জানিয়ে দিয়েছে, অমন কথা ভেবে পর্যন্ত নাকি লাভ নেই। বুড়ো অ্যান্টনিকে এ কথা ওরা জানাতে পারে না। বুড়ো কারখানা-গুলোর ফটকে ফটকে ঘুরে বেড়ায়, ব্যর্থ হ'য়ে বাসায় ফেরে; অন্যদের আনন্দে ও-ও যোগ দেয়, ভয় খায় না, হিম্মৎ হারায় না; বলে, ও-ও একদিন কাজ পাওয়ার সুসংবাদ আনবে।

এতখানি সৌভাগ্য এক সঙ্গে এসে যাওয়ায়, ওদের মনে হয় এবার নিজেদের একখানি বাড়ী হ'লে বেশ হয়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, সকলে মিলে নাছ্ দোরে বসে একথা ওকথার আলোচনা করছিল; বাড়ীর কথাটা সকলের তরফ হ'তে যেন আপনা হ'তেই এসে পড়ে। অতি গম্ভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীর অবতারণা করে ইউরঘিস। আজ সকালে কারখানায় যাবার পথে দেখে দুটি ছেলে বাড়ী বাড়ী কিসের একটা বিজ্ঞাপন বিলি করছে; ছবি আছে দেখে ও একখানা চেয়ে নেয়, কিছু বুঝতে না পেরে পকেটে ভাঁজ ক'রে রেখে দেয়। টিফিনের সময় একজনের কাছে পড়িয়ে বুঝে নেয়; সবটা অবশ্য বুঝতে পারে নি; যেটুকু পেরেছিল, তাই হ'তেই এই আলোচনার অবতারণা।

বিজ্ঞাপনটা হাতচিটের মত একটা ঘিঞ্জি হ্যাণ্ডবিল নয়; দু'ফুট লম্বা আর্ট কাগজে ছাপা চমৎকার একখানা প্রাচীর-পত্র; চারুশিল্পের নিদর্শন আর কি! রঙ নির্বাচনের রুচি থাক বা না-থাক, চটক আছে খুব; জেল্লার রঙ, চাঁদনীতেও ঝক্‌ঝক্ করে। চিত্রের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে আছে একখানা বাড়ী—বিস্ময়কর তার রঙের মিশ্রণ, দেখতে দেখতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঢালু ছাদ গাঢ় লাল, ছাঁচ সোনালী, দেওয়ালগুলো রূপোলী, দোর জান্‌লার কপাটগুলো সাধারণ ফিকে লাল। দোতলা বাড়ী, সামনে একটু গাড়ীবারান্দা। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ নেই। দোরের হাতল, জান্‌লার পাতলা সাদা পর্দা সব কিছুই আছে। বাড়ীর বাইরে এক কোণে আলিঙ্গনাবদ্ধ সুখী এক দম্পতি, অপর

কোণে ঝালর ঢাকা দোলনার ওপর উড়ন্ত বাচ্চা দেবদূতের ছবি। এতেও বিজ্ঞাপন যদি কার্যকরী না হয়, এই আশঙ্কায় (যে সকল দেশ হ'তে আড়-কাঠেরা কুলি আনে সেই) লিথুয়ানিয়, পোল ও জার্মাণ ভাষায় লেখা হ'য়েছে "ওম, নামাই, হেইম্" অর্থাৎ "বাড়ী"। তারপর চলেছে বিজ্ঞাপনের উক্তি—"কেন বাড়ীভাড়া দেবেন ;" এ সবও চলেছে ঐ সব বহু ভাষায়, "নিজের একটী বাড়ী হবে না কেন? জানেন কি, যে-ভাড়া আপনি দেন তার চেয়েও কম ভাড়ায় আপনার নিজস্ব একখানি বাড়ী হ'তে পারে? আমরা হাজার হাজার বাড়ী তৈরী করেছি, এই সব বাড়ীতে কত পরিবার কত সুখে আজ বাস করছেন।…" এই ভাবে উক্তি চলেছে ; নিজের বাড়ীতে ভাড়া না দিয়ে থাকায় দাম্পত্য জীবনের অখণ্ড সুখের বর্ণনা করা রয়েছে। শেষে ইংরেজী কবিতা "হোম, সুইট হোম"-এর একটী কলি উদ্ধৃত করা হয়েছে, পোল ভাষায় তার অনুবাদ পর্যন্ত দেওয়া হ'য়েছে, অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়েছে লিথুয়ানিয় অনুবাদ। হয়তো অনুবাদকার ভেবেছেন, যে ভাষায় ফোঁপানির প্রতিশব্দ "গক্কেৎসিওজিমাস" এবং মৃদু হাসির প্রতিশব্দ "মুসিস্ৎসাইপ্সোজিমাস," সে ভাষায় এমন একটা ভাবপ্রবণ কবিতার অনুবাদ দেবার চেষ্টা বৃথা।

সারা পরিবারটা ছবির ওপর নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, ওনা কষ্টেসৃষ্টে বানান ক'রে ক'রে শব্দগুলো উদ্ধার ক'রে ওদের শোনায়। বাড়ীটায় চারখানা ঘর আছে, একটা বারান্দা আছে ; জমি ও ইমারতে মিলিয়ে দাম লাগবে পনের শ' ডলার, তার মধ্যে আগাম দিতে হবে থোক তিন শ' ডলার, আর বাকী বার শ' ডলার শোধ করতে হবে বার ডলারের মাসিক কিস্তীতে। অঙ্কগুলো ভয়ানক শোনায়, কিন্তু ভুললে চলবে কেন যে, ওরা এখন আমেরিকায়, এখানকার লোক হর্দম ঐ রকম অঙ্ক আওড়াচ্ছে—এ সব তাদের কাছে আতঙ্কের কথা নয়, একান্ত

স্বাভাবিক। চার ঘরযুক্ত একখানা ফ্ল্যাট নিতে হ'লে মাসে অন্ততপক্ষে ন' ডলার ক'রে ভাড়া দিতে হবে, তা'ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নেই; অবশ্য মানুষের মত না থাকতে চাইলে আলাদা কথা; এক কি দু'খানা ঘরে বার জন গুঁতোগুঁতি ক'রে থাকলে ন' ডলার লাগবে কিসে? এখন এমনই আছে, কিন্তু একে তো আর থাকা বলে না। ভাড়া দিলে, আজীবন ভাড়াই গুণতে হবে, কিন্তু তার বদলে কস্মিন কালে কিছু আসবে না। আর আগামের টাকাটা এখন কোন রকমে জোগাড় করতে পারলে, শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় আসবে যখন হ'তে জীবন-ভোর বে-ভাড়ায় থাকা যাবে।

হিসাব কষে ওরা। টেটে এলজবিয়েটার পুঁজির কিছু এবং ইউরঘিসের-ও পুঁজির একটা অংশ এখনও জমা আছে। মেয়ারিজার মোজার মধ্যে ওর পঞ্চাশ ডলার লুকোন আছে, বুড়ো অ্যাণ্টনিরও খামার বেচা টাকার একটা অংশ এখনও জমা আছে। সবটা একত্র করলে আগামের টাকাটা খুব হ'য়ে যাবে; আর মাসিক কিস্তী? ভবিষ্যতে বাঁচতে গেলে চাকরি রাখতেই হবে; আর চাকরি থাকলে কিস্তীর পরওয়া কে করে? তবে, জিনিষটা এমন হাল্কা ভাবে চিন্তা তো দূরের কথা, কথা পর্যন্ত হাল্কাভাবে কওয়া চলে না এ বিষয়ে। একেবারে তল পর্যন্ত হাতড়ে দেখতে হবে ওদের। আবার নিতে হ'লে এখনই একটা কিছু করে ফেলতে হবে; দেরি করবার সময় কই—ভাড়া তো লেগেই চলেছে; ভাড়া দিয়েও তো স্বস্তি নেই; বাস করতে হচ্ছে ভেঁড়া ছাগলের মত গাদাগাদি ক'রে। ময়লা নোংরা জঞ্জাল! ইউরঘিস্ ওসব "গেরাহ্যিই" করে না; রেললাইন তৈরীর গ্যাঙে যারা কাজ করেছে তারা আর কোন কিছুতেই ঘাবড়াবে না; সেখানে খাবার কি শোবার ঘর হতে ইচ্ছে করলে মুঠো মুঠো মাছি ধরা যায়। কিন্তু ওনা ওসব জিনিষ সইতে পারবে কেন? ইউরঘিস্ একদিনে এক ডলার

শাতায় সেণ্ট্‌ রোজগার করেছে, আত্মবিশ্বাসের [illegible] আর অন্ত নেই। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই ও বলে, একটা ভাল আস্তানা[illegible] ব্যবস্থা শীগগীর করতে হবে। একটা জিনিষ ইউরঘিস্‌ বুঝতে পারে না—এ অঞ্চলের অনেকেই তো ওরই মত মজুরী পায়; তবু তারা অমনভাবে বাস করে কেন? অত নোংরার মধ্যে জানোয়ারের মত?

পরের দিন কারখানায় গিয়ে মেয়ারিজা প্রধানার সম্মতি পেলে—পরের হপ্তার প্রথম দিন হ'তে কাজে যোগ দিতে হবে। প্রথমটায় অবশ্য টিনরঙান বিদ্যার শিক্ষানবিশী। তা হ'ক। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ও বাড়ী ফেরে। ওনা আর তার সৎমা তখন বাড়ী সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে বেরুচ্ছে। ও-ও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। সন্ধ্যায় ওরা পুরুষদের কাছে খবর দাখিল করে—বিজ্ঞাপনে যা লেখা তাই, অন্ততঃ দালাল তাই বলেছেন। তা'ছাড়া ভদ্রলোক জানিয়েছেন, প্লটগুলো কারখানার মাত্র মাইল দেড়েক দক্ষিণে; এমন পরিকল্পনা নাকি আর হয় না; খদ্দেরের এত লাভ অন্য কোন কেনাবেচায় হওয়া অসম্ভব। এত ভেতরের খবর তিনি দিচ্ছেন, কারণ এতে তাঁর নিজস্ব [illegible]ন স্বার্থ নেই—কোম্পানীর তিনি মালিকও নন, ডিরেক্টরও নন, এজেণ্ট মাত্র। কোম্পানী এ ব্যবসা নাকি তুলে দেবে, কাজেই কিছু করতে হলে এখনই কেনা-কাটা করে ফেলা ভাল। তবে একটু মুশকিল হ'য়ে গেছে, এত লোক এ বাড়ী ক'খানার জন্য কাড়াকাড়ি করছে যে এখন পর্যন্ত আর কোন জায়গা বা বাড়ী খালি আছে কিনা সন্দেহ। এ কথা শুনে এলজবিয়েটা প্রায় কেঁদেই ফেলে। ওর অবস্থা দেখে ভদ্রলোকের দয়া হয়; বলেন, সত্যিই যদি এরা কিনতে চায়, তা হ'লে না হয় উনি নিজের ট্যাকের পয়সা খরচ করে টেলিফোনেই ওদের জন্য একটা বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে রাখবেন। কাজেই পাকাপাকি বন্দোবস্ত ওরা ক'রে এসেছে—আগামী রবিবার সকালে গিয়ে সকলে জায়গাটা দেখে আসবে।

সেটা বৃহস্পতিবার। বাকী ক'টা দিন ব্রাউনের কারখানায় পুরো চাপে কাজ চলল; ইউরঘিস্ কামিয়ে চলল দিন এক ডলার পঁচাত্তর সেণ্ট্ ক'রে; তাতে হপ্তায় হয় সাড়ে দশ ডলার, ইউরঘিস্ অত হিসেব কিতেব করতে পারে না; কিন্তু ওনা এদিকে ভারী ওস্তাদ, শুনেছে কি মুখে মুখে হিসেব জুড়ে ফেলেছে। সংসারের হিসেব ও-ই ক'রে দেয়। মেয়ারিজা আর জোনাস খাওয়া বাবদ মাসে ষোল ষোল বত্রিশ ডলার দেবে; বুড়ো জিদ করে, ও-ও তাই দেবে, এই কাজটা হ'তে যা দেরি, যে কোন দিন হ'লেই হ'ল। এই হিসেবে সংসারে আসবে তিরানব্বই ডলার। ঠিক হয়, বাড়ী বাবদ মাসিক কিস্তীর তিন ভাগের দু' ভাগ বইবে মেয়ারিজা আর জোনাস মিলিত ভাবে, বাকী আট ডলারের দায়িত্ব নেবে ইউরঘিস্। তাহ'লে খরচ খরচা বলে থাকবে পঁচাশী ডলার। আর যদি ধরা যায় বুড়ো কাজ পাবে না, তা হ'লেও সত্তর ডলার কেউ মারে না; বার জনের সংসারে ওর বেশী লাগা কিছুতেই উচিত নয়।

রবিবারের সকালে সমস্ত পরিবারটি নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে জায়গা দেখতে বেরিয়ে পড়ল। এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লেখা ছিল, উপযুক্ত লোক পেলেই ওরা একবার সেটা দেখিয়ে নেয়। পথটা ওরা বলেছে দেড় মাইল, হয়তো দেড় মাইলই, কিন্তু ভালভাঙ্গা দেড় মাইল বোধ হয়। তবু হেঁটেই ওরা পথটা মেরে দেয়। পৌঁছনর প্রায় আধ ঘণ্টা পরে এজেণ্ট মহোদয়ের মুখ দেখা গেল। ভদ্রলোকের যেমন চেহারা তেমনি পোষাক—সবই সুন্দর উঁচু দরের; একেবারে নিজের মত ক'রে ওদের ভাষায় কথা ক'ন; ফলে এদের সঙ্গে কাজের কথাবার্তা চালাতে তাঁর বিশেষ সুবিধা হয়। ভদ্রলোক ওদের বাড়ী দেখতে নিয়ে যান; একই ধাঁচের খাঁচা খাঁচা এক সারি বাড়ি; ইটের পর ইট গেঁথে তৈরী নয়, তৈরী দেওয়াল জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে।

স্থাপত্যটা এদের হিসেবে ফালতু চীজ, কাজেই সেটার নাম গন্ধ নেই এখানে। ছবিতে দেখান রঙের টিকি দেখা যায় না কোথাও; নক্সার হিসেবে আকারেও ছোট। দেখেশুনে ওনা দমে যায়। তবু রঙ একটা করা হয়েছে—নোতুনই। ভদ্রলোক বলেন, খালি কি রঙটাই নতুন, এর সব কিছু একেবারে আনকোরা নতুন। হড়বড় হড়বড় ক'রে ভদ্রলোক শুধুই বকে চলেন; কথার তোড়ে ওদের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। জানাবার কত কথাই যে জিজ্ঞাসা করা হয় না তার ইয়ত্তা নেই। কত কী জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল সব; কিন্তু জিজ্ঞেস করবার সময় হয় ভুলে মেরে দিলে, নয় জিজ্ঞেস করবার সাহস হ'ল না। সারির অধিকাংশ বাড়ীই পুরনো, খালি। কথাটা একবার ওরা তোলে—এত বাড়ী ফাঁকা কেন। ভদ্রলোক ঝট্‌ করে জানিয়ে দেন বিক্রী হ'য়ে গেছে, বাসিন্দারা শীগগিরই এসে পড়বে। এর পর আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে, ভদ্রলোককে মুখের উপর সন্দেহ করা হয়। ভদ্রলোক জাতের কারও সঙ্গে ওরা জীবনে সভয়ে এবং সবিনয়ে ছাড়া কখনও কথা কয় নি।

বাড়ীটার মেঝে পাশের রাস্তার চেয়ে ফুট দুই নীচু; একতলা বাড়ী বড় জোর ছ' ফুট উঁচু, কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে ঘরে নামতে হয়। চাল-টাকে একটু ছুঁচলো ক'রে গাড়ী বারান্দার মত করা হয়েছে; দু'পাশের দেওয়ালে ছোট ছোট দুটো জানালা। সামনের পথ কাঁচা, আলোর ব্যবস্থা নেই। দোর বা জানালা দিয়ে চাইলে এই ধরণের আরও কতকগুলি বাড়ী চোখে পড়ে; বাদবাকী জায়গাটা খালখন্দ ঝোপঝাড়। বাড়ীর ভেতর চারখানা ঘরই আছে, মেঝে পাতা নেই, দেওয়ালে পলেস্তারা করা হয়নি। দালাল মশায় বোঝান, খদ্দেররা নিজেদের পছন্দ মাফিক মেঝে ও দেওয়াল করে নিতে চায় বলে, ওগুলো অমনি রাখা হয়েছে। ছাদ অর্থাৎ চালের নীচে' এক টুকরো চিলেকোঠা,

তারও মেঝে-স্থলে আছে দু'খানা কড়ি; বরগা লাগিয়ে চিলে কোঠাটা ভাড়া দেওয়া যাবে।

দেখে শুনে ওদের একেবারে দমে যাবার কথা; কিন্তু এজেণ্টের বাগ্‌বাজীতে চর্খী ঘুরে যায় ওদের বুদ্ধি। ভদ্রলোকের কথা সত্যি হলে, এ বাড়ীর সুযোগ-সুবিধার আদি অন্ত নেই; এমন নাকি আর হয় না। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখ বন্ধ হয় না; দেখায় আর বোঝায়, বোঝায় আর দেখায়; খুঁটিনাটি কিছু বাদ পড়ে না। দোরের তালা, জানালার ছিটকিনি, রান্নাঘরের জলের কল, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য জল ও কল-লাগান জলের ড্রাম। এলজবিয়েটা স্বপ্নেও কখন ভাবেনি যে, ওর নিজের এ সব হ'তে পারে; এ সব দেখাশোনার পর খুঁতখুঁত করা অকৃতজ্ঞের কাজ হবে ভেবে ওরা চুপ ক'রেই থাকে, অন্যান্য দোষ ত্রুটি দেখেও দেখে না।

তবু চাষী লোক তো ওরা; টাকা কামড়ে থাকা ওদের প্রকৃতি। এজেণ্টের শত চেষ্টা সত্ত্বেও টাকা ওরা ঝট ক'রে বের করে না; খালি বলে, হ্যাঁ, দেখি, ভেবে দেখি, ভাববার সময় চাই একটু মশায়। সমস্ত দিন ধরে ওরা হিসেব আর যুক্তি, যুক্তি আর তর্ক করে। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলা ওদের পক্ষে গর্ভ-যন্ত্রণা বিশেষ। সকলে একসঙ্গে এক মত হ'তে পারে না। কেউ না কেউ বেঁকে দাঁড়ায়; তার ওপর আছে গোঁয়ারতুমি, জিদ্, সকলে মিলে তাকে বোঝাতে লাগে; সে যদি বোঝে তো আর একজন বেঁকে বসে। সন্ধ্যা নাগাদ সকলে একমত হ'ল, মতের দিক হ'তে বাড়ী প্রায় কেনারই সামিল হ'য়ে গেছে, ঠিক এই সময়টিতে স্তেদবিলাস এসে ওদের মতামত সব ভণ্ডুল করে দেয়। ও একেবারে এর বিরোধী—"নিজের বাড়ী কেনার" এই জোচ্চুরির পাল্লায় পড়ে কত লোকের সর্বনাশ হ'য়েছে; এবং কোন্ কোন্ লোক ধনেপ্রাণে মারা গেছে, তার হাড়-কাঁপান ঘটনা বলে, শুনে

ওদের কাহিনী বলে' মনে হয়। বলে, ওর খপ্পরে পড়লে এমন কোণঠাসা হবে যে টাকাও যাবে, কথাটিও কইতে পাবে না। খরচখরচার তো আদি অন্ত নেই, এখন মনে হচ্ছে বেশ তো বাড়ী, আগাম দিলাম, মাসে মাসে কিস্তীর টাকা ফেলে দিলাম, ব্যস! আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই, ক'বছরের মধ্যে বাড়ী নিজের হ'য়ে গেল; কিন্তু এর মধ্যে যে কত ফিকির কত ফন্দি আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার ওপর বাড়ীর চূড়ো হ'তে ভিৎ পর্যন্ত হয়তো পচা-খসা, চাষাভুষো মানুষ এ সবের কী বুঝবে? তার ওপর ঐ চুক্তি, ও চীজ জোচ্চুরির জড়, গরীব মুখ্য মানুষরা ওর কী-ই বা বুঝবে, কী-ই বা জানবে? এর আগাগোড়া সব জোচ্চুরি, জোচ্চুরি নয়, স্রেফ্ ডাকাতি, এ সংক্রান্তি এড়াতে হ'লে ওর বাইরে থাকতে হবে, ও ঝামেলায় একবার জড়িয়ে পড়লে আর অব্যাহতি নেই।

তা'হলে কি ভাড়া দিয়েই চলব?—ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে।

আরেঃ,—উত্তর আসে, সে কোথাও কি শুধোবার, ও-ও আর এক রকমের ডাকাতি। গরীবের ওপর এ সবই জুলুম, সবই ডাকাতি।

আধ ঘণ্টা ধরে' এমনি সব ভয়ানক আলোচনা চলে; তারপর ওদের মনে হয়, খুব বেঁচে গেছে ওরা, ডুবেছিল আর কি! স্তেদবিলাস ফিরে যায়। দেখতে ছোট হ'লে কী হবে, জোনাস এদিকে বুদ্ধিতে ভারী চালাক। ও মন্তব্য করে, সবই ওর কাছে খারাপ আর মন্দ! হবে না কেন? মিঠাই-এর দোকানখানা খুলেছিল, চলল না; দুনিয়ার সব কিছু খারাপ হবে না ওর কাছে! আবার আলোচনা শুরু হ'য়ে যায়!

ওদের সমস্ত চিন্তা ও আলোচনা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ একটি বিষয়দ্বারা। যেভাবে এবং যেখানে এখন ওরা আছে সেখানে এভাবে আর থাকা চলে না—কোথাও যেতেই হবে। তাছাড়া আর

কোথাও গেলে চিরটা কাল মাসে অন্ততঃপক্ষে ন' ডলার ক'রে দিয়ে যেতে হবে, সেও তো কিছু কম সমস্যা নয়, দেবে কীভাবে, কোন্ আশায় পেট মেরে অতগুলো ক'রে কড়ি গুণে চলবে? হপ্তাখানেক ধরে' দিবারাত্র হয় ঐ-ই ওদের ধ্যানজ্ঞান, যুক্তিতর্কের কুস্তোকুস্তি চলে অবিরাম; শেষ পর্যন্ত সব কিছু স্থির করবার ভার পড়ে ইউরঘিসের ওপর। জোনাস ভায়া কাজ পেয়ে গেছে, ডারহামে ঠেলাগাড়ী ঠেলছে; ব্রাউনের কারখানাতেও জোর কাজ চলছে, ইউরঘিসের আয় শুরু হ'তে প্রায় সমানই চলছে; দেখে শুনে ওর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এই অবস্থাতেই তো গেরস্তকে—বাড়ীর কর্তাকে—মতিস্থির ক'রে সিদ্ধান্ত করতে হবে, কল্পনাকে কাজে পরিণত করতে হবে। অন্য লোক হ'লে হয়তো ভয়ে পিছিয়ে যেত, ও সে জাতের নয়, পিছোবার লোক ও নয়। সমস্ত দিন, দরকার হ'লে সমস্ত রাত্রি ও কাজ করবে, আপনার জন ক'টিকে নিজের একখানা বাড়ী ক'রে দিতে না পারা পর্যন্ত না হয় বিশ্রামই করবে না। ওদের ও বোঝায় আর কিছু না হ'ক, ও একাই জান দিয়ে মেহনৎ ক'রে বাড়ীর বকেয়া দাম শুধে দেবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হ'য়ে যায়, বাড়ী ওরা কিনবে।

আলাপ-আলোচনায় ঠিক হয়, বাড়ী নেবার আগে আরও পাঁচখানা বাড়ী দেখবে, আদেখ্‌লার মত হাতের কাছে যা পেলাম তাই নিলাম, সে ওরা করবে না। কিন্তু মুশ্‌কিল হ'ল, আর কোন কোম্পানী এই ধরণের বাড়ী করে কি না, করলে সে-সব কোথায়, তার কিছুই ওরা জানে না, কীভাবে জানতে পারা যাবে, তাও জানে না। তাছাড়া যখনই বাড়ীর কথা ভাবে, মনের সামনে ফুটে ওঠে দেখা বাড়ীখানিই, তার সুবিধা-অসুবিধা সব কিছু নিয়ে। স্বতঃসিদ্ধের মত ওরা ধরে' নিয়েছে, ব্যবসায়ী মাত্রেই ডাহা মিথ্যুক; দালাল যা বলেছে বা বলবে তার সব কিছু হাঁদা বোকার মত ওরা গিলবে, তা তো নয়।

ধৈর্যসহকারে দালাল মশায় আবার ব্যাখ্যা করতে বসেন; কিন্তু কোন ব্যাখ্যাতেই এবার আর ডাল গলতে চায় না। ইউরঘিসের শেষ গুরুগম্ভীর উপদেশটা এলজবিয়েটার মনে গেঁথে বসে আছে—'কোথাও কোন ভুল দেখলে নিজে বে-ভুল হয়ো না যেন—ওকে আধলা না ঠেকিয়ে একজন উকিল ডেকো আগে।" উদ্বেগে আশংকায় ওর বুক ফাটফাট হয়, মড়ার মত শক্ত ক'রে হাত দুটো মুঠো করে; নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। কথা কইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু কথা ফোটে না। শেষ পর্যন্ত দেহমনের সমগ্র শক্তি দিয়ে ও ওর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে।

জোকুবাস ওর উক্তির অনুবাদ ক'রে দেয়। এলজবিয়েটার ভয় হয়েছিল, ভদ্রলোক এপার ভীষণ চটে' উঠবেন। ও মা! কোথায়! যথাপূর্বং তথাপরং। ভদ্রলোকের ধৈর্যের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। ধীরভাবে বললেন, দরকার হ'লে তিনি নিজেই উকিল ডেকে দিতে রাজী আছেন। এলজবিয়েটা তাতে রাজী হয় না। কাছাকাছির উকিল হয়তো এদের দলের লোক হ'তে পারে। তাই কাছাকাছি কোথাও খোঁজ না ক'রে ওরা ইচ্ছে ক'রেই অনেক দূরে যায় উকিলের খোঁজে। এজেণ্টও ওদের সঙ্গে। আধ ঘণ্টা হাঁটাহাঁটি খোঁজাখুঁজির পর একজন উকিল পাওয়া গেল—উকিল সাহেব এজেণ্টের ডাকনাম ধরেই নমস্কার জানান; ওদের বিষাদ কল্পনারও অতীত হ'য়ে ওঠে —যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই কি সন্ধ্যা হয়! সেই ওরই চেনা উকিল হ'ল শেষ পর্যন্ত!

ওদের মনে হয়, আজ সর্বস্ব গেল। তবু বসতে হয়; বসে বন্দীর মত, যেন মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনতে বসেছে। ফাঁদেই তো পড়েছে—কী আর করবে? উকিলসাহেব ধীরে সুস্থে চুক্তিনামাহ পড়েন; পড়ে জানান সবই তো ঠিক আছে; এ সব চুক্তিনামাহ ইচ্ছে ক'রেই একটু ঝাপসা রাখা হয়, খরিদ্দারের তাতে কোন ক্ষতি হয় না।

স্তেদবিলাস জিজ্ঞাসা করে, দাম, কিস্তী ও সব ঠিক আছে কি ?

নিশ্চয় ! একেবারে নির্ভুল।

এটা কি অমুক লটের অমুক বাড়ী এবং বাড়ীর সব কিছুর বিক্রীর পাট্টা ?

হ্যাঁ, তাই তো বটে। বলে' উকিল সাহেব ওদের দেখিয়ে দেন কোথায় ওসব আছে।

সবই ঠিক আছে তা হ'লে, ফাঁকিটাকি নেই তো কোথাও ? ওরা গরীব মানুষ, এই ওদের পুঁজি, এই ওদের সম্বল, দুনিয়াতে এ ছাড়া আর কিছু নেই ওদের, এটুকু গেলে ওরা একেবারে মারা পড়বে, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে ওদের। স্তেদবিলাস বুঝিয়ে চলে ; মেয়েরা নির্বাক বেদনায় স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। এদেশী ভাষায় ও কথা কয়, ওর কথা ওরা বুঝতে পারে না ; শুধু বোঝে যে এই কথা ক'টার ওপরই ওদের ভাগ্য নির্ভর করছে। ক্রমে স্তেদবিলাসের সকল প্রশ্ন জানবার সব কথা শেষ হ'য়ে যায়। এবার যা হ'ক একটা কিছু ক'রে ফেলতে হয়। হয় কেনাকাটার কথা বন্ধ ক'রে দিতে হয়, নয়তো চুক্তিতে সই ক'রে টাকা দিয়ে দিতে হয়। এলজবিয়েটার বুক ফেটে কান্না আসে। তবু কোনরকমে কান্না চেপে থাকে। জোকুবাস জিজ্ঞাসা করে, 'সই করবো ?" সাড়া নেই, আবার জিজ্ঞাসা করে, "কিনবে ?" এই উকিলটা যে সত্যি বলবে, এ-ও যে ওদের দলের নয়, ওদের সঙ্গে এ-ও ষড় করেনি—কী ক'রে জানাবে বেচারী। তবু সে কথা তো ও বলতে পারে না, অবিশ্বাসের কী ওজর দেবে ও ? ঘরের সকলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওরই দিকে—ওরই সিদ্ধান্ত শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে সকলে। জলে চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে ; তবু হাত চালায়, হাতড়ে হাতড়ে জামার ভেতর যেখানে নোটের তাড়া সেলাই করা আছে। বের ক'রে পুরুষদের সামনেই ও মোড়কটা ধীরে ধীরে খোলে।

ঘরের এক কোণে বসে ওনা এতক্ষণ ধরে বেদনায় ভয়ে হাত কচলাচ্ছিল —সংমাকে ও বলতে চায়, থাম মা, টাকা দিও না, এ ফাঁদ, এ ফাঁদে পড়লে আর উদ্ধার নেই; বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না, কিসে যেন ওর গলা টিপে ধরে; মনের কথা বুকে বেধে যায়। অসহায়ের মত এলজবিয়েটা টাকাটা টেবিলের ওপর রেখে দেয়; নোটগুলো নেড়েচেড়ে গুণে তুলে নিয়ে এজেণ্ট ওদের একটা রসিদ লিখে দেন, তারপর চুক্তিনামাটা এগিয়ে দেন ওদের দিকে। তৃপ্তির একটা শ্বাস ছেড়ে এবার ভদ্রলোক ওঠেন, ওদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন, এখন ঠিক আগেরই মত বিনয়ী নম্র ধীর। এর ওপর উকিলের মজুরী আছে এক ডলার, অনেক ব্যথা অনেক কষ্টের পর সেটাও দিতে হয়। ওরা পথে বেরিয়ে পড়ে। এলজবিয়েটা শক্ত ক'রে ধরে থাকে পাট্টার কাগজখানা। ভয়ে ভাবনায় অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে ওরা, বিশ্রাম না ক'রে আর চলতে পারে না। পথেরই পাশে একজায়গায় বসে পড়ে একটু জিরোতে।

ভয়ঙ্কর একটা জন্তুর মত ভয় ওদের অন্তর চিবোতে থাকে। তবু বাসায় ফিরতে হয়। সন্ধ্যায় ইউরঘিস বাসায় ফেরে, সমস্তটা শোনে, ব্যস! ঠিক জানে ও ওদের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছে দালালটা; সর্বনাশ হ'য়ে গেছে ওর, একেবারে মাটি হ'য়ে গেল ওরা। ঠিক পাগলের মত ও চুল ছেঁড়ে. চেঁচায়, দাপাদাপি করে; অন্যরা ভয়ে নিশ্চুপ জনড় হ'য়ে বসে' থাকে। কিছুক্ষণ ধরে' অবিরাম চলে ওরা গালাগাল আর চিৎকার; বলে, আজ রাত্রেই ও দালালটাকে খুন করবে। শেষ পর্যন্ত পাট্টাখানা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী হ'তে। স্তেদবিলাস খেতে বসেছিল; তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে আর একজন উকিলের কাছে। ওর লাল চক্ষু, রুক্ষ মূর্তি, উগ্র চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল দেখে আঁতকে ওঠে উকিলটা। স্তেদবিলাস ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। আশ্বস্ত হ'য়ে

উকিল চুক্তিপত্রটা পড়তে বসে; ইউরঘিস শক্ত থাবায় মুঠো ক'রে ধরে টেবিলের দুটো কোণ; থরথর ক'রে কাঁপে ওর প্রতিটী শিরা-প্রশিরা।

উকিল মধ্যে মধ্যে মুখ তুলে কী দু' একটা কথা স্তেদবিলাসকে জিজ্ঞাসা করে, আবার গভীর মনোযোগ সহকারে পরচাটা পড়ে, ইউরঘিস ওর কথার বিন্দুবিসর্গ বোঝে না। আকুল আগ্রহে চেষ্টা করে, মুখ দেখে উকিলের মনের কথা বোঝবার। পড়া শেষ করে' উকিল মুখ তুলে ওদের দিকে চায়, হাসে, স্তেদবিলাসকে কী যেন বলে। ইউরঘিসের বুকের ধুকধুকুনি বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

সাথীকে জিজ্ঞাসা করে—"হুঁ" ?

স্তেদবিলাস জানায়, "বলছেন, সব ঠিক আছে।"

"বেবাক ঠিক ?"

"হাঁ, বলছেন, যেমনটী হওয়া উচিত তেমনি আছে।"

স্বস্তিতে অবশ হ'য়ে আসে ইউরঘিসের দেহ, ধপাস ক'রে বসে' পড়ে ও একখানা চেয়ারে। জিজ্ঞাসা করে, "ঠিক বুঝতে পারছেন তো আপনি ?" স্তেদবিলাসকে দিয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন অনুবাদ করায়। জিজ্ঞাসা ক'রে, উত্তর শুনে ওর যেন কিছুতেই তৃপ্তি হ'তে চায় না, ভয় ভাঙ্গে না; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতরকম ক'রে যে একই কথা বার বার জিজ্ঞাসা করে। তা হ'লে বাড়ী ওরা কিনেছে, সত্যিই কিনেছে। বাড়ীটা ওদেরই, ওরাই বাড়ীটার মালিক। টাকা ঠিকমত দিয়ে গেলে বাড়ী ওদেরই হ'বে—নির্ভুলভাবে ওদের হবে, তার মধ্যে আর কোন কিছু নেই। তাড়াতাড়ি চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা চওড়া হাতের তেলোর মধ্যে ও মুখ লুকোয়, চোখ জলে ভরে গেছে; এদের সামনে চোখের জল ও দেখাতে পারে না; নিজের কাছেই নিজেকে কেমন নির্বোধ হয়। কিন্তু কী ভীষণ ভয়ই পেয়েছিল ওর; ওর মত অমন জোয়ানটা যেন ভেঙ্গে পড়েছে একেবারে, দাঁড়াতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

উকিল বোঝান ভাড়া কথাটা এ সব চুক্তির ভাষার ধরণ মাত্র। ওর আসল মানে এখানে লাগান হয় না। শেষ আধলাটা না দেওয়া পর্যন্ত কথাটা অমনি থাকে, কিন্তু টাকা ঠিকমত দিয়ে গেলে ওতে কিছুই আসে যায় না। কোন খদ্দের ঠিকমত টাকা না দিলে তাকে তুলে দিতে সুবিধে হবে বলে, "ভাড়া" কথাটা লিখে রাখা হয়। যতদিন কিস্তীর টাকাটা এরা নিয়মমত দিয়ে যাবে, ততদিন এদের কোন ভাবনা নেই। এখন হ'তে বাড়ী একরকম ওদেরই।

কৃতজ্ঞতায় ইউরঘিসের অন্তর ছেয়ে যায়। উকিলের মজুরী আধ ডলার বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা সংকোচে দিয়ে দেয়। বাড়ীর সকলকে সুসমাচারটা শোনাবার জন্য ও দৌড়ে বাড়ী ফিরে। ফেরে দেখে ওনা অজ্ঞান হ'য়ে আছে, ছেলেমেয়েগুলো প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, বড়রা তাদের চুপ করাবার জন্য আরও চেঁচাচ্ছে—কারণটা জানতে ইউরঘিসের একটু দেরি হল;—ওদের ধারণা, ও দালালটাকে খুন করতে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে বহু চেষ্টার পর সকলে শান্ত হয়। রাত্রিও বড় নিষ্ঠুর; বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায় ইউরঘিসের—ঘুম ভাঙ্গলেই শোনে পাশের ঘরে ওনা আর তার সৎমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাড়ী, নিজের বাড়ী, কেনা হ'য়ে গেছে, যখন খুশী ওখানে ওরা উঠে যেতে পারে, ভাবতেও কেমন বিস্ময় লাগে। এই কথাটাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব সময় ভাবতে ওদের ভারী ভাল লাগে; কী কী জিনিষ, কোন জিনিষ ও বাড়ীর কোনখানে রাখবে, এখন এই ওদের আলোচনা। ওদের বার্ষিক উৎসব আসতে আর মাত্র

তিনদিন বাকী; ঐটে শুভদিনই, ঐদিন ওরা গৃহপ্রবেশ করবে। কিন্তু আসবাবপত্রের কিছু বন্দোবস্ত না করলেই যে নয়! নেই তো কিছুই।

যাই হ'ক, কেনাকাটার জন্য প্যাকিংটাউনে কাউকে ভাবতে হয় না, টাকা থাকলেই হ'ল। বড় রাস্তা ধরে খানিকটা হেঁটে গেলে অসংখ্য সাইনবোর্ড চোখে পড়ে, পড়ে' নিয়ে ঠিক ঠিক দোকানে ঢুকলেই হ'ল; আর নয় বাসে চড়ে বসলে সেখানেই অসংখ্য বিজ্ঞাপন, কি শহরটা একবার চক্কর খেয়ে এলে, কোথায় কী পাওয়া যায়, তার সব কিছু জানা হ'য়ে যাবে, মানুষের যা কিছু দরকার হ'তে পারে সব—সব পাওয়া যাবে। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরামের ব্যবস্থা করবার জন্য কী অক্লান্ত চেষ্টা ব্যবসায়ীদের। কেউ হয়তো ধূমপান করে; অযাচিতে তার চোখের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে সিগারেট সম্বন্ধীয় ছোট্ট একটি আলোচনা —আলোচনাটী বুঝিয়ে দিচ্ছে ধূমপান করতে হ'লে টমাস জেফারসনের পাঁচ সেন্টের প্রিফেক্টো পান করা অত্যাবশ্যক, সুখ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি সব কিছু পেতে হ'লে ঐ বস্তুটী একেবারে অপরিহার্য। আর এক ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন—তার ওষুধ খেলেই ধূমপানদোষ অবিলম্বে বর্জন করা যায়—পঁচিশ মাত্রার দাম মাত্র পঁচিশ সেন্ট, দশ মাত্রাতে কাজ দেবেই। এমনি অসংখ্য বিজ্ঞপ্তি আর উক্তি, যাত্রীকে বুঝিয়ে তবে ছাড়বে যে, তার সুখ সুবিধার জন্য কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও মহাব্যস্ত হ'য়ে খাটছে। প্যাকিংটাউনের বিজ্ঞাপনগুলি ওখানকার জনতার উপযোগী করে লিখিত হওয়ায় তাদের নিজস্ব একটি শিল্প আছে। পরমাত্মীয়ের মত কী দরদ এ সব বিজ্ঞাপনের! কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনার স্ত্রী কি রক্তশূন্যা? সব সময়ই কি তিনি বিরক্তি বোধ করেন? মেজাজ খিটখিটে হ'য়ে থাকে? বাড়ীর মধ্যেও চলতে তাঁর কী কষ্ট হয়? ডাঃ ল্যানাহানের "জীবন রক্ষকের" কথা তাহ'লে তাঁকে বলেন না কেন?" কেউ আবার একটু রসিক, যেন পিঠে একটা

থাম্বর মেয়ে বলছে, "বুদ্ধিতে কাঠের কুঁদো হবেন না! এখনই গিয়ে গোলিয়াথ বুনিয়নের 'সর্বব্যাধিহর' কিনে ফেলুন।" কারও স্বর আবার অতি মোলায়েম। "নিজের মধ্যে গতি আনুন, ইউরেকার আড়াই ডলারের জুতো পড়ুন, খুব আরাম পাবেন।"

পথ চলতে এমনি অনুরোধমাখা একখানা বিজ্ঞাপন ওদের চোখে পড়ে—খুব চমৎকার ছোট্ট ছোট্ট দুটী পাখীর ছবি আছে তাতে, দুটীতে নীড় নির্মাণে ব্যস্ত। জনৈক পরিচিতকে জিজ্ঞাসা করে মেয়ারিজা: কী লেখা আছে ওতে। লেখা আছে, "আপনার নীড়ে পালথ দিন"। তারপর বিজ্ঞাপন বলে চলেছে, বিজ্ঞাপনদাতারা অতি অল্প খরচে চার কক্ষের যে কোন একটী নীড়—অতি অল্প খরচে, এত অল্প যে, শুনলে লোকের হাসি পাবে—মাত্র সত্তর ডলার—তাও একসঙ্গে নয়, অগ্রিম কিছু আর বাকীটা কিস্তীবন্দী—এই রকম অতি অল্প খরচে ওরা নীড় "পালথায়িত" (অর্থাৎ আসবাব-পত্রে সজ্জিত) করে দিতে পারে। দু' চারখানা চেয়ার টেবিল না হ'লে কারও চলে না, এদেরও চলবে না; কিন্তু ট্যাকের অবস্থা প্রায় ফর্সার কাছাকাছি, কী ভাবে চলে সেই দুর্ভাবনাতেই ওদের রাত্রে ঘুম হয় না—চেয়ার টেবিল তো পরের কথা। এই বিজ্ঞাপনটী ওদের চোখের সামনে যেন মুক্তির পথ খুলে দেয়। আবার সেই বুকের খাঁচা-ছেঁড়া দুর্ভাবনা, আবার এলজবিয়েটার একখানা চুক্তিপত্রে দস্তখৎ। এইভাবে একরাত্রি ওরা ইউরঘিসকে খবর দেয় যে চেয়ার টেবিল সব এসে গেছে, রাখা পর্যন্ত হ'য়ে গেছে ঠিক ঠিক জায়গায়—বৈঠকখানার জন্য চারটের এক প্রস্থ, শয়ন কক্ষের জন্য তিনটে জিনিষের একটা প্রস্থ, খাবার ঘরের জন্য বড় একখানা টেবিল আর চারটে চেয়ার, মেয়েদের সাজগোছের জন্য আয়না লাগান আগাগোড়া গোলাপ আঁকা টেবিল আর চেয়ার, কিছু থালাবাটি গেলাস—সেগুলিতেও গোলাপফুল আঁকা। মোড়ক খোলবার সময় দেখা গেল

একখানা ডিস ভাঙ্গা দিয়েছে, সকালে উঠেই ওনা যাবে ওটা বদলে আনতে। তারপর দেবার কথা ছিল তিনখানা প্যান, দিয়েছে মাত্র দু'খানা ; আচ্ছা, ইউরঘিসের মনে হয় কি যে ওরা ঠকাচ্ছে!

পরের দিন ওদের গৃহপ্রবেশ। কিন্তু পুরুষদের কাজ হতে ফিরতে হয়ে যায় সেই সন্ধ্যে ; অ্যান্থুয়েল পরবের খাওয়াটা সেরে নেওয়া হয় দায়সারা করে', গো-গ্রাসে। তারপর শুরু হয়, এ বাড়ী হ'তে ও বাড়ীতে জিনিষ বওয়া। দূরত্বটা আসলে দুমাইলের ওপর ; তবু ইউরঘিস দুদফা যাতায়াত করে—দুবারই মাথার ওপর নিয়ে যায় গদি, তোষক লেপ-বালিশের পাহাড়, তার ওপর পোঁটলাপুঁটলি টুকিটাকি তো আছেই। শিকাগোর অন্য কোথাও হ'লে ওকে এতক্ষণে গ্রেফ্তার করা হ'ত, কিন্তু প্যাকিংটাউনের পুলিসরা এ বাসা বদলানোর ব্যাপারে খানিকটা অভ্যস্ত ; দু-একবার নামে মাত্র তল্লাসী করে তারা ওকে ছেড়ে দেয়। কেরোসিন ল্যাম্পের মিটমিটে আলোতেও বাড়ীখানাকে কী চমৎকার দেখায়! ভাবতে বিস্ময় লাগে, ঠিক সেই ছবির মতই হ'য়ে ওঠে যেন বাড়ীখানা! এইতো বাড়ী, বাসা নয়, বাড়ী! ওনা আনন্দে প্রায় নাচতে আরম্ভ করে ; ও ধরে ইউরঘিসের একটা হাত, মেয়ারিজা ধরে আর একখানা ; ও যেন এক নবাগত। ওকে ওরা এক ঘর হ'তে আর এক ঘরে নিয়ে যায়, নিজেরাই আগে পালা করে প্রতিটা চেয়ারে বসে, ইউরঘিসকেও বসায়। ইউরঘিসের ভারে একখানা চেয়ার কট্ কট্ করে' ওঠে, ভাঙ্গবার ভয়ে ওরা চিৎকার—চিৎকার নয় নিনাদ করে ওঠে ; সে শব্দে কচিটার ঘুম ভেঙ্গে যায়, বড়রা ছুটে আসে ; হাসির ধুম পড়ে যায়।

সবটা মিলিয়ে এটা ওদের কাছে একটা মহাদিন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ওনা ও ইউরঘিস হাতে হাত রেখে, নির্ব্বাক-আনন্দে বসে থাকে, পুলকমাখা চোখে ঘরখানিকে বার বার দেখে, আশা যেন ওদের মেটে

না। এই সমস্যা মিটে গেলে হাতে কিছু টাকাপয়সা জমবে তাহ'লেই ওদের বিয়ে হবে—ক'দিনই বা! এটি হবে তাদের নীড়—দূরের ঐ ছোট ঘরখানি হবে ওদের নিজস্ব।

বাড়ীখানাকে ঠিকমত সাজান শুধু প্রয়োজন নয়, ওদের কাছে এ এক অন্ত-হীন আনন্দের উৎস। অপ্রয়োজন হ'লেও খরচ করতে পারার মধ্যেই একটা আনন্দ আছে—সে আনন্দ ভোগ করবার অবস্থা ওদের নয়; তবু বাস করতে গেলে কিছু কিছু কিনতেই হবে। এই কেনা-কাটিতে ওনার অপার আনন্দ; কিনতে যাওয়াটা ওর কাছে এক একটা অভিযান বলে মনে হয়। কিনতে যায় ও রাত্রিতে; ইউরঘিস চলে সঙ্গে সঙ্গে; কেনে হয়তো অতি নগণ্য সামান্য দামের সস্তা গেলাস-বাটি কতকগুলো, কিন্তু তাতেই কি অপার আনন্দ ওর। শনিবার রাত্রে একঝুড়ি জিনিস কিনে এনে টেবিলের ওপর রাখা হল; দেখবার জন্য সকলে টেবিল ঘিরে দাঁড়াল, ছোটদের যারা পারল তারা চেয়ারে উঠে দেখতে লাগল, যারা পারল না, তারা তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। জিনিস হ'চ্ছে—তেল একটিন, খানিকটা চবি, দুধের টিন একটা, ঘর মাজাঘসার জন্য একটা বুরুষ, মেজছেলেটার জন্য একজোড়া জুতো, কিছু পেরেক আর এটা ওটা কাজের জন্য একটা হাতুড়ি—এই। পেরেকগুলো পোঁতা হবে বিভিন্ন ঘরের দেওয়ালে, জিনিস পত্তর টাঙান থাকবে; কোথায় কোন পেরেকটা পোঁতা হবে, তা নিয়েও চলে ওদের আলোচনা ব্যথা-বেদনা মান-অভিমান। ইউরঘিস পেরেক পুঁততে যায়, ছোট্ট হাতুড়ি—পেরেক পোঁতা যায় না, বার বার আঙ্গুলেই লাগে; চটে যায় ও ওনার ওপর—ওইতো আর পনেরটা সেণ্ট দিতে দিলে না, নইলে কেমন বড় হাতুড়ি আসত একটা, কোন ঝামেলা থাকত না। যত কেপ্পন! কথা কয় না ওনা, হাতুড়িটা কেড়ে নিয়ে নিজে লেগে যায় পেরেক পুঁততে; সজোরে মারে এক ঘা; ঘা'টা পেরেকের মাথায় না

পড়ে' পড়ে ওর বুড়ো আঙ্গুলের মাথায়; পেরেক হাতুড়ি ছেড়ে ও কাঁদতে বসে। শুশ্রূষায় কান্না থামে না, থামে ইউরঘিসের একটি চুম্বনে। সকলেই এক একবার পেরেক পুঁততে হাত লাগায়, পোঁতাও হ'য়ে যায়; যেখানকার যে-জিনিষটী ঝুলিয়ে দিয়ে ওরা দেখে আনন্দ পায়। ইউরঘিস মাথায় করে পরে বয়ে আনে বিরাট বড় একটা প্যাকিং বাক্স, বাজারে আর একটা কিনে রেখে এসেছে, সেটা আনতে পাঠায় জোনাসকে; এক একটা পাশ খুলে তাক্ লাগালে সিন্দুক আলমারী সেলফের কাজ করবে। বিজ্ঞাপনের নীচের "পালখ" আরও কম লোকের জন্য, এত লোকের জন্য নয়, তাই বাড়তি অনেক কিছুই ওদের কিনতে হয়।

রান্না ঘরকেই করে ওরা খাবার ঘর; খাবার ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয় এলজবিয়েটা ও পাঁচটী বাচ্চার। একটী মাত্র খাট, তাতে শোয় এলজবিয়েটা আর দুটী বাচ্চা, বড় তিনটী শোয় মেঝেয় বিছানা বিছিয়ে, মেয়ারিজা আর ওনা শোবার সময় একখানা তোষক নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরে শোয়। বাকী ঘরখানায় শোয় পুরুষ তিনজন; তাদের আর বিছানা জোটে না, মেঝেটা পরিষ্কার করে নিয়ে তারই ওপর শুয়ে পড়ে। বর্তমানের মত এই ব্যবস্থা। কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত তাতে হয় না; স' পাঁচটায় এলজবিয়েটাকে ওদের দোরে বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়তে হয়, তবে ওদের ঘুম ভাঙ্গে। ওরা ওঠবার আগেই এলজবিয়েটা ওদের জন্য তৈরী করে রাখে দুধ না দেওয়া কাল কফি অনেকখানি, মাখন জোটে না তাই চর্বি মাখান রুটি, আর কিছু তরিতরকারী—মাংস বা ডিমের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। দুপুরের জন্যেও ওই খাবার বেঁধে দেয় সকলের—চর্বিমাখান মোটামোটা রুটি, কয়েকটা করে পেঁয়াজ, একটু করে পনীর, ব্যস। খেয়ে, হাতে খাবার ঝুলিয়ে দৌড় দেয় ওরা কারখানার দিকে।

ইউরঘিসের মনে হয়, সত্যিকারে কাজ এই প্রথম করছে ও জীবনে। ওর ভেতর যা কিছু আছে, সব নিঙড়ে বের করে নিতে পারে এমন কাজ এর আগে আর কখনও করেনি। পাশে দাঁড়িয়ে লোকগুলিকে কাজ করতে দেখলে, ওদের মানুষ মনে হয় না, মনে হয় কতকগুলো কল। কী ভীষণ গতিতে কাজ করে চলেছে সব। ইউরঘিসের মনে হয়, এত ভয়ানক তাড়াতাড়ি ও বোধহয় কাজ করতে পারবে না; কিন্তু জামা খুলে একবার হত্যা-মঞ্চে নামলে, সব কিছুই যেন বদলে যায়। ওরও হাত চলে অন্যান্যদের মত। ও তখন আর বাইরে দর্শক থাকে না, ওদেরই একজন হ'য়ে যায়। ভেতরের তত্ত্ব বুঝতে পারে। প্রথম জন্তুটী হত্যা-মঞ্চে পড়ার পর হ'তে বারটা পর্যন্ত এই গতির সঙ্গে তাল রেখে কাজ করার জন্য মানুষের প্রতিটী বোধবুদ্ধিকে নিঃশেষে কাজে লাগাতে হয়; কি মস্তিষ্ক, কি চোখ, কি মন, বুদ্ধি, চিন্তা, হাত কেউ এক মুহূর্তের বিশ্রাম পায় না। বারটায় খাবার ছুটির জন্য ভো বাজে। আধ ঘণ্টা। ফের শুরু হয়ে যায় ঐ একই ভাবে তাদের কাজ। "দলের গতি বৃদ্ধি"র ব্যবস্থাটী অতি চমৎকার। চড়া মাইনের কয়েকজন লোক রাখা হয়েছে, তাদের প্রতিটী ডিপার্টে নিয়ে যাওয়া হয়, অন্যান্যদের গতি বাড়াবার জন্য। এরা মালিকদের চোখের সামনে কাজ করে; তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয় অন্যান্যদের; দেখলে বোধ হয়, এদের ভূতে পেয়েছে, ঐ গতিতে কাজ করতেই হবে, না পার বেরিয়ে যাও; বাইরে হাজার হাজার বেকার একবার চেষ্টা করে' দেখবার জন্য পা বাড়িয়ে আছে।

ইউরঘিসের কিন্তু এতে কোন ক্ষোভ নেই; ও বরং খুশীই হয়। অন্য কাজে ওকে হাত পা ছুঁড়তে হয়, এতে তার অবকাশ নেই। মধ্যে মধ্যে অবশ্য হাসি পায়। লাইনে ছুটে চলে ও অন্যান্যদের সঙ্গে, আগে পিছের মানুষের দিকে একবার তাকাবারও সময় থাকে না;

ওরই মধ্যে সামনের মানুষের দিকে একবার ও চেয়ে নেয়। এটা জরুরী কাজ, প্রয়োজনীয় কাজ, এই ওর সান্ত্বনা। প্রয়োজনীয় একটী কাজ করবার সুযোগ এবং তার বদলে মোটা মাইনে পাওয়ার বেশী অধিকার মানুষ আশা করতে পারে কি?

এই ভাবে ও ব্যক্ত করে ওর তেজস্বী স্বাধীন মত; কিন্তু বিস্মিত হ'য়ে দেখে যে এজন্য অন্যরা ওর ওপর অসন্তুষ্ট হয়। এখানকার অধিকাংশ মজদুরই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে। প্রথম যেদিন ও আবিষ্কার করলে যে এখানকার প্রায় সকল কর্মীই তাদের কাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, সেদিন ওর দুঃখের আর অন্ত রইল না। এই মনোভাবের সর্বব্যাপকতা তার কাছে অদ্ভুত, অদ্ভুত কেন, ভয়ানক বলে মনে হয়। তারা মালিককে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে ম্যানেজারকে, অফিসারকে, ফোরম্যানকে; ঘৃণা করে তারা এই কারখানা, ঘৃণা করে কারখানার এই এলাকাকে, ঘৃণা করে এই শহরটাকে পর্যন্ত; তাদের ঘৃণা ক্ষণিকের নয়, এ ঘৃণা যেন সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী। বালক মজদুর ও মেয়ে কুলীরা সময় পেলেই খিস্তি করে মালিক ম্যানেজার অফিসারদের নামে। বলে, পচে গলে' গেছে, পচা, জঘন্য, সব জঘন্য। ইউরঘিস না বোঝে এত ঘৃণার কারণ না বোঝে ওসব গালাগালের ভাব ও ভাষা। জিজ্ঞাসা করে অন্যান্যদের—মানে কি এর? তারা ওর দিকে কেমন-ভাবে যেন চায়, ওকে যেন সন্দেহ করছে। সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়ে বলে, "থাক ভাই কিছুদিন, নিজেই তা হ'লে সব বুঝতে পারবে।"

ইউনিয়ন সম্বন্ধীয় সমস্যাই হল ওর কাছে প্রথম ও প্রধান সমস্যা। ইউনিয়ন সম্পর্কীয় কোন অভিজ্ঞতাই ওর নেই; ওর কাছে সহকর্মীদের ব্যাখা করে' দিতে হয় যে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জন্য একই পেশাভুক্ত লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হলে তাকে ইউনিয়ন বলা

হয়। ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে, অধিকার কী? প্রশ্নটা করে ও একান্ত সরলভাবে, কাউকে খোঁচা মারবার উদ্দেশ্য ওর আদৌ নেই। অধিকার বলতে ও বোঝে, কাজ খুঁজে বেড়াবার অধিকার, এবং কাজ পেলে মালিকরা যা করতে বলে তাই করা। সহকর্মীরা কিন্তু ওর প্রশ্নে চটে যায়, বিরক্তি বোধ করে ওর প্রশ্নের ধরণে, ওকে গাধা বলে। কসাই-সাহায্যকারী ইউনিয়নের জনৈক প্রতিনিধি ওকে দলভুক্ত করবার জন্য এসেছিল, লোকটা আইরিশ; লিথুয়ানীয় ভাষার দু' চারটে শব্দের বেশী সে জানে না; তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইউরঘিস যা বোঝে তার মোদ্দা কথা এই যে, ওর কিছু খরচ করা দরকার। লোকটা যেখান হ'তেই আসুক এবং যাই করতে চা'ক, কিছু করে টাকা চায়—ইউরঘিস বেঁকে দাঁড়ায়; উঁহু, সেটি হবে না। লোকটারও মেজাজ যায় খিঁচড়ে, রাগেক্ক মাথায় হুমকি দিতে থাকে। ইউরঘিসের রাগটাও গড়গড়ে হ'তে বেশীক্ষণ লাগে না; জানিয়ে দেয় ওকে ভয় দেখিয়ে ইউনিয়নের সভ্য করা একজন আইরিশের দ্বারা হবে না—ওকে মারবে একটা আইরিশ! বহু কথার মধ্যে হ'তে ও ধীরে ধীরে এইটুকু বুঝতে পারে যে, এরা গতিবৃদ্ধি প্রথাটার উচ্ছেদ করতে চায়, তাদের যুক্তি—অনেকেই এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, ফলে গতি বাড়াতে গিয়ে নিজেরাই মারা পড়ে। কিন্তু এ মত বা মতলবের সঙ্গে ইউরঘিস একমত নয়, ও নিজে গতি বাড়িয়ে কাজ করতে পারে, ওরাও ইচ্ছে করলেই পারে—না পারলে মরদ কিসের ওরা! কেতাব-পড়া লোক নয় ও, 'লেএসে ফেয়ার' কথাটা হয়তো ঠিকমত উচ্চারণই করতে পারবে না, কিন্তু তাতে কি? দুনিয়াদার ও, দুনিয়ার অনেকখানি দেখেছে ও, সেই অভিজ্ঞতা হ'তে এটুকু ও বুঝেছে যে, নিজে চরে' খেতে না পারলে, কেউ দেখবে না, সে তুমি কাঁদাকাটাই কর আর না খেয়ে শুকিয়েই মর।

তবু, এমন দার্শনিক আছে, এমন সাধারণ লোক আছে যারা ম্যালথ্যুজের যুক্তি দেখিয়ে মানুষ জাতটাকেই গালাগাল দেয়, আবার দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফ ফাণ্ডে টাকাও দেয়। ইউরঘিসেরও এই অবস্থা, ঝটেনে ও রায় দিয়ে দেয়, অক্ষমদের মরাই ভাল, আবার যখন ভাবে নিজের বুড়ো বাপ কোথায় কারখানায় কারখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজের রুজিটা পাবার মত একটা চাকরির জন্য, তখন দুঃখে দিশেহারা হ'য়ে যায় ও। বুড়ো অ্যান্টেনাস আবাল্য মজদুর; ছোটবেলায় ও একবার লেখাপড়া শেখবার চেষ্টা করায় ওর বাবা ওকে খুব ঠ্যাঙায়; ফলে, ও বাড়ী ছেড়ে দেয় মাত্র বার বছর বয়সে। তখন হ'তেই ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত বিশ্বাসী; ওকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, নজর রাখবার দরকার হয় না। এই ভাবেই কাজ করেছে আজীবন। আর আজ? দেহে মনে ও ক্ষয়ে গেছে, ক্লান্ত; কিন্তু যত সেবাই সে এ সমাজের করে' থাকুক, বুড়ো রুগ্ন খেঁকী কুত্তার চেয়ে বেশী সমাদর আজ আর ওর কোথাও নেই। অ্যান্টেনাসের মাথা গোঁজবার একটা যা হ'ক আস্তানা হ'য়েছে, ওকে দেখাশোনা করবারও লোক আছে; কিন্তু এমন না হতেও তো পারত—ভাবতেই ইউরঘিস চমকে ওঠে। বুড়ো অ্যান্টেনাস প্যাকিং শহরের প্রতিটী কারখানায়, প্রতিটী বাড়ীতে, প্রতিটী ঘরে গেছে একটা কাজের সন্ধানে—চাকরির উমেদারদের লাইনে প্রতিটী সকালে দাঁড়িয়েছে একটা কাজ পাবার আশায়; শেষ পর্যন্ত প্রতিটী কারখানার পুলিস কনষ্টেবল ওকে চিনে ফেলেছে, ওকে দেখলেই এখন এ চেষ্টা ছেড়ে দেবার উপদেশ দেয়। শুধু কি কারখানায়? দোকানে দোকানে ও ঘুরেছে যাহ'ক একটা কাজের জন্য; কিন্তু কেউ কোথাও একটা কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেনি, শুধু তাড়িয়ে দিয়েছে দূর দূর করে।

চলতি দুনিয়ার ওপর ইউরঘিসের আস্থা আছে, সে আস্থায় এই

ফাটলটা ওর শান্তি নষ্ট করে। অ্যান্টেনাস যখন চাকরি খুঁজছিল, ফাটলটা তখন মন্দ চওড়া ছিল না, আবার অ্যান্টেনাস চাকরিটা পাবার পর সে ফাটলটা বন্ধ না হ'য়ে যেন বেড়েই গেল। এক সন্ধ্যায় মহা-উত্তেজিত হ'য়ে বুড়ো বাড়ী ফিরল। ডারহামের চাটনির কারখানার বারান্দায় একটা লোক নিজে হ'তে ওর কাছে এসে ওকে জিজ্ঞাসা করে, চাকরি করে দিলে বুড়ো তাকে কত টাকা দিতে পারবে। অ্যান্টেনাস তার কথা প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তখন সে খোলসা করে বলে, চাকরি সে করে দিতে পারে কিন্তু বুড়োর রোজগারের এক-তৃতীয়াংশ তাকে দিতে হবে। অ্যান্টেনাস জানতে চায়, আপনি মালিক না অফিসার। শোনে, "তাতে তোমার কোন দরকার নেই, চাকরি করে দেব বলছি, চাকরি করে দেব, ব্যস।"

ইউরঘিসের ইতিমধ্যে দু'চারজন বন্ধুবান্ধব হ'য়ে গেছে। তাদেরই একজন—ট্যামোস্ত্‌সিয়স কুস্‌ংস্লেইকাকে ও সমস্ত ঘটনাটা বলে, জিজ্ঞেস করে মানে কী এ সবের? কুস্‌ংস্লেইকা ছোটখাট্ট মানুষটী, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ধীরভাবে ওর সব কথা শোনে, শুনে একটুও বিস্মিত হয় না, চঞ্চল পর্যন্ত হয় না একটুকু। বলে, অতি সাধারণ ঘটনা, ক্ষুদে "কলম"। ক্ষুদে কলম কী? মধ্যস্বত্বভোগী শোষক, ঠক, দালাল। এও একজন অফিসার, নিজের রোজগারটা একটু বাড়িয়ে নিতে চায় আর কী! কিছুদিন এখানে থাকলে ইউরঘিস নিজেই দেখতে পাবে, এমনি অফিসারে আর তাদের দালালে জায়গাটা গিজগিজ করছে। এর সব কিছু পচা—পচে দুর্গন্ধ উঠছে। অফিসাররা এক একটা মজদুর বেছে নিয়ে অন্য মজদুরদের ওপর কলম ক'রে লাগিয়ে দেয়, আবার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফিসারদের কীর্তি জানতে পারলে, তাদেরই কলম ক'রে ব্যবহার করে। বলতে বলতে ট্যামোস্ত্‌সিয়সের দুনিয়ার ওপর বৈরাগ্য কমে যায় যেন, বোঝাতে লাগে ও ইউরঘিসকে—এই ডারহামের

কথা ধরা যাক ; সকলের ওপরে একজন আছে, সে এর মালিক, সে এখান হ'তে শুধু মুনাফা চায়, কীভাবে মুনাফা হ'ল দেখতে চায় না, চায় শুধু মুনাফা, তার নীচে আছে একপাল ম্যানেজার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ফোরম্যান প্রভৃতি ; ওপরের দল নীচের দলকে তাকিয়ে বেড়াচ্ছে, নীচের পালটাকে নিঙড়ে যতখানি কাজ আদায় করা যায়, প্রতিটি ওপরের দল করছে সেই চেষ্টা। আবার একই দলের লোকের মধ্যে সমবেদনা নেই একতা নেই, প্রত্যেককে প্রত্যেকের শত্রু ক'রে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকের কাজের হিসেব-বই আলাদা করে রাখা হয় ; প্রত্যেকের সর্বদা ভয় অন্যেরা তার থেকে ভাল কাজ দেখাতে পারলে তার চাকরি যাবে। চাকরি গেল, চাকরি গেল এই আতঙ্ক সকলের মধ্যে সর্বদা আছে। কাজেই জায়গাটার আপাদমস্তক হিংসের আর ঘেন্নার উত্তাপে দিনরাত ফুটছে যেন। ভক্তি বা কর্তব্য, সৌহার্দ্য বা সৌজন্যের কোন স্থান নেই এখানে ; এখানকার দেবতা ডলার ; ঐ ডলারের জন্য এখানকার প্রত্যেকে যে কোন কাজ করতে পারে। সৌজন্য, ভদ্রতা চুলোয় যাক, কারও মধ্যে একরত্তি সততা পর্যন্ত নেই। কেন ? কে জানে ! বুড়ো ডারহাম নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছিল, মুনাফাই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান ; হয়তো সৌজন্য সততার কোন স্থান তার কাছে ছিল না। তার কোটি কোটি টাকার সঙ্গে তার চরিত্রও উত্তরাধিকারসূত্রে তার ছেলে পেয়েছে।

ওখানে পর্যাপ্ত সময় থাকলে ইউরঘিস নিজেই অনেক কিছু আবিষ্কার করবে ; যত নোংরা কাজ সব করতে হয় এই মজদুরদেরই, কাজেই তাদের চোখকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই ; স্থানমাহাত্ম্যে তারাও অন্যান্য সকলের মত করতে আরম্ভ করে। ইউরঘিস এখানে এসে ভাবছে নিজেকে মালিকদের কাছে প্রয়োজনীয় প্রমাণিত ক'রে জীবনে উন্নতি করবে, দক্ষ শ্রমিক হবে ; শীগগিরই ওর ভুল ভাঙ্গবে ,

ভাল কাজ ক'রে প্যাকিংটাউনে কেউ কখনও উন্নতি করেনি। এটাকে এখানকার নিয়ম, এখানকার কানুন বলে' ধরে' নিতে পারে সে; এখানকার কাউকে উন্নতি করতে দেখলে সে অসঙ্কোচে ধরে' নিতে পারে যে লোকটা দক্ষ কর্মী নয়, একটা পাকা দুর্বৃত্ত। যাকে অফিসার ইউরঘিসের বাপের কাছে পাঠিয়েছিল, সে উন্নতি করবে; আর যে নিজের কাজে দেহমন ঢেলে দেয়, তাকে "গতিবৃদ্ধির" কবলে ফেলবে। গতি বাড়াতে বাড়াতে অনেক আশাশীল অতি শক্তিশালী মজদুরকে ওরা আখের ছিবড়ে ক'রে নালীতে ফেলে দেবে।

তখন হ'তেই ইউরঘিসের মাথা ঘুরতে থাকে, বাড়ী ফিরে তখনও ওর মাথা ঘুরছে। তবু এ সব জিনিস ও নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারে না; না না, এমনটা কখনো হতেই পারে না। ট্যামোস্ত্সিয়স অকম্মা অসন্তুষ্টগুলোদের একজন—সমস্ত সময় কুঁড়েমো ক'রে কাটাবে; সমস্ত রাত্রি কোথা দলের মধ্যে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ী ফিরবে, কাজে মন লাগবে কোথা হ'তে ওর? ক্ষুদে দুর্বল মানুষ, হিম্মত নেই এক কাণাকড়ির; বাঁচবার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে তাই ও, রাগও তাই ওর সকলের ওপর, বিরক্ত ও সব কিছুতে। কিন্তু নিজেকে এত বুঝিয়েও ইউরঘিস পার পায় না; প্রতিদিন একটা-না-একটা অদ্ভুত ঘটনা ওর চোখে পড়ে।

বাপকে ও বোঝায়, ওরকম কাজের মুখে ঝাড়ু মার! কিন্তু বুড়ো নাছোড়-বান্দা, কাজ চায় ও, যেমন কাজ হ'ক, যে মাইনেই হ'ক, একটা কাজ ওর চাই-ই; বুড়োর অনুরোধের ঘ্যানঘ্যানানিতে ক্লান্ত হ'য়ে ইউরঘিস চুপ ক'রে যায়। পরদিন সকালে উঠেই বুড়ো ছোটে সেই লোকটার কাছে; প্রতিশ্রুতি দেয়, তার সমস্ত রোজগারের তিনভাগের একভাগ ও নিশ্চয়ই তাকে দেবে। সেইদিনই ডারহামের "চাটনি ঘরে" বুড়োর কাজ হ'য়ে যায়। "চাটনি ঘরে"র মেঝে কখনও শুকনো থাকে

না; দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে ওরই ওপর। ও ওখানকার ঝাড়ুদার নিযুক্ত হয়েছে; সমস্ত দিনটা একটা বড় হাতলওয়ালা ঝাঁটা নিয়ে ঘরখানা ঝাঁট দেওয়া ওর কাজ। জায়গাটা অত অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে না হ'লে গ্রীষ্মকালে কাজটা খুব খারাপ লাগবার কথা নয়। প্রথম হপ্তার মাইনেটা ভাল মোটা তলাওয়ালা এক জোড়া জুতো কিনতেই খরচ হ'য়ে যায়।

অ্যাণ্টেনাসের মত অত শান্ত মানুষ ভগবানের এ বসুন্ধরায় কমই আছে, সেও কিন্তু মাত্র কয়েকদিন কাজ করার পর বাড়ী ফিরে ডারহাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মতই রাগ প্রকাশ করে, গালাগাল দেয়; অ্যাণ্টেনাসকে গালাগাল দিতে দেখে ইউরঘিসের অন্যান্যদের সম্বন্ধে ধারণাটা একটু বদলায়; মনে হয়, অন্যেরা হয়তো আগাগোড়া মিথ্যে বলে না, পচাসরা বলবার কারণ হয়তো আছে। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে অ্যাণ্টেনাস তার কাজের গল্প করে। ও যেখানে কাজ করে, ধরে' নেওয়া হয় সেখান হ'তেই মাংস টিনে পোরা হবে। আসলে সেখানে বড় বড় ডাবায় বহু প্রকারের ছোট বড় মাংসের টুকরোর সঙ্গে কী একরকমের রাসায়নিক পদার্থ মেশান আছে। মজদুররা বড় বড় কাঁটা দিয়ে মাংসের বড় টুকরোগুলো ঠেলাগাড়ীতে তুলে দেয়—যায় রান্না হ'তে। তোলবার মত মাংস তোলা হ'য়ে গেলে, ডাবাগুলো মেঝের ওপর উপুড় ক'রে দেওয়া হয়; তখন অ্যাণ্টেনাসের কাজ শুরু হয়; ঝাড়ু দিয়ে মাংসের ছোট ছোট টুকরো, জঞ্জাল ও ময়লা জল মেশান পদার্থটাকে ও ফেলে একটা ড্রেনে; ড্রেনের প্রান্তে একটা গভীর চৌবাচ্চা আছে, সেখানে মাংসের টুকরো ও জঞ্জাল জমা হয়; এও যায় রান্নার জন্য; তারপর জলটা যায় একটা নলের মধ্য দিয়ে, তার সঙ্গে মাংসের টুকরো চলে যেতে পারে; কর্তৃপক্ষ এরূপ অপচয় বন্ধ করবার জন্য নলের প্রান্তে ঘন জালি লাগিয়ে রেখেছে; দু'চার দিন

অন্তর অন্তর অ্যাণ্টেনাস সেই জালিটা খুলে জমা "মাংস" তুলে পাঠিয়ে দেয় রান্নার জন্য। নষ্ট হবার উপায় নেই কিছু, সব কিছুই মাংস, সব কিছুই রান্না হয়!

এর পর আসে মেয়ারিজ্জা ও জোনাসের কাজের কাহিনী। কাজ পাওয়া ও মোটা রোজগারের গর্বে মেয়ারিজ্জা ধরাকে সরা বানিয়ে ফেলেছিল। যেত আসত মাথা উঁচিয়ে বুক চিতিয়ে; একদিন কেমন যেন বিষণ্ণভাবে বাড়ী ফিরল; সঙ্গে একজন সহকর্মিণী; মেয়েটা রোগা পাতলা ফ্যাকাসে; নাম জ্যাড্‌বাইগা। কথায় কথায় সে এ পরিবারের সকলকে মেয়ারিজ্জার কাজ পাওয়ার ভেতরের কাহিনী শোনায়। ও যেখানে কাজ করছে সেখানে কাজ করত মেয়ারী ডেনিস নামে একটা মেয়ে; মেয়েটা ছিল জাতে আইরিশ; আইরিশ পাড়া হ্যালস্‌টেড সড়কে এখনও হয়তো বাস করে। ওখানে কাজ করছিল সে পনের বছর বা তারও বেশী কাল ধরে'। অফিসাররা তাকে প্রলুব্ধ করে; তার একটা ছেলে হয়; ছেলেটা জন্মাবধি বাতে পঙ্গু; তবু এ দুনিয়ায় ঐ ছেলেটিই তার অন্তরের ভালবাসার ক্ষুধা মেটাত। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একখানা ঘরে ওরা থাকত, হয়তো এখনও আছে—কে জানে। ক্রমে মেয়ারীর যক্ষ্মা হ'ল। তাই নিয়েই কাজে আসত, অবিরাম কাশত। প্রধানা চায় কাজ, পুরনো মজদুরের জন্য অনুকম্পা [illegible] করা তার কাজ নয়। মেয়ারী কতখানি কাজ করত না করত তারও খোঁজ রাখত না প্রধানা; প্রধানাও নতুন কর্মচারী। একদিন তার চোখে পড়ল মেয়ারী অসুস্থ; সেই দিনই মেয়ারিজ্জা এসে গেল কাজের উমেদার হ'য়ে; মেয়ারীর চাকরি গেল, মেয়ারিজ্জা চাকরি পেয়ে গেল। জ্যাড্‌বাইগা ক'দিন ধরেই ভাবছে মেয়ারীকে একবার দেখতে যাবে, কিন্তু সে নিজেই অসুস্থ, পিঠটায় অসম্ভব ব্যথা, অসঙ্কোচে নির্লিপ্তভাবে বলে, পেটেরই হয়তো কোন গোলমাল। মন্তব্য করে, অত ভারী ভারী টিন তুলে

সমস্ত দিনটা কাজ করা মেয়েদের উচিত নয়; কিন্তু কী করা যাবে?

কী অদ্ভুত সাদৃশ্য! জোনাসও কাজটা পেয়েছে, আর একজনের ভাগ্যবিপর্যয় হওয়াতেই। ঠেলাগাড়ীতে ক'রে ও শূকরমাংস নিয়ে যায় এলিবেটারে (লিফ্‌টে), সেখান হ'তে নিয়ে যায় প্যাক করবার ঘরে—এই তার কাজ। ঠেলাগুলো আগাগোড়া লোহার, প্রতি খেপে মাংস চাপান হয় সাত আট মণ ক'রে। মসৃণ মেঝের ওপরও ভর্তি গাড়ীটাকে প্রথম চালু করা বিশেষ শক্তির কাজ, দৈত্যদানব হ'লে কাজটা সাধারণভাবে সহজে করতে পারত। গাড়ীটা একবার চালু হ'লে ওরা আর থামতে দিতে চায় না। তদারকদার কেউ না কেউ পিছু পিছু আছেই; এক মুহূর্ত দেরি হ'য়ে গেলেই গালাগাল দিয়ে আর কিছু রাখবে না। লিথুয়ানীয় ও শ্লোভাকরা এ সব গালাগালের বিশেষ কিছু বোঝে না; অফিসার, তদারকদাররা তাই কেউ এদের গালাগাল দিয়ে সুখ পায় না; তাই রেগে গালাগাল দেয় আর ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঠেলার এদিক হ'তে ওদিক ছুটোছুটি করে। গালাগাল না বুঝলেও, ওদের মনোভাব বুঝতে ঠেলাওয়ালাদের কষ্ট হয় না; গাড়ী নিয়ে ওরা সব সময়ই ছোটে। জোনাস যার জায়গায় কাজ করছে সে একদিন এমনি গাড়ী নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গাড়ী সমেত দেওয়ালে ধাক্কা খায়, তার ওপর এসে পড়ে পিছনের গাড়ীখানা; ভারী ভারী দু'খানা গাড়ীর ধাক্কায় সে থেঁতলে পিষে চ্যাপ্টা হ'য়ে লেগে যায়, সমান একটা মাংসের প্রলেপের মত।

এ সব ভয়ানক ঘটনা। কিন্তু ইউরঘিস যা দেখেছে তার কাছে এ সব ছেলেখেলা। ওর কাজ, হত্যামঞ্চ হ'তে নাড়ীভুঁড়িগুলোকে বেলচা দিয়ে ঠেলে মেঝের গর্ত দিয়ে নীচে ফেলা। এ কাজ করতে করতে দেখেছে, গর্ভিণী গাইও আনা হয় হত্যার জন্য। কসাইমাত্রেই

জানে গর্ভিণী গাইএর মাংস খাদ্যের যোগ্য নয়। সরকারী আইনে গর্ভিণী গাই হত্যা করা নিষিদ্ধ। এ রকম গাই কারখানায় এসে গেলে, তাদের কিছুদিন সেখানে রেখে খাদ্যের উপযুক্ত করা কিছু কঠিন নয়; কিন্তু তাতে সময় ও পশুর খাদ্য বাবদ কিছু খড়-ঘাস খরচ হয়। কারখানার মালিকরা এতে গররাজী। এই রকম গাই এলেই স্থানীয় অফিসার সরকারী পরীক্ষকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, দু'চারটে কথা কওয়ার পর তারা মৌজ করতে বেরিয়ে যায় দু'জনে। তখন যথারীতি মাংস করার কাজ চলে। নাড়ীভুঁড়ির সঙ্গে গর্ভের বাছুর (ওদের ভাষায় "কোমল-মাংস")-ও মেঝেয় পড়ে; ইউঘিসরা সেটাকে গর্ত দিয়ে চালিয়ে দেয় নীচের দিকে। সেখানে বাছুরটার প্রাণ বের ক'রে দিয়ে শুধু তার হাড় বা মাংস নয় চামড়া পর্যন্ত পিষে "কোমল মাংস" তৈরী হ'য়ে যায়।

একদিন রোজের শেষে হুকুম হ'ল, একটা বিশেষ কাজের জন্য ইউরঘিসকে সেদিন উপরি-সময় খাটতে হবে। বেলা গেছে, ঘরের ভেতরগুলো অন্ধকার; অধিকাংশ মজদুর ও অফিসারের সঙ্গে সব সরকারী পরীক্ষকও চলে গেছে; খালি দশ-বিশজন মজুর তখনও হত্যামঞ্চে দাঁড়িয়ে। সেদিন এ কারখানায় বধ করা হ'য়েছে প্রায় চার হাজার গোরু। দূরদূরান্তরের রাষ্ট্র হ'তে মালগাড়ীতে জীবগুলি এসেছিল; আসবার ঠাসাঠাসিতে কারও পা ভেঙ্গেছে, পাশে গুঁতো খেয়ে কারও পাঁজর ভেঙ্গে গেছে; আবার কতকগুলো মরে গেছে—কিসে বা কীভাবে এগুলো মরেছে কেউ জানে না। এখন এই সব ঝরতিপড়তিগুলোর ব্যবস্থা হবে। সবসুদ্ধ ঘণ্টা দুয়েকের ঝামেলা। বিশেষ গাড়ীতে বিশেষ লিফ্‌টে এগুলোকে হত্যামঞ্চে আনা হয়। মজদুররা একান্ত স্বাভাবিকভাবে কাজগুলো ক'রে যায়, এতে ওদের মধ্যে বিস্ময় চাঞ্চল্য বা কোন রকম ভাবই জাগে না; ওদের দেখলেই বোঝা যায় এটা প্রাত্যহিক ব্যাপার। কাটাকুটি হ'য়ে গেলে লাশগুলো

ঠাণ্ডাঘরে চলে যায়, আগেকার লাশগুলোর মধ্যে এগুলোকে সযত্নে ছড়িয়ে দেওয়া হয়—যাতে ধরা পড়বার কোন আশঙ্কা না থাকে। সে রাত্রে খুব চিন্তিতভাবে বাড়ী ফেরে ইউরঘিস—তা হ'লে ওরাই কি ঠিক? সভ্যতার আমেরিকা, বিজ্ঞানের আমেরিকা, স্বাস্থ্যের আমেরিকা, সততার আমেরিকার ওপর ওর অটুট ভক্তি দেখে যারা হেসেছিল, সেই সব সর্বনিন্দুকরা কি তা হ'লে নিন্দা না করে সত্যি কথাই বলে!

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওনা আর ইউরঘিসের প্রথম প্রেমের চাঞ্চল্য কেটে গেছে; বিবাহের জন্য ওরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছে—দু' বৎসরেরও বেশী। যাতে ওনার সঙ্গে মিলন সহজ হ'তে পারে, তাই ইউরঘিসের কাছে ভাল, যাতে মিলন বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা, তাই ওর কাছে খারাপ। সব কিছুরই ও বিচার করে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। এদের ও নিজের ক'রে নিয়েছে কারণ এরা ওনারই আপনার জন, ওনার নীড় বাঁধবার জন্যই ওর বাড়ী করা। ডারহামের কাজে যত নীচতা যত জঘন্যতাই থাকুক, সে সবে ওদের মিলনে বাধা পড়বে না, তাই ওসব কাজে ও গররাজী নয়।

ওদের মত অনুযায়ী কাজ হ'লে এখনই বিয়ে হ'য়ে যেত; টাকাকড়ি নেই, কাজেই ভোজের দিকটা বাদ পড়ত; ওরাও তাই চায়; কিন্তু বুড়োবুড়ীদের এতে ঘোর আপত্তি: গরীব হ'তে পারে ওরা, তবু এটা একটা সংসার, ভিখিরীর দল নয় যে পথের পাশে দুটো মন্তর বললাম আর মেয়েমদ্দতে বিয়ে হ'য়ে গেল। আজই না হয় ওদের এই হাল—

কিন্তু তা বলে ওদের বংশমর্যাদা কি কুলপ্রথা তো মিটে যায়নি। এলজবিয়েটা বড় জোৎদারের মেয়ে, তাদের খেতখামার ছিল; চাকরবাকর গোরুঘোড়া—ছিল না কী? ওরা ছিল নয় বোন, একটিও ভাই ছিল না; নয় বোনের বিয়েতেই সব শেষ হ'য়ে যায়; নইলে ওরও বড়ঘরে বিয়ে হ'তে পারত, আজ ও মহিলা বলে' গণ্যা হ'তে পারত। অবস্থা আজ যাই হ'ক, তবু অতীতের ঐতিহ্যটা ও ভুলতে পারে না; প্রাণপণে সেটাকে আঁকড়ে ধরে' থাকে। হলই-বা প্যাকিং শহরের অদক্ষ শ্রমিক, সাদা কথায় মুটে-মজুর, তবু জাতজন্ম তো খোয়াতে পারে না। বেসেলিজা বা ভোজ বাদ দেবার কথা যে ওনা বলতে পেরেছে, তাতেই এলজবিয়েটা ক্ষোভে দুঃখে সারারাত্রি ঘুমুতে পারেনি। ওরা বোঝায়, জ্ঞাতি-গুষ্টি আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব এখানে আছে কে যে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে হবে? এলজবিয়েটা বোঝে না। আজ না থাক, দু'দিন বাদে তো হবে, তখন করবে না তারা নিন্দে? ক'টা টাকার জন্য কি আচার-বিচার সব মুছে দিতে চায় ওরা? তাই যদি করতে চায় ওরা, তা হ'লে এই এলজবিয়েটা বলে' রাখছে সে টাকা নিয়ে ওদের ভাল হবে না, কক্ষণো না। বুড়োকে ডাকে ও সমর্থনের জন্য। এখানে আসবার আগেই ওদের ভয় ছিল, বিদেশবিভুঁইএ গিয়ে ছেলে-মেয়েরা হয়তো নিজেদের আচার-বিচার ধম্মোকম্মো সব ভুলে যাবে। এর ঠিক পরের রবিবারে বুড়োবুড়ী প্রায় সকলকে ডাকাতে ডাকাতে গির্জার উপাসনায় নিয়ে যায়; হাতে পয়সাকড়ির বড় টানাটানি, তবু ধর্মে এদের মতি আনবার জন্য শিশু যিশুর একখানা রঙদার মূর্তি কিনে আনে; জিনিষটা চিনেমাটির, এক ফুট লম্বা, চার কোণে মিনারের মত চারটে শুভ্র চূড়া, মধ্যে মা মেয়ারী শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁদের সম্মুখে প্রণত অবস্থায় আছে রাখাল, রাজা ও প্রাচ্যের চারজন জ্ঞানী। পঞ্চাশ সেন্ট্ দাম লেগে যায়; কিন্তু এলজবিয়েটার

ধারণা এসব জিনিষে খরচ করলে অলক্ষ্যপথে মঙ্গলই আসে, খাওয়া-পরা তো নয় যে কড়াকড়ি হিসেব করতে হবে। বৈঠকখানার তাকে মূর্তিটা চমৎকার মানিয়েছে ; আর এ সব না থাকলে কি আর ঘর !

বিয়ের খরচের টাকাটা অবশ্য লৌকিকতার পথে ফিরে আসবে ; কিন্তু খরচটা তো অগ্রিম করতে হবে। এ অঞ্চলে ওরা নতুন, পরিচিতের সংখ্যা একান্তই নগণ্য ; যাও দু'চারজন আছে তাদের, এক স্নেদবিলাস ছাড়া, কারও কাছে একটা টাকা ধার চাওয়া যাবে না। কী করা যায় ? না বোঝে এই বুড়োবুড়ী, এদিকে না আছে টাকার ব্যবস্থা। ওরই মধ্যে একটু ভদ্রগোছের ব্যবস্থা করতে গেলে অন্ততঃ দু'শোটা ডলার খরচ। এত টাকা আসবে কোথা হ'তে। জোনাস বা মেয়ারিজা স্বেচ্ছায় তাদের পুরো রোজগার ধরে দেবে, কিন্তু ওদের সব রোজগার মেলালেও পাঁচ ছ' মাসের আগে অত টাকা জমা সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা দু'টীতে বসে বসে মিলনের মূল্য কষে। ওনা বলে, সেও একটা কাজ নেবে, তাতে আর কিছু না হ'ক, ছ' মাসের দুটো মাস তো কমবে। এমনিভাবে ধীরে ধীরে ওরা এগোয়, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত হ'ল—একটা বিপত্তির কঠিন আঘাতে চুরমার হ'য়ে গেল ওদের সকল আশা।

ঐ সারিরই একখানা বাড়ীর পরে থাকে ছোট্ট একটা লিথুয়ানীয় পরিবার—মা আর ছেলে—ম্যাজস্‌স্কিস পরিবার। দুটী পরিবারে আলাপ হ'য়ে যায়, শুরু হয় যাওয়া আসা। একদিন মা ছেলে এ বাড়ীতে বেড়াতে আসে। একথা সেকথার মধ্যে এই অঞ্চলের ইতিহাস এসে পড়ে। ম্যাজস্‌স্কিস-মায়ের বয়স কমপক্ষে আশী ; সমস্ত শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে, ফোকলা মুখ, মিটি মিটি চায়। জীবনে এত দুঃখ ও পেয়েছে যে ওকে দুঃখের ধাতুতে গড়া বলা যায়। অন্য লোক বিয়ে উৎসব মেলা প্রভৃতির গল্পসল্প করে, এ বুড়ী বলে চলে বুভুক্ষা

ব্যাধি আর মৃত্যুর কাহিনী নয়, ইতিহাস; এ অঞ্চলের ইতিহাস, এ ইতিহাসের সঙ্গে ও এক হ'য়ে গেছে। শুনতে শুনতে এ বাড়ীর সকলের শরীরের রক্ত হিম হ'য়ে আসে। বুড়ী বলে:

এই বাড়ীটার কথাই ধরা যাক। এরা হয়তো ভাবছে এটা নতুন: তা' পনের বছরের পুরানো জিনিষকে নতুন বললে একেও নতুন বলা যেতে পারে; রঙ ছাড়া আর কিছু এর নতুন নয়, তাও আবার রঙ কেমন, এক বছরের বেশী এ বস্তু থাকবে না। এর সব কিছু নড়বড়ে, পচা, খস্‌খসে। এখানকার সব বাড়ীই একটা কোম্পানীর; গরীব মজুরদের সর্বস্বান্ত করবার পরিকল্পনা নিয়ে এরা কাজ করে। এ সব বাড়ীর জন্য পনের শ' ডলার ক'রে নেয়, কিন্তু আসলে ওদের পাঁচশো ডলারের এক আধলা বেশী খরচ পড়ে না। কীভাবে জানল ও? ওর ছেলে এক রাজনৈতিক দলের একজন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কাজ করে, তার থেকে ও সব জেনেছে। যত পচা রদ্দি মাল এই কোম্পানীটা কাজে লাগায় এখানে। এ বাড়ী নিয়ে ওদের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না; ওর কথা কল্পনা নয়, ওর জীবনের ওপর দিয়েই এ বাড়ীর ভোগ গেছে বেশ কয়েক বছর। অধিকাংশ খদ্দেরই বাড়ী রাখতে পারে না। ওর অবশ্য আছে: ওর কথা স্বতন্তর। ওর ছেলে দক্ষ মজুর, মাসে কম্‌সে কম একশো ডলার রোজগার করে, তার ওপর ভারী সেয়ানা বলে বিয়ে করেনি। কোম্পানীর আশার মুখে ছাই দিয়ে বাকী বারশো ডলারই সে শোধ ক'রে দিয়ে বাড়ী পেয়ে গেছে। কিন্তু অন্যেরা—

টাকা মিটিয়ে দিলে কোম্পানীর মুখে কী ক'রে ছাই দেওয়া হয় এরা বুঝতে পারে না—বুড়ী ম্যাজস্‌স্কিয়েনী লক্ষ্য করে, এদের চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বুড়ী পরিষ্কার বুঝতে পারে এরা এ সব ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। বাড়ীগুলো এক হিসেবে সস্তাই; তাই কোম্পানী আশা করে যে ল্যাঙ্গোটওয়ালা ছাড়া অন্য কেউ এ সব বাড়ী কিনবে না;

তাদের জীবিকা ও জীবন অনিশ্চিত; কাজেই কিস্তীর টাকা ঠিক দিতে পারা এদের পক্ষে সম্ভব নয়; একবারের কিস্তীর টাকা ঠিক তারিখে দাখিল করতে অপারগ হ'লে, জমিবাড়ী, আগাম টাকা, অন্যান্য কিস্তীর টাকা ওরা বাজেয়াপ্ত ক'রে নেয়। ভগবান! বলে' বুড়ী বুকের ওপর হাত দিয়ে ক্রুশ বানায়। তারপর সে বাড়ী আবার বিক্রী হয়; এমনি ক'রে কত লোকের যে সর্বনাশ হ'য়েছে, কত জীবন কত সংসার যে উচ্ছন্নে গেছে, এক-একখানা বাড়ী কতবার ক'রে যে বিক্রী হ'য়েছে, সে এক ভগবানই জানেন। তবে মোটের ওপর বলা যায়, এক-একখানা বাড়ী গত পনের বছরের মধ্যে অন্ততঃ সাত আটবার ক'রে বিক্রী হ'য়েছে। প্যাকিং শহর সম্বন্ধে এক তিল খবরও যে রাখে তাকেই এরা জিজ্ঞাসা করতে পারে; তাহ'লেই এরা বুড়ীর কথার সত্য-মিথ্যা জানতে পারবে। যবে হ'তে এ সব বাড়ী তৈরী হ'তে লেগেছে তখন হ'তে বুড়ী এখানে বাস করছে; এর নাড়ীনক্ষত্র—ও জানে না কী! এ বাড়ীখানা? হা কপাল! একে একে বুড়ী নাম করে আগের চারটে পরিবারের; এদেরই মত আশা নিয়ে তারাও এই বাড়ীখানা নিয়েছিল; তারপর কিস্তীর টাকা বকেয়া পড়েই একে একে তারা উঠে গেছে। এ বাড়ীতে এরাই প্রথম নয়। এই বাড়ীখানার ইতিহাস বুড়ী বলতে লাগে—

এ বাড়ীতে প্রথম আসে একটা জারমান পরিবার। প্যাকিং শহরের সব কর্মীই তখন জারমান। দক্ষ জারমান কসাই এনে এরা ব্যবসা শুরু করেছিল। বুড়ী আর তার ছেলে যখন এখানে আসে তখন ওরা ছাড়া আর একটি মাত্র লিথুয়ানীয় পরিবার ছিল এখানে, বুড়ী অন্ততঃ আর কোন পরিবারের কথা জানে না; বাকী সবই ছিল জারমান। তারপর এল সস্তা মজদুর—এরা আইরিশ। জারমানরা হঠে গেল। একসময় এই প্যাকিং শহরটা একটা আইরিশ বসতি হ'য়ে

গিয়েছিল। এখনও ওদের দু' একটা মহল্লা আছে; তাতে এখন যত আইরিশ আছে তাই দিয়ে মজদুর আন্দোলনকারী, পুলিস আর "কলম" হবার যথেষ্ট লোক জুটে যায়; এসব ওদের [illegible] একচেটে। একবছর একটা খুব বড় ধর্মঘট হয়—কারখানা বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হ'য়ে যায়, তখনই বেশীর ভাগ আইরিশ মজদুরের চাকরি যায়। তারপর আসে বোহেমীয়, তাদের পর আসে পোলরা। এইভাবে এখানে একটা জাত আর একটা জাতকে হঠিয়েছে। শোনা যায়, মজুরী সস্তা রাখবার জন্য বুড়ো ডারহামই জাতের [illegible] জাত মজদুর আনত। বুড়ো বলত, এখানকার অধিবাসী এমন [illegible] বসাব যে সব হ'য়ে থাকবে সাপে নেউলে, এক হ'য়ে ধর্মঘট ক[illegible] চিরকালের জন্য খতম ক'রে দেব। এই বুদ্ধি ক'রে সে ইউরোপের [illegible] দেশে, প্রতিটী শহরে, প্রতিটী গ্রামে আড়কাঠি পাঠায় এখানকার [illegible] মজুরী আর কাজের সুবিধার কাহিনী প্রচার করবার জন্য। [illegible] বুড়ো ডারহাম? সে খালি একটা জাতকে আর একটা জাতে[illegible] যুদ্ধে লাগায়নি; প্রচার করিয়ে পালে পালে মানুষ এনেছে, নি[illegible] ক'রে তাদের সমস্ত শক্তি চিপে নিংড়ে নিয়ে, গতির মাত্রা ক্রমশঃই [illegible]ড়িয়েছে, ভেঙ্গে চুরচুর ক'রে দিয়েছে তাদের দেহের ও মনের শক্তি, এইভাবে মানুষের ঢের ঢের নীচে নেমে গেছে এক একটা জাত; বুড়ো তার আগেই আর একটা জাত আনিয়ে ফেলেছে—টাকা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়, স্রেফ প্রচার দিয়ে। লাখে লাখে পোল এসেছিল একসময়, তাদের চেয়ে সস্তা লিথুয়ানীয় এসে তাদের ভাপের মত উবিয়ে দিয়েছে। এখন আসছে স্লোভাকরা, লিথুয়ানীয়দের দশা হ'চ্ছে পোলদের মত। স্লোভাকদের চেয়ে আরও দুঃখী, আরও গরীব দুনিয়াতে কেউ আছে কিনা বুড়ী জানে না; শুধু জানে এদের চেয়েও গরীব দুঃখী আর একটা জাত—একটা কেন, জাতের পর জাত এই ডারহামরা বের

করবে, আনবে। এক কথা, চড়া মজুরী! চড়া মজুরী!! বেচারারা বড্ড বেশী দেরিতে বোঝে যে মজুরী চড়া বটে কিন্তু মজুরীর সঙ্গে অন্যান্য সব জিনিষেরই দর চড়া। বুড়ী যেন তার মিটমিটে চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখে। বলে চলে—

এই সব প্রবঞ্চিত বঞ্চিতের দল ক্রমেই বাড়ছে, কে মাপবে এদের দুঃখ-দুর্দশার পরিমাণ। আজ গরীবিয়ানা ও দুর্দশা সহ্যের সীমা পার হ'য়ে গেছে—হ্যাঁ, এত দুর্দশা মানুষে সইতে পারে না, কিন্তু এরা সইছে; কিন্তু একদিন আসছে, আসতে বাধ্য—সেদিন এরা এই বঞ্চনার এই চরম শোষণের প্রতিশোধ নেবে—সেদিন ধুলো হ'য়ে উড়ে যাবে এই সব কারখানার মালিক প্যাকাররা। বুড়ী সমাজতন্ত্রী না ঐ রকম কী একটা বটে। তার এক ছেলে সুদূর সাইবেরিয়ার খনি-শাস্তি খাটছে; বয়েসকালে সে নিজেও বহু বক্তৃতা দিয়েছে; বলবার তার যেন বিশেষ ক্ষমতা আছে। তার বর্তমান শ্রোতাদের কাছে সে আরও ভয়ঙ্কর হ'য়ে ওঠে তার ঐ বলার ভঙ্গীর জন্যই।

ওরা ওকে বাড়ীর ইতিহাস বলার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ও হ্যাঁ, সে জারমান পরিবারটা ছিল খুব ভাল; কোন ইতরোমো ছিল না তাদের মধ্যে। বাড়ীর কর্তা ছিল ধীর স্থির, কঠোর পরিশ্রমী। নিজের ওপর বিশ্বাসও ছিল প্রচুর। বাড়ীর জন্যে প্রায় আদ্দেক টাকা দিয়েও দিয়েছিল। তারপর একদিন লিফ্‌টের একটা দুর্ঘটনায় বেচারা মারা গেল। তখন এখানে বহু জারমান; কিন্তু এ পরিবারটার এখানেই সব শেষ হ'য়ে গেল।

তারপর এ বাড়ীতে এল একটা আইরিশ পরিবার। তখন এ শহরে বহু আইরিশ। এ বাড়ীর কর্তা ছিল পাঁড় মাতাল। প্রতিদিন কারখানা হ'তে বাড়ী ফিরে বাড়ীর ছেলেদের ঠ্যাঙাত; তাদের চ্যাঁচানিতে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত; এর আর বিরাম ছিল না। কিস্তীর টাকা

ওদের প্রায়ই বাকী থাকত। কিন্তু বাড়ীর কোম্পানী ওদের তাড়াতে হয় সাহস পেত না, নয় "বিশেষ কারণে" তাড়াত না। আইরিশটা, লাফার্টি, ছিল "জঙ্গী-নারা সঙ্ঘের" সদস্য; এখানকার যত ঠগ, গুণ্ডা বজ্জাত এই সঙ্ঘের সদস্য; এ সঙ্ঘের সদস্য এ শহরে যত বড় অন্যায়ই করুক, তার সাতখুন মাফ, গ্রেফ্‌তার পর্যন্ত তাদের করা যায় না। একবার এরা আশেপাশের গরীব গেরস্থদের গোরু চুরি ক'রে এনে কারখানার পিছনে কেটে মাংস বিক্রী করে; এই অপরাধে দলের আরও কয়েকজনের সঙ্গে লাফার্টিও ধরা পড়ে। তিন দিন পরেই লাফার্টি হাসতে হাসতে জেল হ'তে বেরিয়ে এল, কারখানার কাজও ঠিক রইল। মদে মদে লোকটা শেষ পর্যন্ত পঙ্গু হ'য়ে গেল। এর একটা ছেলে মানুষের মত মানুষ ছিল; সে বাপ ও বাপের সংসার এখানে এক কি দু'বছর রেখে খাইয়েছিল। তারপর তার হ'ল যক্ষ্মা; পরিবারটাও ভেসে গেল।

ঐ আর একটা জিনিস—নিজেরই কথার মোড় ঘুরিয়ে ম্যাজ্‌স্কিয়েনী বুড়ী মন্তব্য করে—বাড়ীটা ভারী অলক্ষুণে। এ বাড়ীতে যারাই বাস করেছে তাদেরই কারও না কারও যক্ষ্মা হয়েছে। কেন এমন হয় কেউ জানে না, কেউ বলে বাড়ীর কোন দোষ আছে, কেউ বলে তৈরীই করা হয়েছিল অস্বাস্থ্যকর ক'রে—আবার কারও মতে বাড়ীটা কৃষ্ণপক্ষে আরম্ভ করা হয়েছিল বলে এর এই হাল। এমন আরও অনেক বাড়ী আছে, সেখানে থাকলে পরিবারের কারও না কারও যক্ষ্মা হবেই; কোন কোন বাড়ীতে আবার এমনি ঘর কাছে এক-একখানা। এ বাড়ীতে প্রথম যক্ষ্মা হয় আইরিশ পরিবারের একটি ছেলের; অবশ্য জোর ক'রে বলা যায় না যে তার যক্ষ্মাই হয়েছিল; কেন না কারখানায় যে-সব ছেলে কাজ করত, তাদের কী-যে হ'ত কেউ জানে না। তখনও অল্পবয়স্কদের কারখানায় নিয়োগ না করা সম্বন্ধে কোন আইন হয়নি।

ইউরঘিসরা আবার এখানে জিজ্ঞাসু হ'য়ে ওঠে, কিসের আইন?

ওরা যে ভাবছিল স্ট্যানিসলোবাসটাকে কাজে লাগিয়ে দেবে—ষোল বছরের কম বয়সের ছেলেদের কি কাজে নেয় না আর? ওদের ভয় দেখে বুড়ী হেসে ওঠে। আরে না না, আইন হ'য়ে তফাৎ কিছুই হয়নি; খালি অভিভাবকদের মিথ্যে বলতে বাধ্য করা ছাড়া আইন আর কিছু করেনি। ছেলের বয়সটা বাড়িয়ে বলে এখন অভিভাবকরা। যে বাড়ীর লোকেদের নাবালক ছেলের রোজগারের ওপর বাধ্য হ'য়ে নির্ভর করতে হয়, সরকার সে সব পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোন ব্যবস্থা করেনি; শুধু একটা আইন চালিয়ে দিয়ে কর্তব্য শেষ করেছে। আগে এখানে একেবারে কোলের শিশু ছাড়া আর সকলকেই কাজে লাগান হ'ত; মালিকরা ছেলে-মজতুরই বেশী পছন্দ করে; কারণ পূর্ণবয়স্কের চেয়ে এসব কাজ যে তাদের দ্বারা কম হয় তা নয়, অথচ মজুরী লাগে মাত্র তিনভাগের একভাগ। আজও সেই ব্যবস্থা চালু আছে। মুনাফা বেশী করবার জন্য মালিকরা দিনের পর দিন নতুন নতুন যন্ত্র তৈরী করছে, এ সবে একটা পূর্ণবয়স্ক লোক যা করবে, একটা নাবালকও তাই করবে। অথচ আগের মত মাইনে লাগবে সেই এক-তৃতীয়াংশ। প্যাকিংশহরের কারখানায় তাই এখন ছেলে গিজ গিজ করে। অথচ পূর্ণবয়স্ক জোয়ান মরদরা একটা কাজের জন্য ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়াচ্ছে দোরে দোরে।

হ্যাঁ, যে কথা ও বলছিল, এই বাড়ীর কথা। তার পরের পরিবারটার গিন্নী মরে এই বাড়ীতে—সেও যক্ষ্মায়। বেচারীর নিয়মিতভাবে প্রতি বছর যমজ ছেলে হত; এ বাড়ীতে যখন আসে তখনই তাদের অগুন্তি ছেলেমেয়ে। বেচারা মরলে পুরুষটা কাজে যেত, আর ছেলেমেয়েগুলি নিজেরা খুঁটে খাবার ব্যবস্থা করত; সে কি হাল তাদের! শীতে জমে যেত সব। পাড়ার লোক সাধ্যমত সাহায্য করত। শেষে একনাগাড়ে তিন দিন পুরুষটা বাড়ী ফিরল না। তিন দিন পর খবর পাওয়া গেল,

কারখানায় দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে ; একটা খোঁড়া ষাঁড়ের গুঁতোয় বেচারার প্রাণান্ত হয়। বাড়ীর কোম্পানী এসে ছেলেমেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দিলে। বাড়ীখানায় ওরা ছিল প্রায় চার বছর। আবার এক নবাগত পরিবারের কাছে বাড়ীখানা বিক্রী হ'য়ে গেল।

বিভীষিকার কাহিনী বিবৃত ক'রেই চলে বুড়ী। হয়তো এসব সত্যি—হয়তো ও বাড়িয়ে বলছে—কে জানে কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে! এই যেমন যক্ষ্মা ; এ সম্বন্ধে এরা কিছুই জানে না ; শুধু জানে যক্ষ্মা হলে খুব কাসি হয়। এদিকে বুড়ো অ্যান্টেনাস ক'দিন ধরে ভীষণ কাসছে ; কাসির আর বিরাম নেই। এক একটা ধমক্ ওঠে আর বুড়ো যেন কাচা কাপড়খানি হ'য়ে যায়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, শ্লেষ্মাতে ক্ষীণ একটা লাল রেখা থাকে।

কিন্তু এর পর যা এল তার কাছে ওপরের কাহিনীগুলো যেন কিছুই নয়। ওরা বুড়ীকে এবার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। হিসেব ক'রে ওরা দেখিয়ে দেয়, এই রোজগারেই বাড়ীর কিস্তি শোধ করা তো অসম্ভব নয়। বুড়ী ওদের ঠিকের ভুল দেখিয়ে বলে, হি[illegible] করছ মাসিক বার ডলারের, সুদের হিসেব করবে কে?

"সুদ !?!"—সবিস্ময়ে চিৎকার ক'রে ওঠে ওরা।

"যে টাকাটা এখনও বাকী আছে তার সুদ"—বুড়ী বোঝায়।

"আমাদের কিন্তু সুদ দিতে হবে না," তিন চার জনে একসঙ্গে বলে' ওঠে, "মাসিক খালি বার ডলার দেবার চুক্তি আমাদের।"

জবাবে বুড়ী হাসে। বলে, "তোমরাও ঠিক অন্যদের মত ; ওরা তোমাদের ফাঁদে ফেলে জ্যান্তে গেলে। সুদ ছাড়া বাড়ী ওরা বেচে না। চুক্তি-নামাহ্ বের কর, দেখাচ্ছি।"

সিন্দুক খুলে এলজবিয়েটা কাগজখানা বের করে আনে ; দেখবার শোনবার আগেই ওদের বুক বসে যায়। তবু ওরা প্রায় দম বন্ধ করে

বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়ায়। বুড়ী ইংরেজীও পড়তে পারে বেশ। পড়তে পড়তে এক জায়গায় থেমে বুড়ী বলে, "এই যে, থাকবেই! 'উক্ত রকমের উপর মাসিক কিস্তিতে বার্ষিক শতকরা সাত টাকা হিসাবে স্থদ ধরিতে হইবে'।"

বেশ কিছুক্ষণ সকলে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে কাগজখানার দিকে। একটু সাব্যস্ত হ'য়ে অস্পষ্ট স্বরে ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে, "মানে কী এর?"

"মানেটা স্পষ্ট, মানে আগামী মাসে এবং সকল মাসেই ঐ বার ডলারের ওপর তোমাদের দিতে হবে আট ডলার চল্লিশ সেণ্ট।"

সকলেই নির্বাক। হঠাৎ সামনে যেন একটা বিকট ভূত দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে হয় পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, তলিয়ে যাচ্ছে সব অতল গহ্বরের তলের দিকে। দুর্ভাগ্যের ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর মুষ্টিতে ওরা ধরা পড়েছে—ধ্বংস অনিবার্য, অব্যাহতি নেই এর কবল হ'তে। স্বপ্নের স্বর্গ উৎকট আওয়াজে ভেঙ্গে পড়ে জাগ্রত চোখের সামনে, সে আওয়াজে তালা ধরে কানে। বুড়ী কিন্তু থামেনি, নির্বিকার ভাবে বলেই চলেছে; কুরূপার কণ্ঠস্বরও কি কর্কশ! মন চায়, ও থামুক, থামুক এবার। ইউরঘিসের মুঠো দুটো ক্রমাগত শক্ত হ'তে থাকে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। ওনার গলায় কিসের যেন একটা ডেলা আটকে যায়। দুঃসহ এ অবস্থা কাটিয়ে দেয় এলজবিয়েটার ফোঁপানি; মেয়ারিজা হাত কচলায় আর আর্তস্বরে বলে, 'হায় হায়, সব্বোনাশ হ'য়ে গেল'।

বিষাদে বা বিলাপে কোন কাজ হয় না। মূর্তিমতী দুর্ভাগ্যের মত বুড়ী ম্যাজন্তকিয়েন অবিচলভাবে বলে' চলে তার বক্তব্য। —হ্যাঁ অন্যায় তো বটেই; কিন্তু ন্যায়ের কোন সম্বন্ধ নেই এর সঙ্গে। এ সব এরা জানত না তাও ঠিক, কিন্তু এরা জানুক তাও তো কেউ চায়নি; ওদের অজ্ঞতাটাই তো এখানকার সকলের কাম্য। তবু চুক্তিতে

একথা আছে, কর্তাদের কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। এ যে কত সাঙ্ঘাতিক, সময় এলেই এরা বুঝতে পারবে।

এ অতিথিকে ওরা আর সইতে পারে না, কোন রকমে বিদায় ক'রে দেয়। রাতটা কাটে বিলাপে। ছেলেদের ঘুম ভেঙ্গে যায়; তারাও বোঝে, কিছু একটা বিপদ হ'য়ে গেছে; সুতরাং বিলাপ ক'রে ওরা একেবারে আর্তনাদ জুড়ে দেয়; থামায় কে ওদের! ওদের দুঃখ বা দুর্ভাগ্যের জন্য কারখানা বন্ধ থাকবে না, সকাল হ'তেই ওদের কাজে বেরতে হয়। সাতটা বাজতেই ওনা ও এলজবিয়েটা হাজির হয় দালালের অফিসে। দালাল স্বীকার করেন—ঠিকই বলেছেন সে বৃদ্ধা, সুদের কথা ওতে লেখা আছে বৈ কি, সুদ দিতে হবে। এলজবিয়েটার মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়, কান্নার স্বরে দালালকে দুষতে থাকে একটানা; রাগের সঙ্গে কিন্তু দালালের কোন সম্বন্ধ নেই। আগের মতই সবিনয়ে বলেন, উনি ভেবেছিলেন, সুদের কথা সকলেই জানে কাজে কাজেই এঁরাও জানেন, বাহুল্য বোধে ওটা আর বলেন নি। ঋণ তো এটা, ঋণের ওপর সুদ দিতে হবে বৈকি।

ফিরে আসে ওরা। ওনা যায় কারখানার দিকে। দুপুরে ইউরঘিসের সঙ্গে দেখা করে' ব্যাপারটা বলে। ওনা যা আশঙ্কা করছিল তার কিছুই নয়—ইউরঘিসের মেজাজ বিগড়োয় না। ইতিমধ্যে সে নিজেকে শক্ত করে' ফেলেছে। ওদের ভাগ্যই এই! কী আর করা যাবে? যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ইউরঘিস ওর স্বভাবসিদ্ধ উত্তর দেয়, "আরও বেশী খাটব"। সব পরিকল্পনা উল্টে যায়। ওনাও একটা কাজ নেবে। এলজবিয়েটা বলেছে, ষ্টানিসলোবাসকেও কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। আগে হ'লে ইউরঘিস 'না' বলে দিত; কিন্তু আজ আর মাথা নাড়ে না; কপাল কুঁচকে বলে, তাই করুক, তা ছাড়া আর উপায় কী আছে? সকলেরই এখন কিছু কিছু ত্যাগ করা উচিত।

কাজেই ওনাও এবার কাজ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। সে রাত্রে বাড়ী ফিরে মেরারিজা খবর দেয় ওনার একটা কাজ হয়ে যেতে পারে; অ্যাসাইটাইটি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে তার আজ আলাপ হ'য়েছে, তার এক বন্ধু ব্রাউনের মোড়ক বাঁধার কারখানায় কাজ করে—সে বলেছে, তাদের ওখানে একজন মেয়ে শ্রমিক নেবে। তবে এখানকার প্রধানার 'উপহার' নেওয়ার অভ্যেস আছে—বেশী না, মাত্র দশ ডলার—দশ ডলারের একখানা নোট তাঁর হাতে না দিয়ে তাঁকে কাজের জন্য বলা বৃথা। এতে আর ইউরবিস বিস্মিত হয় না; জিজ্ঞাসা করে, মজুরী কত? কথাবার্তা চলে। প্রধানা বলেন, ঠিক বলতে পারেন না তিনি, তবে, মোড়কের ওপর সেলাই-এর কাজটা ওনার হ'য়ে যেতে পারে; হলে হপ্তায় ও আট দশ ডলার রোজগার করতে পারবে। আবার পারিবারিক বৈঠক বসে। কাজটা কঠিন নয়; কিন্তু কাজ করতে হবে অন্ধকার সেঁতসেঁতে ঘরে বসে; এটা ইউরঘিসের পছন্দ নয়, তবু সব কিছুই তো ইচ্ছেমত পাওয়া যায় না। মজুরীর কথাটাও তো ভাবতে হবে। দশ ডলারের একখানা নোট হাতে ক'রে ওনা আবার প্রধানার সঙ্গে দেখা করতে চলে।

এলজবিয়েটা ক্ষুদ্র ষ্ট্যানিসলোবাসকে পুরুতের কাছে নিয়ে যায়; তিনি ওকে একখানা সার্টিফিকেট দেন—তার অর্থ, এ এর আসল বয়সের চেয়ে দু'বছরের বড়। সেইটী নিয়ে বালক বেরিয়ে পড়ে বিশাল বিশ্বে তার ভাগ্যের সন্ধানে। সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক এই সময়েই ডারহামের কারখানায় চর্বির বিস্ময়কর নতুন কল বসান হয়েছে। ও গিয়ে আরও বয়স্ক উমেদারদের সঙ্গে ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে; সার্টিফিকেট প্রকাশ্যে হাতে রাখে। দেখে দ্বারোয়ান হাসে; বলে, এ দিকে যা, এ দিকে। তার নির্দেশমত ও একটা লম্বা ঘেরা বারান্দা দিয়ে ভেতরে চলে যায়; সেখান হ'তে একটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠে বিজলী বাতি দিয়ে

দিনের বেলা আলো করা একখানা ঘরে; নতুন কলগুলো এখানেই বসান আছে। তার ওপর তলা হ'তে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে লম্বা সরু সুন্দর সাপের মত দুর্গন্ধ চর্বির কয়েকটা লাইন বেরিয়ে আসছে; সব 'সাপ' একসঙ্গে বেরুচ্ছে না; কলে ঠিক যতগুলি লাইনের দরকার ততগুলিই আসছে; উপর তলায় চর্বিটাকে খাবার ও টিনে ভরবার উপযোগী করে' রাখা হয়েছে। প্রতিটি কল এক একটা টিনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরছে চর্বি আসার এক একটা ছিদ্রের নীচে, নির্দিষ্ট সময়ে সেখান থেকে ঘুরে যাচ্ছে আর একটা ছিদ্রের নীচে, কানায় কানায় টিন ভর্তি করা, চাপ দেওয়া, সমান করা—এ সবই কলের কাজ। ঘণ্টায় দুশো টিন ভর্তি হচ্ছে। এত কাণ্ডকারখানা হ'চ্ছে অথচ মানুষ লাগছে মাত্র দুটী; একজন ঠিক সময়ে এবং ঠিক জায়গায় ফাঁকা টিন একটা করে' কলের মুখে লাগিয়ে দিচ্ছে, অপরজন ঠিক সময়ে এবং ঠিক জায়গা হ'তে ভর্তি টিন তুলে নিচ্ছে; দুজনকেই কাজ করতে হ'চ্ছে দু'তিন সেকেণ্ড পর পর।

ষ্ট্যানিসলোবাস বিস্মিত হ'য়ে কলের কাজ দেখে। একজন লোক এগিয়ে আসে ওর দিকে; জিজ্ঞেস করে, কী চাও এখানে? শেখানো মত উত্তর দেয় ষ্ট্যানিসলোবাস, "কাজ"। "ষোল"। প্রতি বছর একজন সরকারী পরীক্ষক কারখানার ভেতরটা ঘুরে যায়, বালকদের দুচারজনকে জিজ্ঞেস করে "বয়স কত"? কাজেই কর্তাদের ভারী সচেতন থাকতে হয়! যেমন এখন। আগন্তুকটী একজন অফিসার। ষ্ট্যানিসলোবাসের সার্টিফিকেটটা নিয়ে সে অফিসে পাঠিয়ে দেয় নথিভুক্ত করবার জন্য। ব্যস, আইনের সেবা হ'য়ে যায়। অফিসার কলের একজনকে অন্যকাজ দিয়ে ষ্ট্যানিসলোবাসকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দেয়। সহজ কাজ। প্রতিনিয়ত বুভুক্ষু রাক্ষসের মত কলের একটা হাত ওর কাছে বেরিয়ে আসছে; ওকে তার ওপর একটা খালি টিন বসিয়ে

দিতে হবে। এ সংসারে ষ্ট্যানিসলোবাসের এই হ'ল কাজ; যাবজ্জীবন এই কাজই করে চলবে ও। খোদার দুনিয়ায় এই ওর মাপা নসীব—মেঝেটার মাপা এক বর্গ-হাত জায়গায় সকাল সাতটা হ'তে বারোটা আবার সাড়ে বারোটা হ'তে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কলের মুখে খালি টিন বসিয়ে যাবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর—ও নড়বে না, কিছু ভাববে না, শুধু টিনের পর টিন বসিয়ে চলবে। ধাতব কল হাত বাড়াবে, মানুষ-কল টিন জোগাবে। গ্রীষ্মের দিনে এই বদ্ধ ঘরের গরমে পচা চর্বির গন্ধে দম বন্ধ হ'য়ে এলেও কলের কাজের ব্যতিক্রম হ'তে পাবে না। শীতে বরফ-ঠাণ্ডা টিনের স্পর্শে ওর নাঙ্গা ছোট আঙুল জমে যাবার উপক্রম হবে, কিন্তু কলের মত কাজ ওকে চালিয়েই চলতে হবে। বছরের আদ্দেক দিন ও যখন কাজে যাবে এবং যখন বেরিয়ে আসবে, এই দু'টি সময়ই বাইরে থাকবে রাত্রির অন্ধকার; তাই ছ'টি মাস ধরে' কাজের দিনে ও জানতেই পারবে না যে, বাইরের জগতে সূর্য ওঠে, দিনের বেলা আলো হয় বাইরেটায়। এ সবের বদলে সপ্তাহের শেষে ও বাড়ী নিয়ে যাবে তিনটী ডলার—এই হ'ল ঘণ্টায় পাঁচ সেণ্ট হিসাবে ওর মজুরী; এই হ'ল আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাড়ে সতের লক্ষ রোজগেরে বালকের আয়ের মধ্যে ওর হিস্সা।

যৌবনের আশা এত সহজে মরে না। ইউরঘিস আর ওনা আবার হিসেব করতে লাগে। আবিষ্কার করে ওরা ষ্ট্যানিসলোবাসের রোজগারে সুদ শোধ হ'য়েও কিছু বাঁচবে। এটা ঠিক শোষণের মনোবৃত্তি নয়। প্রেম মানুষকে একটু অন্ধ করেই! আর ষ্ট্যানিসলোবাস একটা কাজ পেয়ে, একগাদা টাকা রোজগার করবার যোগ্যতা পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে। ওদের আর দোষ কী?

সপ্তম অধ্যায়

হেমন্তের মধ্যেই ইউরখিস আর ওনার বিয়ে হবার মত টাকা জমে যায়। এই দিয়েই দেশের এবং বংশের আচার-অনুষ্ঠান মান-মর্যাদা সব রক্ষা হ'য়ে যাবে। ওরা একটা বড় ঘর ভাড়া করে' নব পরিচিতদের আমন্ত্রণ করে। তারা খানা পিনা নাচগান করে' যায়। ওদের ঋণ দাঁড়ায় পুরো একশো'টী ডলার।

এ ওদের কাছে বড় নিষ্ঠুর বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা; নিরাশার সাগরে ওরা ডুবতে থাকে। তাও আবার, প্রেমের পরশে, মিলনের আলিঙ্গনে হৃদয় যখন কোমল, ঠিক সেই সময় লাগে আঘাতটা; আঘাতটা তাই আরও ভীষণ মনে হয়। বিবাহিত জীবনের প্রস্তাবনা এই। এত যে ভালবাসে ওরা পরস্পরকে, কিন্তু সে ভালবাসা প্রকাশ করবার সময় কই ওদের জীবনে? জগতের সব কিছু ইশারায় ওদের বলে, এ জীবন বড় সুখের, আনন্দের, রঙীন এ জীবন; বিস্ময় ভরা এ বিশ্ব, সামান্য স্পর্শে আনন্দের প্রদীপ জ্বলে ওঠে ওদের হৃদয়ে। আর একদিকে দয়াহীন স্নেহহীন এ সংসার প্রবল আঘাতে কাঁপিয়ে দিয়েছে ওদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত। আজ সামান্য একটু সুখের জন্য কাঁদলে ওদের দুর্বল বলা চলে কি? বসন্তের পুষ্পের মত উন্মোচিত করেছিল ওরা ওদের অন্তর, কিন্তু অকাল শীতের স্পর্শে সে যায় শুকিয়ে জীর্ণ হ'য়ে। ওরা ভাবে, বসুধার আর কোন ফুলকে বোধ হয় এমন ভাবে শুকিয়ে যেতে হয়নি কখন।

অভাবের চাবুক বর্বর ভাবে পড়তে আরম্ভ করে ওদের পিঠে বাসক-রাত্রির পরের প্রভাতটী হতেই। সমস্ত রাত্রি ধরে বিয়ে করতে ওদের কেউ বলে নি; কাজে যেতেই হবে। ক্লান্তিতে ওনা দাঁড়াতে পারে

না ; তাতে কী ? কাজে যেতে হবে , না গেলে, চাকরী যাবে। চাকরী গেলে ধ্বংস হ'য়ে যাবে ওরা। ভালমন্দটা একটু বেশী পাওয়ায় ষ্ট্যানিস-লোবাস কিছু বেশী খেয়ে ফেলেছিল ; রাত্রি সকাল হতেই শরীর খারাপ তবু তাকেও কাজে যেতে হবে, সমস্ত দিন কলের পাশে দাঁড়িয়ে ও কাজ করে, পা টলে, চোখ জড়িয়ে আসে, মাথা ঝিম ঝিম করে, ও কাজ করে চলে। তবু কাজটা যেতে যেতে রক্ষা পেয়ে গেছে। কাজ করতে করতে দু'দুবার ও তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, অফিসারটা দুবারই ওকে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে না জাগিয়ে দিলে চাকরীটা কী আর থাকত !

দেহমনকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ও'দের হপ্তাখানেক লাগে, মেজাজ তবু খিঁচড়েই থাকে ; ছোটগুলো দিবারাত্রি কাঁদে। সব্‌টা মিলিয়ে বাড়ীটা হয় নরক, সব সময় মনে হয় পালাই পালাই। ওরই মধ্যে ইউরষিসের মেজাজটা শান্ত আছে বলতে হবে; সামান্য কারণে ওর মেজাজ বিগড়োয় না। ওনার মুখ চেয়ে ও শান্ত থাকে। অত স্পর্শ-সচেতন মন ওনার, সমাজের এ স্তরের উপযোগী সে একেবারেই নয়, এর কঠিন স্পর্শে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায় যেন ও, তবু প্রকাশ নেই তার, শান্ত থাকে ও সব সময়ই। ওর কথা ভাবতেই অজ্ঞাত শত্রুর ওপর রাগে ইউরষিসের সমস্ত শরীর সির সির ক. ওঠে, হাতের মুঠো আর চোয়ালের হাড় ক্রমাগত যেন শক্ত হ'য়ে বসে। বার বার বলে ও নিজেকে, যোগ্য নই আমি ওর, যোগ্য নই আমি ; এত কোমল, এত সুন্দরকে নিজের ভাবতে ভয় হয় ওর। একেই পাবার তৃষ্ণায় ছটফট করেছে ও এতদিন, আর আজ তাকে পাবার পর মনে হয়, নিজের যোগ্যতা দিয়ে ওনাকে ও অর্জন করেনি ; নিজের অতুলনীয় সরলতা দিয়ে ওনা বিশ্বাস করেছে ওকে, বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে ওর কাছে ; এত মহৎ দান গ্রহণের কোন—কোন যোগ্যতাই যে নেই ওর। স্থির করে—ওর হীনতা, ওর কুৎসিত অন্তর ও কিছুতেই ওনার সামনে প্রকাশ

করবে না, অন্তরের দ্বারে পাহারা তাই বসিয়েই রাখে ও। একটু রাগলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খিস্তি করে এক শেষ করত ও এতদিন; ... ও শান্ত,. অশ্রাব্য একটা কথা আজ আর ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না। নিজের চলায় বলায় এখন ও বড় সাবধান। এত সহজে জলে ভরে আসে ওনার চোখ দুটী, এত কাতর আবেদন মাখা চোখে চেয়ে থাকে ও ইউরিঘিসের দিকে। এ কোমলতার সামনে ওর সকল কঠোরতা বিলীন হ'য়ে যায়, শপথ করে মনে মনে, আর কখন এমন করব না, মন্দ হব না আমি, শত কাজের মধ্যেও ও ওনার অশ্রু আর নিজের প্রতিশ্রুতি ভুলতে পারে না। মনের মধ্যে মহাবেগে বয়ে চলে অজস্র বিষয়ের অব্যাহত স্রোত, এত ভাবনা ইউরঘিস আর কখনও ভাবেনি।

ও রক্ষা না করলে ওনাকে রক্ষা করবার আর কেউ নেই, সংসারে অসংখ্য বিভীষিকার বিরুদ্ধে ওনার লড়াইও ওকে লড়ে' দিতে হবে। পৃথিবীর পরিচয় এখন ও কিছু কিছু পেয়েছে, অনেকখানি বুঝেছে এর গতিবিধি, হালচাল; এর থেকে তাই নিজের বাহু দুটীর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায় ও ওনাকে। এ বড় কঠিন সময়, প্রত্যেককে লড়তে হবে সংসারের সকলের বিরুদ্ধে, নিজের চেষ্টায় নিজেকে বাঁচাতে হবে, অক্ষমের জন্য ক্ষমা নেই এখানে। পারলে অন্যের ঘাড় ভেঙ্গে ভোজ খেয়ে নিতে হবে, নিজে কাউকে খাওয়ান চলবে না। এ সংসারের পথে চলতে হবে সকল সময়ই ঘৃণা ও সন্দেহের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। ও বুঝে নিয়েছে চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে; তারাই ফাঁদ পেতে রেখেছে চতুর্দিকে; সকল ফাঁদেই ধর্ম ও বিভিন্ন সদ্‌গুণের টোপ ফেলা আছে। কাঁচের পিছনে দোকানের দেখন-পেটিগুলো মিথ্যার উক্তিতে ছয়লাপ হ'য়ে আছে, মিথ্যার দেওয়ালীতে পুড়িয়ে মারতে চায় ওরা শামা পোকার মতই; ডাকছে ওরা দেওয়াল হ'তে, বেড়া হ'তে, টেলিগ্রাফের থাম হ'তে, পথের বাতি-স্তম্ভ হ'তে;

যৌথ কারবার বিরাট বস্তু—কিন্তু তারা মিথ্যা বলে নিজেদের কর্মচারীদের কাছে, মিথ্যা বলে' ঠকায় সমস্ত দেশটাকে। এর আগাগোড়া একটা বিরাট মিথ্যা ছাড়া আর কী!

সবই বোঝে ও, কিন্তু কী বিপন্ন অবস্থা! শত্রু অতি শক্তিশালী, তার বিরুদ্ধে কী করবে ও? এই অন্যায় অসম সমরে হৃদয়টাকে ক্ষত-বিক্ষত করা ছাড়া কীই-বা করবার আছে ওর? নিরুপায় দুর্বলের প্রতিশ্রুতি, বোঝাবুঝি, ক্রোধ সবই যে বৃথা, ব্যর্থ। আজই হয়তো ও প্রতিজ্ঞা করল, যেমন করে হ'ক অত্যাচার অবিচারের হাত হ'তে ওনাকে রক্ষা ও করবেই, হপ্তা না ঘুরতেই দেখা গেল ও অক্ষম, যত শক্তিই থাক ওর দেহে ও দুর্বল, রক্ষা করতে পারে নি ও ওর ওনাকে শক্তিশালীর অত্যাচারের কবল হ'তে। একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে, ডিসেম্বর মাস, এতে ভিজে গিয়ে সমস্ত দিন সেই ভিজে পোষাকে ব্রাউনের সেঁত-সেঁতে গর্তে কাজ করা কথার কথা নয়; মজুর এরা, ছাতা বা ওয়াটারপ্রুফ থাকবার কথা নয়, নেই ও। ওনাকে চাদরে ঢেকে নিয়ে গিয়ে ইউরখিস ওকে বাসে তুলে দিয়ে আসে। ঘটনা বশে যে ভদ্রলোকরা এ পথটায় বাস চালায়, তাঁরা অন্যান্য ভদ্রলোকের মতই মুনাফা ছাড়া আর কিছু চান না জগতে। সরকার হ'তে আইন ক'রে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজন মত এক রুট হ'তে অন্য রুটে ট্রান্সফার (বদলী টিকিট) দিতে হবে; স্বভাবতঃই এতে ভদ্রলোকদের দু'এক পয়সা কম আদায় হয়; কাজেই তাঁরা চটে-মটে নিয়ম করলেন, দুটো রুটেরই সমান ভাড়া অগ্রিম দিলে তবে বদলী টিকিট দেবেন; তাতে বিশেষ সুবিধা হ'ল না; তখন তাঁরা নিয়ম ক'রে ফেললেন, খালি পয়সা দিলে হবে না, যাত্রীরা নিজে মুখফুটে না বললে কণ্ডাক্টাররা বদলী টিকিট দিতে পারবে না। পয়সা ফেরত দেবার অবশ্য প্রশ্নই ওঠে না। ওনাকে যেতে হবে দুটো রুট হ'য়ে। এটায় ট্রান্সফার পেলে তবে অন্যটায় যেতে

পারবে; ইউরদিস ওকে পয়সা দিয়ে দেয় সেই অনুপাতে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার মত মেয়ে ও নয়; আশা করে, ও পয়সা দিলেই কণ্ডাক্টর নিজে হ'তে ওকে বদলী টিকিট দিয়ে দেবে। কোথায়! কণ্ডাক্টরের দিকে চেয়ে ও বসে থাকে, ভাবে এখনই ওর দয়া হবে; নামবার জায়গায় এসে যায়, কণ্ডাক্টরের দয়া কিন্তু হয় না। নিজে হ'তেই এবার টিকিট চায়। কণ্ডাক্টরের আইনে নামবার সময় চাইলে তো হবে না, পয়সা দেবার সময় বলতে হ'ত। এই দিনে-ডাকাতির বিরুদ্ধে ওনা সাধ্যমত প্রতিবাদ করে। কণ্ডাক্টর ওর ভাষা বোঝে না, ওর প্রতিবাদের উত্তরে এক চোট গালাগাল দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়; গাড়ী ছেড়ে দেয়। এবার নিরুপায় ওনা কেঁদে ফেলে। পরের ষ্টপে গিয়ে গাড়ী থামে। আর বাড়তি পয়সা নেই ওর কাছে; সেখান হ'তে ফিরে দ্বিতীয় রুটের পথটা হেঁটে যেতে হয়; ভিজে চুপচুপে হ'য়ে যায় ও। সমস্ত দিন সেই ভিজে মাথায়, ভিজে পোষাকে চলে সেলাইএর কাজ।...সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরল তখন দাঁতে দাঁতে ঠোকা-ঠুকি লাগছে, থরথর করে কাঁপছে সারাটা দেহ, মাথায় পিঠে কামড়ে অসহ্য ব্যথা। শ্লেষ্মা বসে দুটো হপ্তা ভোগান্তির আর অন্ত থাকে না; কিন্তু তাই নিয়ে কাজেও যেতে হয় প্রতিদিন। প্রধানার ধারণা বিয়ের পরদিন ওনাকে তিনি ছুটি দেননি বলে সে তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট; ঐ ধারণাবশেই তিনি তার ওপর কঠোর হ'য়ে চলেছেন। ওনার ধারণা প্রধানা নিজে কুৎসিত, বৃদ্ধা এবং অবিবাহিতা বলে' অন্যের বিয়ে হওয়াটা পছন্দ করেন না। অসুখই হ'ক আর যাই হ'ক ছুটি ওনা পায় না।

এ রকম বিপদ অসংখ্য। এ সবের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা ওদের নেই। ছেলেগুলির শরীরও এখানে ভাল থাকছে না। বাড়ীর নীচে দিয়ে নালীর ব্যবস্থা নেই, আছে মস্ত একটা গর্ত। গত পনের

বছরের ময়লা জমে জমে সেটা একটা ময়লার পুকুর হ'য়ে গেছে। তার প্রভাবে শরীর কারও ভাল থাকতে পারে না। বাড়ী কেনবার সময় এ পুকুরের অস্তিত্ব ওরা জানতে পারেনি। রাস্তার কোণ হ'তে যে নীলাভ দুধ কিনে আনে তাতে কত বস্তু মিশিয়ে যে ডাক্তারী বিদ্যে কলান হয়, তার তত্ত্ব জানবার কথা নয় এই সব সাধারণ চাষীদের। দেশে ছেলেমেয়ের অসুখ করলে এলজবিয়েটা জড়িবুটি কুড়িয়ে আনত, তার রসে ভেজাল থাকত না। এখানে ছুটতে হয় ডাক্তারের কাছে, সেখানে ওষুধের চেয়ে ভেজালই বেশী। এই সব শিক্ষিত সজ্জিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা পয়সার জন্য মানুষের জীবন নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারে, এও ওদের জানবার কথা নয়। কী করে জানবে ওরা যে ওদের চা, কফি, চিনি, ময়দা প্রভৃতিতে রাসায়নিকের বিদ্যে কলান আছে? কী ভাবে জানবে যে কৌটার মটর-দানা তাম্র-ক্ষার দিয়ে রঙান, ফলের জ্যামে অ্যানিলাইন রঙ মেশান আছে? আর জানলেই বা কী করত ওরা। যেখানে ওরা বাস করে তার কয়েক মাইলের মধ্যে ঐ জাতীয় বস্তু ছাড়া আর কিছু পাবার উপায় নেই। সামনে নিদারুণ শীত। শীতের পোষাক এবং আরও কিছু বিছানা জোগাড় না করলেই নয়। এর জন্য কিছু টাকা জমাতে হবে; কিন্তু টাকা জমিয়েই বা কী লাভ ওদের? টাকা দিয়ে যে বস্তু পাবে তাতে থাকবে নতুন সুতোর সঙ্গে কুটি কুটি করে' ছেঁড়া-কাপড়ের ফের-পাকান-সুতোর আলগা বুনুনি; সে কাপড়ে এ অঞ্চলের শীত কাটে না; অথচ সে চীজ ছাড়া অন্য কিছু পাবারও তো উপায় নেই এখানে। অবশ্য চড়া দাম দিলে ভাল জিনিস পেলেও পেতে পারে। আবার তাতে বেশী ক'রে ঠকবার সম্ভাবনাও আছে! প্রেম বা পয়সা যাই দিক, গরীবের শীত কাটাবার মত গরম কাপড় ওরা পাবে না। তেদবিলাসের জনৈক বন্ধু হাসে; বিদেশ ঘুরে এসে অ্যাসল্যাণ্ড অ্যাবেনিউএর

একটা কাপড়ের দোকানে কেরানীর কাজ পেয়েছে; হাসতে হাসতে সে গল্প করে কীভাবে তার মালিক জনৈক গ্রাম্য ভদ্রলোককে নিয়ে একটু মজা করেছিলেন। খরিদ্দারটী কিনতে এসেছিল একটী খবর্দারী ঘড়ী; একই রকমের খবর্দারী-ঘড়ী ছিল দোকানে; দোকানদার একই রকমের দুটো ঘড়ী বের করে একটীর দাম বললে এক ডলার, অপরটার বললো পৌনে দু' ডলার। খরিদ্দার তাজ্জব বনে' যায়—দুটোই দেখতে একরকম। দোকানদার হেসে একটায় আদ্দেক দম দেয়, আর একটায় লাগায় পুরো; পুরো দমেরটা জোরে বাজে। খরিদ্দারের ঘুম গাঢ়; তিনি বেশী দামেরটাই কেনেন।

জনৈক কবি গেয়েছেন—

ভাষাহীন দুখে পুড়ে গেল যার যৌবন,
মূর্তি তাহার মহান হয়েছে, গভীর হয়েছে মন।

রিক্ত নিঃসম্বল বঞ্চিতদের লক্ষ্য করে হয়তো কবি একথা লেখেন নি। দারিদ্র্যের মত তিক্ত নিষ্ঠুর অথচ এত তুচ্ছ, কদর্য, অবমাননাকর বস্তু—এতে মহত্ত্বের বা মর্য্যাদার একটা স্পর্শ পর্যন্ত লাগে না—এ নিয়ে কি কাব্য হয়? কবিরা ব্যর্থ প্রেমিকের হৃদয় নিয়ে কারবার করতে পারেন, এই সব হতভাগ্যের হৃদয় তাঁদের বেসাতির বাইরে, তাঁদের শব্দ-ভাণ্ডারে হয়তো এদের জ্বালা প্রকাশ করবার উপযোগী শব্দ নেই। কোন পরিবার অতি কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে একটা বাড়ী নিলে, নিয়ে দেখলে সেটা কীট পতঙ্গ মশা মাছি ছারপোকা আর ইঁদুরে ভরা, মেঝের নীচে হ'তে ওঠে পচা ময়লার বিকট দুর্গন্ধ, ভেজাল খাবারের জন্য যকৃত যায় পচে, অমানুষিক পরিশ্রমে যৌবনের শক্তির সঙ্গে হৃদয়ের সকল সুকোমল বৃত্তি শুকিয়ে যায়, ছেলেদের হয় যক্ষ্মা—এই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা কবিতা কোন কাব্য-প্রেমিক পছন্দ করবেন কি?

পোকামাকড়ের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে এরা পঁচিশ সেণ্ট দিয়ে

কীটনাশক একটা চূর্ণ কিনে আনে, তাতে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মাটি মেশান। এটা ওদের জানবার কথা নয়। কোন আরশুলা এ মাটি খেয়ে যদি জল খায় তাহ'লে সে মরবে—এতগুলি অঘটন বেশী ঘটে না। এদের বাড়ীর পোকামাকড় মরল না, অনর্থক পয়সাটা খরচ হ'ল; দুর্ভাগ্যের জন্য দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জীবনের বাকী দিন ক'টি পোকামাকড়ের সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়াকেই বিধিলিপি বলে মেনে নিলে ওরা।

এর ওপর আছে বুড়ো অ্যাণ্টেনাস। শীত এসে গেছে। গরম জামাকাপড়ের বালাই নেই; ওর কর্মকক্ষ অন্ধকার, ঠাণ্ডা—সেটাকে গরম রাখবার কোন ব্যবস্থা নেই, নিঃশ্বাস ফেললে সেটা নাকের বাইরে এসে ভাপের মত জমে যায়—সমস্ত দিন কর্মচারীরা নিজেদের নিঃশ্বাস দেখে। কাসি ওর বাড়তেই থাকে; শেষে এমন হ'ল যে কাসি আর থামেই না—সহানুভূতি জাগে না আর, কাছে থাকলে বিশ্রী লাগে। কাসির ওপর দেখা দিল আর এক ফ্যাসাদ। যে ঘরটায় কাজ করে ও, তার মেঝেটা সব সময়ই রাসায়নিক পদার্থে ভিজে থাকে; সে পদার্থে জুতোর তলা ক্ষয়ে যায়, তারপর ক্ষয়ে যায় আঙুলের ফাঁকগুলো; বিশ্রী ঘা হয়। অ্যাণ্টেনাসেরও তাই হয়েছে। আশা করে ও, হয়তো সাময়িকভাবে রক্ত খারাপ হয়েছে—কিন্তু সহকর্মীরা ওর ভুল ভেঙ্গে দেয়; বলে এটা এখানে স্বাভাবিক ঘটনা, এখানে যে কাজ করবে তারই হবে, দু'দিন আগে আর পরে। এ ক্ষত জীবনে সারে না, ওরই জন্য আগে কাজ যায়, তারপর আঙুলগুলো খসে পড়ে, শেষে প্রাণটাও যায়; তবে প্রথম অবস্থায় ছাড়লে আঙুলগুলো বেঁচে যেতে পারে। বর্তমানের বিভীষিকার আতঙ্কে ভয়ানক ভবিষ্যৎকে জাগ্রত করতে অ্যাণ্টেনাস নিতান্তই নারাজ; বর্তমানে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ওর অজানা নয়, এবং এই কাজ পেতে ওকে কী হীনতা স্বীকার করতে হয়েছে,

সেও ও ভোলেনি ; খসে যাক পা, চাকরী তবুও ছাড়বে না। পায়ে পচা কানির পটি বেঁধে কাজে যায়, খোঁড়ায়, কাসে, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ; একদিন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল কতকগুলো হাড়ভরা একটা চামড়ার থলির মত। সহকর্মীরা ওকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয় শুকনো জায়গায় ; ছুটি পর্যন্ত পড়ে থাকে সেখানে ; সন্ধ্যার পর দুজন সহকর্মীর কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ী ফেরে। সেদিন হ'তে শেষদিন পর্যন্ত ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও আর উঠতে পারে না ও। পড়ে পড়ে কাসে। হাড়গুলো একমাত্র আবরণ চামড়াটাকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—দেখলেও শরীর শিউরে ওঠে। একদিন রাত্রে ওর মুখ দিয়ে রক্তের ছোট্ট নদী বেরিয়ে আসে। ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে পরিবারটা। আধ ডলার ফী দিয়ে ডাক্তার ডাকে, আধ ডলারের বিনিময়ে তিনি খালি শুনিয়ে যান, করবার আর কিছু নেই ; তবু ভাগ্য ভাল যে ভদ্রলোক বুড়োর সামনেই তাঁর সিদ্ধান্তটা প্রকাশ করেন নি ; বুড়ো তখনও আশায় আশায় আছে—আবার ভাল হবে ও, ভাল হ'য়ে হেঁটে নিজের কাজে যাবে। কোম্পানী খবর [illegible]য়েছে অর্থাৎ ইউরঘিস বুড়োর এক সহকর্মীকে কিছু পয়সা [illegible]য়ে বলা করিয়েছে—অ্যান্টেনাসের জায়গা খালি রাখা হবে ; ভাল হ'য়ে ফিরে গেলেই তার কাজ তাকে দেওয়া হবে। বুড়ো তাই বিশ্বাস করে, বিশ্বাস ক'রে খুশী হয়। তারপর আরও তিন দিন রক্তবমি করে। এইভাবে ক'দিন চলবার পর একদিন সকালে উঠে ওরা দেখে বুড়োর দেহটা শক্ত সোজা শীতল হ'য়ে গেছে। দিন কাটছে বড় কষ্টে, বড় অভাবে। দেশের মত অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করা চলবে না। এলজবিয়েটার বুক ভেঙ্গে যায়, তবু উপায় নেই—অতি অল্পে, একেবারে যেটুকু না করলে নয় সেইটুকুই ওরা করবে। এদেশ সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান এ ক'মাসে ইউরঘিসের হ'য়েছে ; পুরো একটা রবিবার ও

কাটিয়ে দেয় পুরুতের সঙ্গে স্রেফ্ দরদস্তুর ক'রে, দরদস্তুরের সাক্ষী রাখে, যাতে এ ভদ্রলোক আবার কাজের পর প্রতিটী খুঁটিনাটির জন্য আলাদা আলাদা মূল্য না ধরতে পারেন। পঁচিশটী বছর অ্যান্টেনাস রুদকস ও তার এই ছেলে লিথুয়ানিয়ার জঙ্গলে একত্রে বাস করেছে, আজ সে-চির-সাথী পিতাকে এইভাবে বিদায় দিতে ইউরগিসের বুক ফেটে যায়; কিন্তু এ আমেরিকা; শোকোচ্ছ্বাস করতে গেলে এখানে যে মূল্য ওকে দিতে হবে, তাতে নিজের অন্ত্যেষ্টি এগিয়ে আসতেও দেরী লাগবে না; যে দু' চারটে মন্তর না হ'লে নয়, তাই বলিয়ে ও কাজ সারে।

ওদের ওপর দুরন্ত শীত এসে পড়ে। দেশের অরণ্যে ওরা দেখেছে প্রতিটী শাখাপ্রশাখা একটু প্রাণদ রবিরশ্মি পাবার জন্য কী ভাবে মাথা তোলবার সংগ্রাম চালায়; অনেক শাখাই পরাজিত হয় এ সংগ্রামে। তারপর আসে শীত, তীক্ষ্ণ প্রবল বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে চলে তুষার ও শিলাবৃষ্টি, দুর্বল শাখাপ্রশাখা সে আঘাতে ঝরে' ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। এই প্যাকিংশহরেও শীতের আগে হ'তে বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করে গাছের ডালপালা নয়, মানুষ; দুরন্ত শীতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বাঁচবার কী প্রাণান্তকর আগ্রহ; তবু মুঠো মুঠো মানুষ ঝরে' পড়ে শীতের দমকা হাওয়ায়—ওরা বলে সময় হয়েছিল, গেল। প্যাকিং-শহরের যন্ত্রটার বিরাট চক্র অবিরাম আবর্তিত হ'চ্ছে, এরা তার পরিবিধিস্থিত দন্তমাত্র; এরা ক্ষয়ে যায় ফুরিয়ে যায়, কলের অংশ বদলাবার সময় আসে; শীত এলে অনেক দাঁতই একে একে হারিয়ে যায় যন্ত্রটার, মালিকরা সেখানে বিদেশ হ'তে আনা শক্ত নতুন দাঁত লাগিয়ে দেয়—চাকা ঘোরে। দুর্বল, অশক্ত, পুষ্টিহীন দেহের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে হানা দিয়ে ফেরে নিউমোনিয়া আর সান্নিপাতিক জ্বর; যক্ষা তার বাৎসরিক খাজনা নেয় একটু বেশী হারে; অনাহারক্লিষ্ট, ক্লিষ্ট পেশীদের খোঁজে হানা দেয় মহানিষ্ঠুর শীতল হাওয়া ও তুষারঝটিকা। দু'দিন

আগে আর পরে—যন্ত্রটার পরিধিটার এক একটা দুর্বল দাঁতকে আর কাজে লাগতে দেখা যায় না; তার জন্ম শোক নেই, অপেক্ষা করা নেই, আর একজনকে সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবেই কাজ পায় নতুন মজদুররা।

এখানে নতুন মজদুর হবার জন্য লোক আছে হাজারে হাজারে। প্রতিটি সকাল এই সব কপর্দকহীন বুভুক্ষু হাজারে হাজারে অপেক্ষা করে কারখানাগুলোর ফটকে ফটকে, বাঁচবার একটু সুযোগলাভের জন্য ওরা অপেক্ষা করে দিনের পর দিন, গুঁতোগুঁতি করে পরস্পরের মধ্যে। ঠাণ্ডা, হাওয়া বা বরফ কোন তারতম্য করতে পারে না ওদের চেষ্টার; সূর্যোদয়ের দু' ঘণ্টা এবং কাজ সুরু হবার এক ঘণ্টা আগে হ'তে ভীড় করে ওরা বিভিন্ন ফটকের সামনে। কারও নাক কান জমে যায়, কারও জমে যায় হাত পা, কারও-বা আগাগোড়া সমস্ত দেহটাই জমে যায়; বাকীরা তবু আসে। না এসে কী করবে, যাবার যে অন্য কোন জায়গা নেই ওদের। একদিন ডারহাম হ'তে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল, বরফ কাটবার জন্য দু'শো লোকের প্রয়োজন। সারাটা দিন যত নিরাশ্রয় বুভুক্ষু আসে আশেপাশের দু'শো বর্গ[illegible] হ'তে বরফ-ঝড় আর বরফ-কাদা ঠেলে। সে রাত্রে ও অঞ্চলের স্টেশনে এসে ওরা ঢোকে শ' শ'এ; ঘর বারান্দা সব ভর্তি হ'য়ে যায়, গাদা-গাদি ক'রে মানুষ পড়ে থাকে। শেষে পুলিশ স্টেশনের ফটকও বন্ধ ক'রে দেয়; বাইরের যারা বাইরেই থাকে ওপরে নীচে বরফ নিয়ে—যারা পারে বাঁচে, যারা সইতে পারে না এ শৈত্য, মরে। পরের দিন ভোর হ'বার অনেক আগে ডারহামের ফটকের সামনে গুতোগুঁতি করে হাজার তিন উমেদার। কোম্পানী হ'তে পুলিস পাঠায় "দাঙ্গা" থামাবার জন্য। ডারহামরা ওর মধ্যে হ'তে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কুড়িজন বেছে নেয়। তারা চেয়েছিল কুড়িজনই, "দু'শোটা" ছাপার ভুল!

শহরের মাইল চার পূর্বে একটা হ্রদ আছে; সেখান হ'তে শুষ্ক তুষারশীতল হাওয়া বয়ে আসে শহরের ওপর। তাপমানযন্ত্রে পারদ নেমে আসে শূন্যেরও দশ-বার ডিগ্রী নীচে; রাত্রে বাড়ীগুলোর নীচে-তলার জানালা পর্যন্ত বরফে ঢেকে যায়—এত বরফ পড়ে। আমাদের পরিচিত পরিবারটী যে পথ দিয়ে বাড়ী ফেরে বা কারখানায় যায় সেটী শহরের কাঁচা রাস্তা, অর্থাৎ নর্দমারও অধম; খালখন্দ নালা ডোবায় ভর্তি; গ্রীষ্মে একটু বৃষ্টি হ'লেই হাঁটু পর্যন্ত জলকাদা ঠেলে যাতায়াত করতে হয়। রাত্রিশেষের অন্ধকারে ওরা এই পথে কারখানায় যায় কোমর পর্যন্ত বরফ ঠেলে, আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ী ফেরে একই অবস্থায়; বরফের তলে খাল খন্দে পা ঢুকে যায়। কাপড় কম্বল কাঁথা যা-কিছু সম্বল সবই ওরা জড়িয়ে নেয় গায়ে, কিন্তু ভেতরের অপার ক্লান্তির ওপর জড়াবার কিছু তো নেই ওদের। মহাক্লান্তিতে অনেকেই তাই ভেঙ্গে পড়ে বরফঢাকা পথের ওপর, ঘুমিয়ে পড়তে দেরী হয় না—পরম প্রশান্তির সে নিদ্রা আর ভাঙ্গে না। দেহটা থেকে যায় বরফের নীচে।

পুরুষদেরই যেখানে এই হাল, সেখানে মেয়ে-শ্রমিক বা বালক-শ্রমিকদের অবস্থা সহজেই কল্পনীয়। রাস্তায় বাস চললে এবং খরচ করবার মত পয়সা থাকলে কেউ কেউ বাসে যায়; কিন্তু অধিকাংশেরই অবস্থা বাসভাড়া দেবার মত নয়। ক্ষুদে ষ্ট্যানিসলোবাস রোজগার করে ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ সেণ্ট; বাসের দু'মাইলের ভাড়াও পাঁচ সেণ্ট। এটা খরচ করতে ওর বড় মায়া হয়, কষ্ট হয়। ছেলেরা কারখানায় আসে কান পর্যন্ত আলোয়ান জড়িয়ে, তবুও হিম-দুর্ঘটনা ঘটে। একদিন ষ্ট্যানিসলোবাসের সহকর্মী ছেলেটি চ্যাচাতে চ্যাচতে এসে কাজের ঘরে ঢুকলো। একজন বয়স্ক শ্রমিক বিনা বাক্যব্যয়ে তার কানদুটো ঘষতে লাগলো। কানদুটো জমে পাথর হ'য়ে গেছে ততক্ষণে; দু'একবার

রগড়াইতেই সে দুটো টুপটুপ ক'রে খসে পড়ে। সেই হ'তে ষ্টানিস-লোবাসের একটা শীতাতঙ্ক হ'য়ে গেছে। ভোরে কারখানায় যেতে চায় না, ঠেলেঠুলে পাঠাতে হয়; যাবার আগে একচোট কাঁদে। ওকে "ভাল ছেলে" বানাবার পন্থা ওরা খুঁজে পায় না, বকুনি মারধোর কিছুতেই কিছু হয় না; ঐ ভোরে বাইরে যেতে হবে শুনলেই আঁৎকে উঠতে থাকে বেচারা। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হ'ল ও যাবে আসবে ইউরঘিসের সঙ্গে। খুব বেশী বরফ পড়লে, বরফের নীচে কোথাও খালখন্দে ওর ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে বলে ইউরঘিস ওকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যায় আবার কাঁধে ক'রেই নিয়ে আসে। ইউরঘিসকে এক-একদিন অনেকখানি রাত্রি পর্যন্ত কাজ করতে হয়; সে সব দিন বাচ্চার কষ্টের আর অন্ত থাকে না। অপেক্ষা করবার কোন জায়গা নেই; হয় কোন দোরের নীচে বা হত্যামঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া বেচারার অন্য উপায় থাকে না। ক্লান্তিতে শীতে ওর ঘুম পায়, কিন্তু ঘুমুলেই একেবারে জমে যাবে এই ভয়ে ঘুমুতেও পারে না।

কি হত্যামঞ্চ কি অন্য জায়গা, কারখানার যে সব ঘরে মজু[illegible] কাজ করে তার কোনটাতেই তাপতৈরীর ব্যবস্থা নেই; এ[illegible] তুষার-পাতের মধ্যে মাঠে কাজ করা। মাংস রান্না হয় যেখানে সেখানকার মজদুররা গরম পায়, কিন্তু বিপদ তাদেরই সব হ'তে বেশী। গরমে থাকে বলে গায়ে বেশী জামা রাখে না, অথচ হিমশীতল বারান্দা পেরিয়ে এঘর ওঘর করতে হয়। হত্যামঞ্চকক্ষে মজদুরদের গায়ে তাজা রক্ত লাগবেই, গায়ে ঠেকতেই তা বরফ হ'য়ে যায়; থামে হেলান দিলে থামের সঙ্গে জমে যেতে হয়, ছুরির ফলায় হাত ঠেকলে হাতের চামড়া সেখানেই লেগে থাকে। এখানকার মজুররা খবরের কাগজ আর চট দিয়ে পায়ে পটি বাঁধে। তাজা রক্তে সেগুলো ভিজে যায়, চটে শুষে-যাওয়া রক্ত বরফ হ'তে দেরী হয় না; চট কাগজ আবার রক্ত শোষে,

আবার শোষা রক্ত বরফ হ'য়ে যায়। এমনি সকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত বহুবার হ'য়ে চলেছে। বরফে বরফে পা দুটো রাততক্ হাতীর পায়ের মত গোদা গোদা হ'য়ে যায়। অফিসাররা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলে ওরা গোরুর গরম দেহের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেয় একবার ক'রে, অফিসার ওখানে না থাকলে গরম জলের কলে পা দুটো ধুয়ে আসে। ছুরিদারদের দস্তানা পরবার হুকুম নেই উপায়ও নেই—এইটেই বোধ হয় সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা; খোলা হাত ক্রমে হিমে ঢাকা পড়ে, ধীরে ধীরে অবশ হ'য়ে আসে; তারপর কা'রও কা'রও হাত জমে পাথর হ'য়ে যায়। তখন সে হাত ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। গরম জলের তাপ আর সন্ত মারা গোরুর দেহের উত্তাপে ঘরখানা কুয়াসাচ্ছন্ন হ'য়ে যায়; আড়াই হাত তিন হাত দূরের জিনিষ ভাল ক'রে দেখা যায় না; তা না যাক, ছুরি হাতে মহাবেগে ওরা ছুটোছুটি করে। দু'চারজন তাতেই খতম হ'য়ে যায়; কিন্তু গোরুর চেয়ে বেশী মানুষ মরা উচিত ছিল; মরে না, এই আশ্চর্য।

দুপুরের অবকাশে বসে' খাবার একটু জায়গা থাকলে, এ সব কষ্টকে ওরা গায়ে মাখত না। কিন্তু এখানে তার কোন বন্দোবস্ত নেই। দুপুরের খাওয়াটাই ওদের মোটা খাওয়া; গ্রীষ্মে ওরা বাইরে বসে খায়; এখন খায় কাজের ঘরে; ইউরঘিসকে পক্ষে হত্যামঞ্চে, দুর্গন্ধ, ময়লা, ঠাণ্ডার মধ্যে বসে খেতে হবে, নয় অন্যান্য বহু মজদুর যেমন যায় তেমনি একছুটে বাইরের কোন মদের দোকানে ঢুকতে হবে। কারখানার আশেপাশে যেখানেই একটু জায়গা মেলে, সেখানেই সারি সারি মদের দোকান; দোস্তের মত বাহু বিস্তার ক'রে যেন তারা এদের সাদর আহ্বান জানায়। কারখানার পশ্চিমটায় অ্যাশল্যাণ্ড অ্যাভেনিউ—সেখানে মদের দোকানের বিরামহীন একটা সারি আছে এরা তার নাম দিয়েছে "হুইস্কি সারি"। উত্তরের ৪৭ নং রাস্তায় প্রতিটী বাড়ীতে

ছ' সাতটা ক'রে মদের দোকান আছেই; এ দুটো রাস্তা যেখানে মিশেছে সেখানে মদের দোকানের রাজত্ব চলেছে—জায়গাটার নাম রাখা হয়েছে "হুইস্কি স্থান"। উনষাট ষাট বিঘে জমির ওপর আছে ছোট একটা শিরিষের কারখানা আর দু'শো মদের দোকান।

নামই কত তাদের—"ঘরের মজলিস," "আরাম প্রান্ত", "আনন্দ প্রাসাদ", "স্বপ্ন দুর্গ", "প্রেম কানন" "গৃহস্থলী" ইত্যাদি ইত্যাদি। দোকানগুলোর বাইরে প্রাত্যহিক খাবার তালিকা টাঙান, তাও বিভিন্ন ভাষায়; "স্বাগত"-তো আছেই। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব নাম যাই হ'ক, সকলেরই একটা সাধারণ নাম আছে, "ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়"। ইউনিয়ন থাক বা না থাক, গরম জলন্ত চুল্লি আছে, চুল্লির পাশে পাশে আছে চেয়ার, বন্ধু সহকর্মী, হাসি-ঠাট্টা গালগল্প, সবই মজদুরদের জন্য; সর্ত মাত্র একটা—মদ খেতেই হবে। ভেতরে গিয়ে মদ খেতে না চাইলে, বের ক'রে দিতে ওদের দেরী হয় না; বের হ'তে দেরী করলে, বীয়ার-বোতলের ঘায়ে মাথাটা দু' ফাঁক হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। অলিখিত আইনটা বা না-বলা এই প্রথাটা এরা সানন্দে মানে; ওদের ধারণা, এ বাবদ খরচটা ফাউয়ের মতই লাভ-দায়ক; এক গেলাসের বেশী সাধারণতঃ ওরা খেতে পারে না; কিন্তু সামান্য ঐ এক গেলাসের জোরে ওরা পেট পূরে সুস্বাদু খাবার খেয়ে নিতে পারে। কার্যতঃ কিন্তু সেটা হয় না। বন্ধু এসে একজনকে এক গেলাস খাওয়াল, বদলে বন্ধুকেও খাওয়াতে হয়। খাওয়াবার সময় নিজেরও এক গেলাস ক'রে হ'য়ে যায়। আবার হয়তো আর একজন দিল্‌কে দোস্ত এল; মুখ বুজে বসে থাকা যায় না; আবার চলে কয়েক গেলাস। মনে মনে যুক্তি আসে, অত খাটতে গেলে একটু আধটু মদ না খেলে চলবে কেন? অতখানি মদ ভেতরে থাকলে ফেরবার সময় আর কাঁপতে হয় না; একঘেয়ে কাজে আর যেন জানোয়ার বনতে

হয় না। নিজের ভাবনা সাধারণতঃ আসে না, এলে তাতে মনমরা ক'রে ফেলতে পারে না—জীবনটা সহনীয় মনে হয়। বাড়ী ফেরবার পথে আবার কাঁপুনি ধরে, আবার দু' একটা দোকানে ঢুকে দু'চার গেলাস না টানলে ঐ ঠাণ্ডায় বাড়ী ফেরাই অসম্ভব মনে হয়; দোকানে গরম খাবারও পাওয়া যায়; কাজেই নৈশভোজনের জন্য দেরীতে বাড়ী ফিরলে বা একেবারে না ফিরলেও কোন ক্ষতি হয় না। তারপর তার স্ত্রী তাকে খুঁজতে বেরুল, তারও অসহ্য ঠাণ্ডা বোধ হ'ল; সঙ্গে ছেলে-পুলে থাকলে তাদেরও ঠাণ্ডা অসহ্য হয়; দোকানে দোকানে থেমে তারা দেহ গরম ক'রে নেয়। এইভাবে সমগ্র পরিবার মাতাল হ'য়ে যায়। মদের আকর্ষণ খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর মত প্রবাহিত হ'চ্ছে এদের ঠিক পাশ দিয়ে, এদের অনেকেই ভেসে যাচ্ছে তাতে কুটোর মত। অদৃশ্য বিধাতার মত ওদের এই ভেসে যাওয়ায় কারখানার মালিকরা সাহায্য করেন—তাঁরা নগদ টাকা বা নোটে মজুরী না দিয়ে, দেন চেকে। মজদুরদের পক্ষে চেক ভাঙ্গান এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। মদের দোকানে গেলেই কিন্তু চেক ভাঙ্গান হ'য়ে যায়, অবশ্য এ অনুগ্রহের জন্য দু' এক গেলাস মদ কিনতে হয়।

দুপুরের এক গ্লাস ছাড়া ইউরগিস আর মদ খায় না; দোকানে ঢুকতে গেলেই ওনার কথা মনে পড়ে, ও ঢুকতে পারে না। বন্ধুদের কাছে হ'তে জবরদস্তী করে দু'এক গেলাস আদায় করা, নিজে জুলুম ক'রে তাদের না খাওয়ালে কি সাথী, না ইয়ার? সহকর্মীরা ওকে দেখতে পারে না। দুপুরে তাই কোন সেলুনেই ও স্বাগতঃ নয়, এক সেলুন হ'তে আর এক সেলুন ওকে ছুটোছুটি করতে হয়। কাজের শেষে ওনা ও স্ট্যানিসলোবাসকে নিয়ে বাড়ী ফেরে, অনেক সময় ওনাকে বাসে চাপিয়ে দেয়। বাড়ী ফিরেও হয়তো বিশ্রাম নেই, থলে কাঁধে কয়লা কি অন্য কিছু কিনতে বেরুতে হয়; পা টলে, ও কিন্তু 'না' করে না,

টলতে টলতে গিয়ে সওদা ক'রে আনে। বাড়ী আর আকর্ষণীয় মনে হয় না—অন্ততঃ এই চরম শীতে তার সমস্ত মোহ যেন বরফ চাপা পড়ে। একটী মাত্র চুল্লি কিনতে পেরেছে ওরা, তাও ছোট; রান্না-ঘরেই সেটা রাখতে হয়, কিন্তু এত ছোট্ট চুল্লি দিয়ে রান্নাঘরখানাও পুরো গরম হয় না। দিনের বেলা এলজবিয়েটা এবং ইস্কুল না গেলে ছেলেরাও শীতে হী হী করে; সন্ধ্যার পর চুল্লিটুকুর ধারে সকলে ঠাসাঠাসি ক'রে বসে; কোলের ওপর খাবার রেখে খেয়ে নেয়; ইউরঘিস আর জোনাস একই পাইপ হ'তে কয়েক টান তামাক টেনে নেয়; তারপর গুঁড়ি মেরে সুড় সুড় ক'রে সব বিছানায় ঢুকে পড়ে; কয়লা বাঁচাবার চেষ্টায় চুল্লিটা নিবিয়ে দেয়। পোষাক আসাক যা কিছু আছে সবই ওরা পরে' শোয়, যে কোন বস্তুকে বিছানা নাম দেওয়া যায় তাই হয় চাপায় নয় নীচে পেতে নেয়; ফালতু কাপড় ন্যাকড়া সবই লেপের ওপর চাপিয়ে দেয়—তবু শীত ভাঙ্গে না। ছেলেরা জাপটাজাপটি ন্যাপ্টা-লেপ্টি ক'রে শোয়, তবু গরম ধরতে চায় না লেপের ভেতরটা; পাশের মানুষ মধ্যে যেতে চায়, গুঁতোগুঁতি করে; রীতিমত লড়াই লেগে যায়। এই পুরোনো বাড়ীর ফাঁক ফাঁক তক্তাবসান দেওয়াল শীত রুখতে পারে না; দেশে ছিল মোটা কাঁঠের কুঁদোর দেওয়াল, তার ভেতরে বাইরে মাটির পলেস্তারা করা; এখানকার এ বাড়ী শীতকে যেন ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়—মনে হয় এ শীতের প্রাণ আছে, পিশাচের মত সে এদের ওপর চেপে বসে থাকে সারারাত। কনকনানিতে মাঝরাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে যায়—তখন হয়তো অট্টহাস্য ক'রে পিশাচটা বাইরে দাপাদাপি করছে, নয়তো নিঃশব্দে চেপে বসছে সব কিছুর ওপর—অন্ধকারে মনে হয় এ মৃত্যু—মৃত্যুর গহ্বরে ঢুকে গেছে ওরা। ফাটলগুলোর ভেতর দিয়ে সে যেন যমের মত হাত বাড়ায়, ওরা ভয়ে কুঁকড়ে লেপের আরও ভেতরে, আরও ভেতরে ঢুকতে চায় ওর স্পর্শ হ'তে বাঁচবার আশায়; কিন্তু

অব্যাহতি নেই, ধরবেই ও। আসতেই থাকে সে অবিরাম, অবাধ গতি—বিভীষিকার গহ্বর হ'তে মুক্তি পাওয়া ভূতের মত ছুটে আসে হা হা হা রবে; ছুটে আসে নৈসর্গিক প্রাগৈতিহাসিক অস্তিত্বময় বিরাট নিষ্ঠুর মৃত্যুর মত; এ যেন আজ পর্যন্ত অত্যাচারবিধ্বস্ত অসংখ্য মানুষের ক্ষমাহীন আত্মার সর্বগ্রাসী আক্রোশ মূর্তি ধরে' এগিয়ে আসে। এর বজ্রমুষ্টি এগিয়ে আসে নীরবে কখন কখন; শিউরে কুঁকড়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে' বাঁচতে চায় ওরা—কিন্তু উপায় নেই, সকলের মধ্যে থেকেও সকলকে পড়তে হয় ওর কবলে একা একা। সকলে চীৎকার করলেও সাহায্য করতে এ দুনিয়ার শক্তিশালীরা কেউ এগিয়ে আসবে না—কোথাও হ'তে কৃপা মমতা কিছু নেই। এইভাবে বাঁচবার চেষ্টা চলে ভোর পর্যন্ত; উঠে আবার চলে সকলে খাটতে; প্রতিদিনই আগের দিনের চাইতে আর একটু বেশী দুর্বল বোধ করে ওরা; ক্লান্ত পাদুটোকে একটু শক্ত ক'রে কাদায় আটকে আটকে এগিয়ে যায় ওরা কারখানার দিকে—এগিয়ে যায় কাণ্ড হ'তে ঝরে' পড়বার দিনটার দিকে।

মরণসম এ শৈত্যের মধ্যেও আশার অঙ্কুরের উদ্গম ব্যাহত হয় না। এর মধ্যে সুরু হ'য়ে যায় মেয়ারিজার দুঃসাহসিক এক অভিযান।

ব্যক্তিটী বেহালাবাদক কুস্তস্লেইকা; অত হাল্কা ছোট্ট বেঁটে খাটো রোগা দুবলা মানুষের সঙ্গে বিপুলকায়া শক্তিশালিনী মেয়ারিজার যে প্রেম হ'তে পারে, লোকে বিশ্বাসই করতে পারে না। তবু সেই অসম্ভবই ঘটে যায়। লোকে হাসাহাসি করে। বিয়ের রাত্রে ট্যামস্তসিয়স ওর শক্তির প্রাচুর্যে অভিভূত হ'য়ে পড়ে—একটা মেয়েলোকের গায়ে গলায় এত জোর! চলনে বলনে সাক্ষাৎ ভয়ঙ্করা। পরে ও আবিষ্কার করে গায়ে গলায় মেয়ারিজার যত শক্তিই থাক, অন্তরে ও শিশু। সেদিন হ'তেই সম্ভবতঃ ও প্রেমে পড়ে। মেয়ারিজা ওকে

বগলদাবা ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে পারে দু' ক্রোশ রাস্তা—ওর এই দুর্বলতাই হয়তো মেয়ারিজাকে আকৃষ্ট করে ওর দিকে। কিছুদিন হ'তে কুস্তস্লেইকা রবিবারের বিকেলে নিয়মিত ওদের বাড়ী আসতে থাকে। নিরালায় মেশবার জায়গা নেই বাড়ীতে, তা না থাক, সকলের সঙ্গে রান্নাঘরেই বসে টুপিটা হাঁটুর ওপর ধরে। একসঙ্গে দু'চারটা কথার বেশী বলতে পারে না, মুখটা বারবার রাঙা হ'য়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ইউরঘিস ওর চিরাচরিত হৃদ্যতার সঙ্গে বলে, আরে ইয়ার, তোমার ব্যায়লা বাজিয়ে শোনাও না একটু! আর অনুরোধের প্রয়োজন হয় না। বেহালাটি সযত্নে বের ক'রে সুরকার সুর তোলে তার যন্ত্রে; সঙ্কোচ কেটে যায়, মুহূর্তমধ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তার মুখ; লুপ্ত হ'য়ে যায় ঘরের অন্যান্য সকলে—থাকে শুধু ও আর ওর মেয়ারিজা; অবস্থাটা মেয়ারিজার পক্ষে একটু অস্বস্তিকর হ'য়ে ওঠে—কুস্তস্লেইকা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে সুরের মাধ্যমে বলে চলে ওর অন্তরের আবেদন। বিচিত্র বস্তু এই সঙ্গীত, মেয়ারিজাও আরক্তমুখে চোখ নামায়। অন্তরের কানে কী ব্যথার কথা যে কয়ে যায় এ সুর, এলজবিয়েটা জানে না; অথচ হৃদয় তার কোমল হ'য়ে আসে, গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অবিরল অশ্রুধারা। ছেলেমেয়েগুলি অবাক হ'য়ে চেয়ে শোনে মানুষের অদ্ভুত আবিষ্কার এই সঙ্গীত। এতগুলি অজ্ঞ মানুষ একসঙ্গে মানবাত্মার পরমানন্দ ও অব্যক্ত বেদনার জগতে প্রবেশের অধিকার পায়—বড় বিস্ময়কর লাগে ইউরঘিসের কাছে।

এই বন্ধুত্ব হ'তে বস্তু, বাস্তবিক লাভ হয় মেয়ারিজার। ট্যামস্ত-সিয়সকে বড় বড় ভোজে কাজে নিমন্ত্রণ করে বাজানর জন্য, মোটা টাকা দেয় তার জন্য; আবার অনেকে ওর ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে বন্ধু-ভাবে এমনিই আমন্ত্রণ জানায়—তারা ভাল ক'রেই জানে যে ভালমানুষ ট্যামস্তসিয়স তার যন্ত্রটা না নিয়ে যাবে না; খাওয়া-দাওয়ার পর একবার

অনুরোধ করলেই ও বাজাবে, তখন বিনা খরচে বাজনার তালে তালে নাচতে পারবে তারা। একবার এমনি একটা ভোজে ও মেয়ারিজাকে ওর সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করে ভয়ে ভয়ে; কিন্তু একবার বলতেই মেয়ারিজা রাজী হ'য়ে যায়। তারপর হ'তে যন্ত্রী আর কোথাও একা যায় না, যুগলে যায়। বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হ'লে গুণী এদের সমস্ত পরিবারটিকেই সঙ্গে নিয়ে যায়। একা গেলে মেয়ারিজা পকেট-ভর্তি চকোলেট, স্যাণ্ডউইচ্, মিঠাই নিয়ে আসে ছেলেদের জন্য, আর সকলের জন্য আনে নিজে পেট পূরে যে সব জিনিষ খেয়ে এসেছে তার অফুরন্ত গল্প। অন্য মেয়ে বা খুব বুড়ো পুরুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে ও নাচতে পারে না; ফলে ভোজে গিয়ে অধিকাংশ সময় ও ভোজের টেবিলেই কাটিয়ে দেয়। ট্যামস্তসিয়সের উত্তেজনাপ্রবণ মন সামান্যতেই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; কোন অবিবাহিত পুরুষ মেয়ারিজার মেদবহুল কটিদেশ বেষ্টন করলেই ট্যামস্তসিয়সের সুর কেটে যায়, ঐক্যতানেরও গয়া হ'য়ে যায়।

সমস্ত হপ্তা নিরানন্দ একঘেয়ে খাটুনির পর শনিবারের রাত্রে এই রকম আমোদ-আহ্লাদের একটু সুযোগ পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়—অন্ততঃ মেয়ারিজার পক্ষে। বড় গরীব ওরা, বড় বেশী খাটতে হয় ওদের—অন্য লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার না আছে ওদের অবস্থা, না অবসর। খালি ওরা কেন, প্যাকিংশহরের অধিকাংশ মজদুরেরই এই অবস্থা। তাদের পরিচিতের সংখ্যা খুবই কম; আশেপাশের দু'চার ঘরের লোক পরস্পরকে চেনে, আর বড় জোর যে সব দোকান হ'তে ওরা জিনিষ কেনে সেখানকার ছোকরারা ওদের বন্ধু; ব্যস্, এই নিয়ে ওদের জগৎ। এ যেন হাজার হাজার বন্য গ্রামকে একত্রে হঠাৎ জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। অন্যান্যের মত মেয়ারিজার জীবনও, ওর প্রাণপ্রাচুর্য সত্ত্বেও, নীরস উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে উঠেছিল। আজ সংসারে

এমন একজন এসে গেছে যে ওর জীবনের দিকচক্রবাল ক্রমাগতই বাড়িয়ে দিচ্ছে, পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে নতুন মানুষ, নতুন জীবন, নতুন আনন্দ, কত বৈচিত্র্যের সঙ্গে। এখন কত অজানা ওর জানা হ'য়ে গেছে—গল্প করে ও, অমুক কী পোশাক পরেছিল, কোথায় কাজ করে, কী কাজ করে, কত পায়, কার সঙ্গে তার প্রেম, কীভাবে এই লোকটা অন্য মেয়ের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে, কীভাবে এই দুটি মেয়ের মধ্যে ঝগড়া হ'য়ে গেছে; অমুক পুরুষ মানুষটা কীভাবে তার স্ত্রীকে ঠ্যাঙায়, কীভাবে সে স্ত্রীর রোজগারও মদে ওড়ায়, কীভাবে স্ত্রীর জামাকাপড় পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে আসে। যাদের পরিচিতের সংখ্যা বেশী তারা হয়তো ওর এই পরচর্চা শুনে হাসবে; কিন্তু এদের কাছে এই যে সম্পদ। কথাও একেবারে ফুরিয়ে এসেছিল চরম দারিদ্র্যের বিশ্রী চাপে।

এক শনিবার ফেরবার পথে ট্যামস্তসিয়স বেহালার বাক্সটা ধীরে সুস্থে পথের ধারে নামিয়ে রেখে মেয়ারিজার দিকে ফিরে বলে, আমি তোমায় ভালবাসি! শুনে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যায় মেয়ারিজা; দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার ভালবাসার মানুষকে! দু'জনে বাড়ী ফেরে আনন্দসাগরে ভাসতে ভাসতে। বাড়ী ফিরেই হড়বড়িয়ে স[illegible] কিছুই সকলকে বলে মেয়ারিজা। ব্যস, তখন হ'তে আর ওদের ভাঙ্গা কথায়, সঙ্গীতের সুরে প্রেম করতে হয় না। শনিবার বিকেলে ওরা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'য়ে আনন্দের অতলে ডুবে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রান্নাঘরটুকুর একটী কোণে। এ পরিবারের অন্য সকলে নিয়ম ক'রে নিয়েছে ও কোণে কী হ'চ্ছে বা চলছে এরা তার কেউ কিছু জানবে না।

দুটীতে পরিকল্পনা করে আগামী বসন্তে ওদের বিয়ে হবে; এ বাড়ীরই চিলেকোঠাটা সারিয়ে নিয়ে সেখানে বাঁধবে ওদের সুখের নীড়। ট্যামস্তসিয়স মজুরী পায় ভালই; ইউরষিসরাও ধীরে ধীরে

মেয়ারিজ্জার ঋণ শোধ করছে। কাজেই সুষ্ঠুভাবেই ওরা সংসার পাততে পারবে অদূর ভবিষ্যতে। এখন হ'তেই সরলা মেয়ারিজ্জা প্রতি সপ্তাহে মজুরী পাবার পর তার ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনবার জন্য জেদ করতে থাকে। এদের মধ্যে মেয়ারিজ্জা ধনিক বিশেষ। টিন-রঙানয় এখন ও দক্ষ শ্রমিক হ'য়ে উঠেছে। একশো দশটা টিন রঙাতে পারলে চৌদ্দ সেন্ট্ মজুরী পাওয়া যায়—ও এখন মিনিটে দুটো টিন রঙাতে পারে। ওর এখন মনে হয়, খুশীর চাবিকাঠি ওর হাতে, ও ইচ্ছে করলেই ওর চতুর্দিকের পরিবেশ হাসিখুশী হ'য়ে উঠবে।

বন্ধুবান্ধবরা বলে—ধীরে মারিয়া ধীরে। সুখী হবি তুই সে তো সুখের কথা, কিন্তু সৌভাগ্যের আশায় মানুষের কি নিজেকে এমনভাবে ভাসিয়ে দিতে হয়? বিপদ-আপদ ঘটতে কতক্ষণ! সে কথা কানে তোলে না মেয়ারিজ্জা। ভবিষ্যতের সুখনীড়ের কল্পনায় ও স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকে ও। শেষে সত্যিই আঘাত এল ওর জীবনে; আশাভঙ্গের সে কি আতুর মূর্তি ওর! দেখা যায় না চোখে অমন মেয়ের এমন-ভাবে ভেঙ্গে পড়া।

টিনের বিরাট কারখানাটা মেয়ারিজ্জার কাছে চন্দ্র-সূর্যের তুল্য ছিল; ওর ধারণা ছিল চন্দ্র-সূর্যের মত এ কারখানাও চলবে চিরকাল। কিন্তু তা চলল না, একদিন বন্ধ হ'য়ে গেল কারখানাটা। মালিকরা এর কোন কারণ দর্শায়নি, এক দিন আগেও ওকে সাবধান ক'রে দেয়নি। এক শনিবার বিকেলে হঠাৎ একটা ইস্তেহার টাঙান হ'ল, সকল মজদুর আজ বিকেলে মাইনে নিয়ে যাবে। অন্ততঃ এক মাসকাল আর কাজে আসবার প্রয়োজন নাই। ব্যস!—আর কিচ্ছু না। ওর কাজ খতম, ওর রোজগার খতম।

মেয়ারিজ্জা সহকর্মিণীদের কাছে শোনে, এর নাম 'ছুটির চাপ'।

জোর কাজ চলে কিছুদিন, তারপর কাজে ঢিলা পড়ে; কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হ'য়ে যায়। কিছুদিন বাদে হয়তো আংশিক কাজ চালাবার জন্য খোলা হবে; কিন্তু কাজের দিক হ'তে সে কিছুই নয়। আগামী গ্রীষ্ম না এলে নাকি পূরো কাজ আর সুরু হবে না। কারখানার ঠেলাগাড়ীচালকরা খবর আনে তুড্জেমান হ'য়ে একেবারে ছাদ পর্যন্ত টিন জমা হ'য়ে গেছে; আর এক হপ্তা, কারখানা চালালে টিন রাখবার জায়গা থাকবে না। ওদেরও তিন-চতুর্থাংশের চাকরী যায়—এ আবার আরও খারাপ লক্ষণ; কারণ জমা মালের ওপর অর্ডার থাকলে ঠেলাওয়ালাদের বরখাস্ত করা হয় না; বোঝা যাচ্ছে মাল জমে গেছে, কিন্তু বরাৎ নেই মালের। অন্য মেয়েরা বলে, এর সবটাই জোচ্চুরি, সবটা। তখন কত তাড়াতাড়ি টিন রঙাতে পার তাই নিয়ে পাগল হ'য়ে উঠেছিলে, হপ্তায় বার চৌদ্দ ডলার কামাচ্ছিলে, ভাবছিলে চিরকাল এমনি চলবে; আদ্দেক খরচ করবে. আদ্দেক জমাবে। নাও এখন। আদ্দেক বছর এখন কারখানা বন্ধ থাকবে; ওই মজুরী হ'তেই এখন তোমায় চালাতে হবে। বোঝ এখন সত্যি কত পেতে! মজুরী আদ্দেক হ'ল কিনা! জোচ্চোরদের ফাঁকিটা তো এইখানেই, জান বের ক'রে ক'মাস খাটিয়ে খুব মাল তৈরী ক'রে নেয়, তারপর কারখানা বন্ধ ক'রে দেয়—মরে মজদুররা।

মেয়ারিজা বাড়ী ফেরে। চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না এ মেয়ে; কাজ না থাকলে, কবে যে কী নিয়ে ও বিস্ফোরণ করবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ওকে লাগিয়ে দেয় ওরা বাড়ীখানা পরিষ্কার করার কাজে। অনেকদিন ধরে এ কাজটা হয়নি, ময়লা জমেছিল প্রচুর, খাটতেও হয় খুব; কিন্তু ক'দিনের কাজ এ মেয়ারিজার কাছে? কারখানায় কারখানায় ও আবার টহল দিতে সুরু করে কাজের খোঁজে। টিনের প্রায় সব কারখানাই বন্ধ হ'য়ে গেছে, সে সব কারখানার সব

মেয়ে মজদুররাই হন্যে হ'য়ে ফিরছে কাজের খোঁজে। লোক আছে, কাজ নেই। মেয়ারিজাও কাজ পায় না। ও এবার মনোহারী দোকান, মদের দোকান প্রভৃতিতে চেষ্টা করে। তাতেও কোন ফল হয় না। এবার ছোটে ও সুদূর হ্রদ অঞ্চলে। সেখানে বড় বড় বাড়ীতে বড় বড় ধনী বাস করেন। তাঁদের দোরে দোরে অনুরোধ জানায় ও, যা হ'ক একটা কাজ দেওয়া হ'ক ওকে; ইংরেজী না-জানা মেয়ে করতে পারে এমন কাজও তো ঢের আছে, তারই একটা দেওয়া হ'ক ওকে।

টিনের ব্যবসা গোঁত্তা খেয়েছে, তার প্রভাব হত্যামঞ্চের শ্রমিকরাও ধীরে ধীরে অনুভব করে; ...র ইউরগিস এবার হাড়ে হাড়ে অনুভব করে ওর সহকর্মীদের তিক্ততার কারণ। টিন কারখানার মত এ কারখানা বন্ধ হ'য়ে যায় না, তবে কাজের সময় ক্রমেই কমে আসে। মালিকরা চায় মজদুররা কাজে আসুক ঠিক সাতটায়; কিছুদিন ধরেই বেলা দশটা এগারটার আগে কাজ সুরু হচ্ছিল না; ক'ড়েরা গিয়ে গোরু কেনাকাটি করবে, হত্যামঞ্চে গোরু আসবে, তারপর আরম্ভ হবে এদের কাজ; সকল দিক হ'তে বিবেচনা করলে এ-ই লাগতো ওদের ভারী বিশ্রী। এখন আবার কাজ শুরু হ'তে বেলা দুটো তিনটে বেজে যায়। কাজ না আসা পর্যন্ত ওদের বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়; তাপমানযন্ত্রে তখন পারা নেমেছে হয়তো শূন্যেরও কুড়ি ডিগ্রী নীচে। বাইরে ওরা নিজেদের গরম রাখবার জন্য ছুটোছুটি করে, ছোটদের মত ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা করে। কিন্তু এসব কতক্ষণ পারে মানুষ! দেখা যায় কাজ সুরু হ'বার আগেই ওরা অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে; কাজ করবে কী, চলাই তখন ওদের পক্ষে কষ্টকর। তাতে কী যায় আসে? হঠাৎ চলে—গতি বাড়াও, গতি বাড়াও! শরীরের অবস্থা যাই হ'ক গতি বাড়াতেই হয়। একটানাই হয়তো কয়েক হপ্তা ধরে এই রকম চলল।

বিকেল হ'তে কাজ আরম্ভ ক'রে বড় জোর দু'ঘণ্টার কাজ হয়; সকাল হ'তে এলেও মজুরী পাওয়া যায় ঐ দু'ঘণ্টারই অর্থাৎ দিন পঁয়ত্রিশ সেণ্ট্; দৈনিক রোজগারের হার এমনি চলে এক আধ দিন নয়, একটানা কয়েক হপ্তা। কোন কোন দিন আধ ঘণ্টার বেশী কাজ হয় না; এক এক দিন আবার তাও হয় না। গড়ে দিন ছ' ঘণ্টা কাজ হয়, ইউরগিসের কাছে এর অর্থ হপ্তায় ছ' ডলার, এবং এই ছ' ডলারের জন্য হত্যামঞ্চে বেলা একটা পর্যন্ত, কখন কখন বেলা তিনটে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অনেকদিন একেবারে বেলা গড়িয়ে গেলে একপাল জন্তু এসে যায়; তাদের মারাকাটার কাজ সেই দিনই শেষ করতে হবে, ফলে ওদের বিজলী বাতি জ্বা'লিয়ে রাত্রি ন'টা দশটা বা বারটা একটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়; এই সময়টা দাঁতে একটা দানা কাটবার পর্যন্ত ফুর্সৎ পায় না ওরা। জানোয়ারদের কৃপার ওপর নির্ভর করে মানুষ। গোরুর খদ্দেররা দর নামাবার চেষ্টায় এমন ভাব দেখায় যেন সেদিন কেনবার ওদের দরকার নেই, বিক্রেতাদের ওখানে কয়েক-দিন বসে থাকাও সম্ভব নয়; আবার কোন অজ্ঞাত কারণে পশুর খাদ্যের দাম বাজারদর অপেক্ষা কারখানার আঙিনায় বেশ চড়া। বরফে রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যায় বলে অনেক গাড়ী দেরীতেই পৌছয়। কারখানার মালিকরা কিনতে অনেক টালবাহনা করে, দর কমলে তখন কেনে—মজদুররা তো অপেক্ষা ক'রেই আছে—তাদের ওপর ওদের লৌহদৃঢ় অনড় নিয়ম চালায়, পশু যেদিন কেনা হ'য়েছে, মারাকাটা শেষ করতে হবে সেই দিনই। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে বহু প্রতিনিধি বহুবার এ নিয়ম বদলাবার দাবী নিয়ে কারখানার মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন; প্রতিবারই তাঁরা শুনে এসেছেন, এটা আইন, আইন শুধু বদলাবে না নয়, বদলাবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই। অতএব অন্যান্য শ্রমিকের সঙ্গে বড়দিনের পূর্বরাত্রে ইউরগিসকে হত্যামঞ্চে রাত্রি

একটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়, আর বড়দিনের দিন কাজে যেতে হয় ভোর সাতটায়।

এ সব মন্দ, কিন্তু মন্দতম নয়। অত কঠোর পরিশ্রম ক'রেও তার প্রতিদান কি? যত ঘণ্টা ওরা কাজ করে, তার পুরো মজুরী ওদের দেওয়া হয় না। আগে কেউ এদের এ সব জোচ্চুরির কথা বললে, আরও দু' চারজন আনাড়ীর মত ইউরঘিসও তাদের উপহাস করত; এরা বলত, এত বড় বড় কারবার সামান্য মজদুরদের সঙ্গে জোচ্চুরি করতে পারে? অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দেখে বিশেষ বড় বলেই এই সব কারবার নির্ভয়ে গরীব মজদুরদের প্রবঞ্চনা করতে পারে। এক মিনিট পরে এলে এক ঘণ্টা লেট ধরা হয়, ঐ উনষাট মিনিট তাদের বাইরে অপেক্ষা করতে দেওয়া হয় না; ও সময়টাও কাজ করতে হয়; অথচ হিসেবের এক ঘণ্টা ঘাটতি আবার সন্ধ্যার দিকে পুরিয়ে দিতে হয়। সাতটার আগে এলে অফিসাররা আগেই কাজে লাগিয়ে দেয়, দশ পনের মিনিট ফালতু কাজের জন্য অতিরিক্ত মাইনে দেওয়া হয় না। প্রারম্ভের ব্যবস্থা নয় এটা, সারা দিনই এমনি চলে; পুরো ঘণ্টা না হ'লে তার মজুরী দেওয়া হয় না—কর্তারা তাকে বলেন "ভাঙ্গা সময়"; যেমন, পুরো পঞ্চাশ মিনিট একটা লোক কাজ করল, কিন্তু বাকী দশ মিনিট পুরো করবার মত কাজ হয়তো আর নেই, কাজেই ঐ ভাঙ্গা সময় পঞ্চাশ মিনিটের জন্য তাকে কোন মজুরীই দেওয়া হ'ল না। এজন্য প্রতিদিনই রোজের শেষটা একটা লটারী বিশেষ হ'য়ে দাঁড়ায়—লটারী কেন লড়াই, অফিসাররা চেষ্টা করে এক ঘণ্টার কাজ গতি বাড়িয়ে পঞ্চাশ মিনিটে করাতে, মজদুররা সেটাকে পুরো এক ঘণ্টাতেই দাঁড় করাতে চায়। ইউরঘিস দোষ দেয় অফিসারদের; কিন্তু আসলে তারাও মালিকদের ভয়ে অস্থির হ'য়ে থাকে—যখন-তখন চাকরী যাবার আশঙ্কা তাদেরও আছে; তাই মজদুর

নিঙড়ে যতখানি পারে তারা কাজ আদায় ক'রে নেয়। তাতেও না হ'লে সহজতম পন্থা ধরে ওরা—"গীর্জার জন্য" কাজ করতে হবে। গরীবদের অতিরিক্ত খাটিয়ে পাওয়া টাকাটা নাকি গীর্জাকে দেওয়া হবে। কী হয় মালিকরাই জানে, মজদুররাও যে বোঝে না তা নয়। কারখানার মালিক জোন্স খালি এই প্রতিষ্ঠানগুলির [illegible] বসে নেই, বহু ধর্মসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানেরও তিনি শিরোমণি; ধর্মের জন্য নাকি অমন ক'রে আর কারও প্রাণ কাঁদে না। মানুষের অকল্পনীয় জঘন্যতম কাজ অহরহঃ হ'য়ে চলেছে কারখানায়; মজদুররা চোখ টিপে হেসে রসিকতা করে—"গীর্জার জন্য" হ'ল এটা।

এ সবের প্রভাবে ইউরঘিসের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসে। দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করবার কথা আগে কেউ বললে ইউরঘিস বিব্রত বোধ করত; এখন ওর নিজেরই মনে অসংখ্য দাবী সৃষ্টি হয়, সেগুলো আদায় করবার জন্য লড়তে ইচ্ছে হয়। এবার কসাই সহায়ক সংসদের সেই আইরিশ প্রতিনিধিটি ওর কাছে এসে সম্পূর্ণ অন্য ব্যবহার পেলে। ওরা সব একজোট হ'য়ে লড়বে ওদের দাবী আদায়ের জন্য, ওদের মিলিত শক্তির কাছে হার মানতে হবে কারখানার মালিককে—ভাবতেও পুলকিত হ'য়ে ওঠে ইউরঘিসের মন! সবিস্ময়ে ইউরঘিস সাথীদের জিজ্ঞাসা করে, সকলের আগে কে এটা আবিষ্কার করেছিল? ওরা উত্তর দেয়, আমেরিকার মজদুরদের পক্ষে এটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, হামেশাই তারা এটা ক'রে থাকে। এতদিনে ইউরঘিস যেন "মুক্ত আমেরিকা" কথাটার একটু মানে বুঝতে পারে। আইরিশ প্রতিনিধি ব্যাখ্যা করে, প্রতিটী লোক যদি সঙ্ঘের সভ্য হয়, সকলে যদি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায় তা হ'লেই সাফল্য-লাভের আশা করা যেতে পারে। ইউরঘিস সাগ্রহে প্রতিশ্রুতি দেয়, ওর দিক হ'তে কোন ত্রুটি হবে না। এক মাস যেতে না যেতে ওদের

পরিবারের সকলেই ইউনিয়নের সভ্য হ'য়ে যায়, সগর্বে ইউনিয়নের বোতাম খোলাখুলিভাবে ওরা লাগিয়ে রাখে। ভাবে, ইউনিয়নের সভ্য হ'লেই সকল দুঃখের অবসান হবে!

কিন্তু মেয়ারিজা তাদের ইউনিয়নের সভ্য হ'বার এক সপ্তাহ পরেই ওদের টিন কারখানা বন্ধ হ'য়ে যায়; সমস্ত পরিবারটাই বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে ভাবে ইউনিয়ন এ বিপৎপাতটা বন্ধ করল না কেন। ইউনিয়নের একটা সভায় ও যোগদান করে। প্রথম সভাতেই ও একটা জোর বক্তৃতা দিয়ে নেয়। সভাটা ছিল অফিস সেক্রেটারি নির্বাচনের জন্য, সভার কাজ চলছিল ইংরেজীতে; মেয়ারিজার তাতে কিছু যায় আসে না। ওর মনে যা ছিল গাঁক গাঁক ক'রে বলে চলে ও। সভাপতি টেবিল চাপড়ায় ওকে থামাবার জন্য, সভ্যবৃন্দরা চেঁচায়—বসুন বসুন, কে কার কথা শোনে! ওর কথা ও বলে চলে, নিজের ওপর বিপৎপাতের কথা, সাধারণভাবে সকলের ওপর যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হ'ল তার কথা, কারখানার মালিকদের সম্বন্ধে ওর ধারণা, যে জগতে এ অন্যায় করতে দেওয়া হয় তার সম্বন্ধে ওর বক্তব্য —সব মিলিয়ে ওর যা কিছু বক্তব্য গড়গড় ক'রে বলে চলে ও। হতাশ হ'য়ে সকলে বসে থাকে। ওর কথা শেষ ক'রে ও বসে পড়ে। হাঁপ ছেড়ে ওরা নির্বাচনী কাজে মন দেয়।

ইউরবিসের এই সংস্রবে একটা অভিজ্ঞতা হ'য়ে যায়। ইউনিয়নের একটা মিটিঙে গিয়ে ভয়ে ভয়ে এক কোণে ঢোকে ও; মিটিঙে যা কিছু হয়, তাই দেখে ও বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে। ওর এই ভঙ্গীটাই হ'ল ওর পক্ষে মারাত্মক। একটা বেঁটে আইরিশ এগিয়ে আসে ওর দিকে; লোকটার নাম টমি ফিনেগান; ফিনেগানের চোখ দুটো ভাসা ভাসা, মাথাটা খারাপ। বহু বৎসর আগে পারলৌকিক সত্তাদের সম্বন্ধে ওর কী একটা অভিজ্ঞতা হয়, তখন হ'তেই ওর মাথা খারাপ, তখন হ'তেই

ও লোককে বুঝিয়ে চলেছে আত্মাদের অস্তিত্ব, গুরুত্ব এবং জীবিতদের পরিবেশের ওপর তাদের প্রভাবের তত্ত্ব; তার মতে তাঁরা থাকেন বুদ্ধির উচ্চতর স্তরে, সেই স্তরে জীব-জগৎটাকে নিয়ে গেলে বর্তমান অবস্থা বজায় থাকবে কিনা ইউরঘিসকে জিজ্ঞাসা করে। শ্রোতার বুকের জামা ধরে ক্রমাগত মুখের কাছে মুখ আনার বদ অভ্যাস আছে লোকটার; দাঁত খারাপ, মুখ গন্ধ, থুথু ছিটকে আসে; ইউরঘিস এ সবও হয়তো গ্রাহ্য করত না; কিন্তু পরলোক, আত্মা, ওর বড় বড় চোখ, বলার ভঙ্গী সবটা মিলিয়ে ওকে ঘাবড়ে দেয়—ঘামতে থাকে ও। আর একজন সাথী এসে ওকে উদ্ধার করে; আইরিশটা ধরে ইউরঘিসের মতই সাদাসিধে আর একটা ভূতকে। ভয়ে আর ইউরঘিস এক জায়গায় বসে না; অবিরত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে সভার মধ্যে।

ইউনিয়নের কোন মিটিং বাদ দেয় না ইউরঘিস। ইংরেজীর দু'চারটে শব্দ ও ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছে; ইংরেজীর শব্দ শিখতে বন্ধুরা ওকে সাহায্য করে। কিন্তু দু'চারটে শব্দ সম্বল ক'রে এ সব সভার বক্তব্য বোঝা যায় না। অন্ততঃ জন ছয়েক বক্তা বিভিন্ন উচ্চারণের ইংরেজীতে কী যেন আগুন ছড়ায়। এদের কণ্ঠের আগ্রহ আবেদনটা ওর কাছেও ব্যর্থ যায় না। ইউরঘিসও তো লড়তে চায়, ওরও লড়াই যে এটা। মোহমুক্তির পর ইউরঘিস ঠিক করেছিল, নিজের বাড়ীর লোক ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না ও, দুনিয়ার কাউকে না—কিন্তু ইউনিয়নে ঢোকার পর দেখল, সমব্যথার ব্যথী বহু ভাই, বহু বন্ধু আছে ওর। বাঁচবার তাদের একটীমাত্র উপায়—ঐ ইউনিয়ন; কাজেই, ইউনিয়নের মার্ফৎ লড়াইটা ওদের কাছে একটা ধর্মযুদ্ধের রূপ নেয়। আজীবন ইউরঘিস ধর্মসঙ্ঘের (গীর্জার)-ও সভ্য; কিন্তু ও সঙ্ঘ ওর অন্তর কখনও স্পর্শ করতে পারেনি; আজ গীর্জার ব্যাপারটা ছেড়ে দেয় ও মেয়েদের ওপর। এখানে সন্ধান

পেয়েছে ও নতুন ধর্মের—এ ধর্ম ওর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ স্পর্শ করে, ওর দেহমনের সমগ্র সত্তার সঙ্গে এ ধর্ম মিশে যায়। নব-ধর্মান্তরিতের আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে ও সর্বত্র, সকল সময় করে ওর এই নবধর্মের প্রচার। ইউনিয়নের সভ্য নয় এমন বহু লিথুয়ানিয়ান আছে তাদেরই মধ্যে ও প্রচার সুরু করে। নতুন মন্ত্রের সত্য বোঝাবার সে কি আগ্রহ ওর! নতুন ধর্মের নতুন প্রার্থনা শেখাবার চেষ্টা করে ও তাদের। তারা নিজেদের গোঁ ধরে থাকে; শত বোঝালেও নিজেদের জেদ ছাড়তে চায় না। ইউরঘিস শিখেছে এ সকল জায়গায় ধৈর্য ধরে' থাকতে হয়, কিন্তু এদের গোঁ ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়! ভুলে যায় ও, এক-দিন নিজেও সে এদেরই মত অন্ধ ছিল—সভ্যতার প্রথম যুগ হ'তে নবভ্রাতৃত্বের প্রচারকরা প্রচার চালিয়েছে অস্ত্রের জোরে—ইউরঘিস সেইটাকেই সরলতম পথ ভাবে।

নবম অধ্যায়

ইউনিয়ন আবিষ্কারের পর হ'তে ইউরঘিস ইংরেজী না-জানার অসুবিধাটা প্রতিনিয়ত অনুভব করে। দু'চারটে শব্দে কাজ হয় না। মিটিঙে কী হয়, কী বলে ওরা, কী সিদ্ধান্ত নেয় সব জানতে চায় ও, নিজে অংশ নিতে চায় মিটিঙের কাজে। এখন হ'তে নতুন ইংরেজী শব্দ শুনলেই ও শিখে নেবার চেষ্টা করে। ছেলেরা স্কুলে গিয়ে দ্রুত এদেশী ভাষা শিখছিল, তারাও ওকে দু'চারটে শব্দ শেখায়; কিন্তু তাতে তৃষ্ণা মেটে না। এক বন্ধু একখানা বই দেয় সামান্য কয়েকটা কথা আছে তাতে, ওনা ওকে পড়ে' শোনায়, বারবার আবৃত্তি ক'রে শেখে ও। কিন্তু কী হবে এই সব টুকিটাকিতে আর বিশেষ ক'রে নিজে পড়তে না

পারলে! কার কাছে শোনে এ অঞ্চলে একটা স্কুল আছে বয়স্কদের বিনে মাইনেয় ইংরেজী পড়তে ও বলতে শেখান হয় সেখানে। কালবিলম্ব না ক'রে ভর্ত্তি হ'য়ে যায় ও। অধিকাংশ দিনই যাবার সময় পায় না ও, যেতে যেতে স্কুলের সময় কাবার হ'য়ে যায়; তবু গিয়ে আধ ঘণ্টা শেখবার সময় থাকলেও ও যায়।

ইউনিয়ন ওর মধ্যে আর একটা চেতনা এনে দেয়—মনে প্রশ্ন জাগে এ দেশটা সম্বন্ধে, গণতন্ত্র জন্ম নেয় ওর অন্তরে। ওর ইউনিয়ন, সেও তো একটা রাষ্ট্র, ছোট্ট প্রজাতন্ত্র; এর অধিকার, দায়িত্ব সকলেরই অধিকার ও দায়িত্ব; প্রত্যেকেরই সমান অধিকার আছে এতে। সংক্ষেপে ইউরঘিসের রাজনীতি জন্ম নেয় ঐ ইউনিয়নেরই মধ্যে। ও যে দেশ, অন্ততঃ যে অঞ্চল হ'তে এসেছে সেখানে কোন রাজনীতি ছিল না: (১৯০৩-৪ এর) রাশিয়ায় ঝড়-শিলাবৃষ্টির মত মনুষ্যসৃষ্ট স্থায়ী অভিশাপ আছে একটা—তার নাম সরকার। আমেরিকায় আসবার সময় শুনেছিল, এটা মুক্ত দেশ; মানেটা ঠিক বোঝেনি; সাদা চোখে দেখেছিল, রাশিয়ার মত এখানেও সব কিছুই বড়লোকদের মুঠোর মধ্যে; সেখানকার মত এখানেও গরীবরা বাঁচবার জন্য পশুর মত খাটে, কাজ না পেলে ক্ষিধেয় মরে; সেখানকার ক্ষিধে এবং এখানকার ক্ষিধের মধ্যে কোন তফাৎ ও দেখতে পায়নি।

এখানে তিন হপ্তা কাজ করার পর একদিন দুপুরে ইউরঘিসের কাছে কারখানার একজন নৈশ প্রহরী এসে বলে, নাগরিক হবে? নাগরিক হওয়ার অর্থ ও বোঝে না। লোকটা বোঝায়, এদেশী হ'য়ে যাওয়া আর কী। লাভ কি তাতে? অনেক। প্রথমতঃ, এক আধলা খরচ নেই এতে, দ্বিতীয়তঃ, আদ্দেক দিন পুরো মাইনেতেই ছুটি পাওয়া যাবে, তৃতীয়তঃ, নির্বাচন এলে ও ভোট দিতে পারবে। ভোট আবার আর এক আজব চীজ—ইউরঘিস বুঝতে পারে না। লোকটাও ভাল

বোঝাতে পারে না। বলে—লাভ আছে, মজা আছে খুব ওতে। সানন্দে রাজী হ'য়ে যায় ইউরঘিস। নৈশ প্রহরী ওর অফিসারের কাছে কী বলে—ব্যস্, ছুটি হ'য়ে যায় সেদিনকার মত, কিন্তু মাইনে কাটা যাবে না। পরে বিয়ের দিন ছুটি চেয়ে ও ছুটিই পায়নি—মাইনেসহ ছুটি তো দূরের কথা। এখন ও ভাবে কী অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল সেদিন—ছুটিকে ছুটি, মাইনেকে মাইনে। যা হ'ক, সেদিন আরও জন কুড়ি লিথুয়ানীয়, পোল প্রভৃতি নবাগত জোগাড় ক'রে প্রহরীটা ওদের বাইরে নিয়ে গিয়ে লম্বা একটা ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠায়; গাড়ীর মধ্যে জন বার আগে হ'তেই বসে আছে। গাড়ী চলতে সুরু করে—সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় বীয়ার পান, দাম লাগে না, অথচ যত খুশী তত টান; জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শহরের দৃশ্য দেখ, কোন বাধা নেই। গাড়ীটা গিয়ে থামে পাথরের বিরাট একটা বাড়ীর সামনে। সেখানে আগে হ'তে একেবারে ছাপান কাগজপত্র নিয়ে এক ভদ্রলোক ওদের জন্যে বসে আছেন; কী সুন্দর লেখা তাতে! যুক্ত-রাষ্ট্রের একটা লাল মোহর ছাপান আছে তার ওপর। খালি একটা সই করলেই হ'ল। দস্তখৎ ক'রে দেয় ওরা। ওদের জানিয়ে দেন ভদ্রলোক, এখন হ'তে ওরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হ'য়ে গেল; সমান হ'ল অন্য সকলের সঙ্গে—এমন কি মার্কিণ রাষ্ট্রপতিরও সমান হ'য়ে গেল ওরা।

মাসখানেক কি মাস দুই পরে লোকটার সঙ্গে ইউরঘিসের ফের দেখা হয়; সে বলে দেয় ওকে নাম রেজেষ্ট্রি করবার জন্য কোথায় যেতে হবে। এর এক মাস পর নির্বাচন দিবস এল। কারখানায় কারখানায় নোটিস ঝুলল—'কোন শ্রমিক ইচ্ছা করিলে আজ বেলা নয়টা পর্যন্ত বাহিরে থাকিতে পারে।' সে রাত্রে কাজের পর নৈশ প্রহরীটা ইউরঘিস ও পালের অন্যান্য মেষকে নিয়ে চলল একটা মদের দোকানে; সেখানে

সামনে না বসে' দোকানের পিছনদিককার ঘরে বসে' খানাপিনা হ'ল; লোকটা ওদের দেখিয়ে দিলে—একেই বলে ব্যালট কাগজ; এর এই জায়গাটায় এমনি একটা চিহ্ন দিয়ে ভোট দিতে হয়। বুদ্ধিমান্ এরা, শিখতে কতক্ষণ! প্রত্যেকের হাতে দুটি ক'রে ডলার দেওয়া হয়। ওরা চলে ভোট দিতে। ভোটকেন্দ্রে ঠিক ওদেরই তদারকের জন্য একজন পুলিশ রাখা হ'য়েছে; প্রদর্শিত পন্থায় ওরা ভোট দিয়ে দেয়। ইউরঘিস বাড়ী ফেরে বিজয়-গৌরবে; বাড়ী ফিরে দেখে ও বিজয়ী হ'লেও মহাবিজয়ী নয়। জোনাস ভোটের কর্তাকে পাশে ডেকে বলেছিল একটা ভোটের জন্য দু' ডলার দেবার প্রয়োজন নেই, চার ডলারে সে তিন তিনটে ভোট দেবে। কর্তা ওর দরে রাজী হ'য়ে যায়, ও তিনবার ভোট দিয়েছে, ইউরঘিসের দুনো রোজগার ক'রে এসেছে।

ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে কতকগুলো লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল; ভোট রহস্যের ভেতরের কথা তারা বুঝিয়ে দেয়। রাশিয়ার সঙ্গে তফাৎটাও তারা বোঝাতে ভোলে না। বলে, তফাৎ খালি এইটুকু যে এখানে এরা গণতন্ত্রের মুখোস পরে' থাকে। যে সব আমলা দেশটাকে শাসন করে তারা এবং তাদের "কলম"রা প্রথম নির্বাচিত হ'য়ে নেয়; এখানে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী কলম দল আছে—দুটোই নিজেদের রাজনৈতিক দল বলে। যে কলমদল সবচেয়ে বেশী ভোট কিনতে পারে, তারাই সরকারী ক্ষমতা দখল করে। মাঝে মাঝে নির্বাচন আসে, তখন গরীবরা একবার ক'রে গণ্য হয়। প্যাকিংশহরে জাতীয় বা সরকারী নির্বাচনে মজদুরদের ডাকা হয়; স্থানীয় নির্বাচনে তাদের দরকারই হয় না, কারণ গণতন্ত্রীরা এটা সব সময় অধিকার ক'রে আছে। এই অঞ্চলের শাসনকর্তা তাই মিঃ স্কুলি নামে একজন বেঁটে আইরিশ—লোকটা গণতন্ত্রী। স্কুলি সরকারী যন্ত্রে কী একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার

ক'রে আছে, সেই জোরে সে নাকি এ শহরের মেয়রের ওপরও কর্তামি করে। সে সগর্বে বলে প্যাকিংশহর তার পকেটে। বিরাট ধনী লোকটা। শহরের এবং শহরের আশেপাশে যত রকমের কারবার আছে সবেতেই প্রায় তার অংশ আছে, নয় নিজস্ব। আসবার দিন ইউরঘিস ও ওনা যে ময়লা-গাদাটা দেখেছিল, সেটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, উদাহরণ-স্বরূপ, সেটাও ধরা যেতে পারে; ওর একটা ইটের কারখানা আছে, এখানকার ময়লা-গাদা হ'তে মাটি নিয়ে কারখানায় ইট তৈরী করিয়েছিল; তারপর শহরের সব ময়লা ঐখানে ফেলতে বাধ্য করছে পৌরপ্রতিষ্ঠানকে। এরপর ঐ ময়লা-গাদায় তৈরী হবে ইউরঘিসরা কিনেছে সেই সব বাড়ী। তারপর তৈরী ইটগুলো ও নিতে বাধ্য করে পৌরপ্রতিষ্ঠানকে ওর নিজের দেওয়া দরে, তাও পৌরপ্রতিষ্ঠানকে বয়ে আনতে হবে নিজের গাড়ীতে। আর একটা বড় খাল আছে না, যেখানে শহরের যত ময়লা জল জমা হয়? হ্যাঁ, সেটা ওর বরফের কারখানা। শীতকালে ময়লা জল জমে' বরফ হ'য়ে যায়, সেইটে কাটিয়ে কাটিয়ে ও বরফ বিক্রী করে—পৌরপ্রতিষ্ঠানের খাল ও জল ব্যবহার করার জন্য ট্যাক্স দেয় না ও, ময়লা জলের বরফ বিক্রী করার জন্য ওর কাছে কৈফিয়ৎ চাইবারও কেউ নেই। খবরের কাগজগুলো এই কেলেঙ্কারিটা নিয়ে খানিকটা চেঁচামেচি করে একবার; স্কুলি একটা লোক ভাড়া করে—সে নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিয়ে নেয়; তারপর একদিন দেখা গেল লোকটা আমেরিকায় নেই। মজদুর নিয়োগ করা হ'য়েছে পৌরপ্রতিষ্ঠানে, মজুরী পেয়েছে তারা পৌরপ্রতিষ্ঠান হ'তে, কিন্তু তৈরী করেছে তারা স্কুলির ইটের কারখানা। পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের ওপর খুব বেশী চাপ না দিলে এ কথা কেউ স্বীকার করবে না, কেননা দুঃখে দুর্দৈবে ওরা এই মাইক স্কুলির ওপর নির্ভর করতে পারে ভাল-ভাবেই, তা ছাড়া এ সব বলে' দিয়ে লাভই বা কী ওদের? ও এক

কলম লিখে দিলে প্যাকিংশহরের যে কোন কারখানায় যে কোন সময় চাকরী একটা হবেই, হয়েছেও অনেকেরই ; এদের কাজ করতে হয় মাত্র আট ঘণ্টা, কিন্তু মাইনে দেওয়া হয় সব চাইতে বেশী। এইভাবে ওর "বন্ধু"র সংখ্যা একটু বেশীই ; এই বন্ধুদের প্রত্যেকে আবার "জঙ্গীনারা সঙ্ঘের" সভ্য ; কারখানা অঞ্চলের ঠিক বাইরেই এদের ক্লাব-ঘর। এইটিই শিকাগোর সবচেয়ে বড় ক্লাব-ঘর, এখানে প্রতিযোগিতায় বাজী রেখে পুরস্কার দিয়ে বহুপ্রকারের খেলা, কুস্তি, ব্যায়াম, কুকুর-লড়াই, মোরগ-লড়াই প্রভৃতি বহু ব্যাপার চলে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদের প্রত্যেকটীই জুয়াখেলা। পুলিস বিভাগ এ সব জুয়া-খেলা দমন করে না, কারণ তাদের প্রত্যেকেই এর সভ্য, ক্লাবে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান থাকলে তার টিকিট বিক্রী করে পুলিসই। যে লোকটা ইউরঘিসদের নাগরিক হবার জন্য নিয়ে গিয়েছিল সেও এই ক্লাবেরই সদস্য ; জঙ্গীনারা সঙ্ঘের সদস্যদের একটা সাধারণ নাম আছে—"ভারতীয়"। নির্বাচন দিনে কয়েক শত ভারতীয় বেরিয়ে পড়ে শহরের চতুর্দিকে, পকেটে থাকে তাড়া তাড়া নোট, ঢালাও হুকুম থাকে শহরের যে কোন মদের দোকানে যত খুশী মদ খাবার ও খাওয়াবার—[illegible] প্রত্যেকটী মদের দোকানের মালিককে "ভারতীয়" হ'তেই হবে, হুকুম আসবামাত্র তা তামিল করতে হবে, নইলে দোকানে জুয়াখেলার ব্যবস্থা রাখা চলবে না ; শুধু তা কেন, ব্যবসা করাই চলবে না এ শহরে। অগ্নিনির্বাপক বিভাগের আগাগোড়া সকল কর্মচারী ও চাকরী সোজাসুজি স্কুলির অধীন, তেমনি পৌরপ্রতিষ্ঠানের কারখানা অঞ্চলের আঞ্চলিক অফিসাররা সব ওর লোক ; অ্যাশ্‌ল্যাণ্ড অ্যাভেনিউর কোথায় ওর ফ্ল্যাট দেওয়া বাড়ী তৈরী হচ্ছে এক সার ; এগুলো তদারক করছে পৌরপ্রতিষ্ঠানের জনৈক ইন্সপেক্টর, মাইনেটা অবশ্য সে পাবে পৌরপ্রতিষ্ঠান হ'তেই। পৌরপ্রতিষ্ঠানের জলসরবরাহ বিভাগের

জনৈক ইন্সপেক্টর পূরো এক বছর আগে ইহধাম ত্যাগ করেছেন, এখনও কিন্তু পৌরপ্রতিষ্ঠানের খাতায় তাঁর নাম আছে, আর ভূত হ'য়েই হ'ক বা অন্য দেহ ধারণ করেই হ'ক, মাসে মাসে মাইনে তিনি ঠিকই নিয়ে চলেছেন। ফুটপাথ ইন্সপেক্টরটী জঙ্গীনারা সঙ্ঘের ক্লাব-ঘরের মদের দোকানটী দেখাশোনা করেন—ফুটপাথ ইন্সপেক্টর হিসেবে তিনি যে কোন দোকানদারের ব্যবসা অচল ক'রে দিতে পারেন—অবশ্য জঙ্গীনারা সঙ্ঘের সদস্য বনে' গেলে ব্যবসা অচল হবার আশঙ্কা থাকে না।

শুধু কি তাই? শোনা যায় প্যাকিংশহরের বড় বড় কারখানার মালিকরা পর্যন্ত তাকে ভয় করে। প্যাকিংশহরের অত্যাচারিতরা এ কথাটি বলে যেন আনন্দ পায়। কারণ, তারা মনে করে, অত্যাচারী মালিকরা আর স্কুলি একপক্ষীয় নয়; ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে স্কুলি জনসাধারণের মনে গেঁথে দিয়েছে যে ও জনসাধারণের আপনার জন, তাদের নেতা; নির্বাচন এলে এ কথাটা প্রচারের আর অন্ত থাকে না। কারখানার মালিকরা অ্যাশ্‌ল্যাণ্ড অ্যাভেনিউএর ওপর একটা পোল চেয়েছিল, কিন্তু স্কুলের সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত সেটা তৈরী হয়নি। বুদ্বুদ কাঁতারের ওপর সাঁকোর ব্যাপারটা আবার উল্টো হচ্ছিল; পৌরপ্রতিষ্ঠান হ'তে সাঁকোটী তৈরী ক'রে দেবার জন্য মালিকদের ওপর চাপ দিচ্ছিল, ফালতু কিছু খরচ হয়েছিল আর কি! স্কুলি এগিয়ে এসে ওদের রক্ষা করে। বুদ্বুদ কাঁতারটা শিকাগো নদীর একটা শাখা, কারখানা অঞ্চলটাকে বেষ্টন ক'রে আছে এই কাঁতারটা; এতেই গিয়ে পড়ে কারখানাগুলোর যত নর্দমার জল। ফলে, এটা কোথাও তিরিশ বত্রিশ, কোথাও প্রায় ষাট হাত চওড়া একটা খোলা ড্রেনে পরিণত হ'য়ে গেছে; বুদ্বুদ কাঁতারেরও আবার একটা বদ্ধ শাখা আছে, এখানে পচা জল চিরকাল ধরে' পচছে, অন্য জিনিষ পচাচ্ছে আর দুর্গন্ধের সঙ্গে রোগ ছড়াচ্ছে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও চর্বি বয়ে'

আনে কারখানার জল ; সবটা মিলে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত অদ্ভুত রূপান্তর গ্রহণ করছে অহরহঃ, ভুটভাটু অবিরাম বুদ্বুদ উঠছে, এই থেকেই খালটার নাম হ'য়েছে ; বুদ্বুদ ওঠার পরিমাণ দেখলে মনে হয় জলের নীচে বোধ হয় বিরাট বিরাট মাছ চার খাচ্ছে, বা অতিকায় কোন জলজন্তু অতি গভীরে বিচরণ করছে ; অঙ্গারক অম্ল গ্যাসের বুদ্বুদ উঠে ফেটে যাচ্ছে, জলের ওপর তৈরী হচ্ছে ফুট দুই চওড়া চওড়া বৃত্ত ; কোথাও চর্বি ও জঞ্জাল মিশে ভাসমান চাপড়ার সৃষ্টি হ'য়েছে ; দূর হ'তে এটাকে একটা গলিত ভূগর্ভ-প্রবাহ বলে' মনে হয়। চাপড়াগুলোর ওপর মুরগী চরে, অজ্ঞ পথিকরা হেঁটে পার হ'তে গিয়ে ডুব দিয়ে নেয় এই জলে। আগে এই চাপড়া জমতে জমতে চর্বিভেজা একটা ডাঙ্গার মত হ'য়ে যেত ; মধ্যে মধ্যে আগুন লেগে কাঁতারের ওপর বিরাট অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে যেত ; ফায়ার ব্রিগেড্‌কে আগুন নেভাতে হ'ত। কারখানার মালিকরা জল বা আগুন নিয়ে মাথা ঘামাত না। একবার এদের চেয়েও প্রতিভাশালী একটী লোক এসে হাজির ; এই ময়লা তুলে, তা' থেকে সে তৈরী করতে লাগল খাবার চর্বি। মালিকদের টনক নড়ল, তারা আদালতের হুকুম আনিয়ে তার ব্যবসা বন্ধ করে নিজেরাই লাগল ময়লা তুলে চর্বি করতে ; কাঁতারটার পার দুটো লোমে লোমে থিক থিক করত ; এটাও তাদের নজরে পড়ল, লোমগুলো সাফ হ'য়ে বুরুশ প্রভৃতি তৈরী হওয়ার কাজে লাগতে লাগল।

এখানকার গালগল্প অনুযায়ী এর চেয়েও অদ্ভুত জিনিষ হ'য়েছে এখানে। কাগজগুলো একবার হৈ হৈ করতে লাগল—কারখানার মালিকরা নাকি রাস্তার নীচের জলের প্রধান নল হ'তে চোরা নল লাগিয়ে পাওনার চেয়ে বেশী জল নেয়, অর্থাৎ চুরি করে। হৈ চৈ-এর ঠেলায় একটা অনুসন্ধান কমিটি বসান হল, মাটি খুঁড়ে চোরা নলের

ব্যবস্থাও বের হ'ল, তারপর যে কী হ'ল কেউ জানে না, শুধু জানল, কারও শাস্তি হয়নি। আর একবার শিকাগোর নাগরিকরা এদের পচা দূষিত মাংস বিক্রী বন্ধ করার আন্দোলন ক'রে এই সব কারখানায় মাংস পরীক্ষা করবার জন্য নিযুক্ত সরকারী পরীক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে লাগল; দেখা ক'রেই তাদের শান্তি, ভাবল রোগের কবল হ'তে রক্ষা-ব্যবস্থা করা হ'য়ে গেল; খালি, ঠিকে একটু ভুল হ'য়ে গেল—তারা বুঝল না বা জানল না যে এ সব কারখানার মালিকদেরই অনুরোধে এবং সরকারী মাইনেতেই ঐ একশো তেষট্টি জন ইন্স্‌পেক্টরের চাকরী হ'য়েছে এবং চলছে। এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা বা অধিকার ওদের নেই। এ শহরে এবং এই রাষ্ট্রে যে মাংস বিক্রী হবে, তার পরীক্ষার ভার আছে স্থানীয় রাজনৈতিক চক্রের তিনটী জী-হুজুরের ওপর। একবার এদের মধ্যে স্বাধীন মতের এক ডাক্তার ছিল; একবার সে আবিষ্কার করল, যে সব গোরুর যক্ষ্মা ছিল তাদের মৃতদেহে টোমেইনিস্‌ নামক অতি বিপজ্জনক বিষ থাকা সত্ত্বেও সে সব দেহ খোলাখুলিভাবে শহরের বাজারে বিক্রী করা হয়; তাই সে পরামর্শ দিল বিক্রীর আগে এই সব দেহে কেরোসিন ইঞ্জেকশান দেওয়া হ'ক, পরের সপ্তাহে তাকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে হ'ল। ওর ঐ টিপ্পনীতে মালিকরা রেগে কাঁই হ'য়ে গিয়েছিল; তাই ওর চাকরী খেয়েই সন্তুষ্ট হ'ল না তারা, জড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলবার ব্যবস্থা করলে—মাংস পরীক্ষার ব্যবস্থাই তুলে দিতে বাধ্য করালে মেয়রকে। এতদিন পরীক্ষার তবু একটা ভান ছিল, এবার তাও গেল। খালি যক্ষ্মাক্রান্ত গোরু হ'তেই এদের সপ্তাহে দু' হাজার ডলার রোজগার হ'য়ে যায় চুপিচুপি; এমনি আরও হাজার দুই ডলার রোজগার হয় ট্রেনে আনবার সময় কলেরায় মরা শূয়োরগুলোর চর্বি হ'তে। এ চর্বির কারখানা এখানে না ক'রে ওরা ইণ্ডিয়ানায় গ্লোব নামে একটা জায়গায় খুলেছে। ওস্তাদীটা পোক্ত

করবার জন্য সাধারণ চর্বি বলে' এই বিষাক্ত বস্তুটা বিক্রী না ক'রে, বহুপ্রকারের শ্রেণীভেদ, নাম, রঙ ও দাম ক'রে এটা বিক্রী করা হয়।

যাদের হাত দিয়ে এই সব মহৎ কাজ করান হয়, তাদেরই মুখে ইউরাঘস ধীরে ধীরে এগুলো শোনে; ওর মনে হয়, অন্য কোন ডিপার্টের লোকের সঙ্গে দেখা হ'লেই নতুন ধরণের আর একটা জুয়াচুরির কাহিনী বেরিয়ে পড়বে। যেমন ধরা যাক মেয়ারিজাদের টিনের কারখানার লিথুয়ানীয় কসাইএর বলা বিবরণটা। এর মালিকরাও অল্পস্বল্প মাংসের কারবার করত, নিজেরাই কিছু কিছু গোরু শূয়োর মারত। সে সব গোরু শূয়োরের বর্ণনা শুনলে ঐখানেই থাকতে হয়; বর্ণনায় দক্ষ দান্তে বা জোলা এ বর্ণনা শুনলে কাজে লাগত! লোকটা বলে, দেশের যত বুড়ো, রুগ্ণ, রোগযুক্ত, কানা, খোঁড়া জানোয়ার খুঁজে আনবার জন্য নিশ্চয় এদের দেশ জুড়ে দালাল লাগান আছে। গা-ভর্তি ঘা-ওয়ালা গোরু আসে। এ সব জীব হত্যা করা নাকি ভারী জঘন্য কাজ—ছোরা বসালেই পুঁয রক্ত ছিটকে এসে গায়ে মুখে লেগে যায়; হাত, জামার হাতা সব কিছুতেই এমনি পুঁয রক্ত থক থক করে যে চোখ-মুখ মোছবার পর্যন্ত উপায় থাকে না। এই সব জীব হ'তেই "প্রলেপ গোমাংস" তৈরী হয়; শত্রুর গুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যত সৈন্য মরেছে, তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী মরেছে এই মাংস খেয়ে;—কিন্তু খালি এদের দুষলে তো হবে না, সৈন্যদের টাটকা মাংস কোন কোম্পানীই সরবরাহ করে না, সৈন্যরা খায় নতুন রাসায়নিক পদার্থ মেশান পাঁচ সাত বৎসরের পচা মাংস।

এক রবিবারের সন্ধ্যা। রান্নাঘরে চুল্লির পাশে বসে' ইউরঘিস তামাক টানে। জোনাস ওদের ডারহামের কারখানার একজন মজদুরকে এনে পরিচয় করিয়ে দেয় ওর সঙ্গে। লোকটা ডারহামের কারখানায় কৌটোয় মাংস ভরার ডিপার্টে কাজ করে। অদ্ভুত অদ্ভুত

খবর বলে লোকটা ডারহামদের কীর্তিকাহিনীর। ডারহামরা নাকি পরশমণির বরপুত্র—লোহা থেকে সোনা তৈরী করতে না পারুক, গোদেহের আঁতরি, যকৃৎ, ফুস্ফুস্, পিলে, বাতিল অন্যান্য অংশ পিষে চটকে মসলা মাখিয়ে কৌটোয় পুরে দেয় আর বস্তুটা নানা নামের ও দামের শূকরমাংস হ'য়ে যায়; 'ছত্রাকভোগ' তৈরী করে ওরা অথচ কারখানার কেউ ছত্রাক কখন দেখেনি পর্য্যন্ত; হাজার হাজার কৌটো "মোরগ পাতরি" তৈরী হয় কারখানায়, অথচ একটা মোরগও কখন ওখানে আনতে দেখা যায় না;—এ যেন বোর্ডিং বাড়ীর গল্প: রবারের মোজা প'রে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল একটা মোরগ আর জলটা হ'য়ে গেল মোরগের ঝোল! জিনিষটা আসলে তৈরী হয় গোরুর কণ্ঠ-নালী, পায়ু, আঁতরি, পচা বাসি বাতিল মাংসের টুকরো পিষে রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে রঙ ও স্বাদ বদলে। গোদেহের এই সব অংশ হ'তে শূকরমাংস, মুরগীমাংস, ছত্রাকভোগ প্রভৃতি কত কী তৈরী হ'য়ে যাচ্ছে। ডারহামের তৈরী এ সব মাংস অতিবিখ্যাত—জাতীয় সম্পদ্! নতুন কোন নকল বস্তু আবিষ্কার করতে পারলেই ডারহামদের কাছ হ'তে মোটা ইনাম পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে এত সূক্ষ্মবুদ্ধি নকলনবীশ আছে যে নতুন কোন নকল বস্তুর আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এরা আবার গোরু কিনে কিছুদিন রাখে; সে সব গোরুর যক্ষ্মা হওয়াটা এদের একান্ত কাম্য—কারণ যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায় গোরু তাড়াতাড়ি মোটা হয়, তখন কাটলে বেশী মাংস পাওয়া যায়। বিভিন্ন শহরের দোকান হাতড়ে এরা যত পচা মাখন কিনে আনে, তারপর তাতে রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে, তার মধ্যে দিয়ে জোর ক'রে হাওয়া চালিয়ে গন্ধটা উড়িয়ে দেয়, গন্ধ গেলে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় কাঁচা চামড়া-পেষা রস—ব্যস্, খাঁটি, অকৃত্রিম ও টাটকা মাখনের চৌকো বনে' যায়

—বাজারে হু হু ক'রে বিক্রী হয় এই অভূতপূর্ব "মাখন"। বছর দুই আগে সার তৈরীর অজুহাতে এই সব কারখানায় বুড়ো রুগ্‌ণ ঘোড়াও মারা হ'ত। অনেক আন্দোলন ক'রে কাগজগুলো জনসাধারণকে বোঝায় যে প্রকৃতপক্ষে এই সব ঘোড়ার মাংস টিনে ভরে' গোমাংস বা শূকরমাংস বলে' বিক্রী করা হয়। এখন এখানে আইন হ'য়ে গেছে প্যাকিংটাউনের কারখানায় অশ্বহত্যা চলবে না—এ আইনটা সত্যি সত্যিই ওরা এখনও মেনে চলেছে। যে কোনদিন কারখানার দিকে গেলেই দেখা যাবে ভেড়ার সঙ্গে ছাগলও রয়েছে অনেক। এই সব ছাগের মাংস দিয়ে বেমালুম মেষমাংস হ'য়ে যাচ্ছে—জনসাধারণকে এ কথা বোঝায় কে?

প্যাকিংশহরে আর একটী বেশ মজার তথ্য সংগ্রহ করা যায়—অন্যের কাছে মজার হ'লেও মজদুরদের কাছে সেটা মজার নয় আদৌ—এটা কারখানায় কাজ করার ফলে তাদের যে সব অসুখ হয় তারই হিসাব। স্তেদবিলাসের সঙ্গে প্রথম যেদিন ইউরঘিস জীবদেহ হ'তে বহুপ্রকারের বস্তু তৈরী হ'তে দেখে, দেখে বড় কারখানার শাখা হিসাবে আর বহুপ্রকারের ছোট ছোট কারখানা গড়ে' উঠেছে, সেদিন সে এদের কর্মকুশলতা, এদের বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিল। এখন দেখে ছোট ছোট কারখানাগুলি হত্যামঞ্চের মতই এক-একটী নরক। তাদের প্রত্যেকটীতে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যাধি আছে। নবাগত দর্শকের কাছে বহুপ্রকারের জোচ্চুরির কথা কাহিনী মনে হ'তে পারে, কিন্তু শ্রমিকদের দেহের ওপর স্পষ্ট ব্যাধিটা বলার বা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, এক-একসময় তাদের যে কেউ হাত বাড়ালেই যথেষ্ট।

চাটনি-ঘরের কথা ধরা যাক; বুড়ো অ্যাণ্টেনাস তার মৃত্যু কুড়িয়ে আনে এখান হ'তেই। দেহে কোন-না-কোন ব্যাধির বিভীষিকার ছাপ

নেই এমন শ্রমিক এখানে নেই বললেই চলে। ঠেলাওয়ালাদের কেউ একবার আঙ্গুল চুলকোলেই হ'য়েছে! সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষতটা তৈরী হবে তারই দৌলতে সে ভবসিন্ধু পার হ'য়ে যেতে পারবে স্বচ্ছন্দে; এ এক দিনে নয় অবশ্য; অ্যাসিডের প্রভাবে একটার পর একটা আঙ্গুলের গিঁঠ আস্তে আস্তে খুলে পড়বে। কসাই, মেঝের শ্রমিক অর্থাৎ জন্তুদেহ হ'তে কেটে ফেলা অংশগুলো যাদের কাটাকুটি করতে হয়, হাড়-চাঁচা দল, এমনি যারা ছোরা ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশেরই হাতের বুড়ো আঙ্গুল বস্তুটী নেই; এর ভিতেটা কতবার যে ছাঁটা হ'য়ে যায় তার ঠিকঠিকানা থাকে না; বুড়োআঙ্গুলের জায়গাটায় একটা মাংসের ঢিবুলি হ'য়ে আছে, ধরে' রাখবার জন্য তারই ওপর ওরা চেপে ধরে' থাকে ছোরাটাকে। ওটা বাদ দিলে বাকী হাত তুটো কেটে কেটে কর্ষিত ভূমির মত হ'য়ে গেছে; কাটার দাগ গোণবার চেষ্টা এখানে প্রতি-ক্ষেত্রেই বৃথা হ'তে বাধ্য। চামড়া টেনে টেনে আঙ্গুলগুলো নখহীন, আঙ্গুলের গোড়াটা ডাব হ'য়ে ফুলে থাকে, সেখান হ'তে বেরিয়ে থাকা আঙ্গুলগুলোকে আলাদা করা যায় না, দেখলে একখানা পাখা মনে হয়। রান্নাঘরের গরমে, ভাপে, দুর্গন্ধে, কৃত্রিম আলোতে মানুষের আয়ু ক্ষীণ হ'য়ে এলেও যক্ষার জীবাণু সেখানে দু'টী বৎসর বহাল-তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারে, তবু প্রতি ঘণ্টায় নতুন নতুন বীজাণুদল সরবরাহ করা হয় এখানে। ভোর চারটে হ'তে গোমাংস-বাহকদের কাজ সুরু হ'য়ে যায়; আড়াই মণ ওজনের গোমাংস বইতে হয় ওদের প্রতি ক্ষেপে; এই ভয়াবহ কাজের চাপে অতি শক্তিশালী জোয়ানও ভেঙ্গে পড়ে কয়েক বছরের মধ্যে। ঠাণ্ডিঘরে কাজ করে যে সব শ্রমিক, তাদের নিজস্ব ব্যাধি হচ্ছে বাত—এখানে পাঁচ বছরের বেশী কেউ নাকি কাজ করতে পারে না। চামড়া হ'তে পশম তোলে যারা তাদের আঙ্গুল চাটনি-ঘরের শ্রমিকদের আঙ্গুলের অনেক আগে ক্ষয়ে যায়।

পশম ঢিলে করবার জন্য তাতে আগে অ্যাসিড মাখান হয়; তারপর শ্রমিকরা নাঙ্গা হাতে সেগুলো টেনে তোলে, কাজ শুরু করার কয়েকদিন পর হ'তেই অ্যাসিডে আঙুল ক্ষইতে সুরু করে। টিনের কৌটো তৈরী করে যারা তাদের হাতও কেটে-কেটে কাটা দাগের চষা ভুঁই হ'য়ে থাকে, যে কোন ক্ষত হ'তে রক্ত বিষিয়ে যাবার ভয় থাকে। ভারী ধারাল মোহর দ্রুত তুলে ফেলে যারা চামড়ায় ছাপ মারে ক্লান্তিকর একঘেয়ে কাজে শীঘ্রই তাদের গতি কমে আসে, কিছুক্ষণ কাজের পর নিজের নামসুদ্ধ ভুলে যায় তারা, কখন পশুদেহ ছেড়ে নিজের হাতেই ভারী মোহরটার ছাপ দিয়ে বসে। "উত্তোলক" অর্থাৎ যারা মৃত পশুদেহ হাতল চেপে ওপরে ওঠায়, তাদের ব্যাধিটা দাঁড়ায় এদের সবার হ'তে আলাদা; ওপরের কড়িবরগার ওপর দিয়ে তাদের হাঁটতে হয়, দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নীচে; ওদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে কড়িবরগা লাগান হয়নি; যে কড়িবরগাগুলোর ওপর দিয়ে ওরা হাঁটে তার ফুট চার ওপরে আর এক সেট কড়িবরগা আছে; আট দশ পা চলবার পরই মাথায় লাগবার সম্ভাবনা, তাই ওরা সোজা হ'য়ে চলাই ছেড়ে দেয়; সমস্ত সপ্তাহটা এই রকম ঝুঁকে চলার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ওরা বনমানুষের মত ঝুঁকে বেঁকে বেঁকে চলতে থাকে। এ সব তবু তো ভদ্রস্থের মধ্যে আছে; সার তৈরীর কারখানা বা রান্নার কারখানায় শ্রমিকদের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। সার-কারখানার শ্রমিকদের সমস্ত দেহে সকল সময় এমন দুর্গন্ধ ছাড়ে যে তাদের একশো গজের মধ্যে কারও যাওয়াই মুস্কিল। আর রান্নার কারখানায় মেঝের সঙ্গে সমতল ক'রে কতকগুলো গামলা বসান আছে, এগুলিতে ফুটন্ত জলে মাংস সিদ্ধ হয়; ঘরখানা সব সময়ই বাষ্পে ভরপূর থাকে, তার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের হর্দম ছুটোছুটি করতে হয়; ফলে মাঝে মাঝেই দু'একজন ক'রে ফুটন্ত জলের গামলায় পড়ে যায়; ছেঁকে তুললে

দেখাবার মত দেহের বিশেষ কিছু থাকে না; আবার অন্যের খেয়াল না থাকায় যারা দু'চার দিন ওই সব গামলায় থাকে তাদের হাড় ক'খানা বাদে দেহের বাকী অংশটা "ডারহামের খাঁটি পত্র চর্বি" হ'য়ে বাজারে চলে যায়।

দশম অধ্যায়

শীতের প্রথমদিকটা খাওয়া-পরা চালিয়েও ইউরখিসরা ধার বাবদ কিছু কিছু দিয়ে এসেছে; কিন্তু ইউরখিসেরই হপ্তার মজুরী ন'-দশ ডলার হ'তে পাঁচ-ছ' ডলারে নেমে আসাতে, সংসার চালানই মুস্কিল হ'য়ে উঠল, দেনা শোধ মাথায় উঠল। শীত যায়, বসন্ত আসে; ওদের দৈন্যদশার কিন্তু পরিবর্তন হয় না; কর্পূরের মত রোজগার কখন যে একেবারে উবে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই, অথচ চাকরী না থাকলে, কি রোগ হ'লে একটা মাস, মাত্র একটা মাস চালাবার মত সংস্থানও ওরা ক'রে রাখতে পারে না। মেয়ারিজার সে সাহস আর নেই, হতাশ হ'য়ে পড়ে বেচারা; টিনের কারখানা খোলবার কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না এখনও। ভবিষ্যতের স্বপ্ন সফলের আশায় যা-কিছু জমিয়েছিল তাও ফুরিয়ে এসেছে। বিয়ে করার কল্পনা অন্ততঃ এখনকার মত ছেড়ে দিতে হয় ওকে; খালি নিজেরটা দেখলেই তো চলবে না, ওর সাহায্য না পেলে এ-সংসারটা অচল হ'য়ে যেতে পারে। আবার আর একদিক দিয়ে ও বোঝা হ'য়ে পড়তে চলেছে এদের ওপর, ওদের সামান্য আয়ের ওপর বসে না থাক, ওর পুঁজি নিঃশেষ হ'য়ে গেলে ওদের কাছে ওর যা পাওনা আছে তার কিছু কিছু ক'রে নিতে হবে তো, নইলে ও বাঁচবে কেমন ক'রে? ইউরখিস, ওনা ও টেটা

এলজবিয়েটা গভীর রাত্রি পর্যন্ত চিন্তিতমুখে পরামর্শ করে—মেয়ারিজারও টাকাটা বন্ধ হ'য়ে গেলে কী ক'রে চালাবে ওরা, কী ভাবে রুখবে অবশ্যম্ভাবী কাঠ-উপোসকে ?

টাকা টাকা টাকা—এমন ক্ষণ নেই, এমন মুহূর্ত নেই যখন ওরা টাকার চিন্তা করতে বাধ্য না হয়—অবিরাম ঐ দুশ্চিন্তা—এই হ'ল ওদের জীবন, অভাব আর অভাব, প্রতিনিয়ত তার সমাধান ক'রে ওদের বেঁচে থাকা। বিস্ময়কর দৈবঘটনার মত একটা অভাবের সমাধান হয় যদি, তো সামনে এসে দাঁড়ায় আর একটা সঙ্কট। এক-দিকে অমানুষিক দৈহিক পরিশ্রম, আর একদিকে বিরাম-বিশ্রামহীন এই মানসিক টানাহাঁাচড়া ; কাজের সময় সুখ নেই, বিশ্রামের সময় মনের বিশ্রাম নেই, জেগে শান্তি নেই, ঘুমিয়ে শ্রান্তি ঘোচে না। একে বাঁচা বলে না, টিঁকে থাকাও বলা যায় কিনা সন্দেহ, কিন্তু এইভাবে ধড়ে প্রাণে এক ক'রে রাখার জন্য মূল্য তো ওদের কিছু কম দিতে হয় না। সমস্ত সময় তারা খাটতে রাজী, খাটছেও কিছু কম নয়, কিন্তু তার বদলে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাঁচবার অধিকারও কি ওরা পাবে না !

হর্দম কেন, কেন আর কেন,—কেনাকাটার যেন আর শেষ নেই, যে খরচের কল্পনা পর্যন্ত কাল রাত্রে করেনি, আজ সকালে উঠেই দেখে তেমনি একটা খরচ অপরিহার্য হ'য়ে সামনে এসে হাজির হ'য়েছে। একবার জলের নলে জল জমে বরফ হ'য়ে নল ফেটে গেল ; অজ্ঞতা ওদের অপরিসীম ; সহজতম পন্থা হিসাবে ওরা ঠুকে বের ক'রে দেয় জমা বরফটা ; আর যায় কোথা, ঘরে বান ডাকে ! পুরুষরা তখন কেউ বাড়ীতে নেই, এলজবিয়েটা চ্যাঁচামেচি ক'রে ছুটোছুটি করে রাস্তায়, এ বান কখনও শেষ হবে কিনা, না এতেই ওদের চরমধ্বংস সমাসন্ন তাও ও জানে না। শেষেরটাই একরকম সত্যি হ'য়ে দাঁড়ায়—জলের

কলের ইঞ্জিনিয়ার কাজের ঘণ্টাপিছু পঁচাত্তর সেণ্ট, তার সহকারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজটা দেখার জন্য মোট পঁচাত্তর সেণ্ট, এটা-ওটা জিনিষপত্তর তো কিনতেই হবে, নইলে কল সারতে ডাকা কেন ?—ঘরে বাইরে করতে করতেই ওদের ঘণ্টা বেড়ে যায়। জানুয়ারীর জন্য বাড়ীর কিস্তী দিতে গিয়ে দালাল মহোদয়ের প্রশ্ন শুনে এল. বাড়ীর বীমা এখনও করা হয়েছে, না হয়নি ? ওদের পাল্টা প্রশ্নের উত্তরে তিনি চুক্তিনামার একটা ধারা দেখিয়ে দেন—বাড়ী নেবার এক বৎসর পর বাড়ীর জন্য এক হাজার ডলারের একটী বামা করতে হবে; বছর শেষ হ'তে তো আর মাত্র ক' দিন। এ আঘাতটাও পড়ে বেচারী এলজবিয়েটার ওপর। প্রশ্ন ক'রে জানে, বীমা বাবদ মাসে সাত ডলার ক'রে অতিরিক্ত খরচ হবে। ক্রোধে উদ্‌ভ্রান্ত ইউরঘিস এজেণ্টকে বলে, কোন্ কোন্ ফিকিরে কত খরচ হ'তে পারে তার মোট একটা ফিরিস্তি দিয়ে দিন; দিলে বাধিত হবে ওরা। আর ক্রোধ হয় না ওর, কথা কইতে গেলে শ্লেষ আসে, নতুন জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছে তো। শ্লেষ মাখিয়েই বলে, চুক্তিতে সই তো ক'রেই ফেলেছি; চুপ মেরে থেকে আপনার আর বেশী লাভ হবার আশা নেই, বলে ফেলুন না, কী কী গ্যাঁড়াকল আর আছে বলে ফেলুন না। কথায় শ্লেষ, মুখে হাসি মাখান থাকলেও চোখে ইউরঘিসের লঘুত্বের লেশমাত্র নেই, তীব্র দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে এজেণ্টের দিকে। আইনসম্মত এবং শিষ্টাচারসঙ্গত মামুলী প্রতিবাদ করবার চেষ্টামাত্র না ক'রে এজেণ্ট তাকে চুক্তিনামাখানা আর একবার পড়ে' শুনিয়ে দেন। প্রতি বৎসর বীমাটি নূতন ক'রে করিয়ে নিতে হবে; বাৎসরিক দশ ডলার হিসাবে একটা খাজনা দিতে হবে; বাৎসরিক ছয় ডলার জলকর দিতে হবে—(নিঃশব্দে ইউরঘিস জলের কলটা বন্ধ করতে মনস্থ করে); এই, আর মাসিক কিস্তী আর আগের বলে দেওয়া মাসিক সুদটা, ব্যস ! তবে শহরের

পৌরপ্রতিষ্ঠান যদি ভূগর্ভ নালী কি ফুটপাথ তৈরী করতে চায়, তা হ'লে—এজেন্ট মশায় আর কী করবেন—আর কিছু ট্যাক্স লাগবে বৈকী! ওরা নালী বা ফুটপাথ চা'ক বা না চা'ক পৌরপ্রতিষ্ঠান যদি চায় তা হ'লেই ট্যাক্স লাগবে। তা আর কত লাগবে! সামান্যই। নালীর জন্য বাইশ ডলার আর ফুটপাথ কাঠের হ'লে পনের, সিমেন্টের হ'লে পঁচিশ ডলার লাগবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ইউরঘিস বাড়ী ফেরে—কু-খবরের শেষ জেনে এসেছে ও, ভবিষ্যতে ওকে আর হকচকিয়ে দেওয়া যাবে না। ও দেখে বোঝে, কী ভাবে ওদের সর্ব্বস্ব লুঠের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে; কিন্তু মাথা গলিয়েছিল ওরাই, ফেরবার পথও আর নেই। এখন লড়তে হবে আর এগোতে হবে, এগোতে হবে আর লড়তে হবে; পরাজয়ের পরিণাম ভাবতে কেঁপে ওঠে ও।

বসন্ত আসায় শীতের হাত হ'তে রক্ষা পেলে ওরা—এটা কম কথা নয়। হিসেব করেছিল, কয়লার খরচটা এবার বেঁচে যাবে; কিন্তু ঠিক এই সময় হ'তে মেরিজার দেওয়া টাকাটা বন্ধ হ'য়ে যায়। তারপর প্রতিটী ঋতুরই এক-একরকমের অত্যাচার আছে; ও অঞ্চলে বসন্তকালেই বৃষ্টি হয়; দু'-চার দিন বৃষ্টির পর পথ-ঘাট খাল-বিলে পরিণত হয়; ঘোড়া পেট পর্যন্ত আর গাড়ীর চাকা ধুরি পর্যন্ত পাঁকে পুঁতে যায়; শুকনো পায়ে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রেখে এক পা বেরোবার উপায় থাকে না। অন্যান্য শ্রমিকদের মত এদের প্যাণ্ট-জুতোও কোনরকমে জড়িয়ে লাগিয়ে রাখা যায়; অতি মূল্যবান সে জীর্ণ পদার্থগুলি একবার কর্দমাক্ত হ'লে কষ্টটা কাদার মতই অপরিমেয় হ'য়ে দাঁড়ায়। পুরুষদের তবু তো যেমন তেমন, ছোট ছেলে আর স্ত্রীলোকদের অবস্থা দাঁড়ায় সঙ্গীন। দিন কেটে যায় তবু।

এল গ্রীষ্ম। ডারহামের জানালাহীন হত্যামঞ্চে ভাপ্‌সানি গরমের

ডিগ্রী ওঠে সেদ্ধ ক'রে ফেলবার পর্যায়ে; একদিন তো হত্যামঞ্চে এক এক ক'রে তিন তিনটে শ্রমিক কাজ করতে করতে টুপ টুপ ক'রে পড়ল আর মরল—একই দিনে তিনজন। তাজা গরম রক্তের স্রোত বয় মেঝেয় সমস্ত দিন, দিন বাড়ে—সূর্য চড়ে আকাশের মাথায়, রক্তস্রোতের তাপ বাড়ে, পুরুষানুক্রমে দেওয়াল থাম ছাতে জমা ঘুমন্ত ময়লাবাসী দুর্গন্ধগুলো জেগে ওঠে সূর্যতাপের পরশে; এদের এখানে আস্তানা বহুকালের,—ছাত, থাম, দেওয়াল, দোর ধোওয়া হয় না কখনও। এখানকার শ্রমিক এখন কর্মান্তে দিনান্তে সান্ধ্য হাওয়ায় বেরিয়ে আসে দুর্গন্ধের চলমান স্তম্ভ হ'য়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা চলবে না; ওদের মধ্যেও ছিমছাম স্বভাবের লোক ছিল, আছে এখনও তারা, তবে সে স্বভাব তারা ছেড়ে দিয়েছে—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যায় না, থাকবার উপায় নেই। পরিষ্কার থাকার বদস্বভাবটা ছাড়তে হয় শেষ পর্যন্ত সকল শ্রমিককেই। গা ধোওয়া বা স্নান তো দূরের কথা, হাত ধোবার পর্যন্ত জায়গা নেই একটা কারখানার ভেতর; কনুই পর্যন্ত গো-রক্ত মাখান থাকে, তাই নিয়ে ওরা টিফিনের খানাটা খেয়ে নেয়, খানার সঙ্গে মুফৎ গো-রক্ত মাখান হ'য়ে যায়। কাজ করবার সময় মুখ মোছবার পর্যন্ত সময় পায় না ওরা—নবজাতকের মত নিরুপায়ভাবে মুখে হাতে গায়ে সব কিছু মেখে থাকে ওরা; প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ হয়, শীতে চড়চড় করে, কিন্তু গ্রীষ্মে অবস্থাটা অসহনীয় হ'য়ে দাঁড়ায়—মাথা মুখ ঘাড় গর্দান হ'তে ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল হয়তো জামার ভেতর, মোছবার উপায় নেই; মুখের উপর মাছি বসে, মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে ঘামমেশান রক্ত খায় কিন্তু তাড়াবার উপায় নেই, সময় নেই। জলা, ময়লা না হত্যামঞ্চ—কিসের জন্য বলা যায় না, গ্রীষ্ম এলেই প্যাকিংটাউন মাছিতে থিক্ থিক্ করে, দেওয়াল মেঝে কপাট সকল কিছু কাল ক'রে গায়ে গা লাগিয়ে বসে থাকে এরা। অব্যাহতি নেই

এদের অত্যাচার হ'তে—দোর জানালা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকলে অবশ্য অন্য কথা কিন্তু দোর বা জানালা খুললে আর অব্যাহতি নেই, ঝড়ের একটা ঝাঁকির মত এক ঝাঁক ঢুকে পড়বে ঘরের ভেতর।

গ্রীষ্ম এলে এদের অনেকের মনে পড়ে দেশের গ্রামের কথা—সবুজে-সবুজ মাঠ, বনানীর শ্যামলিমায় ঢাকা পাহাড়, স্বচ্ছ নীল জলভরা হ্রদ। কিন্তু মনে পড়বার সুযোগ বা সময় এদের কই? প্যাকিং কারখানার বিরাট যন্ত্র সবুজের স্বপ্ন না দেখেই আবর্তিত হ'য়ে চলেছে, এরাও—স্ত্রী পুরুষ শিশু মজদুররাও—কাজ ক'রে চলেছে তার সঙ্গে ছন্দ রেখে নয়, গতি বাড়িয়ে; সবুজের মায়ার স্থান এখানে নেই। সবুজ তো সবুজ, একটা ফুল পর্যন্ত মাথা গলাতে পারে না এখানকার ফাঁকে ফাটলে। এখান হ'তে মাইল চার পাঁচ দূরে মিশিগান হ্রদ—কিন্তু তাতে লাভ কী ওদের? চার পাঁচ মাইল দূরে থেকেও ওদের যে লাভ, শ' চার মাইল দূরে থাকলেও ওদের সেই লাভই হ'ত। রবিবারটা অবশ্য ছুটি থাকে, কিন্তু এত ভীষণ ক্লান্ত হ'য়ে থাকে ওরা যে অতদূর হেঁটে গিয়ে হ্রদের ছলছলানি দেখবার সখ আর কারও থাকে না। ঐ যন্ত্রের সঙ্গে ওরা বাঁধা, যাবজ্জীবন বাঁধা। ম্যানেজার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কেরাণী প্রভৃতি অন্য শ্রেণী হ'তে নেওয়া হয় এখানে, দক্ষতা থাকলেও মজদুর শ্রেণীর কাউকে এ সব পদে নিয়োগ করা হয় না। তাঁরা ভদ্র-লোক, এরা ছোটলোক! ভদ্রলোকদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র অতি নীচও এদের সাধ্যমত ঘৃণা করে। ডারহামের একটা কেরাণী হপ্তায় ছ' ডলার হিসেবে গত বিশ বৎসর এখানে কাজ করছে, আরও বিশ বৎসর কাজ করলেও যে মজুরী বাড়বে তা মনে হয় না,—হ্যাঁ, এদের পারিশ্রমিকটা মজুরী নয়, মাইনে! তবু হতভাগা দক্ষতম শ্রমিকের চেয়ে নিজেকে উন্নত মনে করে, আলাদা ফ্যাশনে জামাকাপড় পরে, শহরে এদের থেকে উল্টো দিকে থাকে, একটু আলাদা সময়ে অফিস

(কারখানা নয়, অফিস) আসে—মোটের ওপর যত রকমে এই সব ঘৃণ্য মজদুরদের হ'তে আলাদা থাকতে পারে তার জন্য সাধ্যমত সর্ব-প্রকার চেষ্টা করে। এখানকার মজদুরদের অতি জঘন্য কাজ করতে হয় বলেই হয়তো কেরাণীদের মধ্যে এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি হ'য়েছে। মোট কথা, মজদুরদের অপাংক্তেয় ক'রে রাখা হ'য়েছে যে সেটা অন্যরা আচারে-ব্যবহারে অহরহঃ ওদের অনুভব করিয়ে ছাড়ে।

বসন্তকালের শেষাশেষি টিনের কারখানা আবার কাজ সুরু করল, মেয়ারিজার আবার কাজ হ'ল; ওর অবসাদ বিষাদ কেটে গেল; ট্যামস্তসিয়সের বেহালার সুর আর অত করুণ রইল না। কিন্তু একটা মহাবিপৎপাত ঘটে গেল মেয়ারিজার জীবনে; টিনরঙার কাজ ঠিক এক বৎসর তিন দিন করার পর ওর চাকরী গেল। চাকরীটা গেল, কিন্তু কেন গেল কেউ বলল না। মেয়ারিজা বলল, ইউনিয়নে কাজ করার জন্য চাকরীটা ওর গেল।

সে এক দীর্ঘ কাহিনী। মালিকরা অবশ্য প্রতিটী ইউনিয়নে চর রেখেছে, প্রয়োজনমত কয়েকটী ইউনিয়ন-কর্মকর্তাকে কিনে রাখাও প্রথায় পরিণত করেছে ওরা। ইউনিয়নে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট প্রতি সপ্তাহেই মালিকরা নিয়মিত পায়; কী হচ্ছে বা হ'য়েছে নয় শুধু, কী হবে তার খবরও ইউনিয়ন-সদস্যরা জানবার অনেক আগেই মালিকরা জেনে বসে থাকে। তারা যাকে বিপজ্জনক ভাবে, যত ভাল কাজই সে করুক, অফিসারের সুনজরে থাকবার আর তার জো নেই। বিদেশীদের মধ্যে মেয়ারিজা ইউনিয়নের কাজ ভাল চালিয়ে যাচ্ছিল। সে যাই হ'ক, কারখানা বন্ধ হবার আগে মালিকরা মেয়ারিজাকে ওর রঙান তিনশো টিনের দাম আর দেয় না। মেয়ে-শ্রমিকরা যে সব টেবিলে কাজ করে, সেগুলির সামনে দিয়ে একজন মেয়ে-কেরাণী কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের কাজের হিসেব

রাখে। মেয়েটা মানুষ, তারও মাঝে মাঝে ভুল হয়, কিন্তু একবার মজুরী কম করা যাবে এমন ভুল হ'লে তার আর চারা নেই, কোন প্রতিকার নেই। শনিবারে পাওনার চেয়ে কম মাইনে পেলে, সুবোধ বালকের মত তাই নিতে হবে হাসিমুখে, প্রতিবাদ করা চলবে না, করলে চাকরীটা খতম হওয়া ছাড়া অন্য ফল হবে না। মেয়ারিজা কিন্তু এই সরল হিসেবটা বুঝতে পারে না, ঐ নিয়ে গোলমাল করতে থাকে। তার গোলমালের অবশ্য কোন অর্থ নেই এখানে, চ্যাচামেচি করেছে ও পোল ও লিথুয়ানীয় ভাষায়, তার বিন্দুবিসর্গ এরা জানে না; অন্যায়ের প্রতিবাদ ও যত জোরে করেছে, ওরা তেমনি প্রাণভরে হেসেছে; ক্ষোভে দুঃখে ও শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলে। এ সব আগের কথা। এখন ও চোস্ত ইংরেজীতে খিস্তি ক'রে গালাগাল করতে পারে; হিসাব-রক্ষিণী মেয়েটা ইদানীং ভুল ক'রে আর ওর জিভের আঘাত হ'তে অব্যাহতি পেত না। মেয়ারিজা বলে, ও ইচ্ছে ক'রেই এক-একজনের কাজের ভুল হিসেব রাখত; ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাই হ'ক, মেয়ারিজার কাজ সম্বন্ধে ভুল তার প্রায়ই হয়। প্রতিবাদ বা গালাগালে কাজ হয় না দেখে মেয়ারিজা এবার রণং দেহি হ'য়ে দাঁড়ায়; প্রথম নালিশ করে ওদের প্রধানার কাছে, সেখানে সন্তোষজনক ব্যবহার বা প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি না পেয়ে ও চলে যায় একেবারে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে। এতখানি হিম্মত, এত বেয়াদবী এখানে আগে কেউ দেখা দূরে থাক শোনেনি পর্যন্ত। যা হ'ক, সুপার সাহেব জানান, দেখবেন তিনি এ বিষয়ে। মেয়ারিজা বোঝে, তা হ'লে ওর ন্যায্য পাওনা ও নিশ্চয় পাবে এবার। তিন দিন অপেক্ষা করার পর সুপার সাহেবের সঙ্গে ফের দেখা করতে যায় ও। এবার বড়সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বলেন, ও সব ব্যাপারে নজর দেবার সময় নেই তাঁর। সহকর্মীরা এমনটি আর না করতে পৈ পৈ ক'রে উপদেশ দেয় ওকে। কে কার কথা শোনে!

ও ফের যেতেই ভদ্রলোক বেশ চটে ওঠেন এবার। তারপর ভেতর ভেতর কী হয়েছে মেয়ারিজা জানে না। বিকেলের দিকে প্রধানা ওকে ডেকে জানিয়ে দেয়, ওর কাজের আর প্রয়োজন নেই। প্রধানা ওর মাথায় গাঁট্টা মারলেও হয়তো মেয়ারিজা এত অ-বাক্ হত না। প্রথমটা ও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি; কিছুক্ষণ পর একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে চেঁচাতে সুরু করে, নিজের অধিকারে চাকরী করছে ও কারও মেহেরবানীতে নয়, চাকরী ও আদায় করবেই করবে। রাগের পালাও ফুরিয়ে যায়; তখন মেঝেয় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ও কাঁদতে সুরু করে।

মাথামোটা মেয়ারিজা অন্যের উপদেশ শোনেনি সত্যি, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর শিক্ষা হ'ল ওর মোটাবুদ্ধির জন্য। সুযোগ বুঝে প্রধানা জানিয়ে দেয়, এবার যদি কোথাও কাজ পাও তাহ'লে মনে রেখো সব সময় কী কদরের মানুষ তুমি! তা তো হ'ল; এখন ও বাড়ী ফেরে নিষ্ঠুর সংবাদটা নিয়ে; তারা কেউ টিপ্পনী কাটে না, টিপ্পনী কাটবার মত সংবাদ এ নয়, এ তাদের বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব ক'রে তোলবার মতটাএক সমস্যা।

এ সময় আঘাত আরও বেশী ক'রে লাগে: ওনার সন্তান হবে। এর জন্য ইউরঘিস অতি কষ্টে কিছু কিছু সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছিল। প্যাকিংশহরে "ধাত্রী"রা সংখ্যায় মাছির মতই; তাদের বিদ্যা ও কীর্তির বহু লোমহর্ষক কাহিনী এরা শুনেছে, তাই ঠিক করেছিল ধাত্রী না ডেকে একজন পুরুষ ডাক্তার ডাকবে ওরা। একবার ধরলে ইউরঘিসকে আর না করান যায় না; মেয়েরা বলে, এ সব ব্যাপারে পুরুষ কেন আবার? যত সব অসৌষ্ঠব, এটা মেয়েদেরই রাজ্যান্তর্গত একটা ব্যাপার। সস্তা-তম ডাক্তারেরও রোগীর বাড়ী আসার মজুরী কমপক্ষে পনেরটা ডলার, এর ওপর বিল এলে দেখা যাবে, এদিক

ওদিক ক'রে আর দু' চার ডলার চেপে গেছে—ইউরঘিস বলে, তা হ'ক, তাই খরচ করবে সে, না খেয়ে থাকতে হয় সোভি আচ্ছা।

মেয়ারিজার এখন মোট পুঁজি পঁচিশটী ডলার। দিনের পর দিন ও কারখানাগুলোর ফটকে ফটকে কাজ ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়; কাজ হয় না। মন প্রফুল্ল থাকলে মেয়ারিজা জোয়ান পুরুষের সমান কাজ করতে পারে, কিন্তু এখন হতাশায় এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, বিশেষ ক'রে সারাদিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর রাত্রে যখন ফেরে, ওকে দেখলে মায়া লাগে তখন। খুব শিক্ষা হয়েছে এবার ওর, দরকারের চেয়ে দশ গুণ বেশী শিক্ষা হ'য়ে গেছে—ওর সঙ্গে সমগ্র পরিবারটাই শিক্ষা পেয়ে গেছে—ওরা শিখেছে, কাজ পেলে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে, যাই হ'ক না কাণ্ড চলবে না।

চার সপ্তাহ পুরো এবং পঞ্চম সপ্তাহের অর্ধেক ও চাকরী খুঁজে ফেরে; ইউনিয়নের চাঁদা আর দেয় না, বোকার মত ইউনিয়নের ফাঁদে মাথা গলিয়েছিল বলে' নিজেকে এখন গাল দেয় ও। ধরে' নেয় ও, সব কিছুই শেষ হ'য়ে গেছে ওর। এই সময় একজনের মুখে খবর পেয়ে একটা কাজ পেয়ে গেল ও, গোদেহের ঝুলেপড়া অংশগুলো ছাঁটবার কাজ। কাজটা ও পেল কারণ, অফিসার দেখলেন, পুরুষের মত পেশী আছে ওর; চট ক'রে মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় অফিসারের। একজন পুরুষ মজদুরকে বরখাস্ত ক'রে, তার মাইনের অর্ধেকের কিছু বেশী দিয়ে তিনি মেয়ারিজাকে কাজে লাগিয়ে নেন।

রুগ্ন পশুর দেহ ছাঁটাকাটা সম্বন্ধে ওদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে যে একটা লোক গল্প করেছিল, সেইটেই এখন হ'ল মেয়ারিজার কাজ, পুঁযভরা মাংস ছাঁটতে হবে ওকে। প্যাকিংশহরে প্রথম আসার পর এ কাজ পেলে ও করত না। এই ডিপার্টের অন্যান্য মজদুরের সঙ্গে ওকেও একটা ঘরে বন্ধ ক'রে দেওয়া

হয়; দিবালোকের এখানে প্রবেশাধিকার নেই; এর ঠিক নীচেই ঠাণ্ডিঘর—সেখানে জীবদেহ বরফের মত জমান হয়; আর এর ঠিক ওপরেই রান্নার ডিপার্ট। কাজেই মেয়ারিজার মাথার ওপর যেন আগুন ঝরে, সময় সময় নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়ে, আর পা থাকে বরফের মত ঠাণ্ডা মেঝের ওপর। কাজও খুব ভাল! নামেই ঝুলেপড়া মাংস ছাঁটাইএর কাজ; আসলে ঘা-পুঁয ভর্ত্তি মাংস হাড় হ'তে চেঁচে তোলা এদের কাজ। বাজার মন্দা হ'লে কাজ যাবার ভয় আছে, বাজার চড়া থাকলে বেশী সময় খাটতে হয়, এত বেশী যে মজদুররা শেষ পর্যন্ত কাঁপতে থাকে, চটচটে ছোরাটা ভাল ক'রে ধরে থাকতেও পারে না, জীবদেহের হাড় ঘেঁসে চলতে চলতে কখন যে নিজের হাড় ঘেঁসে বসে যায় ছোরাটা ওরা জানতেও পারে না; বসলে অবশ্য হাড়ে হাড়ে বোঝে, শুধু তখনই নয়, অনেকদিন ধরে, অনেকে জীবন দিয়ে—কারণ ও ক্ষতে পচন ধরে, সেটা হ'তে প্রাণ যাওয়া অসম্ভব নয়। কাজের হদিসটা ভালভাবেই বোঝে মেয়ারিজা; কিন্তু বুঝলে হবে কী? ও মানুষ-ঘোড়া—কাজ ওকে করতেই হবে, না হ'লে ও খাবার খরচ দেবে কী ভাবে, কী ভাবে চলবে ওদের সংসার? আর ট্যামস্তসিয়স? অনেক-দিনই তো অপেক্ষা করল ওরা, নয় আর কিছুদিনই অপেক্ষা করবে, হ'য়েছে কী তাতে? খালি ট্যামস্তসিয়সের রোজগারে ওদের চলবে বলে মনে হয় না, এদিকে মেয়ারিজার আয় হ'তে কিছু না পেলে এ-সংসারটা অচল হ'য়ে যাবে। সে এ বাড়ী আসতে পারে, রান্নাঘরে মেয়ারিজার হাত ধরে' গদগদভাবে যতক্ষণ খুশী বসে থাকতে পারে—এতেই এখন তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু ট্যামস্তসিয়সের বেহালা দিনের পর দিন বড় করুণ, বড় হৃদয়বিদারক হ'তে থাকে; আর মেয়ারিজা বসে থাকে যুক্তকরে—তার গণ্ড সিক্ত, দেহ কম্পমান,

ভবিষ্যের মানুষ তার মধ্যে জীবনলাভের জন্য ক্রন্দন করছে, ও শুনতে পায়।

মেয়ারিজার শিক্ষা হ'তে ওনাও শিক্ষালাভ করে; সে তার কাজে খুশী থাকতে পারছিল না, মেয়ারিজার চেয়ে ঢের বেশী কারণ ছিল তার সন্তুষ্ট না থাকবার। তার ঘটনার অর্ধেকও সে ঘরে বলেনি, কারণ ইউরঘিস অনর্থক যন্ত্রণা পাবে, কী ক'রে বসে তারই বা ঠিক কী? বহুদিন ধরেই ও দেখে আসছে, ওদের ডিপার্টের প্রধানা মিস্ হেণ্ডার্সন ওকে দেখতে পারেন না। প্রথম প্রথম ওনা ভাবত, বিয়ের জন্য ছুটি চেয়ে যে ভুল ও করেছিল, এ হয়তো তারই জের; তার পর ওর ধারণা হ'ল, "উপহার" নেওয়ার অভ্যাস আছে প্রধানাটীর, অন্যান্য মেয়ে-মজদুর মাঝে মাঝে তাঁকে উপহার দেয়, ওনা কিন্তু কিছু দেয় না, হয়তো তারই জন্য প্রধানা ওর ওপর নারাজ হ'য়ে থাকেন। "উপহার"-দাত্রীদের ওপর প্রধানাকে খুশী থাকতেই অবশ্য দেখা যায়। আরও পরে ওনা আবিষ্কার করে, আসল কারণটা এ সবের ঊর্ধ্বে; কুমারী হেণ্ডার্সন এখানে নবাগতা; তাঁর সম্বন্ধে কারও কিছু জানবার কথা নয়, তবু ধীরে ধীরে গুজব রটে, গুজব সত্য বলে' শোনা যায়—এই কারখানার অন্য কোন ডিপার্টের জনৈক সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের রক্ষিতা তিনি। ওঁকে চুপ করিয়ে রাখবার জন্যই সুপার সাহেব ওঁকে ঐ চাকরীতে বসিয়েছেন; সম্পূর্ণ সফল হননি—শোনা যায় এখনও মাঝে মাঝে তাঁদের ঝগড়াঝাঁটি হয়। মহিলার মেজাজটা খট্টাসের মত—যেখানে তিনি কিছুক্ষণ থাকেন, সে স্থানটি অল্পক্ষণের মধ্যে ডাইনীডাঙ্গায় পরিণত হ'য়ে যায়। ওঁর স্বজাতীয়া দু'-চারটি মেয়ে এখানে আছে তারা তাঁকে গাছে তোলে, কলাগাছ বানায়, এরাই আবার চুকলি খায়, ফলে তাঁর ক্রোধবহ্নিতে স্থানটি প্রায় সব সময়ই জলমান থাকে। মহিলার বর্তমান আবাসস্থল "নিম্নশহর" নামক বিশেষ পল্লী,

তাঁর বর্তমান রক্ষক কোনোর নামক কদাকার এক আইরিশ; তিনি কারখানার বাইরে মালবোঝাইকারী দলের অফিসার অর্থাৎ সর্দার—ভদ্রলোক বেশ প্রেমপটু—কামিনীরা সামনে দিয়ে যাতায়াত করে, তিনি বেশ খোলাখুলিভাবে প্রেমের, কখন কখন তারও উর্ধ্বস্তরের প্রস্তাব করেন। মন্দাবাজারে কারখানা বন্ধ হ'য়ে গেলে, কিছু কিছু মেয়ে কুমারী হেণ্ডার্সনের সঙ্গে নিম্নশহরে গিয়ে বসবাস করে; সেখানেও তিনি একটা প্রতিষ্ঠানই পরিচালনা করেন, সুতরাং এখানে একটা ডিপার্টের প্রধানা হওয়া তাঁর কাছে বিশেষ কিছু নয়। এই সব মেয়েদের কাউকে কাউকে এনে তিনি গৃহস্থ মেয়েদেরই পাশে কাজ দেন, অনেক সময় গৃহস্থ মেয়েদের বরখাস্ত করতে হয় ঐ সব মেয়েদের জায়গা দেবার জন্য। এর ডিপার্টে কাজ ক'রে নিম্নশহর সম্বন্ধে গালগল্প না শুনে উপায় নেই—এ-কথা সে-কথার মধ্যে এসে যাবেই নিম্নশহরের প্রসঙ্গ। গৃহস্থ মেয়ে কাজ করছে একমনে, তার উল্টো-দিকের মেয়েরা গল্প করছে নিম্নশহরের, আর চোখ টেপাটেপি করছে গৃহস্থ মেয়েদের সঙ্গীন অবস্থা নিয়ে। সামনে অবধারিত উপবাসের চিত্র না থাকলে ওনা এখানে একদিনও কাজ করত না; প্রতিদিনই মনে হয়, আজ তো কাটল, কালকে কি পারবে এখানে কাজ করতে এদের সহ্য ক'রে। এখন ও বুঝতে পারে, কেন মিস্ হেণ্ডার্সন ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না—কারণ ও গৃহস্থঘরের মেয়ে, সুষ্ঠু জীবন যাপন করে ও; চুকলিখোর দুশ্চরিত্রা কামিনীরা ঠিক একই কারণে সকল প্রকারে ওকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতে চায় এখানে।

এ সব বিষয়ে সচেতন হ'লে কোন মেয়ের আর প্যাকিংশহরে চলাফেরা করা চলে না। এমন জায়গা এখানে একটাও নেই যেখানে গেরস্তঘরের শিষ্ট মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধায় বেশ্যারা যেতে না পারে। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর; তাদের

জীবনের বা বাঁচবার সুযোগ-সুবিধা এমন শ্রেণীর লোকদের হাতে নির্ভর করে, যাদের জানোয়ার অপেক্ষা কোন বিষয়ে উন্নত বলা যায় না; এই মালিক শ্রেণীটার কোন হীনতাতেই কোন সঙ্কোচ নেই; এই পরিবেশের মধ্যে দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি ব্যাপকভাবে প্রচলিত—আগেকার আমেরিকায় ক্রীতদাসীদের নিয়ে ঠিক এমনি কারবার চলত। লেখা তো দূরের কথা, কোন সভ্য মানুষ যা মুখে আনতে পারে না, তাই দিনরাত এই প্যাকিংশহরে ঘটে চলেছে একান্ত স্বাভাবিকভাবে; এখানকার কেউই এ সবে আর বিস্মিত হয় না। আগেকার ক্রীতদাসী ও মালিকদের মধ্যে রঙের তফাৎ ছিল, এখন আর সেটুকুরও বালাই নেই।

একদিন সকালে ওনা বাড়ীতে থেকে গেল; নিজের খেয়ালমত ইউরঘিস একজন পুরুষ ডাক্তার ডাকলে; নিরাপদে প্রসব হ'য়ে গেল। ছেলেটী হ'ল মোটাসোটা গোলগাল; ওনা তো এতটুকু; দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে এ ছেলে ওর। ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইউরঘিস নবজাতককে দেখে, ও যেন বিশ্বাস করতে পারে না ঘটনাটাকে।

নবজাতক সুনিশ্চিতভাবে ইউরঘিসের জীবনের পথ নির্ধারিত ক'রে দেয়; কালও সাথীদের সাথে সন্ধ্যায় মদের দোকানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছে মন; আজ হ'তে চিত্তের সে নড়বড়ে অবস্থার অবসান হ'য়ে গেল। আজ হ'তে সে পিতা, সংসারী। এতটুকু একটা মানব-শিশুর আকর্ষণ অত বড় মদের দোকানের চেয়ে অনেক বেশী। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে শিশুর দিকে চেয়ে থাকতে ওর ভারী ভাল লাগে। নিজেই বিস্মিত হ'য়ে যায় ও, এর আগে তো ওর কখন শিশু ভাল লাগেনি। তবে, ওর মনে হয়, এ শিশুটী অন্য সকল শিশুর চেয়ে আলাদা। কালো চোখ দুটী কী উজ্জ্বল, কী সুন্দর কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল—ঠিক ইউরঘিসের মতই—ব্যাপারটা যেন খুব বিস্ময়কর। বাপের নাকের

ক্ষুদে হাস্যকর নকল নিয়ে ঐটুকুন বাচ্চা দুনিয়ায় এল, এল আবার কেমন ভাবে—সমস্তটা মিলিয়ে ভাবতে মজা লাগে ইউরষিসের।

ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত ও ঠিক করে, এটা যে ওরই, ওর আর ওনার, একে আদরে যত্নে বড় ক'রে তুলতে হবে ওদেরই—এইটুকু বোঝবার জন্যই হয়তো শিশুকে এমন চেহারা দিয়ে পাঠান হ'য়েছে। শিশুর মত এত মজার বস্তুর অধিকারী ইউরষিস জীবনে কখনও হয়নি; সত্যিই বিস্ময়কর অধিকার। এ বড় হবে, মানুষ হবে, এর মধ্যে বড় হবে মানুষের আত্মা, এর একেবারে নিজস্ব মন হবে, চিত্ত হবে, ব্যক্তিত্ব হবে। এ সব চিন্তায় পূর্ণ হ'য়ে যায় ওর মন, পূর্ণ হয় অবুঝ, কেমন যেন ব্যথাময় উত্তেজনায়। বিস্ময়করভাবে ও এই শিশু অ্যাণ্টেনাসকে নিয়ে গর্ববোধ করে—এর খাওয়া, এর পোষাক, জাগা ঘুমোন—এর সকল কিছুতেই ওর কৌতূহল—অদ্ভুত অদ্ভুত হাস্যকর প্রশ্ন ক'রে বসে ও মেয়েদের এ সম্বন্ধে। এত ছোট অথচ মানুষ, ভয় হয় ওর, তুললে হয়তো এর ঐ ফুচ্‌কি ফুচ্‌কি হাত পা ভেঙ্গে যাবে।

কিন্তু শিশুকে দেখবার সময় কই ওর—বন্ধন এতদিনও ছিল, কিন্তু এত বিশ্রীভাবে সেটাকে এর আগে ও অনুভব করেনি। কাজ হ'তে ফিরে দেখে শিশু ঘুমোচ্ছে, ও নিজে ঘুমিয়ে পড়বার আগে কদাচিৎ জাগে ওর ছেলে; সকালে ছেলের দিকে একবার চাইবার পর্যন্ত সময় থাকে না; এক রবিবার ছাড়া ছেলে আর দেখা হয় না ওর। এটা বিশ্রী লাগে ইউরষিসের; কিন্তু এ অবস্থা অতি নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে ওনার পক্ষে; ওর নিজের ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তার ওনাকে বাড়ীতে থাকবার পরামর্শ দিয়েছেন; কিন্তু কাজে ওকে যেতেই হয়, এলজবিয়েটার হাতে শিশু সারাটা দিন দুধ বলে কেনা ফিকে নীল বিষটা পান করে। প্রসবের জন্য ওনা মাত্র এক হপ্তা কামাই করে; পরের হপ্তায় ঠিকমত হাজির হয় কারখানার কাজে। ইউরষিস সাহায্য

করবার অন্য উপায় না দেখে ওনাকে বাসে তুলে দেয়, নিজে বাসের পিছু পিছু ছুটে চলে ; ওনা বাস হ'তে নামলে তাকে ব্রাউনের কারখানায় পৌঁছে দেয়। ওনা বলে, তার পর আর কী? যা কষ্ট সে তো ওই যাওয়া-আসাতেই, স্থির হ'য়ে বসে মাংসের প্যাকেট, হ'ক না সমস্ত দিন, সেলাই করার মধ্যে কষ্ট কোথায়! সাত দিনের বেশী অনুপস্থিত হ'লে তাদের ভয়ঙ্করা অর্থাৎ প্রধানাটী তার জায়গায় অন্য কাউকে বসিয়ে দেবেন। চাকরী ছুটে গেলে আগে যা হ'ত তা হ'ত, এখন গেলে ছেলেই যে উপোস ক'রে মরে' যাবে ; তার চেয়ে বড় বিপদ কি ওনা কল্পনা করতে পারে! কাজে কামাই করা তো দূরের কথা, ছেলের জন্য এখন হ'তে ওদের আরও বেশী ক'রে খাটতে হবে। এত বড় একটা দায়িত্ব ওদের! এমনভাবে ছেলেকে মানুষ করবে যেন বড় হ'য়ে ছেলেকে বাপমায়ের মত কষ্ট করতে না হয়। ইউরঘিসও এ কথা আগে—ওনারও আগে ভেবেছে—মনকে শক্ত ক'রে কঠোরতম সংগ্রামের জন্য নিজেকে তৈরী করেছে।

ব্রাউনের কারখানায় এত শীগ্‌গির ফিরে গিয়ে ওনা চাকরী ও এক হপ্তার মজুরী বাঁচাল ; মেয়েদের হাজারো-এক ব্যাধি আছে—তাদের সাধারণ নাম "জরায়ুঘটিত ব্যাধি", তাদেরই একটায় আক্রান্ত হ'ল ওনা ; জীবনে সে ব্যাধি আর ওর সারল না। ওনার কাছে এ যে কত ভীষণ, কত হাহাকারময়, সে কথা কথায় প্রকাশ করা যায় না ; এত সামান্য অপরাধের জন্য এত বড় শাস্তি ভাবতে পারে না, শুধু ওনা কেন, ওদের কেউই। ওনার কাছে জরায়ুর ব্যাধি মানে ডাক্তার ডাকা, রোগনিরূপণ, চিকিৎসা, অস্ত্রপ্রয়োগ বা ঐ ধরণের কোন ব্যাপার নয়, তার কাছে এর মানে মাথা ধরা, পিঠে ব্যথা হওয়া, মনের অবিচ্ছিন্ন বিষণ্ণতা, হৃদ্‌রোগ, অম্ল, একটু ঠাণ্ডা বা বৃষ্টি লাগলেই সর্দি কাশি। প্যাকিংশহরের গেরস্ত শ্রমিক মেয়েদের অধিকাংশেরই এ ধারার

একটা-না-একটা রোগ আছেই আছে; কারণটাও একই; কাজেই, ওনার এ অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে বা ডাক্তার ডাকা দরকার, এ কথা মনেই করতে পারে না ওরা। বরং বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী পেটেণ্ট ওষুধ ব্যবহার করা যায়—তাই করতে লাগল ওনা একটার পর একটা। এদের প্রত্যেকটীতে সুরাসার বা ঐ জাতীয় কোন-না-কোন উত্তেজক পানীয় মেশান আছে, যতদিন ব্যবহার করা যায় ততদিনই উপকার। এইভাবে অন্ধকার প্রান্তরে ও ধাওয়া করে স্বাস্থ্য মরীচিকার পিছু পিছু, কিন্তু নাগাল তার কোনদিনই ও পায় না—ও যে বড় গরীব, ওষুধ খাওয়া মানে হাতীকে খাওয়ান, সে খরচ কোথা হ'তে যোগাবে ওরা!

একাদশ অধ্যায়

গ্রীষ্মের সঙ্গে প্যাকিংশহরে পূর্ণ কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এল, অন্যান্যের সঙ্গে ইউরঘিসেরও রোজগার বাড়ল; গত গ্রীষ্মের মত অত রোজগার অবশ্য আর হ'ল না, কারণ মালিকরা এবার বেশী শ্রমিক নিয়োগ করল। মনে হয়, প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন লোক আসে—এ যেন একটা নিয়মিত ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; পরের পড়্‌তিবাজার পর্যন্ত ওরা এই বাড়ান মজদুরসংখ্যা টিঁকিয়ে রাখবে, যাতে প্রত্যেকেই আগের চেয়ে কম কামাতে পারে। এই পদ্ধতিতে ওরা শিকাগোর ভাসমান সকল শ্রমিককেই কাজ শিখিয়ে নিতে পারবে। কী শয়তানি কৌশল! পুরাতন শ্রমিকরা নূতন শ্রমিকদের বাধ্য হ'য়ে কাজ শেখাবে, তারপর এই নতুনরাই একদিন পুরোণদের হরতাল ভেঙ্গে দেবে; আর একদিকে লোকসংখ্যা বাড়িয়ে সকল শ্রমিককে এত গরীব ক'রে রাখা হয় যে, ওরা শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারে না।

লোক বাড়ছে বলে' কাজ সহজ হ'চ্ছে এমন ভাববার কারণ নেই! বরং উল্টো; "গতি বাড়াও, গতি বাড়াও" রব দিনকে দিন আরও হিংস্র বর্বর হ'য়ে উঠতে থাকে। শ্রমিক শোষণের নতুন কৌশল, নয়া ফিকির প্রতিদিনই যেন ওরা আবিষ্কার ক'রে চলেছে—এ যেন মধ্যযুগের তুরুমঠোকা। নতুন নতুন বেগবর্ধনকারী শ্রমিক ওরা কোথা হ'তে জোগাড় ক'রে আনে, এদের বেশী মাইনে দেয়; নতুন যন্ত্রের সঙ্গে তাল রাখিয়ে শ্রমিকদের গতি বাড়ায়; শূকর মারার ঘরে গতি নির্ধারণ করা হয় ঘড়ির সাহায্যে, প্রতিদিন এ গতি একটু একটু ক'রে বাড়ান হয়—শ্রমিকরা অন্ততঃ তাই বলে। ফুরনের কাজে ওরা সময় কমিয়ে, সেই কম সময়ের মধ্যে আগের বেশী সময়ের কাজ করিয়ে নেবে, কিন্তু মাইনে দেবে আগের হারেই; তারপর শ্রমিকরা নতুন গতিতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে, সময় অনুযায়ী মাইনে দেবে, অর্থাৎ কম সময়ের জন্য কম মাইনে দেবে! টিনের কারখানার মালিকরা এতবার খেলেছে যে মেয়েরা এখন প্রায় মরিয়া হ'য়ে উঠেছে; গত দু' বৎসরের মধ্যে ওদের মজুরী পূরো এক-তৃতীয়াংশ কমেছে; প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ; এ ক্রোধ যে কোন দিন ফেটে পড়তে পারে। মেয়ারিজা আগে যে টিনের কারখানায় কাজ করত, সেখানে এখন মজুরী প্রায় অর্ধেক ক'রে দেওয়া হয়েছে; এতে অসন্তোষ এত বেড়ে গেল যে, মালিক বা মুরুব্বিদের সঙ্গে একবার আলোচনা পর্যন্ত না ক'রে, মজুরী কমার নোটিশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংগঠন মজবুৎ করতে লাগল। একটী মেয়ে কোথায় যেন পড়েছিল যে, লাল ঝাণ্ডাই সকল শোষিত অত্যাচারক্লিষ্টের নিজস্ব ঝাণ্ডা, সেই জ্ঞান অনুযায়ী ওরা একটুকরা লাল পতাকা উড়িয়ে কারখানার আঙিনা অঞ্চলে শোভাযাত্রা ক'রে বেড়ায়, ক্রোধের অভিব্যক্তিস্বরূপ নানা ধ্বনি দিয়ে সরগরম ক'রে তোলে অঞ্চলটাকে। এই হরতালের ফলস্বরূপ

একটা ইউনিয়ন জন্মলাভ করে, কিন্তু অপরিণত, অসংগঠিত এই হরতাল তিন দিনের দিন খতম হ'য়ে যায়, ধর্মঘটীদের দুর্বলতার জন্য নয়, নতুন কামিন ভর্তি হ'য়ে যায় হুড়হুড় ক'রে। এ সব হৈ-হল্লা শেষ হবার পর, যে মেয়েটী লাল ঝাণ্ডা তুলেছিল, তার আর এদিকে স্থান রইল না, সে চলল নিম্নশহরে—সেখানে একটা বিভাগীয় দোকানে আড়াই ডলার হপ্তায় একটা কাজ মিলল।

অন্যদের মত ইউরগিস ওনাও এ সব কথা শোনে, শুনে দমে যায়; ওদের পালা কখন আসবে, কে জানে। দু'একবার গুজব শোনা গেল, বৃহত্তম কারখানাগুলির কোন একটিতে শীঘ্রই অদক্ষ শ্রমিকদের মাইনে ঘণ্টায় পনের সেণ্টে নামান হবে। তাই যদি হয়, তাহলে ইউরগিসের পালা আসতে দেরী হবে না। এতদিনে বুঝেছে, প্যাকিংশহরে অনেক-গুলো কারখানা নেই, আছে একটিমাত্র কারবার, নাম—গোমাংস যৌথ প্রতিষ্ঠান। প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন কারখানার ম্যানেজারদের একটি ক'রে সভা হয়; সে সব সভায় গতি-পরিণতি, শ্রমিকদের কাজের গতি ও দক্ষতা নির্ধারিত হয়; জানোয়ার কেনবার ও মাংস বিক্রয়ের দরের সঙ্গে শ্রমিকদের দেয় মজুরীর হারও নির্ধারিত হ'য়ে যায় এই সব সভায়; তাই বিভিন্ন কারখানায় বিভিন্ন হার, বিভিন্ন দক্ষতা, বিভিন্ন দর—এ সব কিছু নেই। এর সব কিছু যে ও বোঝে এমন নয়, বোঝবার জন্য মাথাও বিশেষ ঘামায় না।

মজুরীতে ছাঁট পড়বে শুনে ভয় পায় না একমাত্র মেরিয়া; কতকটা দুষ্টুমি ক'রে বলে, আর একজনকে তাড়িয়ে তবে আমাকে নিতে হ'য়েছে এমনি সৌভাগ্য আমার। হাড় চাঁচায় ও এখন অর্ধদক্ষ বলে যে কোন দিন স্বীকৃত হ'তে পারে, কাজের দিক হ'তে আবার ও 'নাম' করতে থাকে। গ্রীষ্মের ও হেমন্তের আয় দিয়ে কঠোর চেষ্টায় ইউরগিস ও ওনা ওর ঋণের পাই পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দেয়। এখন ও টাকা জমা

রাখতে শুরু করে একটা ব্যাঙ্কে, ট্যামস্তসিয়সও ব্যাঙ্কে টাকা রাখে; দু'জনের এখন টাকা জমানর পাল্লা লেগে যায়। আবার ওরা বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখে।

প্রচুর অর্থ থাকার দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তাও প্রচুর—কিছুদিনের মধ্যেই মেয়ারিজা বুঝে যায়। কোন এক বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে ও অ্যাশ্‌ল্যাণ্ড অ্যাভেনিউএর এক ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ব্যাঙ্কটা সম্বন্ধে ওর জ্ঞান—বিরাট বড় বাড়ী, অনেক লোকজন, জমজমাট ব্যাপার, এর বেশী আর কিছু ও জানে না; জানবার কথাও নয়; পাগল-পুঁজির এই দেশে বিদেশী চাষীর মূর্খ মেয়ে এর বেশী জানবেই বা কি ভাবে। শুনেছে ব্যাঙ্ক 'উঠে' যায়; ওরও প্রতিদিন ভয় এটাও উঠে যেতে পারে, তাই প্রতিদিন কাজে যাবার সময় একবার ঐ পথ ঘুরে দেখে যায় ব্যাঙ্কটা উঠে গেছে, না এখনও যথাস্থানে আছে। আগুনকেই ওর সব চাইতে বেশী ভয়, কারণ জমা দিয়েছে নোটে, যদি কোন রকমে আগুন লেগে সেগুলো পুড়ে যায়, তা হ'লে অন্যের টাকা তো আর ব্যাঙ্ক ওকে দেবে না। ওর এই ভয় নিয়ে ইউরঘিস হাসিঠাট্টা করে—ও পুরুষ, ওর জ্ঞানটা মেয়ারিজার চেয়ে পুষ্ট বলে অহঙ্কারও আছে; সান্ত্বনা দেয় অজ্ঞকে—ব্যাঙ্কের আগুন-নিরোধক গর্ভকক্ষ আছে, কোটি কোটি ডলারের নোট সেখানে মালিকরা রেখে দেয়, আগুন লাগতেই পারে না।

একদিন কিন্তু ঘোরাপথে ব্যাঙ্ক দেখে যাবার সময় দেখে, ব্যাঙ্কের দোর হ'তে রাস্তার অনেকখানি পর্যন্ত জনতার একটা জঙ্গল লেগে গেছে। ভয়ে ওর মুখ রক্তশূন্য হ'য়ে যায়। দূর হ'তেই ও দৌড়তে থাকে, জনতাকে প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তর শোনে না, ছুটে চলে; ঠিক দোরে জনতা একেবারে জমাট হ'য়ে গেছে, এখানে পৌঁছে থামতে বাধ্য হয় ও। ওর প্রশ্নের জবাবে তাদের কেউ বলে "ব্যাঙ্কে দৌড় হয়েছে"। সে আবার কী বস্তু! কিছুই বোঝে না ও; একজনের পর একজনকে

জিজ্ঞাসা করে—বুকটা মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। ব্যাঙ্কের কিছু হ'ল নাকি? ঠিক কেউ জানে না, তবে তাদের তাই ধারণা। ওর টাকা কি ও ফিরে পাবে না? কেউ জানে না। হয়তো পাবে না। তবে ওদের সকলেই নিজের নিজের টাকা ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। এত সকালে ঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন, ব্যাঙ্ক খুলতে এখনও তিন ঘণ্টা দেরী। ভয়ে হতাশায় মেয়ারিজার একেবারে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম; আঁচড়ে ছেঁচড়ে ও বাড়ীটার দোরের দিকে চলে তবু; ওরই মত উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত শিশু, নারী ও পুরুষ পরস্পরকে ঠেলে দোরের দিকে যেতে চেষ্টা করে। এ অনেক মানুষের একসঙ্গে পাগল হ'য়ে যাবার দৃশ্য; মেয়েরা বিলাপ ক'রে মূর্চ্ছা যায়, শিশুরা সাধ্যমত হাঁ ক'রে কাঁদে, পুরুষরা ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি ক'রে সব কিছু-মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চায়। এই হুল্লোড়ের মধ্যে মেয়ারিজার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ব্যাঙ্কের পাশ বই তো নেই ওর কাছে, সেটা না থাকলে কোন রকমেই টাকা তোলা যাবে না। সর্বমর্দিনীরূপে আবার ও ভিড় ঠেলে বের হয়; বের হ'য়ে আর কোন দিকে না তাকিয়ে দৌড় দেয় বাড়ীর দিকে। ওর ভাগ্য খুব ভাল, তাই পাশ বইয়ের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল—ও যাবার অল্পক্ষণ পরেই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যাঙ্কের সামনে পুলিশ ফৌজ হাজির হয়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেয়ারিজা আবার হাজির হয়, তার পিছনে এলজবিয়েটা—দৌড়ে দৌড়ে ও ভয়ে দু'জনেরই দম বন্ধ হবার উপক্রম। এদিকে জনতাকে লিকলিকে একটা লাইনে পরিণত করা হ'য়েছে, তার পাশে সবিক্রমে টহল দিচ্ছে শতখানেক পুলিস; করবার আর কিছু না পেয়ে লাইনের পিছনে এলজবিয়েটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়ারিজা। ন'টায় ব্যাঙ্ক খুলল; টাকা দেওয়াও সুরু হ'ল; কিন্তু তাতে লাভ কী মেয়ারিজার? ওর সামনে অন্ততঃ তিন হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে,

তাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু দিতে হ'লে এ রকম কয়েকটা ব্যাঙ্ক ফতুর হ'য়ে যাবে।

অবস্থাটাকে আরও করুণ করবার জন্যই বোধ হয় এর ওপর টিপি-টিপি বৃষ্টি আসে, তাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে জামা তো জামা হাড় পর্যন্ত ভিজে যায় ওদের; তবু ধীরভাবে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে আর লক্ষ্যের দিকে অতি ধীরে ধীরে এগোয়; সকাল গিয়ে দুপুর হয়, দুপুর গড়ায় বিকেলের দিকে, ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'বার সময় হ'য়ে আসে; বুক ধুকপুক করে ওদের, ওদের না দিয়েই হয়তো ব্যাঙ্ক বন্ধ হ'য়ে যাবে। মেয়ারিজা ঠিক করে যাই হ'ক, ব্যাঙ্কের দোর ও ছাড়বে না; প্রায় সকলেই বোধ হয় তাই স্থির করেছিল; শীতের দীর্ঘ রাত্রির সমস্তটা ওখানে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও বেশীদূর ও এগোতে পারল না। ছেলেদের কাছে ব্যাপারটা শুনে ইউরষিস কিছু খাবার ও শুকনো কাপড় নিয়ে আসে, তাতে কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

পরদিন প্রভাত হবার আগেই আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশী লোক আসে ভিড় ক'রে—নীচুশহর হ'তে আরও পুলিস আসে। মরণ-পণ করে মেয়ারিজা লাইন আঁকড়ে থাকে; বিকেলের দিকে ব্যাঙ্কে ঢুকতে পায়; ওর জমা টাকাও পেয়ে যায়, নোটে নয়, কড়কড়ে ডলারে, একেবারে রুমালভর্তি। ডলারগুলো হাতে পেতেই ওর ভয় ভেঙ্গে যায়, ডলারগুলো আবার ঐ ব্যাঙ্কেই জমা রাখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু জমার জানালার লোকটা যেন বর্বর! বলে, এ 'দৌড়ে' যারা যোগ দিয়েছে তাদের টাকা আর এ ব্যাঙ্ক জমা নেবে না। কাজেই রুমাল-ভর্তি ডলার নিয়ে বাড়ী ফিরতে বাধ্য হয় ও; পথে সব সময় ভয় হয়—এই বুঝি কেউ ছিনিয়ে নেয়, এদিক-ওদিক চেয়ে চেয়ে অতি সাবধানে চলে। বাড়ী ফিরে মন স্বস্তি পায় না। অন্য ব্যাঙ্কে এগুলো জমা না দেওয়া পর্যন্ত করবারও আর কিছু নেই, কাজেই ও জামার

মধ্যে ডলারগুলো সেলাই ক'রে নেয়; সেই বোঝা নিয়ে এক হপ্তারও বেশী চলাফেরা করে; ইউরগিস বলে, ঐ বোঝা নিয়ে একবার পাঁকে পড়লে মেয়ারিজার টিকিটিও আর দেখা যাবে না; ভয়ে ও বাড়ীর সামনের পথটায় পা দেয় না। ডলারের বোঝা নিয়ে কারখানায় যায় ভয়ে ভয়ে—এটা চাকরী যাবার ভয়। প্যাকিংশহরের শতকরা দশজন শ্রমিকের টাকা জমা ছিল এই ব্যাঙ্কে, কামাই করেছিল তাদের সকলেই। এতগুলি লোককে একসঙ্গে বরখাস্ত করা সুবিধার কাজ নয়। মেয়ারিজার চাকরীটা টিঁকে যায়। ব্যাঙ্কের পাশের বাড়ীতে একটা মদের দোকান আছে, সেখানে পুলিশ একটা মাতালকে গ্রেপ্তার করতে যায়; হাঙ্গামা সুরু হ'য়ে যায়, কাজে যাবার পথে মজদুররা দাঁড়িয়ে পড়ে; ব্যাঙ্কের সামনে ভিড় দেখে আমানতকারীরা ভড়কে যায়; সুরু হ'য়ে যায় ব্যাঙ্কের ওপর 'দৌড়'!

প্রায় এই সময় ইউরগিস ও ওনা ব্যাঙ্কে হিসেব খোলে। মেয়ারিজার ও জোনাসের ধার শোধ দেবার পর ওরা আসবাবের ধারটা প্রায় শেষ ক'রে আনে; তারপর এই ক'টা টাকা জমা হয়। যতদিন তারা হপ্তায় নয়-দশ ডলার বাড়ী আনতে পেরেছে, বেশ কেটে গেছে ততদিন। ইতিমধ্যে আর একটা নির্বাচন এসে যায়, তাতে হ'তে ইউরগিস আধ সপ্তাহের রোজগার কামিয়ে নেয়, এর সবটাই লাভ। এবারকার নির্বাচনটায় রেশারেশি খুব বেশী, তার ঢেউ এসে প্যাকিং-শহরেও লাগে। দু'দল 'কলম'ই এখানে হল্ ভাড়া ক'রে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার আশায় বাজী পোড়ায়, বক্তৃতাবাজী করে। সব না বুঝলেও ইউরগিস এতদিনে এটুকু বুঝেছে যে ভোট বিক্রী করাটা ঠিক কাজ নয়। তবু, সকলেই বিক্রী করছে, ওর ভোটটা দেওয়া না-দেওয়ায় কিছুই যাবে আসবে না; কাজেই ও কথা মনে এলেও, লাভ কী ওর ভোট বিক্রী করতে অস্বীকার ক'রে!

আবার দিন ছোট হ'তে থাকে, ঠাণ্ডা বাতাস বয়; মনে পড়িয়ে দেয় ওদের, শীত আসছে! মনে হয় শীতের সঙ্গে লড়বার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায়নি ওরা, বড় তাড়াতাড়ি এসে যাচ্ছে শীতটা। তবু একান্ত নির্ভুলভাবে শীত আসে, বাচ্ছা স্ট্যানিসলোভাসের চোখে ভয় বাসা বাঁধে। ওনার কথা ভেবে ইউরঘিসও ভয় পায়, এ শীত এ তুষারপাত তো ওনা সইতে পারবে না, সে শক্তি তো আর ওনার নেই। তারপর এমনও তো হ'তে পারে—একদিন হয়তো জোর তুষার-ঝড় বইতে সুরু করল, পথে বাস চলল না, ওনাও কাজে যেতে পারল না; পরের দিন গিয়ে দেখলে ওর জায়গায় ভর্তি করা হ'য়েছে আর একজনকে—তা হ'লে?

বড়দিনের আগের সপ্তাহেই তুষার-ঝড় এল একটা; সিংহের মত বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়ায় ইউরঘিস এই নৈসর্গিক বিপৎপাতের বিরুদ্ধে। অ্যাশল্যাণ্ড অ্যাভেনিউর বাসগুলো চার দিন ধরে' অচল হ'য়ে থাকে। বাধা যে কী বস্তু ইউরঘিস তার প্রথম পরিচয় পায় এবার। বহু মুস্কিলের সম্মুখীন হ'য়েছে ও এর আগে, এখন মনে হয়, এর তুলনায় সে সব ছিল ছেলেখেলা। এবার চলে মরণপণ লড়াই, ওর অন্তরের সমগ্র শক্তি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। প্রথম দিন ওরা দু'ঘণ্টা আগেই বেরিয়ে পড়ে; কয়েকখানা কম্বলে মুড়ে ওনাকে ঘাড়ে ফেলে, আর ছেলেটা অমনি কম্বলমোড়া হ'য়ে থলের মত ঝোলে ওর পকেটের কাছে। ওদের বিপরীত দিক হ'তে ক্রুদ্ধ প্রবাহের পর প্রবাহ বয়ে আসে, তাপ নেমে আসে শূন্যেরও নীচে; সমস্ত পথটা হাঁটু-সমান উঁচু হ'য়ে বরফ জমেছে, কোথাও কোথাও বুক পর্যন্ত; পা বেধে যায়, মনে হয় এখনি বুঝি ফেলে দেবে ওকে; ওর গতি রুদ্ধ করবার জন্যই যেন কোথাও কোথাও দেওয়াল হ'য়ে বরফের স্তূপ হ'য়ে গেছে: ক্রুদ্ধ বন্য মহিষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তার ওপর; নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে আগুন হ'য়ে ছোটে ওর গুপ্ত শক্তি। এই ভাবে প্রতি ইঞ্চি স্থান জয় ক'রে ক'রে

এগোয় ও; ডায়হামে যখন পৌঁছল, সমস্ত শক্তি তখন নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, পা টলছে, বিরাট হাঁ ক'রে নিশ্বাস নিয়েও যেন বুক ভরছে না, চোখ যেন দৃষ্টিহীন হ'য়ে গেছে; একটা থামে হেলান দিয়ে ও দাঁড়ায়; খবর পায় হত্যার জন্য জানোয়ার তখনও হত্যামঞ্চে পৌঁছয়নি—স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে একটা। সন্ধ্যায় আবার এর পুনরাবৃত্তি হবে; কিন্তু কারখানা হ'তে কখন বেরুতে পারবে তার ঠিক নেই; তাই একটা মদের দোকানের সঙ্গে চুক্তি করে, ও না-ফেরা পর্যন্ত তারা ওনাকে ওর এক কোণে অপেক্ষা করতে দেবে। ,একদিন ওর ফিরতে রাত্রি এগারোটা হ'য়ে গেল; বাইরে তখন কয়লার খনির মত অন্ধকার, তবু ওরা বাড়ী ঠিক পৌঁছে যায়।

এ তুষার-ঝটিকায় অনেকেই ঝরে' যায়, বাইরে তখন বুভুক্ষের ভিড়টা বিরাট হ'তে বিরাটতর হ'য়ে উঠছে; যে কারও আসতে সামান্যতম দেরী হ'লেই মালিকরা অন্য লোক লাগিয়ে নিচ্ছে, এক মিনিটের জন্যও অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই তাদের। দুর্বিপাকের অন্ত আছে; ঝড় শেষ হয়; সঙ্গীতে যেন পূর্ণ হ'য়ে যায় ইউরঘিসের অন্তর—সে বিজয়ী, বিজয়ী—সে বিজয়ী! শত্রুর সঙ্গে সমানে লড়াই ক'রে সে বেঁচে আছে, পরাজিত করে দিয়েছে সে ভীষণ শত্রুকে। ন্যায়যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত ক'রে বনরাজ কেশরীও হয়তো এই গৌরব অনুভব করত; কিন্তু নৈশ অন্ধকারে রক্ষিত গোপন ফাঁদের বিরুদ্ধে সে লড়বে কেমন ক'রে?

হত্যামঞ্চে কোন ষাঁড় ছাড়া পেয়ে গেলে, এরা সেটাকে একটা বড় বিপদের মধ্যে গণ্য করে। মারবার তাড়াহুড়োতে মাথাটা ঠিকমত চোট পাবার আগেই অনেক ষাঁড়কে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়; আহত অন্ধ এ সব ষাঁড় দাঁড়িয়ে উঠে অন্ধ ক্রোধে হত্যামঞ্চের সব কিছুই গুঁড়িয়ে ফেলতে চায়। লোকগুলোও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে হাতের

কাজ ও হাতিয়ার ফেলে নিকটতম থামের পিছনে আশ্রয় পাবার জন্য দৌড়তে থাকে ; ধাক্কাধাক্কি, পড়াওঠা, চেঁচামেচিতে জায়গাটা নরক হ'য়ে ওঠে—এ হ'ল গ্রীষ্মকালের অবস্থা ; শীতকালে এর জঘন্যতা কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয় : সমস্ত জায়গাটা বাষ্পে পূর্ণ হ'য়ে যায়, তিন হাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না—ফলে প্রাণ বাঁচাবার জন্য এদের প্রাণান্তকর চেষ্টা অবস্থাটাকে বীভৎস ক'রে তোলে। ছাড়া পাওয়া ষাঁড় অন্ধ হ'তে পারে, কাউকে আঘাত করবার নির্দিষ্ট ইচ্ছাও না থাকতে পারে, তবু তার সামনে পড়ে গেলে রক্ষা থাকে না। কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক হ'য়ে দাঁড়ায় এদের হাতের ছোরাগুলো—কে কোথায় যে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে তার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। এতেই শেষ নয়—ষাঁড় মারবার জন্য অফিসার ছুটে আসেন বন্দুক হাতে, ষাঁড় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—তিনিও কিছুক্ষণ ধরে, ষাঁড় যে দিকে যায় সে দিকেই গুলি চালাতে থাকেন।

এই রকম একটা ধ্বস্তাধ্বস্তিই হ'ল ইউরখিসের ফাঁদ। ফাঁদ ছাড়া একে আর কী বলা যাবে? এত নিষ্ঠুর, এমন অনাশঙ্কিত বিপদের অন্য কী নাম দেওয়া যেতে পারে? প্রথমে জিনিষটাকে আমল দেয়নি ও, লাফিয়ে আশ্রয় নিতে গিয়ে একটা গোড়ালি একটু মচকে যায়। তখন হ'তে সব সময়ই জায়গাটা বেদনা করে, কেয়ার করে না ও ; আহা-উহু করা ওর স্বভাব নয়, কত বেদনাই তো সয়েছে জীবনে। বাড়ী ফেরবার জন্য বাইরে বেরিয়ে দেখে উপেক্ষা করবার মত বেদনা এ নয়, যথেষ্ট বেদনা করছে ; হাঁটাই মুস্কিল। সকালে দেখে গোড়ালি ফুলে দুনো হ'য়ে গেছে, জুতোয় আর পা ঢোকে না। তখনও খানিকটা খিস্তি ছাড়া আর কিছু করে না ও ; পায়ে ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া জড়িয়ে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাস ধরতে চলে। সেদিন ডারহামে প্রচুর কাজ ; ছুটোছুটি করতে হয় ওকে একটু বেশীই ; দুপুর

নাগাদ ব্যথা অসহ্য হ'য়ে ওঠে, অফিসারকে না বলে' আর পারে না। কারখানার ডাক্তার আসে, পরীক্ষা করে; ওষুধ দেয় না; বলে, বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়, তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য কয়েক মাসই হয়তো পড়ে থাকতে হবে তোমায়। তার সঙ্গে সে জানিয়ে দেয়, এ আঘাতের জন্য ডারহাম কোম্পানী দায়ী নয়, কাজেই তার দায়িত্ব, চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ঐখানেই অবসান।

প্রাণে বিকট ভয় আর দেহে অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে কোনরকমে বাড়ী ফেরে ও। এলজবিয়েটা ওকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, ঠাণ্ডা জলের পটি দিয়ে পটি বেঁধে দেয়; ওর হাবভাব হ'তে ইউরঘিস যাতে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে না পারে, তার চেষ্টাও করে সাধ্যমত। অন্যদের বাড়ী ফেরবার সময় হ'লে বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে অবস্থা বোঝায়; হাসিমুখে তারাও ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে, বিশেষ কিছুই নয় এ, দু'এক হপ্তার মধ্যেই সেরে উঠবে ও।

ইউরঘিস ঘুমুলে পর ওরা রান্নাঘরে জমা হ'য়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে আলোচনা করে নিজেদের বিপদ। স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওরা অবরুদ্ধ। ব্যাঙ্কে ইউরঘিসের মাত্র ষাট ডলার জমা আছে, পড়্‌তি কাজের দিন সামনে। জোনাস ও মেরারিজার আয় অদূর ভবিষ্যতে ওদের খাইখরচা চালাবার পর্যায়ে নেমে আসতে পারে, বাকী থাকবে ওনার আয়টুকু, আর ছেলেটার রোজগারটাকে যদি রোজগার বলা যায় তা হ'লে তাই। কিন্তু বাড়ীর দরুণ খাজনা, সুদ ও বীমার টাকা দিতে হবে, আসবাবের জন্য এখনও কিছু বাকী আছে; তার উপর এই দুরন্ত শীতে কয়লার খরচ। এই জানুয়ারী, শীতের এখন মাঝামাঝি, এ সময় এই বিপদ! পথে পথে বরফের পর্বত হবে, কে ওনাকে বয়ে' নিয়ে যাবে তার কারখানায়? এই জন্যই হয়তো ওর কাজ যাবে। স্ট্যানিস-লোভাসও কাঁদে, কে দেখবে ওকে!!

এ বিপদের কি পার আছে! পড়ে পড়ে কষ্ট পেতে হবে, অথচ কিছু করবার নেই মানুষের। এই তিক্ত চিন্তাই ইউরঘিসের আহারনিদ্রা হ'য়ে দাঁড়ায়। তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা বৃথা, ও যা বুঝছে, ও তার চেয়ে একরত্তি কম বোঝে না, সত্যি সত্যি সমস্ত সংসারটা উপোস ক'রে মরে যেতে পারে। এই চিন্তাই ওকে খেয়ে ফেলে—রোগের প্রথম দু' চার দিনে ওর চেহারা অতি বিশ্রী হ'য়ে ওঠে। ওর মত শক্তিশালী একটা মরদ এমন অসহায় হ'য়ে পড়ে থাকতে থাকতে পাগল হ'য়ে ওঠে যেন। মহাশক্তিশালীর ক্ষুদ্রের হাতে বন্ধনের মত মনে হয় ওর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিছানায় পড়ে থাকে ও, আর যে সব চিন্তা আগে কখন আসেনি, যে সব অনুভূতি আগে কখন অনুভব করেনি, সেই সব এখন ছেঁকে ধরে ওকে। জীবনে বহু পরীক্ষা বহু সংগ্রাম আছে—এ ওর অজানা ছিল না—পৌরুষের সঙ্গে সে তাদের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছে। দিনটা একরকম ক'রে কেটে যায়, রাত্রে ঘুম আসে, এপাশ-ওপাশ করে বিছানায় পড়ে পড়ে—সকলে ঘুমন্ত, অন্ধকারে ছাওয়া ঘরে বিরাট ভয় বিপুল আকার নিয়ে যেন ওর সামনে দাঁড়ায়—সে মূর্তির সামনে এতটুকু হ'য়ে যায় ও, মাথার চুল খাড়া হ'য়ে ওঠে। আবার কখনও অনুভব করে, অতল গহ্বরে কেউ যেন ওকে ফেলে দিচ্ছে, একটা বিকট মূর্তি হাঁ ক'রে আছে ওর সামনে, ও বাধ্য হ'চ্ছে তাতে ঢুকতে। অনেকের মুখেই ও শুনেছে, জীবনে সংগ্রামের অন্ত নেই, শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রয়োগ ক'রেও মানুষ এর বিরুদ্ধে জয়ী হ'তে পারে না—তাই কি সত্যি? যত চেষ্টা, যত মেহনৎই ও করুক হয়তো ও শেষ পর্যন্ত পারবে না, পড়ে যেতে হবে, গুঁড়িয়ে যেতে হবে শত্রুর চাপে। বাড়ীটাকে সকল বিভীষিকার আস্তানা মনে হয়; মনে হয় ও আর ওর এই অতি প্রিয় আপনার জনগুলি ঠাণ্ডায় অনাহারে আস্তে আস্তে কুঁকড়ে মরে যাবে—কেউ শুনতে আসবে না ওদের

আর্তক্রন্দন—ভাবতে ভাবতে ওর ভেতরটা বর্ণনাতীত আশঙ্কায় বরফের মত জমে যায় যেন। কত সত্য, কত ভীষণ সত্য ওদের এই নিরুপায়তা! সভ্যতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই শহরে, ঐশ্বর্যের পাশে পাশে প্রকৃতির আক্রমণে মনুষ্যজীব মরবে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে, আদিম গুহাবাসী মানুষের মত অজ্ঞানতার অসহায়তা নিয়ে—তবু তাদের সাহায্য করবার কেউ নেই, কিছু নেই—সত্যি, এ সত্যি!

ওনা এখন মাসে প্রায় ত্রিশ ডলার আর স্ট্যানিসলোভাস প্রায় তের ডলার ক'রে রোজগার করছে। আর খাওয়ার জন্য জোনাস ও মেয়ারিজ্জা যা দেবে—দুয়ে মিলিয়ে মোট পঁয়তাল্লিশ ডলার হ'তে পারে। এতে হ'তে সুদ, বীমা ও কিস্তির টাকা বাদ দিলে থাকে ষাট ডলার, কয়লার জন্য বাদ দিতে হয় দশ, থাকে পঞ্চাশ ডলার। খাওয়া-পরার দিক হ'তে প্রায় সব কিছুর ওপরই ওরা কাটছাঁট করে, নেহাৎ যেটুকু না হ'লে মানুষের বাঁচাই অসম্ভব, সেটুকুই ওরা করে, তার বেশী নয়। পুরোনো ছেঁড়া কাপড় পরে ওরা, শীত লাগে খুবই, কিন্তু কী করবে? ছেলেদের জুতো ছিঁড়লে সারায় না, ন্যাকড়ার ফালি বেঁধে দেয়। আধা অক্ষম হ'য়েও ওনা গাড়ীতে চড়ে না, হেঁটেই যায়, এতে শরীরের আরও ক্ষতি হয়, তবুও ও হাঁটে। বলতে গেলে খাবার ছাড়া আর কিছুই কেনে না ওরা, কিন্তু তা হ'লেও পঞ্চাশ ডলারে মাস চলে না, মাস চলে না কেন, বেঁচে থাকাও কঠিন হ'য়ে পড়ে। খাঁটি খাবার ন্যায্য দরে পেলে তবু না হয় বেঁচে থাকা সম্ভব হ'ত, কিম্বা অত ভীষণ অজ্ঞ না হ'য়ে কী কিনতে হবে এই সাধারণ জ্ঞানটুকু যদি থাকত ওদের, তা হ'লেও হয়তো বাঁচা সম্ভব হ'ত; কিন্তু ওরা এসে পড়েছে একটা নতুন দেশে, এখানে সব কিছু, খাবার পর্যন্ত ওদের কাছে নতুন। দেশে যে খাদ্য খেত সেই নামের সেই 'উপাদানে'র খাদ্যই কেনে এখানে, কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে রং ও স্বাদ তৈরী করা হয়েছে, সেটা ওদের

জানবার কথা নয়; এ খাবারের সঙ্গে "আলু-ময়দা" নামক পদার্থটিও মিশিয়ে দেওয়া হয়। এর কোন খাদ্যগুণ নেই, পেটে গিয়ে বিষের কাজ করে। ইউরোপে এ বস্তু খাদ্যের সঙ্গে ভেজাল দিলে কঠোর শাস্তি হ'বার আইন আছে; সেখানকার পুঁজিপতিরা তাই আইনের ফ্যাকড়ার মধ্যে না গিয়ে লাখ লাখ টন আলু-ময়দা মার্কিন মুলুকে চালান দেয়। এ বস্তু খেয়ে দেহের প্রয়োজন মেটে না, তাই পেট ভরে'ও যেন ভরে না, সারবস্তু এতে কিছুই নেই, তাই পরিমাণটা বাড়াতে হয়। অথচ আর্থিক এই দুরবস্থার মধ্যে কত আর পরিমাণ বাড়াবে ওরা? দিন এক ডলার পঁয়ষট্টি সেণ্ট ক'রে খরচ করে এর পিছনে, তবু ভরপেট যেন খাওয়া হয় না। কাজেই ব্যাঙ্কে ওনার সামান্য জমা হ'তেই টাকা তুলতে হয়; ওরই নামে হিসেব, ওর দস্তখতেই টাকা ওঠে; ইউরঘিসকে ও জানায় না, অন্তরের ব্যথা অন্তরেই চেপে রাখে।

সত্যি সত্যি অসুস্থ হ'য়ে পড়লে, চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত না থাকলে ইউরঘিসের পক্ষে ভাল হ'ত। সময় কাটাবার কত রকমের ব্যবস্থাই তো আছে পঙ্গুদের; ইউরঘিসের কিন্তু সময় কাটে বিছানায় পড়ে পড়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে; সময় কাটতে চায় না, মেজাজ বিগড়ে যায়, কখন তেড়েফুঁড়ে ওঠবার চেষ্টা করে, হাঁ-হাঁ করে ওঠে এলজবিয়েটা, ধরে বেঁধে শুইয়ে দেয় আবার। সমস্ত দিনটা এলজবিয়েটাই ওর একমাত্র সঙ্গী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথার ধারে বসে' এলজবিয়েটা ওর কপালে হাত বুলিয়ে দেয়, নানারকম গল্পগুজব ক'রে ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। এক একদিন ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে, ছেলেরা স্কুলে যেতে পারে না; সেদিন ওদের রান্নাঘরে খেলা করতে হয়; ইউরঘিসও এখানেই থাকে, কারণ সমস্ত বাড়ীর মধ্যে এই ঘরটাই যা একটু গরম। এই সব দিনে বাড়ীর অবস্থা ভীষণ হ'য়ে ওঠে, রাগে গর্জাতে থাকে ও। দোষও যে ওকে খুব

দেওয়া যায় তা নয়, সীমাহীন দুশ্চিন্তায় ঘুমুতে পারেও না একে, তাতে যদি কয়েক মিনিটের জন্য একটু চোখ লাগল তো পুষ্টিহীন এই সব ছিঁচকাঁদুনে ছেলেদের কান্নাকাটিতে তন্দ্রাটুকু বজায় রাখবার উপায় থাকে না।

এ সময় এলজবিয়েটার মহাসম্পদ হ'য়ে ওঠে বাচ্ছা অ্যাণ্টেনাসটা; বাচ্ছাটা না থাকলে ওদের কী ক'রে যে কাটত বলা কঠিন। ছেলেকে সমস্ত দিন দেখতে পায়, বন্দীদশায় এই এখন ইউরঘিসের একমাত্র সান্ত্বনা। ওদের জামাকাপড় রাখবার একটা টুকরি আছে, তাতেই বাচ্ছাকে শুইয়ে রাখা হয়; টুকরিটা থাকে ইউরঘিসের বিছানার পাশে, কনুইএর ওপর ভর দিয়ে বহুক্ষণ ধরে ইউরঘিস ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে আর কত কি কল্পনা করে। বাচ্ছা এখন দেখতে শিখেছে, মাঝে মাঝে চোখ খোলে, একবার দেখে নিয়ে হাসে—কেমন সুন্দর হাসিটা ওর! মুহূর্তের মধ্যে সব ভাবনাচিন্তা ভুলে যায় ইউরঘিস, খুশী বোধ করে মনে মনে, যে দুনিয়াতে এত মিষ্টি হাসবার মত বাচ্ছা আছে তার ভেতরটা কখনও অত ভীষণ কদর্য হতেই পারে না। "প্রতিনিয়ত ছেলেটা যেন ঠিক বাপের মত হ'য়ে উঠছে—অদ্ভুত ছেলে।" এলজবিয়েটা মন্তব্য করে, একবার না, সারাটা দিনে বহুবার; কারণ ও লক্ষ্য করেছে এ মন্তব্যে ইউরঘিস বেশ আনন্দ পায়। আজীবন সব কিছুকেই ভয় ক'রে এসেছে এলজবিয়েটা, আজ এই দানবের কষ্ট দেখেও ভয় পায় সে, তাই সাধ্যমত সর্বপ্রকারে ওকে খুশী রাখবার চেষ্টা করে। ছেলে ঠিক বাপের মত দেখতে! মেয়েদের চিরকালের ভণ্ডামি এটা! মেয়েদের এই স্বভাবসিদ্ধ প্রতারণা বোঝবার ক্ষমতা ইউরঘিসের নেই; এলজবিয়েটার কথা ওর খুব মনে ধরে, আনন্দে সেও হাসে। আঙুল তুলে শিশুর চোখের সামনে এদিকে-ওদিকে নড়ায়, আঙুলের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চোখও এদিক-ওদিক করে—ভারী বিস্ময়কর বলে'

মনে হয় ইউরঘিসের, হো হো শব্দে প্রাণ খুলে হাসতে থাকে ও। শিশুর মত এত মনভোলানো আর কিছু বোধ হয় নেই; পরম গম্ভীরভাবে বাচ্ছা ইউরঘিসের দিকে হয়তো চেয়ে থাকে—আনন্দে ইউরঘিস চীৎকার ক'রে ওঠে, "দেখ মা, দেখ, নিজের বাপকে ঠিক চেনে দুষ্টুটা, ঠিক চেনে!"

দ্বাদশ অধ্যায়

পুরো তিনটী সপ্তাহ ও পড়ে থাকে; বিশ্রীভাবে মচকে গেছে পা'টা, সারতে যেন আর চায় না। তিন হপ্তার পর আর ও শুয়ে থাকতে পারে না; সকলে নিষেধ করে উঠতে; ও বোঝায়, এ আর ভাল হ'য়ে এসেছে। জোর ক'রে দু' এক পা ক'রে হাঁটা অভ্যাস করে। কয়েকদিন পরে জেদ ধরল, কাজে যাবেই। রোখে কে ওকে বাড়ীতে! খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে বাস ধরল। অফিসার ওর চাকরি তখনও ধরে' রেখেছেন, অর্থাৎ ও আসতে নয়া লোকটীকে তাড়িয়ে দিলেন। কাজে লেগে যায় ইউরঘিস; কাজ করেও প্রায় সমস্ত দিন; কিন্তু কাজের ঘণ্টা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও বাড়তে থাকে; ছুটির এক ঘণ্টা আগে যন্ত্রণা অসহ্য হ'য়ে পড়ে; মনে হয় এখনি বোধ হয় মাথা ঘুরে পড়ে' যাবে। জানাতেই হয়, ও অক্ষম, আর পারছে না। এটুকু জানাতে বুক ফেটে যায় ওর, একটা থামে ঠেস দিয়ে কিশোরের সারল্যে কেঁদে ফেলে। দু'জন সহকর্মী ওকে বাসে তুলে দিয়ে আসে। কিন্তু বাস হ'তে নেমে আর নড়বার ক্ষমতা থাকে না ওর; বরফের ওপরই বসে থাকে। একজন লোক কিছুক্ষণ পরে ঐদিকে এসে যাওয়ায় ও বাড়ী পৌছতে পারে।

বাড়ীর লোক আবার ওকে শুইয়ে দেয়। প্রথমদিকেই ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল, কিন্তু ডাকেনি ওরা; আজ ডেকে পাঠায়। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বলেন, একটা রগ বিশ্রীভাবে জখম হ'য়ে গেছে, যথাস্থানে তাকে বসিয়ে সারবার মত সময় দিতে হবে। ফোলা গোড়ালি ধরে' টেনে মুচড়ে ডাক্তার রগ বসান, আর ইউরঘিস দাঁতে দাঁত চেপে কঠিনভাবে খাটের বাজু চেপে ধরে। টানাটানি শেষ ক'রে ডাক্তার জানান রগটাকে ঠিক জায়গায় বসান হ'য়েছে, এখন ছুটী মাস একভাবে শুয়ে থাকতে হবে, উঠলে কি নড়াচড়া করলে আজীবন খোঁড়া হ'য়ে থাকতে হবে।

এর তিন দিন পর আবার তুষার-ঝড় আরম্ভ হ'ল। জোনাস, মেয়ারিজা, ওনা ও স্ট্যানিসলোভাস কারখানা অভিমুখে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল ভোর হবার ঘণ্টাখানেক আগে—কখন পৌছতে পারবে, কে জানে! দুপুরের দিকে শেষের দু'জন ফিরে আসে; স্ট্যানিস-লোভাসের আঙুল জমবার মত হ'য়ে গেছে। এ অবস্থায় কী করতে হয় ওরা জানে না, ঠিক করে আগুনের ধারে ধরলেই হয়তো ভাল হ'য়ে যাবে; আগুনের ওপর হাতটা ধরে' স্ট্যানিসলোভাস সমস্ত দিনটা কাঁদে। রুগ্ন ইউরঘিসের এ কান্না সহ্য হয় না; পাগলের মত সে চীৎকার ক'রে ধমকে ওঠে; সে দিন ও সে রাত্রি পরিবারের সকলে আতঙ্কে পাগল হ'বার উপক্রম হয়—এদের দু'জনের চাকরি নিশ্চয় যাবে! পরের দিন অর্থাৎ রাত্রিশেষে স্ট্যানিসলোভাস আর কিছুতেই বের হ'তে চায় না, কান্নাকাটি করে, কিন্তু কাঁদলে কী হবে? যেতেই হবে, ফস্টেমো নয় তো এ, জীবন-মরণ সমস্যা! কাজ যাওয়ার চেয়ে ওর জমে' যাওয়া ভাল। ইউরঘিস ওকে লাঠিপেটা করে। মার খেয়ে মরার চেয়ে জমে' মরাই ভাল ঠিক ক'রেই বোধ হয় ও ওনার সঙ্গে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক আগে বেরিয়ে পড়ে। ওনার দৃঢ়বিশ্বাস,

চাকরি আর ওর নেই; গিয়ে দেখে আগের দিন প্রধানা নিজেই আসতে পারেন নি; এজন্য একটু নরম হ'তে হয় তাঁকে।

ঘটনাটার দুটী ফল হ'ল: প্রথম, ছেলেটার তিনটী আঙ্গুলের প্রথম পর্ব চিরতরে অবশ হ'য়ে গেল, আর দ্বিতীয় ফল, বাইরে বরফ পড়লে ওকে পিটতে হয়, তবে ও কাজে বের হয়। পিটুনির ভারটা নিতে হয় ইউরঘিসকেই, পিটতে গেলে ব্যথা বাড়ে সুতরাং রাগও বাড়ে, প্রতিহিংসা নেওয়ার মত ক'রেই ঠ্যাঙায় ও। ঠ্যাঙানির পরও ওর মেজাজ মিঠে হয় না। সব সময় বাঁধা থাকলে অতিভাল কুকুরও কামড়াতে যায়—মানুষও ঐ একই নিয়মের অধীন, ইউরঘিস তো কোন্ ছার। সমস্ত দিনটা পড়ে' থাকা ছাড়া ওর কাজ নেই—পড়ে' পড়ে' নিজের ভাগ্যকে গালাগালি দেয়, মেজাজ চড়তেই থাকে, সব কিছুরই ওপর রাগ ধরে।

রাগটা দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে না। ওনা কাঁদতে লাগলেই ওর রাগ উবে যায়। দেখতে ওকে ভূতের মত লাগে, চোখ গাল বসে' গেছে, উস্কোখুস্কো লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল চোখ মুখের ওপর এসে পড়ে; এত ভেঙ্গে পড়েছে যে চুল ছাঁটবার কথা কি নিজের চেহারার কথা মনেই আসে না ওর। ওর পেশী চুপসে নরম থলথলে হ'য়ে গেছে; ক্ষুধাও গেছে, নানারকম সুস্বাদু সুমিষ্ট খাদ্য দিয়ে ওর ক্ষুধার উদ্রেক করার মত অবস্থা নয় ওদের। নিজেই বলে ও, খেয়ে হবে কী? খাব না—না খেলে খরচ বাঁচবে। মার্চের শেষদিকে একদিন ওনার ব্যাঙ্কের খাতাখানা কেড়ে নেয়—আর জমা আছে তিন ডলার; এ দুনিয়ায় ওই ওদের সম্বল।

সংসারটা এতদিন এইভাবে থাকার আর একটা ফলও হ'ল, জোনাস বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল, অবশ্য কাউকে না জানিয়ে। এক শনিবার রাত্রে সে আর বাড়ী ফিরল না; অনেক খোঁজাখুঁজি করলে ওরা,

কিন্তু তার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ডারহামে ওর অফিসার বললে, হপ্তার মাইনে নিয়ে চলে' গেছে। এ সংবাদ সত্য না-ও হ'তে পারে, কারণ কারখানার কেউ মারা পড়লে ক্ষতিপূরণ এড়াবার এই ওদের সহজতম পন্থা। যেমন ধরুন, কোন শ্রমিক হয়তো মাংস সিদ্ধ করবার বিরাট একটা টবে পড়ে' গেল, তার মাংস চামড়া আঁতরি সবই সেদ্ধ হ'য়ে খাঁটি পত্রচর্বি বনে' গেল, আর হাড় দিয়ে হ'ল অতি উৎকৃষ্ট সার; এরপর তার পরিবারবর্গকে তার মৃত্যুর খবরটা দিয়ে অনর্থক নিজেদের ঝামেলা বাড়িয়ে আর ওদের দুঃখ বাড়িয়ে কার কী লাভ? তবে জোনাসের ক'দিন আগে হ'তে যে ভাব-গতিক ছিল, তার থেকে ওদের মনে হয়, এ সংসারের কষ্ট আর সইতে না পেরে সে ওদের ছেড়ে পালিয়েছে। সুখ চায় না কে? সেও সুখের খোঁজে গেছে। অসন্তোষটা ওর অনেক দিন হ'তেই ছিল; খাবার জন্য খরচ ও মন্দ দিত না, কিন্তু এ সংসারে ভাল তো দূরের কথা পেটপুরেই কেউ খেতে পায় না। এদিকে মেয়ারিজা তার পুরো রোজগারই এদের দিয়ে দেয়, একই জায়গায় থেকে ওর খালি খাই-খরচটা দেওয়া কীরকম কীরকম দেখায়। অন্য দুঃখ-দুর্দশাও প্রচুর, তার ওপর ছেলে-গুলোর কান্নাকাটি—মহাপুরুষ না হ'লে এ সব ঝঞ্ঝাট কেউ অনর্থক ঘাড়ে তুলে নিতে পারে না—জোনাস সাধারণ মানুষ, ও চায় ভাল খাওয়া, শান্তি আর ঘুমোবার আগে একটু শান্তিতে নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ বসে' বসে' আপন মনে তামাক টানতে—পরের অবিরাম দুঃখ-দৈন্য, পরের ছেলেমেয়ের কান্নাকাটি সইবার মত মহানুভবতা নেই ওর। আর এ বাড়ীতে? মানুষ গিজগিজ করছে, রান্নাঘরের চুল্লির পাশে বসবার একটু জায়গা পাওয়া যায় না, কয়লার অভাবে অন্য ঘরে আগুন জ্বলে না—আরামের নাম নেই এ বাড়ীতে। কাজেই বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে তার পালাবার ইচ্ছে হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না। দুটী বছর

ও ভারহামে তের চৌদ্দ মণের গাড়ী টেনে চলেছে, রবিবার ও বৎসরে চারদিন ছুটি ব্যতীত আর অবসর নেই, গালাগাল লাথি ঘুষি ছাড়া কথা নেই—ভাল জাতের কুকুরও বোধ হয় এ সব সহ্য কর[illegible] না। ঢের সয়েছে ও। এবার শীত কেটেছে, বসন্তের হাওয়া ব[illegible] মন ধরেছে অন্য সুর। প্যাকিংশহরের ধুলো ধোঁয়া অত্যাচার অ[illegible]দৈন্য সয়ে মন আর থাকতে চায় না; বিশেষতঃ এক দিন হাঁটলেই মা[illegible] এই কদর্যতার রাজ্য ছেড়ে সবুজের রাজ্যে চোখ মেলতে পারে, রা[illegible] রঙে রাঙান ফুলের মুখ দেখতে পায়; আজ সে এই এক দিনে[illegible]টার পথেই চলে গেছে—এই তো স্বাভাবিক।

এতে সংসারের আয় কমল তিন ভাগের এক [illegible]গ, কিন্তু খাবার মুখ এগারটার জায়গায় দশটি রয়ে গেল। ওদিকে [illegible]রিজার কাছে ওরা ধার ক'রেই চলেছে, খেয়ে খেয়ে তার ব্যাঙ্কের [illegible] নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে—তার বিয়ের স্বপ্ন, সুখের আশাও ভেঙ্গে [illegible]। শুধু কি তাই? ট্যামশুসিয়স কুস্লেইকার কাছেও ওরা নি[illegible]ত ধার করছে। ট্যামশুসিয়সের আপনজন কেউ নেই, অথচ [illegible] আছে প্রচুর—প্রচুর টাকা জমানরই কথা ওর। কিন্তু প্রেমে প[illegible]ড়ে' গেছে, প্রেমিকার আপনজনের জন্য সবই দিতে পারে, দিচ্ছেও প্রায় তাই; ফলে, আর্থিক অবস্থায় দ্রুত নেমে আসছে এদের সঙ্গে।

সমস্যার সমাধানের জন্য স্থির হ'ল, আরও দুটী ছেলেকে স্কুল ছাড়াতে হবে। ষ্ট্যানিসলোভাসের বয়স এখন পনের, তার চেয়ে দুবছরের ছোট বোন কোট্রিনা, তারপর দুটি ছেলে—এগার বছরের বিলিমাস আর দশ বছরের নিকালোইউস। ছেলে দুটী বেশ চালাক-চতুর; ওদেরই বয়সের লাখ লাখ ছেলে এখানেই কাজ করছে, আর ওরা থাকতে এই সংসারটা উপোস করবে, কোন মানে হয় তার? অতএব একদিন সকালবেলা ওদের দু'জনকে কিছু খাবার এবং প্রচুর উপদেশ দিয়ে শহরে পাঠান

হ'ল খবরের কাগজ বেচতে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখতে! রাত্রিবেলা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফেরে দুটীতে—পাঁচ ছ' মাইল পথ হাঁটার পর একজন লোক এসে খবরের কাগজ কিনে দেবার কথা বলে, ওরা তার সঙ্গে সঙ্গে যায়, ওদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সে একটা দোকানে ঢোকে; ওরা রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষাই করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে; লোকটা কিন্তু আর বেরিয়ে আসেনি। সুতরাং, বাড়ীতে ওদের বেশ ক'রে চাবকান হয় সে রাত্রে—পরের দিন আবার বেরিয়ে পড়ে ওরা। এবার ওরা কাগজের অফিস বের করে, কাগজ কেনে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে "কাগজ, কাগজ" হাঁকও ছাড়ে; কিন্তু সেটা অন্য কাগজওয়ালার রাজ্য, অনধিকার প্রবেশের অপরাধে সে এদের কাগজ কেড়ে নিয়ে উত্তমমধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। সৌভাগ্যবশতঃ লোকটার খপ্পরে পড়বার আগেই ওরা কিছু কাগজ বেচে ফেলেছিল, তাতে লাভ না হ'ক পুঁজিটা উঠে এসেছিল।

প্রায় একটা সপ্তাহ এমনি সব দুর্ভোগ ভোগবার পর ওরা ব্যবসাটার ঘোঁৎঘাঁৎ শিখে ফেলে—কোন্ কাগজের কী নাম, কোন নার কত কপি নিতে হবে, কী ধরণের লোকের কাছে কোন্ কাগজ তুলে ধরতে হবে, কোথায় কী ভাবে সেগুলো পাওয়া যায়, কোথা যেতে হয়, কোথায় যেতে হয় না প্রভৃতি প্রায় সবই ওরা শিখে ফেলে। এর পর ভোর হ'তেই ওরা বাড়ী হ'তে বেরিয়ে পড়ে, সকাল হ'তে বারটা পর্যন্ত সকালের কাগজ আর তারপর সান্ধ্য কাগজ নিয়ে ওরা ছুটোছুটি করে, বাড়ী ফেরে সন্ধ্যার পর, কোন কোনদিন তারও পরে—এক একজনের লাভ হয় ত্রিশ হ'তে চল্লিশ সেণ্ট। এতে হ'তে ওদের বাসের ভাড়া বাদ যায়, বহু পথ চলা দরকার, অত হাঁটবার ক্ষমতা নেই ওদের। আরও কিছুদিন পরে ওরা বাস-কণ্ডাক্টরদের সঙ্গে দোস্তী পাতিয়ে নেয়, আরও নানা রকম ফন্দী-ফিকির শেখে; ফলে, ভাড়াটা

বেঁচে যায়। খুব ভিড় হ'লে ওরা বাসে ওঠে, উঠে বড়মানুষের বেশী ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে, কণ্ডাক্টর হয় দেখতেই পায় না, নয় ভাবে ওরা আগেই দিয়ে দিয়েছে—এইভাবে চারবারের মধ্যে অন্ততঃ তিনবারের ভাড়া বেঁচে যায়। অনেক সময় আবার নেহাৎ ধরা পড়ে' গেলে দু'একবার পকেট হাতড়ে কান্না জুড়ে দেয়—তখন হয় কোন বৃদ্ধা ওদের ভাড়াটা দিয়ে দেন, নয় নেমে পড়ে' পরের ষ্টপে কসরৎ খেলে। কারখানা খোলা ও বন্ধের সময় বাসে অসম্ভব ভিড় হয়, সে ভিড় ঠেলে ভাড়া আদায় করা কণ্ডাক্টরদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। এ কার দোষ? তা ছাড়া শহরসুদ্ধ লোক বাস কোম্পানীকে চোর বলে, বজ্জাত রাজনীতিকদের হাত ক'রে জনসাধারণের চলাচলের এই ব্যবস্থাটাকে তারা একচেটে ব্যবসায়ে পরিণত করেছে। ভাড়া ফাঁকি দিতে বিবেকে বাধে না ওদের!

শীত কেটে গেছে, বাইরে বরফ নেই, কয়লা কিনতে হয় না, অন্য ঘরগুলো বাস করবার মত গরম হয় এখন, আরও কিছু রোজগার হওয়ায় হপ্তাটা কেটে যায় কোনরকমে, ছেলেরা এখন অন্য ঘরে চেঁচামেচি করতে পারে—এ সবের ফলে ইউরঘিসের মেজাজ এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়। কিছুদিনের মধ্যে সব কিছুই মানুষের অভ্যাস হ'য়ে যায়, ইউরঘিসের বিছানায় পড়ে থাকা অভ্যাস হ'য়ে যায়। ওনার যন্ত্রণা বাড়ে কিন্তু ইউরঘিসের মনের শান্তি টুটে যাবে ভেবে ওকে সে কথা জানায় না। বসন্তের বৃষ্টি হয় মঝে মাঝে, খরচ না হ'লেও বাসে না গিয়ে পারে না ওনা—শরীরের রক্তশূন্যতা বেড়েই চলে। ইউরঘিসের প্রশান্তি নষ্ট করবে না ভাবে; কিন্তু তবু মন চায়, ইউরঘিস তার রক্ত-শূন্যতার লক্ষ্য করুক; ইউরঘিসের এখন আর এ সব দিকে খেয়াল নেই, ওর এই ঔদাসীন্যের জন্য ওনা রোগের চেয়ে বেশী কষ্ট পায়। মাঝে মাঝে ভাবে, আগের মত হয়তো আর ভালবাসে না, হয়তো দারিদ্র্য-দুর্দশার

জন্যই প্রেম শুকিয়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা ওনা ওর কাছে থাকতে পায় না, দূরে নিজের নিজের কষ্ট নিয়ে দু'জনে থাকে; বাড়ী ফেরে ওনা অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে—যাও-বা দু'একটা কথা হয় সেও ঐ অভাব-অভিযোগ নিয়েই—এই কঠোর শুষ্ক জীবনে শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেম-স্নেহ থাকবে কী ভাবে? এই চিন্তাটাই ওনাকে ভেতর ভেতর আরও যেন খেয়ে ফেলছে—এক এক রাত্রে ও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না; বিরাটকায় স্বামীকে ক্ষীণ দুটি বাহু দিয়ে চেপে ধরে' কাঁদে, কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞাসা করে, ওর স্বামী কি সত্যিই ওকে ভালবাসে। ইউরঘিস বিব্রত বোধ করে, এর জবাব কী করবে, কী বলবে বুঝতে পারে না; কঠিন দারিদ্র্য আর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে কোন কোমলভাব ভাল-ভাবে ও বুকে পুষ্টিলাভ করতে পারেনি। ওনা এভাবে কাঁদলে ও জবাব খুঁজে পায় না, খালি মনে করবার চেষ্টা করে, সেদিন কি ও রেগে উঠেছিল? মার বা ধমক ছাড়া মানুষের কাঁদবার কারণ থাকতে পারে না। হতাশ হ'য়ে ওনা নিজের মনে কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

এপ্রিলের শেষাশেষি ইউরঘিস নিজেই চলে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে; একটা ব্যাণ্ডেজ সেলাই ক'রে দেওয়া হয় ওর পায়ে, এবং বলে' দেওয়া হয়, এখন ইচ্ছে করলে কাজে যেতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া যায়, যোগ দেওয়া যায় না। ব্রাউনের কারখানার হত্যামঞ্চের প্রধান জানিয়ে দেন, এত দিন ধরে' ওর 'পদ' খালি রাখা সম্ভব হয়নি। ইউরঘিস বোঝে ওরই মত কাজ করতে পারে এমনি একজনকে পাওয়া গেছে, তাই আর লোক বদলাবার ঝঞ্ঝাট ওরা পোয়াতে চায় না। ঘরটার দোরে ও বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, সহকর্মীরা কাজ করে, ও দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেকে পতিত বলে' মনে হয় ওর। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পর বেরিয়ে গিয়ে ও বেকার

বুভুক্ষুর দলে যোগ দেয় ফটকের বাইরে।

এবার আর আগেকার সে আত্মবিশ্বাস নেই, সে আত্মবিশ্বাস থাকবার কারণও অবশ্য আর নেই। ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়বার মত শরীর বা স্বাস্থ্য নেই আর, লুফে নেবে কেন অফিসাররা? তার ওপর ছেঁড়া ময়লা পোষাক, চোখে আর্তক্লিষ্ট দৃষ্টি, আকৃষ্ট করবার মত কিছুই নেই আর ওর। ওরই মত হতাশ ভেঙ্গেপড়া মন নিয়ে, বসা চোখ ভাঙ্গা গাল রুক্ষ চুল কঙ্কালমূর্তি নিয়ে আরও হাজার হাজার লোক মাসের পর মাস একটা কাজের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে প্যাকিংশহরের দোরে দোরে। ইউরঘিসের জীবনে এ এক সঙ্কটজনক অবস্থা; অন্যান্য কর্মপ্রার্থী বুভুক্ষু সকালের দিকে ফটকে ফটকে ভিড় করে, শেষে পুলিস এসে তাড়িয়ে দেয়, পালিয়ে যায় ওরা ফটক ছেড়ে, ভেতরে ঢুকে অফিসারদের সঙ্গে দেখা করবার সাহস নেই ওদের। পুলিস তাড়িয়ে দিলে ওরা গিয়ে জোটে মদের দোকানে, সমস্তটা দিন কেটে যায় সেখানে। দুর্বলচিত্ত হ'লে ইউরঘিসেরও ঐ দশা হ'ত। বাইরে চমৎকার আবহাওয়া, কোন ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে' থাকবার প্রয়োজন নেই ওর, তা ছাড়া দিবারাত্র মনে জেগে থাকে স্ত্রীর ক্ষুদ্র ক্লিষ্ট মুখখানি—এই সব কারণে ও ভেতরে ঢুকে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে দেখা ক'রে কাজের খোঁজ করে, প্রত্যাখ্যানই পায়, তবু খোঁজে। হতাশার সঙ্গে অবিরাম লড়াই করে, মনকে ধমক দেয়, কাজ ওর চাই-ই চাই, কাজ ওকে পেতেই হবে; জোগাড় করতেই হবে একটা কাজ, আগামী শীতের আগে কিছু ওকে জমিয়ে নিতেই হবে।

কিন্তু তার জন্য কোথাও কাজ নেই, কোথাও না। এত সবের মধ্যেও ও ইউনিয়নের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেছিল, আজ ইউনিয়নের সকল সভ্যের সঙ্গে দেখা করে, অনুরোধ করে ওর জন্য তারা একটু বলুক নিজের ডিপার্টে। যাকে চেনে তারই কাছে যায়, যেখানে হ'ক একটা

কাজ জোগাড় ক'রে দাও। সপ্তাহ দুইএর মধ্যে ও সকল কারখানা, সকল ডিপার্ট এবং সুযোগ পেলে প্রতিটী ঘর ঘুরে নেয় চাকরির খোঁজে, নাঃ কোথাও কাজ খালি নেই। সব কিছু দেখা হ'য়ে গেলে মনে হয় এতদিনে হয়তো কোথাও লোকের প্রয়োজন হ'য়েছে, কোথাও। এইভাবে বারবার ঘোরে ও কারখানায় কারখানায়; শেষে প্রতিটী কারখানার প্রহরী ও চররা ওকে চিনে ফেলে, ও যেতে গেলেই তারা বকাবকি, অপমান ক'রে ওকে তাড়িয়ে দেয়। তখন হ'তে এভাবে খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ও অন্যান্যের মতই সকাল হ'লেই কর্মপ্রার্থীদের সঙ্গে গিয়ে একটা ফটকে দাঁড়ায়. চেষ্টা করে সামনের লাইনে দাঁড়াতে, চেষ্টা করে বলিষ্ঠ প্রফুল্লভাবে চাইতে, তারপর পুলিস তাড়িয়ে দিলে বাড়ী ফিরে বাচ্ছা অ্যান্টেনাস ও কোট্রিনার সঙ্গে খেলা করে।

ওর কাছেও এর মানেটা খুবই পরিষ্কার; তাই তিক্ততাটা বাড়ে বিশ্রীভাবেই। আগে ছিল সতেজ শক্তিধন্য দেহ, প্রথম দিনেই কাজ পেয়েছিল। এখন ও হাত বদলান মাল, পুরনো; কেউ আর ওকে চায় না। বেপরোয়া 'গতি বাড়াও' পদ্ধতি দিয়ে ওর মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে আগ্রহ ক'রে ওরা নিঙ্‌ড়ে নিয়েছে ওর সমস্ত শক্তি, ছিবড়ে ক'রে দিয়েছে একেবারে—আজ বলছে দরকার নেই আর, দূর হ'য়ে যাও। অন্যান্য বেকার বুভুক্ষুর সঙ্গে ইউরাঘিস আলাপ করে, দেখে এটা ওর একলার অভিজ্ঞতা নয়, সকলের অভিজ্ঞতা একই। অবশ্য অনেকের 'অপরাধ' অন্য প্রকারের, কেউ হয়তো অত কাজের চাপ মদ না খেয়ে টানতে পারেনি, কেউ হয়তো অন্য কোন কারখানার ছিবড়ে। তবে অধিকাংশ এই বিরাট যন্ত্রের ক্ষয়ে-যাওয়া অংশ, নিষ্ঠুর যন্ত্রের ক্ষয়-পাওয়া ভাঙ্গা অংশ। ওদের অনেকে ঐ গতিতে ঐ চাপে দশ হ'তে বিশ বৎসর পর্যন্ত কাজ ক'রে শেষটায় আর তাল রাখতে পারেনি। কাউকে কাউকে খোলাখুলি বলে' দেওয়া হ'য়েছে, বুড়ো হ'য়ে গেছ বড্ড, জোয়ান

চাই আমরা। কেউ কেউ কাজে যন্ত্রের অভাব বা অযোগ্যতার জন্য বিতাড়িত হ'য়েছে, ইউরঘিসের মত অবস্থায় পড়ে' বেকার হয়েছে এমনও অনেক আছে—কেউ শরীরকে শরীর মানেনি, অল্প খেয়েছে, তারপর একদিন বহুদিনের জন্য বিছানা নিয়েছে, কারও হাত পা কেটে গিয়ে রক্ত বিষিয়ে যায়, বহুদিন পড়ে' থাকে। সুস্থ হ'য়ে ফিরে এলে চাকরি ফিরে পাবার দাবী নেই, মালিক ম্যানেজাররা দয়া করলেথাকতে পারে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। তবে কেউ স্পষ্টতঃ কারখানা পরিচালকদের দোষে আহত হ'লে, মালিকরা প্রথমতঃ ধরাছোঁয়া দেবে না, এমনি একজন উকিল পাঠিয়ে দেয় তার কাছে, উকিল চেষ্টা করে দাবী-দাওয়া ছাড়বার চুক্তিতে বা সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেবার স্বীকৃতি-পত্রে সই করাবার, তাতে অক্ষম হ'লে তবেই ওরা আহতকে ও তার পরিবারবর্গকে দু' বছরের খাওয়া-পরা দেয়; ব্যস, ঐ দুটো বছরই। দু' বৎসর "স্মৃতিশাস্ত্রের সীমা", তারপর আর তার নালিশ করবার অধিকার থাকে না।

এরপর লোকগুলো কী করে সেটা নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার ওপর। অত্যন্ত দক্ষ শ্রমিক হ'লে তার কিছু জমা অর্থ থাকে, দু' [illegible] দিন তাতেই কেটে যায়। ষাঁড়ের মাথা ফাটানেওয়ালারাই এখানে সব-চেয়ে বেশী মজুরী পায়—চড়া-বাজারে দিন ছ' সাত ডলার, আর একেবারে পড়া-বাজারেও কম পক্ষে এক হ'তে দু' ডলার পায় ওরা। এ রকম আয় হ'লে কিছু জমান যায় বৈকি। তবে এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম; কারখানাপিছু জন বারো মাত্র। তাও আবার এক-একজনের পোষ্যসংখ্যা অনেক; ইউরঘিসের পরিচিত এমনি এক দক্ষ শ্রমিক আছে, তার বাড়ীতে একুশটী ছেলে—এদের প্রত্যেকেই আশা করে বড় হ'য়ে 'ষাঁড়ের মাথা ফাটাবার মত দক্ষ শ্রমিক' হবে। অদক্ষরা চড়াবাজারে সপ্তাহে দশ ডলার আর পড়া-বাজারে পাঁচ ডলার পর্যন্ত

রোজগার করে—এদের সঞ্চয়টা নির্ভর করে বয়স ও পোষ্যের সংখ্যার ওপর। এই মজুরীর অদক্ষ শ্রমিক অবিবাহিত হ'লে এবং নির্ভেজাল স্বার্থপর হ'লে—অর্থাৎ বুড়ো বাপ মা, ছোট ছোট ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, ইউনিয়নের বন্ধুবান্ধব, পড়শীর উপোস, সকলের দাবী, এদের সকলের প্রতি মায়ামমতা চক্ষুলজ্জা একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারলে—তারা অবশ্যই কিছু জমাতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইউরঘিসের চাকরির এই খোঁজের সময় এলজবিয়েটার একটী ছেলে ক্রিষ্টোফোরাস মারা গেল। ক্রিষ্টোফোরাস ও তার ভাই ইয়োৎসাপাস ছোট হ'তেই পঙ্গু; গাড়ী চাপা পড়ে' ইয়োৎসাপাসের একখানি পা ভেঙ্গে যায়; ক্রিষ্টোফোরাসের কটিসন্ধিতে ছিল জন্মগত দোষ, এজন্য জীবনে হাঁটা আর তার হয়নি। সে-ই এলজবিয়েটার শেষ সন্তান, ওকে পাঠিয়েই হয়তো প্রকৃতি এলজবিয়েটাকে জানাতে চেয়েছিল যে, যথেষ্ট হয়েছে, আর না। হাড়সার অপুষ্ট ক্রিষ্টোফোরাস তিন বছরের হ'লেও আকারে এক বছরের ছেলের চেয়ে বেশী বাড়েনি। সমস্তটা দিন সে স্যাঁতসেঁতে মেঝের ধুলোময়লার ওপর ময়লা জামা প'রে' ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলত, সর্দি-কাশি লেগেই থাকত বার মাস। সমস্তটা মিলিয়ে ও ছিল সকলের অপ্রিয়, রুগ্ণ ছেলে, কান্না ছাড়া কাজ ছিল না—ওর জন্য অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত সকলে। অথচ ওর মা অন্য সব ছেলেমেয়ের চেয়ে ওকে বেশী ভালবাসত; ওর যা খুশী করবে, কিন্তু কিছু বলতে পাবে না কেউ; ইউরঘিস ওর ওপর চটে' উঠলে এলজবিয়েটা কেঁদে ভাসিয়ে দিত।

এবার সে মরল। হয়তো কৌটোর মাংস খেয়েই মরল। যক্ষ্মার জীবাণু থাকলে, সে মাংস রপ্তানী করা হয় না, দেশেই বিক্রী করা হয়। যাই হ'ক, কৌটোর মাংস খাবার এক ঘণ্টা পর হ'তেই ছেলেটা যন্ত্রণায় কাঁদতে শুরু করে, কয়েক মিনিট পরে ছটফট করতে থাকে; তখন বাড়ীতে ছিল কোট্রিনা, ও চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, ডাক্তার আসে—ততক্ষণে ছেলেটা চিরতরে চুপ ক'রে গেছে। এলজ-বিয়েটা ছাড়া আর কেউ এতে দুঃখ পায় বলে' মনে হয় না। ইউরঘিস বলে পৌরপ্রতিষ্ঠানে খবর দিয়ে দেওয়া হ'ক তারাই কবর দিয়ে দেবে, কারণ খরচ করবার মত টাকা নেই ওদের। অ্যাঁ, এলজবিয়েটার ছেলের কবর হবে ভিখিরীদের গোরস্থানে!—এলজবিয়েটা কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। ইউরঘিস নয় পর, কিন্তু ওনা? নিজের পেটের না হ'ক সৎ মেয়ে তো বটে ওনা, এ কথা শুনে সে একটা কথা বলে না! ওনার বাপ বেঁচে থাকলে কি ওনা এমনটা করতে পারত! একটা ছেলে কেন? সকলে একসঙ্গে পৌরপ্রতিষ্ঠানের খরচে কবরে ঢুকলেই তো পারে!··· অবস্থা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। মেয়ারিজা দশ ডলার দিতে রাজী হয়; কিন্তু ইউরঘিস তখনও গোঁ ধরে' থাকে। এলজবিয়েটা বের হয় পাড়াপড়শীর কাছে ভিক্ষে করতে। যা হ'ক, শেষ পর্যন্ত কফিন আসে, পুরুত আসে; মন্তর, সাদা ফুল, গীর্জার আঙিনায় সবুজ ঘাস ঢাকা এবং কাঠের একটা ক্রুস লাগান নিজস্ব একটা কবর—সবই হয় ক্রিষ্টোফোরাসের। শোক কাটতে মায়ের কয়েক মাস লেগে যায়, মেঝের দিকে চাইলেই সে কেঁদে ফেলে—আহা রে, বাছা তার কোন সুবিধেই জীবনে পেল না! সময়ে জানতে পারলে যে সে শহরের সব হ'তে বড় ডাক্তারকেই ডাকত গো! তা হ'লে কি বাছা ওর জন্ম-পঙ্গু হ'ত! ও শুনেছে, কিছুদিন আগে শিকাগোর জনৈক ধনী কয়েক হাজার কোটি ডলার খরচ ক'রে তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য ইউরোপ হ'তে একজন বড় ডাক্তার

আনিয়েছিল ; তার মেয়েরও নাকি ক্রিষ্টোফোরাসের মত একই অসুখ ছিল। ধনীর সন্তানের ওপর অস্ত্র-উপচার করবার আগে অন্য বহু দেহের ওপর পরীক্ষা করা দরকার, তাই কাগজগুলো মারফৎ প্রচার করা হয় যে, অতুলনীয় মহত্ত্ববশতঃ উক্ত ডাক্তার বিনা খরচে এই রোগভোগী গরীবদের চিকিৎসা করবেন। এটা এলজবিয়েটা জানতে পারেনি—কাগজ পড়ে না তো ওরা। আর জানলেই বা কী করত? রোজ রোজ ডাক্তারের কাছে ওকে নিয়ে যাবার জন্য বাস খরচের দরকার, সঙ্গে যাবার লোকের দরকার ; কোথা পাবে ওরা অত পয়সা আর অত অবসরওয়ালা একজন মানুষ।

বেকারীর এই দিনগুলিতে বিকট একটা বিপদ যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলে' ইউরঘিসের মন হয়। তাকে এড়াতে পারে না যেন, তার আকর্ষণে জেনে বুঝে এগিয়ে যায় তারই দিকে। প্যাকিংশহরে সর্বস্তরের বেকার আছে—ওর ভয় হয়, ও বোধ হয় নিম্নতম স্তরে পৌছচ্ছে। নিম্নতম স্তরের মজুররা কাজ পায় সারের কারখানায়।

বেকার মজদুররাও ভয়ে ভয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে আলোচনা করে এই কারখানা সম্বন্ধে; কাঠ-বেকারদের প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জন ওমুখো হয় না, ওখানকার অবস্থা শুনেই স্তব্ধ থেকে যায়, বড় জোর ফটকের ফুটো দিয়ে দু'একবার উঁকি মেরে আসে। না খেয়ে মরার চেয়েও তো অবাঞ্ছনীয় বস্তু দুনিয়ায় আছে। অন্য বেকাররা ইউরঘিসকে জিজ্ঞাসা করে, "কাজ করেছ কখনো ওখানে? পেলে করবে?" কী জবাব দেবে ও নিজের সঙ্গে নিজেই তর্ক ক'রে শেষ করতে পারে না। অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ওদের, দুঃখকষ্টের সীমাপরিসীমা নেই—এ অবস্থায় কাজ পেলে, সে যত জঘন্য কাজই হ'ক, করবে না ও? বাড়ী ফিরে রুগ্ণ ওনার রোজগারের অন্ন কোন্ সাহসে মুখে তুলবে? কাজের বিভীষিকার ভয়ে ও পিছিয়ে গেছে, একথাই বা বলবে ওদের

কোন্ মুখে? সমস্ত দিন এইভাবে নিজের মনে যুক্তি খুঁজে খুঁজে ও সারের কারখানার দিকে যায়—ফটকের ফুটো দিয়ে একবার ভেতরে চাইতেই ভয়ে ওর অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, ছুটে পালায়। কিছুদূর গিয়ে ধিক্কার দেয় নিজেকে, পুরুষ ও—কাজের গুণাগুণ দেখলে চলবে না তো ওর, কর্তব্য করতে হবে। গেলেই যে হবে, তাই বা কে বলতে পারে? আর ইতস্ততঃ না ক'রে দরখাস্ত ক'রে দেয়।

ডারহামের অন্যান্য কারখানা হ'তে খানিকটা দূরে এই সারের কারখানা। এ কারখানা খুব কম লোকই দেখতে যায়; যারা যায়, বের হ'বার সময় তাদের মুখের অবস্থা হয় যেন এতক্ষণ নরকদর্শন করছিল। বিভিন্ন কারখানার মেঝে ঝেঁটিয়ে মাংসের সঙ্গে সম্বন্ধীয় যে সব বস্তু এক বৎসর জমা থাকার পর মাংস বলে' চলে না, সেই সব জমা মাল আসে সারের কারখানায়; আঁতরির নিষ্কাষিত বস্তু, হাড় প্রভৃতি তো আছেই। এর বিভিন্ন কক্ষ এমনভাবে তৈরী যেন রোদ্দুর কখনো ভেতরে ঢুকতে না পারে। দম-আটকান এই গরম অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে পুরুষ নারী শিশু কল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাড় ঘষে; কত কী তৈরী হয়; আর ঐ হাড়ের সূক্ষ্ম গুঁড়ো সর্ব সময় শ্বাসের সঙ্গে টেনে টেনে ঐ সব নারী শিশু পুরুষ ফুসফুস্ পূর্ণ করে; দ্রুত মৃত্যু এগিয়ে আসে ওদের ঐ গুঁড়োর সঙ্গে;—এখানে কাজ করলে নির্দিষ্ট সময়ের পর এদের সকলেই মরবে। শুকনো রক্ত হ'তে এখানে আলবুমেন হয়; এমনই সব পূঁতিগন্ধময় বস্তু হ'তে নারকীয় দুর্গন্ধযুক্ত পণ্য তৈরী হয়। লম্বা লম্বা ঢাকা বারান্দা আছে, অন্ধ গহ্বরের মত ঘর আছে—সেগুলি হ'ল এই পণ্যের জন্মস্থান। বাষ্পে ও বিভিন্ন বস্তুর উড়ন্ত চূর্ণে জলন্ত বিজলী বাল্বগুলোকে দূরস্থ তারা—লাল, লালচে, নীল, সবুজ তারার মত ঝিক্‌মিক্ করতে দেখা যায়; বাতির বর্ণ তৈরী হয় উড়ন্ত গুঁড়ো ও বাষ্পের রঙ হ'তে। বীভৎস এই সব কক্ষের উদ্ভূত দুর্গন্ধের নাম এ ভাষায় নেই। বাইরে হ'তেই তার প্রচুর

আভাস পাওয়া যায়; ফুটন্ত জলে ঝাঁপ দেবার সাহস আছে যাদের, তারাই এই সব স্থানে ঢুকতে পারে। একজনের প্রবেশ বর্ণনা করলে জিনিসটা একটু বোঝা যাবে—নাক ও চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ডুব-সাঁতার দেওয়ার মত ক'রে তো ঢুকল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আরম্ভ হ'ল কাশি আর হাঁচি; তাতেও না থেমে এগিয়ে চলল সে দুরন্ত সাহসে ভর ক'রে, কয়েক মিনিটের মধ্যে কপাল দপ্ দপ্ করতে লাগল, তবু এগোয়—এবার এমন মাথা ঘোরে যে দাঁড়ানই মুশ্‌কিল হ'য়ে পড়ে; তবু এগোয়—এবার আসে অ্যামোনিয়ার প্রবল এক-একটা ঝাঁকি; যত দুর্ধর্ষই সে হ'ক এই একটা ঝাঁকি তাকে ক্যাব্‌লা বানিয়ে ছেড়ে দেবে; প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পাবে না সে তখন।

এক বৎসরের জমানো মাল যে সব ঘরে শুকোনো হয়, তার দুর্গন্ধ উপরে বর্ণিত ঘরগুলোকেও ছাড়িয়ে যায়। চর্বি রসা বসা প্রভৃতি সব কিছু বের করবার পর জীবদেহের বাতিল অংশও ঐ জমানো মালের সঙ্গে এখানে আসে। এই সব-কিছু মিলিয়ে যে পদার্থটা দাঁড়ায়, তাকে শুকিয়ে অতি সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করা হয়, তারপর তার সঙ্গে মেশানো হয় রহস্যজনক একরকম পাথরের অতি সূক্ষ্ম বাদামী রঙের গুঁড়ো; শেষোক্ত বস্তুটি কোথা হ'তে যে ওরা আমদানি করে ওরাই জানে। শত প্রকারের 'খাঁটি বোন ফস্‌ফেট্' সারের অন্যতম হ'ল এই মিশ্রিত পদার্থটি; এই বস্তুই বস্তাবন্দী হ'য়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে আদর্শ বোন ফস্‌ফেট্ সারের নামে। দূর দেশের চাষী এই বস্তু টন্ পিছু পচিশ ডলার দিয়ে কেনে; ঘরে রাখলে ঘরে গন্ধ হয়, জমিতে ছড়াতে গেলে জমি, চাষার নিজের শরীর, গরু, ঘোড়া, গাড়ী লাঙ্গল—সব-কিছুতেই কিছুদিন পর্যন্ত গন্ধ থাকে। খোলা মাঠে মাত্র একটন যদি কয়েক দিনের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, তাহ'লে হাজার হাজার টন এই বস্তু পাহাড়প্রমাণ হ'য়ে একটা ঘরে জমা থাকলে,

মেঝেতে কয়েক ইঞ্চি পুরু হ'য়ে জমে থাকলে আর বাইরের দমকা হাওয়ায় জায়গাটা ভরপুর হ'য়ে থাকলে যে অবস্থাটা দাঁড়ায় সেটা কল্পনা করা খুব কঠিন নয়।

যেন অদৃশ্য একটা হাত ইউরঘিসকে প্রতিদিন এখানে টেনে আনে। অস্বাভাবিকভাবে মে মাসটা ঠাণ্ডা কাটছিল, কিন্তু জুনে দমকা হাওয়ার মত এসে গেল একটা গরম প্রবাহ। এক প্রবাহেই সার-কারখানায় অনেক চাকরি খালি ক'রে দেয়, মালিকদের আবার মজতুরের প্রয়োজন হয়।

একটা গুঁড়োঘরের অফিসার ইতিমধ্যে ওকে চিনে ফেলেছে; একদিন বেলা তখন দুটো, গরমে হাড়ের ভেতর পর্যন্ত চিন চিন করে, ইউরঘিস তখন বাইরে দাঁড়িয়ে; অফিসারটা ওকে ইশারায় ডাকে। চাকরির এই আহ্বানে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে না ইউরঘিস, পালায়ও না, দাঁতে দাঁত চেপে ভেতরে চলে' যায়। দশ মিনিটের মধ্যেই চাকরির কথাবার্তা সেরে কাজে লেগে যায় ও।

কাজ শিখতে লাগে ওর বড় জোর এক মিনিট। সামনে [illegible]টা গুঁড়ো-কল ঘুরছে; তাতে হ'তে নদীর আকারে অতি সূক্ষ্ম সা[illegible] [illegible]রিয়ে আসে, অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ো ঘরখানার বাতাসটুকু পূর্ণ ক'রে রাখে; আরও জন বারো মজতুরের সঙ্গে এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে বেল্‌চা দিয়ে সার তোলা হ'ল ওর কাজ। কেউ কাউকে ওরা দেখতে পায় না, শব্দ পায় না, বেল্‌চায় বেল্‌চায় ঠোকাঠুকি লাগে, ওরা বোঝে অন্যেরাও কাজ করছে, এই ধুলোর ঝড়ে তার বেশী জানবার উপায় নেই। একখানা গাড়ী ভর্তি হ'লে ইউরঘিস হাত ছুঁড়ে নাকের সামনে হ'তে ধুলো তাড়াবার চেষ্টা করে, আবার গাড়ী আসে, গাড়ী ভ'রতে লেগে যায়। কান দুটি ক্রমে ভর্তি হ'য়ে আসে, শোনাও বন্ধ হয়ে যায়; মজতুরদের নিশ্বাস নেবার ব্যবস্থাস্বরূপ মালিকরা ওদের কয়েক স্তর পুরু একখানা

ক'রে কাশি দেয়; এতে নাকটা একটু রক্ষা পায়, কিন্তু ঠোঁট, চোখের পাতা প্রভৃতি জমাট বাঁধতে শুরু করে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই, আপাদ-মস্তক ধুলোয় লিপ্ত হ'তে লাগে ঐ পাঁচ মিনিটই। পা হ'তে মাথা পর্যন্ত ওদের বাড়ী ছাদ দেওয়াল মেঝে প্রভৃতির সঙ্গে একরঙা হ'তে লাগে প্রথম দিনের ঐ পাঁচ মিনিটই। আশপাশের শতখানেক গজের রঙও ঐ একই। সার উড়ে উড়ে এই কীর্তিটি করে; এজন্য ডারহাম কোম্পানীর অনেক টাকা লোকসান হ'য়ে যায়।

এ গরমে লোমকূপগুলো ঘাম বের করবার জন্য খুলে যায়, কিন্তু খোলা থাকে কয়েক মিনিট মাত্র; তারপর সেগুলো ভেতর পর্যন্ত বুজে যায় ঐ সারে। মিনিট পাঁচের মধ্যে ইউরঘিসের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে, পনেরো মিনিটের মধ্যে বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে' আসে। মাথার মধ্যে রক্ত দপ্ দপ্ করে, তালুটায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়; মনে হয় হাত দুটো আর ওর ইচ্ছামত কাজ করতে পারবে না। হাত থেমে আসে আর ও একবার ক'রে মনে ক'রে নেয় চার মাসের বেকারী; শক্তি—ইচ্ছাশক্তি ফিরে আসে, হাত চালিয়ে চলে ও। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে বমি আরম্ভ হ'য়ে যায়, নাড়ীভুঁড়ি সব যে টুকরো টুকরো হ'য়ে উঠে আসতে চায়। অফিসার বলে' দিয়েছিলেন, কাজ করবার ইচ্ছে থাকলে এ সব সহ্য হ'য়ে যায়। ইউরঘিস বোঝে, এ মন শক্ত করার প্রশ্ন নয়, পাকস্থলী শক্ত করার প্রশ্ন।

বিভীষিকার এই দিনটাও শেষ হ'য়ে আসে, কিন্তু তখন দাঁড়ানও যেন কষ্টকর হ'য়ে পড়ে ইউরঘিসের। চলবার পথে মধ্যে মধ্যে থামে, কোন দেওয়াল কি অন্য কিছুতে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলে নেয়, তারপর আবার চলতে শুরু করে। অন্যান্যরা সার-কারখানা হ'তে বেরিয়ে সোজা মদের দোকানে ঢোকে—এরা হয়তো সার ও সাপের বিষকে একই পর্যায়ভুক্ত ভাবে। ইউরঘিস কিন্তু বড় দুর্বল অসুস্থ বোধ

করে, মদ খেতে সাহস হয় না ওর, কোনরকমে পথে বেরিয়ে টলতে টলতে ও বাসে উঠে পড়ে। সার-কারখানায় কাজ করার পর ও বাসে উঠলে অন্যদের অবস্থা কী দাঁড়ায়—দুষ্টু মিবুদ্ধি নিয়ে ভাবত ও আগে। সত্যি এখন সেই অবস্থা এসে পড়েছে—ও বাসে উঠলেই, অন্যরা নাকে রুমাল দেয়, হাঁচে, হাঁপায়, সাধ্যমত সরে' গিয়ে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে—কিন্তু এ সব লক্ষ্য করবার মত দেহ-মনের অবস্থা নেই এখন ওর। শুধু এইটুকু ওর চোখে পড়ে, একজনের সামনে ও দাঁড়াতেই সে আসন ছেড়ে ওর বসবার জায়গা ক'রে দেয়, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'পাশের দু'জনও উঠে যায়, সামনের লোকরা সরতে থাকে, কয়েক মিনিটের মধ্যে বাসখানা প্রায় খালি হ'য়ে যায়।

ও আসার কয়েক মিনিটের মধ্যে ওদের বাড়ীটাও ছোটখাট একটা সারের কারখানায় পরিণত হ'য়ে যায়। সমস্ত দেহে আধ ইঞ্চি পুরু হ'য়ে সার জমেছে, শুধু দেহের ওপরে কেন, ভেতরটাও সারময় হ'য়ে গেছে। এক সপ্তাহ ধরে' ঘষামাজা করলে বাইরের এবং প্রচণ্ড ব্যায়াম করলে ভেতরের সার হ'তে অব্যাহতি লাভ করা যেতে পারে। ওর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন বস্তু তো দুনিয়ায় নেই—তবে শোনা যায় পণ্ডিতরা নাকি কী একটা বস্তু আবিষ্কার করেছেন, অবিরাম শক্তি বিচ্ছুরণ ক'রেও নাকি বস্তুটির কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না, তার সঙ্গে হয়তো ওর বর্তমান দেহের তুলনা চলে। ওর উপস্থিতির গুণে টেবিলের খাদ্যবস্তুগুলি সারগন্ধে ভরপুর হ'য়ে ওঠে, সে গন্ধে ও আস্বাদে বাড়ীর সকলেই বমি করে; নিজে ও তিন দিন পর্যন্ত পেটে একটা দানা রাখতে পারে না। বেশ ভালভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়, কাঁটাচামচে ব্যবহার করে, কিন্তু মুখ হ'তে গলা পর্যন্ত যে বস্তুটি চিটিয়ে লেগে আছে!

কাজ তবু ও ছাড়ে না। টনটনানিতে মাথা ফাটবার উপক্রম

হয়; তা নিয়ে আহাউহু না ক'রে নিঃশব্দে কারখানায় এসে কাজে লেগে যায়, দৃষ্টি-আচ্ছন্ন-করা সেই ধুলোর মেঘের মধ্যে মুখ বুজে বেল্‌চা চালিয়ে যায়। এক সপ্তাহ! তারপর আজন্মের মত ও সার-মজদুর হ'য়ে যায়। খাবার ক্ষমতা ফিরে আসে, গন্ধ সহ্য হ'য়ে যায় যেন; মাথার ব্যথা, মাথাঘোরা তখনও থাকে, তবে তত অসহ্য আর বোধ হয় না।

এইভাবে আর একটা গ্রীষ্ম কেটে যায়। দেশে সেবার বাড়বাড়ন্ত; প্যাকিংশহরের পণ্য প্রচুর খায় সারাটা দেশ; প্যাকিংশহরের কারখানার মালিকরা ফাল্‌তু মজদুর লাগিয়ে মজুরী নামিয়ে রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বহু বুভুক্ষু কাজ পায়; ইউরঘিসদের সংসারের সকলেই কাজ পেয়ে যায়, পেট পুরে খাবার সংস্থান হ'য়ে যায় সেবার ওদের। আবার ধারের কড়ি শুধতে থাকে, জমায়ও কিছু কিছু। তবু যে সব ব্যবস্থা ওরা অভাবের দিনে চালু করেছিল, তার সবগুলো, যেমন ঐ সব ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে কাগজ বিক্রি করানো উচিত মনে হয় না। শুধু যে লেখাপড়া হবে না তাই নয়, যত বদ অভ্যাস কুড়িয়ে বেড়ায় ওরা হীরের মত; নতুন পরিবেশের জঘন্য জবান, জঘন্য যত ইংরেজী গালাগাল ওদের ঠোঁটস্থ হ'য়ে গেছে; অনুরোধ ক'রে, ভয় দেখিয়ে, মেরে পর্যন্ত ওদের শোধরানো যায়নি; সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে টানতে শিখেছে, পথের ছোঁড়াদের সঙ্গে দু'চার পয়সায় জুয়ো খেলা অভ্যাস ক'রে নিয়েছে, যত বেশ্যা পাড়া ও বেশ্যা বাড়ী চিনে ফেলেছে ওরা, বাড়ীউলীদের নামগুলো নামতার মত একটানা বলে' যেতে পারে, বাড়ীউলীরা পুলিস অফিসার ও বিশিষ্ট রাজনীতিকদের কোন্ মাসে কোন্ তারিখে বা কোথায় চা'পানে আপ্যায়িত করে, সে সব সম্বন্ধে ওরা এখন পরম ওয়াকেবহাল। গ্রাম্য কোন খরিদ্দার

হিক্কিডিকের মদের দোকানের পাত্তা জিজ্ঞেস করলে ওরা না ভেবে দোকানটা দেখিয়ে দিতে পারে, শহরের যত গুণ্ডা ঠগ্ মাতাল জোচ্চোর পকেটমার লম্পট প্রভৃতির ওরা নাম জানে, ঠিকানা জানে; রাহাজানিতে কে কত 'উস্তাদ' তাও অজানা নয় ওদের। এ সব তবু পদে ছিল. রাত্রে বাড়ী ফেরার অভ্যাস পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে ওরা ভুলে যায়। ধমকালে বলে, ঝড়বৃষ্টি নেই বাইরে, কোন গাড়ীর তলে কি গাড়ীবারান্দায় তো বাড়ীর মতই চমৎকার ঘুম হয়, অনর্থক বাড়ী ফিরে সময়, শক্তি নষ্ট ক'রে কী হবে?—হয়তো বাসের ভাড়াও লেগে যেতে পারে। আধ ডলার ক'রে দিন দেয় তো বাড়ীতে, কখন দিলে সেটা, তা নিয়ে বাড়ীর লোকের এত মাথাব্যথা কেন? কিন্তু ইউরঘিস বলে মাঝে মাঝে রাত্রে বাড়ী না-আসা হ'তে একেবারে বাড়ী না-ফেরার স্বভাবটা অভ্যস্ত হ'তে বেশী দিন লাগে না; কাজেই আর লাগাম না ছেড়ে, ছুটির পর স্কুল খুললে ফের ভর্তি ক'রে দেওয়া হবে; ওদের রোজগারটা পুষিয়ে নেবার জন্য এলজবিয়েটা কোথাও একটা কাজ খুঁজে নেবে, ঘরসংসার দেখবে তার ছোট মেয়েটা।

গরীবের ঘরের মেয়ে কোট্রিনা; অন্যান্য গরীব ঘরের মেয়ের মত সেও কাঁচা বয়সে পেকে গেছে—অন্ততঃ কাজে। পঙ্গু ছোট ভাইটিকে ও শিশুকে দেখাশোনা খাওয়ান, রান্না করা, বাসন মাজা, বাড়ী ঘর পরিষ্কার করা, সন্ধ্যায় ওরা সকলে বাড়ী ফেরবার আগে খাবার তৈরী ক'রে রাখা—সবই ওর কাজ; বয়স মাত্র তের; বয়সের অনুপাতে দেহ পুষ্ট নয়, দেখতে ছোট্টটি, তবু এক হাতে ওই সব কিছু করে, কিন্তু তা বলে' একটু বিরক্তি বা দুঃখ নেই। দিন দুই কারখানা অঞ্চলে ঘোরাঘুরির পর ওর মা একটি 'ঝোলকলে'র ঝি হ'য়ে কাজে লেগে যায়।

কঠোর পরিশ্রম করাই এলজবিয়েটার অভ্যাস, তবু এ 'কাজটা' বড় কঠিন বোধ হয় ওর। সকাল সাতটা হ'তে ঠায় নিশ্চল হ'য়ে বেলা

সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ঐ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—বড় কষ্টের কাজ। প্রথম প্রথম মনে হয়, ওর দ্বারা বোধ হয় এ কাজ হবে না, ইউরঘিসের মতই মাথা ধরে ওর, সন্ধ্যায় কারখানা হ'তে বের হ'লে মনে হয় পৃথিবীখানা চক্কর খাচ্ছে—এমনি মাথা ঘোরে। একে তো এমনি দাঁড়িয়ে থাকা, তার ওপর কলের ঘরখানায় আলো ঢোকে না কস্মিন-কালে, বিজলী বাতি জ্বলছে দিনরাত, সমস্ত মেঝেটা ভিজে চ্যাপচ্যাপ করে, সকলের ওপর পচা মাংসের গন্ধ তো আছেই, এই গন্ধেই বেশী মাথা ঘোরে। প্রকৃতির যে নিয়মে শীতে শুষ্ক পাতার রঙ্ বদলায়, বহুরূপী ক্ষণে-ক্ষণে রঙ্ বদলাতে পারে, সেই নিয়মেই এখানকার মজুরেরাও এই "টাটকা ঘরোয়া ঝোলের" মত রঙ্ লাভ করে অল্পকাল এখানে কাজ করবার পরই।

কয়েক মিনিটের জন্য কেউ যদি এই ঝোলঘর দেখতে যায়, তার কাছে এটা ভালই লাগবে; অবশ্য শ্রমিকদের দিকে চাইতে পাবে না, চাইলে কল দেখার আনন্দ ঘুচে যাবে একটা মুহূর্তে। আগে হয়তো হাতে মাংস কেটে রান্নার জন্য চাপান হত, এখন কলের কল্যাণে সে সব মজুরের কাজ গেছে; একটা কলের জন্য কর্মচ্যুত লোকের সংখ্যাটা অনেকের কাছে হয়তো কৌতূহলোদ্দীপক; ঘরের একপাশে আছে 'ঝম্পক', এতে শ্রমিকরা মাংস ও মসলা পুরে দিচ্ছে; ঝম্পকের বিরাট গহ্বরে কতকগুলো ছুরি মিনিটে দু'হাজার বার ক'রে ঘুরছে, ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে মাংসের কুঁদোগুলো কিমায় পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে; মশলা, আলু-ময়দা ও জল উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে, মিশ্রিত দ্রব্যটি কলের সাহায্যেই ঘরের অপর পার্শ্বস্থিত রান্নাযন্ত্রে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর পরিচর্যা করছে স্ত্রী-শ্রমিকরা। যন্ত্রটা হ'তে ছুঁচোর মুখের মত কতক-গুলো মুখ বেরিয়ে আছে, মেয়েরা এতে কতকগুলো পনেরো-কুড়ি হাত সুতো বসিয়ে দিচ্ছে, প্রতিটি সুতোকে জড়িয়ে জড়িয়ে বসাতে হয়;

চোখের পলকে ওরা পনেরো-কুড়ি হাত সুতো জড়িয়ে ফেলে। তারপর একটা হাতল টেপার সঙ্গে সঙ্গে সুতো অবলম্বন ক'রে বেরিয়ে আসে রান্না মাংসের লম্বা দীর্ঘ 'সাপ'; অবিশ্বাস্য বেগে সাপগুলি বেরিয়ে আসে, বিরাট একটা গামলায় দুটি মেয়ে সমান গতিতে তাদের ধরে' নেয়। হাতলে আর একটা চাপ পড়ে, অমনি একটা 'সাপের' স্থলে একই মুখ হ'তে একসঙ্গে ছ'টি ক'রে 'সাপ' বের হ'তে থাকে; অনভিজ্ঞ দর্শক তাজ্জব বনে' যায় এতে। চাপটা একবার দিয়েই কাজ শেষ হয় না; অবিরত চলছে চাপ দেওয়ার কাজ; এত দ্রুত এদের কব্জি ঘোরে যে হাত প্রায় দেখা যায় না—খালি দেখা যায়, সাপের আকারে মাংস বেরিয়ে আসছে একসঙ্গে অনেকগুলি এবং অবিরত। সমস্ত ঘরটা বাষ্পে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, তারই মধ্য হ'তেই হয়তো দর্শকদের চোখে পড়ল শ্রমিকার দৃঢ়বদ্ধ গম্ভীর মুখ, কপালে স্থির বলিরেখা, গণ্ডের অবিশ্বাস্য পাণ্ডুর রং; তখন তার মনে পড়ে যাবে, যাবার সময় হ'য়ে গেছে। শ্রমিকারা কিন্তু যায় না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর একই ভাবে তারা মাংসের সাপ বের করছে, আর লড়ে' চলেছে মৃত্যুর সঙ্গে। কাজটা ফুরণের; শ্রমিকাদের প্রত্যেকেরই সংসার আছে; সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা রাখতে হ'লে, এই ভাবেই তাদের খেটে চলতে হবে। ফলে চোখ মন আত্মা নিবদ্ধ ক'রে সে খেটে চলে, পাশে সুসজ্জিত ও সুসজ্জিতা অতিথিরা চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখার মত ওদের দেখেন; কিন্তু তাঁদের দিকে একবার চোখ তোলবারও অবসর নেই ওদের।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্যাকিংটাউনে যে সব জোচ্চুরি চলে তার অনেকখানিই পরিবারটির জানা ছিল, কেন না তাদের একজন যে কারখানায় কাজ করে সেখানে গোমাংস টিনে পোরা হয়, আর একজন খেটে চলেছে সুরুয়া কারখানায়। সুতরাং এই সব জোচ্চুরির হাঁড়ির খবর তারা ভাল করেই জানে। ওরা দেখত, খানিকটা মাংস হয়তো পচে থস্ থস্ করছে, কাজে লাগাবার কোন পন্থা নেই; তখন "ব্যবসায়গত রীতি" অনুযায়ী সব খাদ্য হয় টিনে পোরা হ'ত, নয় নূতনভাবে সুরুয়া করে' দেওয়া হ'ত। জোনাস কাজ করত "ধূম্রদান" বিভাগে। সে ওদের এ সম্বন্ধে বলেছিল। নষ্ট হ'য়ে যাওয়া মাংস নিয়ে যে ব্যবসায় চলেছে, তার গোপন কথাটি ওদের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। প্যাকিংটাউনে একটা পুরোনো পরিহাস প্রচলিত আছে; ওরা বলত, মালিকরা শূয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ-টুকু ছাড়া আর সব কিছুই কাজে লাগায়—বলত আর হাসত। কথাটা হাসিরই। কিন্তু এখন এই হাসির কথার মধ্যে তারা নতুন মানে পেলে—কী নিষ্করুণ কী কঠোর সে মানে।

জোনাস গল্প করত, বিক্রী না হ'লে বাসি পচা দুর্গন্ধ মাংস ফিরে আসে; কিন্তু তা ফেলে দেওয়া হয় না; তার টক স্বাদ আর দুর্গন্ধ দূর করবার জন্য খানিকটা সোডা মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘষা হয়; তারপর পদার্থটিকে নোতুনভাবে রান্না করে' হয় টিনে পোরা হয়, নয় সঙ্গে সঙ্গে খাবার জন্য খোলাভাবে বিক্রী করা হয়। জোনাস বলত, রসায়নেরই বা কী অলৌকিক রহস্য! যে কোন রকম মাংস—টাটকা

হ'ক আর বাসি হ'ক, গোটাই হ'ক আর কাটাই হ'ক, রসায়নের অপার মহিমায় মালিকরা তাকে যে কোন স্বাদ, যে কোন গন্ধ, যে কোন বর্ণ দিতে পারে। শূয়োরমাংসে ধেঁায়া দেবার তারা এক সুকৌশল যন্ত্র ব্যবহার করে; এতে আছে একটা মস্ত ফাঁপা সূচ, সূচের সঙ্গে লাগান আছে পাম্প; মজদুর সূচটা শূয়োরের মাংসে ফুটিয়ে দিয়ে পায়ে করে' পাম্পটা চালায়—কতক্ষণই বা লাগে, কয়েকটা মুহূর্ত; কিন্তু বাঁচে অনেক, যন্ত্রের কাছে হ'তে বেশ কাজও আদায় করে' নেওয়া হয়। তবু খানিকটা মাংস নষ্ট হয়, পচে যায়, এমনই দুর্গন্ধ তাতে যে সে ঘরে পর্যন্ত কোন মানুষের টেঁকা দায় হ'য়ে ওঠে। এই সব মাংসে আরও জোরদার ধেঁায়া বা বাষ্প দেওয়া হয়—মজদুরদের ভাষায় এ কাজটার নাম "শতকরা ত্রিশ দেওয়া"। এত সত্ত্বেও এক-একটা খণ্ড খারাপই থেকে যেত; পূর্বে সেগুলিকে "তৃতীয় পর্যায়"এর বলে বিক্রী করা হ'ত; কিন্তু প্রতিভার অভাব কোথায়? এতেও কোন প্রতিভা[illegible]ন এক কৌশল আবিষ্কার করে—আবিষ্কারটা সংক্ষেপে এই: দুর্গন্ধযুক্ত [illegible] হ'তে হাড়টাকে টেনে বের করে' নিয়ে মাংসের ছ্যাঁদাটায় ঢুকিয়ে [illegible]য়া হয় গরম লাল লোহা, কারণ হাড়ের পাশের মাংসেই নাকি প[illegible]ন শুরু হয়। এ পদ্ধতি আবিষ্কারের পর প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পর্যায় তুলে দেওয়া হয়েছে; এখন সবই প্রথম পর্যায়ের। মাংসের টুকরোটাকরা গুলোকে চুপিয়ে চুপিয়ে কিমাতে পরিণত করে' নাম দেওয়া হয় "অস্থিহীন শূকরমাংস"; অস্থিহীন শূকরমাংস প্যাক হয়, চালান যায়। শূয়োরের ঘাড় কনুই "আঙুল" প্রভৃতির হাড়গুলো হ'তে প্রায় সব মাংস চেঁচে নিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ যে রাসায়নিক বস্তুটি তৈরী হয় তার নাম "ক্যালিফোরনিয়া শূকরমাংস"। সবার ওপর "নিশ্চর্ম শূকরমাংস; এর জুড়ি হয় না। যে সব শূয়োর খুব বুড়ো হয়, মাংস হয় দড়ি দড়ি, তাদের চামড়া যে কী বস্তু সহজেই কল্পনীয়; এই মাংস হ'তে হয় "নিশ্চর্ম শূকরমাংস" । কিন্তু

চামড়া? ও স্বরূপে বিক্রী হবে না। তাই সেটাকে পিষে তৈরী হয় "মাথার ঘীলু"!

এ সবের চেয়েও যে মাংসের অবস্থা খারাপ হয়, সেটা পাঠান হয় এলজবিয়েটাদের ডিপার্টে। সেখানে একটা মাংসকাটা চাকা ঘুরছে ঘণ্টায় দু' হাজার বার; তারই সামনে ফেলে দেওয়া হয় পচা মাংস। কিছুক্ষণ পর মাংসটার যে অবস্থা দাঁড়ায় তার নাম দেওয়া যায় "রেণু মাংস;" এর সঙ্গে মেশানো হয় সমপরিমাণ অন্য মাংস। ব্যস! কোন-কালে যে এতে দুর্গন্ধ ছিল কে বলবে! সুরুয়ার কারখানায় নজর দেবার দরকার পর্যন্ত কেউ বোধ করে না। ইউরোপ হ'তে ছাতাধরা বিবর্ণ বিস্বাদ দুর্গন্ধ মাংস-সুরুয়া টিনে টিনে ফিরে এসেছে; ভাববার কোন কারণই নেই। ক্ষার নুন আর গ্লিসারিণ মিশিয়ে এটাকে টাটকা করে' নেওয়া হয়, নূতন পদার্থটা বিক্রী হয় "ঘরের" অর্থাৎ আমেরিকার বাজারে। মজদুররা মেঝেতে থুথু ফেলছে (বাইরে যাবার হুকুম বা সময় নেই), ছড়িয়ে পড়ছে কোটি কোটি যক্ষ্মা-বীজাণু, সেগুলো লেপ্টে লেগে থাকছে পায়ের ধুলোকাদায়, এ সবের ওপর ছিটকে পড়ছে টুকরো-টুকরো মাংস; কোন ঘরে মাংস গাদা করা আছে, ফুটো ছাদ বেয়ে গাদার ওপর জল পড়ছে; তার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করছে ইঁদুরের পাল। সে অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না; কিন্তু অভ্যস্ত মজদুররা মাংস-গাদার ওপর দিয়ে হাত চালায়, গাদার ওপর হ'তে সরিয়ে ফেলে দেয় মুঠো মুঠো ইঁদুরনাদি। মজদুররা ইঁদুরগুলোকে সইতে পারে না; রুটিতে বিষ মিশিয়ে ছড়িয়ে দেয়; ইঁদুর মরে, মরে' পড়ে' থাকে। তারপর মাংস, রুটি, ইঁদুর—সব এক সঙ্গে চলে যায় মিশ্রণযন্ত্রের গহ্বরে। মজদুরদের পায়ের কাছে ছড়ান মাংসও বাদ যায় না। এ সব আষাঢ়ে গল্পও নয়, বীভৎস রসসৃষ্টির রসিকতাও নয়। কারখানার ব্যাপার। বেল্‌চায় করে' মাংস তুলে ফেলা হ'চ্ছে গাড়ীতে; বেল্‌চা চালাচ্ছে

একটা ক্লান্ত মজদুর; মাংসের মধ্যে কী আছে না-আছে দেখবার তার সময় নেই। যদিই বা মাংসের মধ্যে এক-আধটা ইঁদুর চোখে পড়ে' যায় কী দায় পড়েছে তার সেটা তুলে ফেলে দেবার? ফলে এমন সব বস্তু মাংসের সঙ্গে যায়, যার তুলনায় বিষাক্ত ইঁদুর অমৃত! টিফিন খাবার আগে মজদুররা যে হাত ধোবে তার কোন ব্যবস্থা নেই, মুক্তয়ায় দেবার জলেই তারা ও সব কাজ সেরে নেয়। মাংসের টুকরো, ছড়ানো ছিটেফোঁটা চর্বি হাড়, কলের আশপাশে লেপ্টে লেগে থাকে মাংস বা চর্বি চটকানো পর্দা, সব জড় করা হয় একটা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরের কোণে; পড়ে থাকে সেখানেই; নয়তো ভরে' রাখা হয় অমনি একটা খোলা পিপেয়। মাংসের ব্যবসায়ে কতকগুলো কাজ রোজ রোজ বা অল্পদিন পরে পরে করতে গেলে খরচা বেশী পড়ে যায়; অথচ মালিকরা খরচ কমানোর দিকে কঠোর নজর রাখেন। ঐ ঘর বা পিপে-গুলো সাফ করে' পচা টুকরো মাংসগুলো তাই কাজে লাগান হয় দীর্ঘকাল পরে পরে, রোজ রোজ করতে গেলে আয় দেয় না। এক বছর জমা হবার পর বসন্তকালে একবার করে' পিপেগুলো খালি করা হয়। ততদিনে মাংসের সঙ্গে পিপেয় জমে' ওঠে ময়লা, মরচে, পুরোনো পেরেক, পচা জল—এই বিচিত্র বস্তু গাড়ীতে গাড়ীতে ভর্তি হ'য়ে চালান যায় মিশ্রণযন্ত্রে, কিছু নতুন টাটকা মাংসের সঙ্গে মিশে এইটেই হ'য়ে যায় ভদ্রমহোদয়দের নাস্তা। খানিকটা মাংসকে "ধূম্রিত" হয়তো করা যায় কিন্তু তাতে সময় লাগে কাজেই খরচও বেশী পড়ে; মালিকরা তাই ওপথ মাড়ান না। মাংস একেবারে অকেজো হ'য়ে গেলে ডাক পড়ে রসায়ন বিভাগের। রাসায়নিক বিদ্যার দৌলতে মাংসটা কিছুদিন সোহাগার সহবাসে থাকবার পর জিলেটিনের সঙ্গে মিশে চমৎকার বাদামী রঙ ধরে। একই বস্তু বিভিন্ন টিনে ঢুকে দুই জাতিতে বিভক্ত হ'য়ে যায়, ছাপ পড়ে 'বিশেষ' আর 'সাধারণ'। বিশেষদের দামও অবশ্য বেড়ে যায়।

এলজবিয়েটা গিয়ে ঢুকল এই পরিবেশে; এই সব কাজ সে-ও করে; কারণ করতে সে বাধ্য। এ কাজ মানুষকে নির্বোধ করে, পশু করে; এলজবিয়েটা খেটে চলে, ভাববার সময় পায় না, দেহে মনে অন্য কিছু করবার মত জোর পায় না। সেও হ'য়ে পড়ে যন্ত্রের একটা অংশ; তার যে গুণ, যে শক্তি যন্ত্র চালাতে কাজে লাগবে না, তার কোন দামই নেই, কাজেই ফালতু গুণ, বাড়তি শক্তি চূর্ণ পিষ্ট হ'য়ে যায় যন্ত্রের ঘূর্ণনে। এই শোষণ-পেষণের একটা নিষ্ঠুরতা যতই থাক, একটা স্নেহময় দিকও আছে—এর আওতায় যে কিছুদিন থাকবে তার চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হ'য়ে আসবে, সুখেরই হ'ক আর দুঃখেরই হ'ক কোন চিন্তাই মগজে ঢোকবার পথ পাবে না। এলজবিয়েটাও কেমন চুপচাপ হ'য়ে যায়—দেহ কাজ করে' চলেছে কিন্তু চেতনা যেন নিদ্রিত। সন্ধ্যায় ছুটির পর ও, ইউরঘিস আর ওনা জমা হয় একজায়গায়, তারপর তিনজনে বাড়ির পথে এগিয়ে যায়; পথে হয়তো একটা কথাও হয় না। এককালে ওনা মুক্ত গগনের পাখীর মত গানে গানে পূর্ণ করত নিজের পরিবেশ—এখন সেও যেন কেমন নির্বাক হ'য়ে উঠছিল। অবসন্ন, রুগ্ন, বিষণ্ণ—কথা কইবে কে? এক-এক দিন দেহটাকে বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেও ওনার কষ্ট হয়। বাড়ি ফিরে যা খাবার থাকে সব চুপচাপ খেয়ে নেয়। খাওয়ার পরও সব নির্বাক। কী কথাই বা বলবে? বলতে গেলেই ঐ সেই চিরন্তন দুঃখ-দুর্দশা অভাবের কথা। ও দুশ্চেষ্টা ওরা করে না। খেয়ে নিয়েই চুপ চুপ করে' শুয়ে পড়ে যে যার বিছানায়। তারপর ঘুমোয়, না একটানা অসংলগ্নভাবে চিন্তা করে ওরা নিজেরাই জানে না; কিন্তু কেউ একটু নড়ে না পর্যন্ত। অন্ধকার থাকতে উঠে গায়ে খানিকটা করে ত্যানা চাপিয়ে ছোটে কলের দিকে। ওদের সকল অনুভূতিই ভোঁতা হ'য়ে গেছে; খিদে পর্যন্ত ওরা ভাল করে' অনুভব করতে পারে না; বাচ্চাগুলোর

ও-দশা এখনও আসেনি; খাবার কম হ'লে এখনও তারা চ্যাঁচায়, কাঁদে।

হৃদয়ের দিক হ'তে ওনা মরেনি, ওদের কারও হৃদয়ই মরেনি; ঘুমিয়ে পড়েছে মাত্র—এটা একটা আশীর্ব্বাদ। অন্তর কিন্তু এক-একদিন জেগে ওঠে—সেইটেই হয় নিষ্ঠুরতম সময়। স্মৃতির দুয়ার খুলে যায়—বিগত দিনের আনন্দ বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে চায়, আগেকার দিনের আশা, পুরানো স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে ডাকে—কিন্তু ওরা যেতে পারে না, বিরাট একটা বোঝার নীচে নড়াচড়া করে, মনে হয় এ বোঝার বুঝি পরিমাপ হয় না। বোঝার চাপে কাঁদবার শক্তিও যেন লুপ্ত হ'য়ে গেছে। তবু মরণযন্ত্রণার চেয়েও তীব্র একটা বেদনা ওরা অন্তরে অনুভব করে। এ বেদনা হয়তো ব্যক্ত করা যায় না—দুনিয়া কোনদিন এ বেদনা ব্যক্ত করেনি—মানুষের সমাজ নিজের এই গলদটা কোনদিন জানবেও না।

ওরা পরাজিত; হারজিতের খেলায় পরাজিত। ঢেউএর পর [illegible] ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওদের দূরের কোন কিনারায়। তাদের প[illegible] [illegible] নোংরা এই জীবন—মজুরী, মুদি আর বাড়ীভাড়া নিয়ে বিষাক্ত একটা বৃত্ত। তবু এ যেন একখানা নাটক, বিয়োগান্ত নাটক। তাদেরও জীবনে স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার,. আশা করেছিল বিশ্বের অবার আঙিনায় দাঁড়িয়ে জীবনটাকে দেখবে, শিখবে, চেয়েছিল সুরুচিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন জীবন, কামনা ছিল সন্তান বেড়ে উঠবে শক্তিধর হ'য়ে—আজ? চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গেছে সব, নিঃশেষে শেষ হ'য়ে গেছে আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা—তারা আর জাগবে না, সফল হবে না। জীবনের জুয়াখেলায় বাজী ধরেছিল ওরা, হেরে গেছে।

একটু বিশ্রাম; কিন্তু সে পেতে হ'লে এখনও দীর্ঘ ছ'টি বছর এইভাবে খেটে যেতে হবে, তবে না শেষ হবে বাড়ীর দরুণ দেনা। কিন্তু এইভাবে

ছ'টি বছর প্রাণ থেঁতো করে' খেটে চললে ছ'টি বছর শেষ হবার আগে ওদের প্রত্যেকেই শেষ হ'য়ে যাবে--মনে মনে এ নিষ্ঠুর সত্য ওরা বোঝে; তবু এই রকম করে' জীবনের জের টেনে চলা ছাড়া তো উপায় নেই। কূলকিনারাহীন সাগরের মাঝে ওরা হারিয়ে গেছে, অবিরত ডুবেই চলেছে—উদ্ধার নেই, মুক্তি নেই, আশা নেই। বাস অবশ্য ওরা শহরেই করছে কিন্তু ওদের কাছে এ একটা নির্মম সীমাহীন মহাসাগর, পথহীন দিগন্তবিস্তৃত অরণ্য, জনহীন দোসরহীন আশ্রয়হীন মরুভূমি, এটা ওদের কবর। কতদিন রাত্রে কিসে যেন ওনার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অমনি এসে হাজির হয় এমনি সব চিন্তা। আদিম জীবনের ক্রুদ্ধ রক্তচক্ষুর সামনে ওর আন্তরাত্মা ভয়ে থর থর কেঁপে উঠে—জেগে ও পড়ে' থাকে, সমস্ত শক্তি যেন লুপ্ত হ'য়ে যায়। একবার ও কেঁদে উঠেছিল। শব্দে ইউরঘিসের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কে কাকে সহানুভূতি দেখাবে; ইউরঘিস চটে' উঠেছিল। তারপর হ'তে ওনা একা একা চুপিচুপি কাঁদতে শিখে নিয়েছে। ভয় পায়, একা কাঁদে। ওদের চিন্তা আর এক খাতে চলে না। ওদের আশাগুলিও যেন ভিন্ন ভিন্ন সমাধিতে সমাহিত।

ইউরঘিস পুরুষমানুষ, তার নিজস্ব ঝঞ্ঝাট আছে। তার পিছনে অবিরত লেগে আছে একটা মোহ। এ বিষয়ে কারও কাছে ও মুখ ফুটে একটা কথাও কয়নি; কেউ বললে সহ্যও করবে না—এর অস্তিত্বই ও নিজের কাছে পর্যন্ত স্বীকার করে না। তবু এরই সঙ্গে লড়াইএ ওর পৌরুষ নিঃশেষে নিয়োগ করতে হয়। তাতেও এক-এক সময় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইউরঘিসের কাছে আবিষ্কৃত হ'য়েছে মদ।

একটা আবদ্ধ গরম ঘরে ও কাজ করে, গরম বাষ্পাকীর্ণ নরক বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানেই ও কাজ করে' চলেছে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দেহযন্ত্রটির প্রতিটি অংশ প্রায় বিকল। বিনা

বেদনায় কোন অঙ্গ আর নড়ে না। মাথার ভেতরটায় শব্দে অবিরত যেন ঝড় বয়ে' চলে। ফেরার পথে মনে হয় রাস্তার পাশের বাড়িগুলি নাচ শুরু করে দিয়েছে। অন্তহীন এই যন্ত্রণা, এই বিভীষিকা হ'তে মুক্তি পাবার, বিশ্রামলাভের একটিমাত্র উপায়—মদ! বেদনা চলে' যায়—ঘাড় হ'তে ঝরে' পড়ে নিরাশার বোঝা; দৃষ্টি আবার স্বচ্ছ হয়, ওর মন মত মস্তিষ্ক আবার কাজ করে, নিজের চিন্তাকে নিজের বাসনা-কামনাকে নিজের খুশীমত চালাবার ক্ষমতা ফিরে পায়। ওর মৃত ব্যক্তিত্ব আবার যেন জেগে ওঠে, শিরায় শিরায় জীবন হয় চঞ্চল। ও হাসে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মস্করা করে। পৌরুষ ফিরে আসে—মনে হয়, নিজের মালিক ও নিজে, কারও গোলাম নয়।

দু'তিন গ্লাসের বেশী পান করা ওর পক্ষে খুবই কঠিন। এক পাত্র টানার পর পেটটা ক্ষিধে বোধ করে, তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারে। মনকে ও বোঝায়, এতে অর্থের সাশ্রয়ই হ'ল। আর এক পাত্র পেটে গিয়ে ক্ষিধেটাকে আরও চনচনে করে দেয়—খাওয়াটা তখন আর দায়সারা থাকে না, বেশ তৃপ্তি করে' উপভোগ করে' ও খায়। তবু বিকল দেহটা দুটি গ্লাসের জোরে প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করবার শক্তি পায় না। আরও একটা গ্লাস পেলে ও প্রয়োজনীয় খাবার ভেতরে চালান দিতে পারত, কিন্তু আরো মদ খেতে ওর বাধে; মনে হয় দু গ্লাসের বেশী পান করা ওর পক্ষে বিলাসিতা। মনে হয় নয়, মজদুর ইউরঘিসের এটা একটা সহজাত সংস্কার—ক্ষিধেকে ওরা পরোয়া করে না। পরোয়া করলে চলবেই বা কেন? পয়সা কোথায়? একদিন পকেট খালি করে' পেট পুরে মদ খেয়ে ও বাড়ী ফিরেছিল—ওদের ভাষায় "পিপে" হ'য়ে। সমস্ত বছরটার মধ্যে সেই একটা দিনই ও পুরোপুরি প্রাণের আনন্দের সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু ভোগ করতে পারেনি, এ আনন্দ স্থায়ী হবে না, হ'তে পারে না, এ কথাটাই ওকে বেশী করে' খোঁচা

দিচ্ছিল; তাই পাওয়া আনন্দটাকে ছাপিয়ে উঠেছিল জানোয়ারের মত একটা অন্ধ ক্রোধ—যারা তার জীবনের আনন্দকে চূর্ণ করেছে, ক্রোধটা পড়েছিল তাদেরই ওপর বেশী, রাগ হচ্ছিল এই দুনিয়াটার ওপর, কারণ খুঁজে না পেলেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না ও। আনন্দ আর রাগের তলে তলে বয়ে' চলেছিল আর একটা ধারা, সেটা লজ্জার। ওর অবস্থা দেখে ঘরের লোকরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। মনে মনে ও খরচের পরিমাণটাকে যোগ দেবার চেষ্টা করলে—চোখ উপচে জল ঝরে' পড়ল; কিন্তু কাঁদলে ওর চলবে না—ও পুরুষ, সংযমী ও হবেই। আবার ওর প্রতিপক্ষ এই মোহমূর্তির সঙ্গে শুরু হ'ল ওর লড়াই।

এ লড়াইএর শেষ হ'ল না, হ'তে পারেও না। কিন্তু ওর মাথায় এ কথাটা সরলভাবে ঢোকে না—গভীরভাবে চিন্তা করবার শক্তি বা সময়ও ওর নেই। এইটুকু খালি ও বোঝে যে, ও লড়াই করে' চলেছে। দুঃখ-দুর্দশা হতাশায় একেই ও অস্থির, দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে, তার ওপর শুধু শুধু রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা মানে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। একটু এগিয়ে গেলেই, রাস্তার ঐ কোণটায় একটা মদের দোকান পড়ে—একটা কেন? দুনিয়ায় যত রাস্তা আছে, রাস্তার যত কোণ আছে সেখানেই হয়তো একটা করে' মদের দোকান আছে—প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, কেউ অন্য কারও মত নয়, অথচ ওর মনটাকে টান দেবার বেলা প্রত্যেকেই সমান। যাওয়া আর আসা—খুব ভোরে বা ঠিক সন্ধ্যার পরটিতে—বাইরেটা তখন ঠাণ্ডা অন্ধকার শূন্য—কিন্তু ভেতরটি? কেমন গরম, একটু আলো-আঁধারী, তপ্ত খাবারের মিষ্টি গন্ধ, হয়তো বা সঙ্গীতের একটু রেশ, চেনামুখ দু'একটি। বেশ। এখানটায় ওরা পরস্পরকে উৎসাহিত করে, মুখে হাসি ফোটায়। পরিবেশের গুণ। কিন্তু—

ইউরঘিস একা পথ চলতে ভয় পায়। ওনার সঙ্গে হাতে হাত

জড়িয়ে ও রাস্তা চলে, হাঁটে দরকারের চেয়ে বেশী জোরে—চলতে চলতে ওনার হাতটাকে একটু জোরেই জড়িয়ে নেয় নিজের হাতের সঙ্গে। ওনা যদি জানতে পারে! ভাবতেই ওর মাথা ঘুরে যায়। এর চেয়ে বড় অন্যায় আর হয় না। বেচারা মদের স্বাদ পর্যন্ত জানে না। কেমন করে' ইউরঘিস তার মনের কথা বোঝাবে? এক-এক সময় ইউরঘিস মরীয়া হ'য়ে ওঠে; মনে হয়, জানুক, ওনা-ও জানুক মদের স্বাদটা। তখন দু'জনে একসঙ্গে খাবে; লজ্জার এ টানা-পোড়েন আর থাকবে না। একসঙ্গে মদ খাবে দু'জনে, জীবনের বিভীষিকা—হ'ক না কেন ক্ষণিকের জন্য—ভুলে যাবে ওরা একই সঙ্গে। তারপর? যা হবার হবে।

এমনভাবে আর কতকাল চলবে? মদের পিপাসা তীব্র হ'য়ে ওঠে। ওর চেতনা অবিরত লড়াই করে' চলে ঐ আকর্ষণের বিরুদ্ধে। মেজাজ যায় খিঁচড়ে। ওনাকে দেখলে ঘৃণা হয়, রাগ ধরে বাড়ীসুদ্ধ লোকের ওপর। ওরাই তো পথের বাধা। বেকুব না হ'লে কি আর ও বিয়ে করত? বিয়ে করে' স্বেচ্ছায় ও শেকল পরেছে, জন্মের মত গোলাম বনে' গেছে। বিয়ে করেছে বলেই তো কারখানায় পচছে; নইলে জোনাসের মত ও-ও তো উধাও হ'য়ে চলে' যেতে পারত। জাহান্নমে যেত কারখানার মালিকরা। কী সম্বন্ধ ওর তাদের সঙ্গে? অবিবাহিত লোক যে কারখানায় নেই তা নয়; কিন্তু তারা তো কাজে উন্নতি করবার জন্য লেগে নেই, মুক্তির পথ প্রশস্ত করবার জন্য মুখ বুজে খেটে চলেছে। তা ছাড়া, ভাববার মত তাদের একটা কিছু আছে, খাটে আর আগের দিনের মদের কথা ভাবে, খাটে আর ভাবে কাজের পর আবার মদ খাবে, তরলের তলে ডুবিয়ে দেবে নিরেট দুঃখটাকে। আর ইউরঘিস? একটা পয়সাও নিজের ফুর্তির জন্য খরচ করবার উপায় নেই তার। যা কিছু পাবে সব ঢালতে হবে ঐ সংসারের পিছনে।

সংসারে যাদের কেউ নেই তারা কেমন দুপুরে দোকানে খেতে যায়, আর সারের দুর্গন্ধ গাদার ওপর বসে' বসে' ও চিবোয় বাড়ী হতে আনা বিস্বাদ রুটি!

সব সময়ই মনটা এমন খিঁচড়ে থাকত না। ঘরের জীবগুলোর কথা ভেবে মায়া হ'ত! স্নেহ প্রেম তখনও মন হ'তে মরে যায়নি। সামনে পরীক্ষা। ছোট্ট কচি অ্যান্টানাসটা—কী মিষ্টি ওর হাসি, ইউর-গিসকে দেখলেই একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানায়, ক'দিন হ'তে সে হাসি আর নেই—লাল লাল গুটিতে সর্বাঙ্গ ঢেকে গেছে। ছোটদের যত রকম রোগ হ'তে পারে সবই ওর হ'য়েছে। এই হামটা হুপিং কাশির ঠিক পরেই এসেছে। কোট্রিনা ছাড়া তাকে দেখবার আর দ্বিতীয় মানুষ নেই। ডাক্তারের তো কথাই ওঠে না। ডাকবে কোথা হ'তে? গরীব যে ওরা! তা ছাড়া হাম হ'লেই ছেলেরা মরে না, অন্ততঃ যত ছেলের হয় তত মরে না। একটু সময় পেলে কোট্রিনা বাচ্ছার বিছানার পাশে বসে' কাঁদে, নয়তো রোগা ছেলে একাই পড়ে' থাকে। মেঝে স্যাঁৎ-সেঁতে, ঠাণ্ডা লাগলে আর বাঁচবে না। রাত্রে ওকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়, নইলে পা ছুঁড়বে, ঢাকাটা সরে' যাবে—ক্লান্ত মা-বাপ ওর ঢাকা তুলে দেবার জন্যে সারারাত বসে' থাকতে পারে না—ওরা পড়ে' থাকে ক্লান্তির তন্দ্রায়। বাচ্ছা ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রাণপণে চীৎকার করে কাঁদে। কেউ উঠে আসে না; চ্যাচাবার ক্ষমতা শেষ হ'লে যন্ত্রণায় একটানা একটা আওয়াজ করে' চলে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, চোখদুটো দগ্‌দগে। দিনের বেলা ওর দিকে চাওয়া কঠিন। মানুষের বাচ্ছার আকার যে এমন হ'তে পারে বিশ্বাস করা যায় না। হামে ঘামে ময়লায় মিলে শরীরের ওপর লাল চটের মত একটা প্রলেপ পড়েছে। মনে হয় যন্ত্রণার একটা পিণ্ড।

কথাগুলো যত মর্মান্তিক শোনাচ্ছে, ব্যাপারটা আসলে তত ভীষণ

নয়। অসুখ করেছে বলে ও এখন ভাগের দিক থেকে বাড়ীর মধ্যে সব-চেয়ে ভাগ্যবান। জ্বালাযন্ত্রণা সইবার শক্তি আছে ওর; তবু চ্যাঁচায় কেন? বোধ হয় দুনিয়াকে ও জানতে চায় কী বিস্ময়কর ওর স্বাস্থ্য, ওর জীবনীশক্তি। মা-বাপের যৌবনের আনন্দের সন্তান ও। যাদুকরের মন্ত্রে যেন ও গজিয়ে উঠেছে ছোট্ট কোমল একটু গোলাপচারার মত, কিন্তু জগৎটা লেগেছে শামুকের মত ওর পিছনে। এখন ওর অসুখ, নইলে সারাটা দিন ও হ্যাংলা চাহনি নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—বাড়ীর সকলের মধ্যে ভাগ করা খাবারের যেটুকু ওর ভাগ্যে পড়ে, তাতে পেটও ভরে না, মনও ওঠে না—ওর আরও পাবার দাবি চাপা দেওয়া কঠিন। বয়স কতই বা হবে? বছরখানেক। কিন্তু এরই মধ্যে ওর বাবা ছাড়া ওকে আর কেউ সামলাতে পারে না।

বাচ্ছাটাকে দেখলে মনে হয়, মায়ের সমস্ত শক্তি শুষে নিয়ে ও ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে, ওর পরে যাদের আসবার সম্ভাবনা আছে তাদের জন্যে যেন কিছুই বাকী রাখেনি। ওনা আবার অন্তঃসত্ত্বা, ভাবতেও ভয় করে। ইউরঘিস এখন নির্বাক, নিস্পৃহ; কিন্তু ও পর্যন্ত ভাবে, সামনে আরও যন্ত্রণা; ভাবতে অন্তরাত্মা ওর কেঁপে ওঠে।

চোখের সামনে ওনা ভেঙ্গে পড়ছে। বৃদ্ধ ডেডে আন্টানাসের একরকম কাশি হয়েছিল, তাতেই মারা গেল, ওনারও সেই কাশি হয়েছে, শুধু হয়েছে নয়, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মুনাফা-লোভী পথগাড়ী সংঘ (একটা ব্যবসায়ী কোম্পানী) বৃষ্টির মধ্যে ওকে পথে বের করে' দেয়; কাসিটা দেখা দেয় সেই দিন হ'তে। রোগ এখন ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে; কোন রাত্রি হয়তো ঘুমুতেই পারল না, সমস্ত রাত্রিটা বিছানায় বসে' কাটিয়ে দিলে। তার ওপর দেখা দিয়েছে স্নায়বিক দুর্বলতা। কখনও ভীষণ মাথা ধরে, কখনও অকারণে কান্না পায়। ও কাঁদে। কোনও দিন বা কেমন বিবশ হ'য়ে

কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফেরে, ফিরেই আকুল কান্নায় লুটিয়ে পড়ে নিজের বিছানাটুকুর মধ্যে। কখনও কখনও কান্না আর থামতে চায় না; যদি বা অনেক সান্ত্বনায় থামল, তো আবার হাউ হাউ করে' কেঁদে উঠল। ভয়ে ইউরঘিস কেমন পাগলের মত হ'য়ে যায়। এলজবিয়েটা বোঝায়, ভয় পাবার কিছু নেই, মেয়েদের এমন হ'য়ে থাকে—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বেচারা সান্ত্বনা পায় না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করে, কী হ'য়েছে ওর, কেন অমন করছে? ও তর্ক করে, মেয়েদের হয় বললেই তো হবে না, আগের বারে তো ওনার এমন হয়নি! ব্যাপারটা ভাবা যায় না, পৈশাচিক। ওদের জীবন অভিশপ্ত, ওনার কাজ অভিশপ্ত, তবু দুর্বল মেয়েটাকে সেই কাজই করতে হবে; ঐ কাজই ওকে একটু একটু করে' হত্যা করছে। এখন তো শরীর ভেঙেছে। শরীর ভাঙার আগেও ও কাজের যোগ্য ছিল না। জগতের কোন মেয়েই ও কাজের যোগ্য নয়, কোন মেয়েকে এ কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। দুনিয়া যদি তাদের অন্য কাজ দিতে না পারে, তাহ'লে এমন একটু একটু করে' না মেরে একেবারে মেরে ফেলুক—ঝঞ্ঝাট চুকে যাক। ওদের বিয়ে করা অন্যায়, ওদের ছেলে হওয়া অন্যায়। কোনও মজদুরের বিয়ে করা উচিত নয়। স্ত্রীলোক কী বস্তু আগে জানলে ইউরঘিস নিজের চোখ দুটো উপড়ে ফেলে দিত, বিয়ে করত না। বেচারা নিজেই হাউ হাউ করে' কেঁদে ওঠে। এমন শক্তিমান একটা পুরুষ, এত নিরুপায়! ওর কান্না চোখে দেখা যায় না। কোনও রকমে ওনা নিজেকে সামলে নেয়; শক্ত না হ'য়ে উপায় কী? স্বামীর বুকে মাথা রেখে সান্ত্বনা দেয়—কাঁদছ কেন? আবার সেরে উঠব, সব ঠিক হ'য়ে যাবে; রোগ কি কারও হয় না! কথা কিন্তু শেষ করতে পারে না, চোখের জলে ভিজিয়ে দেয় স্বামীর বুক। বনের অবোধ হরিণ কারও ক্ষতি করেনি, অদৃশ্য শত্রু তাকে লক্ষ্য করে' শরনিক্ষেপ করে; অবোধ সভয় বিস্ময়ে চেয়ে থাকে শুধু। ইউরঘিসের অবস্থাও আজ তাই—অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে দুনিয়ার দিকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এ সব অশান্তির শুরু গ্রীষ্মকাল হ'তে; ইউরঘিসের বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়; ওনা আতঙ্কমাখা চোখে কথা দেয়, এমন আর হবে না; কিন্তু হবে না বলার ওপর কিছুই নির্ভর করে না, আবার হয়, আবার ও কথা দেয়। এক-একটা সঙ্কট আসে আর ইউরঘিস আরও ঘাবড়ে যায়, এলজবিয়েটার সান্ত্বনা আর মন মানতে চায় না, মনে সমস্ত ব্যাপারটা বিভীষিকাময় রহস্য; কী ও বোঝে না, কেউ ওকে বোঝায়ও না; ও বুঝে নিয়েছে, মেয়েদের এ সব ওকে জানতে নেই। কোন কোনও দিন ওনার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে যায়; ওনার চাহনি মানুষের মত নয়, কেমন যেন ভীতত্রস্ত শত্রুতাড়িত জানোয়ারের মত চাহনি; কখনও বা ওনা পাগলের মত কাঁদে, ব্যথা হতাশার দু'-একটা অসম্পূর্ণ কথা ওর কান্নার মধ্যে হ'তে ধরা যায়। ও চাহনি বা এই সব ভাঙ্গা কথা বা কান্নার মানে নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা ইউরঘিসের নেই—চিন্তাশক্তি, অনুভূতি সবই যেন অসাড় হ'য়ে গেছে। গাধার মত বোঝা বয়ে চলেছে; ঝঞ্ঝাটটার মধ্যে পড়ে গেলে অধৈর্য নিরুপায় হ'য়ে একটু ভাবে; তারপর সবই ভুলে যায়। মূক পশুর মত ও বাঁচছে বর্তমানের মুহূর্তটিকে নিয়ে—অতীত বা ভবিষ্যতের অস্তিত্ব ওর কাছে নেই।

শীত আসছে; এবারকার শীতটা যেন আরও নিষ্করুণ, ভয়াবহ। অক্টোবর মাস। বড়দিন আসতে দেরি নেই। বড়দিনের বাজার সাজিয়ে দেবার জন্য মাংসের কারখানাগুলোয় জোর কাজ চলছে। বড়দিনের প্রাতরাশের জন্য প্রয়োজনীয় মাংসের পরিমাণ কম নয়; অর্ধেক রাত পর্যন্ত যন্ত্রগুলো চালু থাকছে। মেয়ারিজা, এলজবিয়েটা বা ওনা যন্ত্রেরই

অংশ হ'য়ে গেছে; ওরাও দিন পনেরো-ষোল ঘণ্টা খেটে চলেছে। উপরন্তু সমস্তটা খাটবে কি খাটবে না, সেটা ওদের—ওদের কেন—কোন মজুরেরই মতের ওপর নির্ভর করে না। খাটতে হবে, নইলে চাকরি থাকবে না; শুধু কি ঘণ্টা, যে কোন কাজ করবার হুকুম হবে, তাই করতে হবে—শরীর বইছে কি বইছে না দেখবার কারও দরকার নেই, না বয় চাকরি ছেড়ে দাও। তা ছাড়া উপরন্তু খাটুনির জন্য সামান্য কিছু উপরন্তু মজুরীও আছে। বড় বড় বোঝা বয়ে চলে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা; পা কাঁপে, কিন্তু উপায় কী? সকাল সাতটায় ওরা কাজ শুরু করে, বারোটায় যা হ'ক দু' গ্রাস মুখে দেয়, আবার খাটতে শুরু করে; রোজ শেষ হয় রাত দশটা কি এগারোটায়। দিন বারোটা হ'তে এই রাত দশ-এগারোটা পর্যন্ত পেটে আর একটা দানাও পড়ে না। একসঙ্গে ঘরে ফেরবার জন্য ইউরঘিস ওদের জন্য অপেক্ষা করতে চায়, করেও; কিন্তু খাটুনির চাপে ওরা ইউরঘিসের কথা ভুলে যায়। কারখানার বাইরে ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ও কাজ করে সারের কারখানায়; এখন সেখানে কাজ বাড়বার কারণ নেই; তাই সময়মতই সেটা বন্ধ হ'য়ে যায়। অপেক্ষা করবে কোথায় দাঁড়িয়ে। এক জায়গা, মদের দোকান। কিন্তু…। ঘন অন্ধকারে ওরা একা একা বেরিয়ে আসে; একটা কোণ ঠিক করা আছে, সেখানে ওরা মিলিত হ'য়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। কারও একা খুব বেশী দেরি হ'য়ে গেলে বাসে ক'রে বাড়ী ফেরে। ফিরুক যেমন করেই, রান্না করবার বা খাবার শক্তি তখন আর থাকে না; ক্লান্তিতে শরীর যেন দশগুণ ভারী হয়ে ওঠে; কোন-রকমে ওরা "লেপ"-টার নীচে দেহটা গলিয়ে দেয়—জুতো জামা পর্যন্ত খোলা হয় না। এ ওদের বাঁচবার লড়াই, জিততে ওদের হবেই, নইলে যে শেষ হয়ে যাবে। এখন এইভাবে খাটতে না পারলে শীতকালে বাড়ীতে এক ছটাক কয়লা থাকবে না।

"ধন্যবাদদান দিবসের" দু'-এক দিন আগে একসঙ্গে চলল বরফপাত আর ঝড়। শুরু হয়েছিল দুপুরে, সন্ধ্যা নাগাদ রাস্তায় দু' ইঞ্চি পুরু বরফ জমে গেল। ইউরঘিস মেয়েদের জন্য কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করলে; কিন্তু মানুষ তো, পারবে কেন? ঢুকল গিয়ে মদের দোকানে। ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত কাঁপছে; শরীরটাকে একটু চাঙ্গা ক'রে নেবার জন্য দু'গ্লাস মদ খেলে—লোভ বেড়ে যায়, আবার শুরু হয় মনের লড়াই—ও বেরিয়ে আসে, ছুটে চলে বাড়ীর দিকে। ঠিক করল বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে ওদের ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকবে; কিন্তু শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল। জাগল দুঃস্বপ্নে চমকে ওঠার মত করে'—এলজবিয়েটা কাঁদে আর ওকে ঠেলে। ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে থাকে ও, এলজবিয়েটা কী বলছে মাথায় ঢোকে না; শেষ পর্যন্ত বুঝল, তখনও ওনা বাড়ী ফেরেনি। কটা বাজে? ভোর হ'য়ে এসেছে; ওঠবার সময় হ'য়ে এল। সে রাত্রি ওনা বাড়ী ফেরেনি! এই ঠাণ্ডা বাইরে, পথে হাতখানেক উঁচু হ'য়ে বরফ জমেছে! ওনা বাড়ী ফেরেনি!

ধড়মড়িয়ে ও উঠে বসে। মেয়ারিজা কাঁদছে, ছেলেগুলো বোধ হয় সহানুভূতিতে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—ষ্টানিসলোভাসের বাচ্চাটা পর্যন্ত চেঁচাচ্ছে—বরফকে ওর বড় ভয়। পোশাক নেই, তাই বেরুবার আগে পোশাক পরবার ঝঞ্ঝাটও নেই; কোটটা আর জুতো জোড়া পরে' নিয়ে ইউরঘিস বেরিয়ে পড়ে। প্রথমটা ছুটে চলল, তারপর মনে হ'ল ছুটে লাভ কী? কোথায় যাবে, তাই তো জানে না। তখনও দুপুর রাত্রির মত অন্ধকার; বরফের বড় বড় আঁশগুলো তখনও পড়েই চলেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধতার মধ্যে পড়ন্ত আঁশগুলোর খস খস শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। একটুক্ষণ দাঁড়ালেই শরীরের উপর বরফের বোঝা জমছে।

ঠিক করে' নিলে কারখানার দিকেই যেতে হবে। ভেবেই সেদিকে

দৌড় দিলে। তখনও দু'-একটা মদের দোকান খোলা আছে ; সেগুলোতে খোঁজ করে। ওনা হয়তো ক্লান্ত হ'য়ে পথে পড়ে গেছে, হয়তো কারখানায় কোন দুর্ঘটনায় আহত হ'য়েছে। ওনাদের কারখানায় গিয়ে একটা পাহারাওয়ালাকে দুর্ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করে ; কই না, ওখানে—কাল—কোন দুর্ঘটনা ? না, পাহারাওয়ালা যতদূর জানে, কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। সময়-দপ্তর (মজুরদের যাওয়া-আসার সময়ের হিসাব রাখে এই অফিসটি) ইতিমধ্যেই খুলে গেছে। সেখানকার কেরানী বললে, এই, গত রাত্রে ওনার যাবার সময় লেখা আছে।

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। এদিকে, দাঁড়িয়ে থাকলে তো ঠাণ্ডায় জমে যাবে, কাজেই পায়চারি করে। এরই মধ্যে কারখানার প্রাঙ্গণ কর্মমুখর। দূরে গাড়ী হ'তে গরু শূয়োর নামান হ'চ্ছে ; গোমাংসের এক-একটা বিরাট খণ্ড নিয়ে "গোমাংস বাহকরা" টলতে টলতে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, চলেছে রেফ্রিজারেটার গাড়ীর দিক। তখনও দিনের আলো ফোটেনি ; দলে দলে মজুর আসে দ্রুতপায়ে, হাতে দোলে খাবারের ঝোলান কৌটা। সময়-দপ্তরের জানালা দিয়ে খানিকটা আলো বাইরে পড়েছে, ওখানটায় মজুরদের মুখ চেনা যেতে পারে। ইউরখিস দাঁড়ায় আলোটুকুর পাশে। ঘন হ'য়ে বরফ পড়ছে। আলোতে সব স্পষ্ট নয়। ও তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নইলে ওনা কখন সামনে দিয়ে চলে যাবে ও জানতেও পারবে না।

সাতটা বাজে। প্যাকিং কলে কাজ শুরু হ'য়ে গেছে। সারের কারখানায় এতক্ষণ ইউরখিসের হাজির হওয়া উচিত ছিল। গেলে মনটা লুপ্ত হ'য়ে যেত কাজের মধ্যে, ওনার জন্য এই যে দুশ্চিন্তা এর কোন পাত্তাই থাকত না। ও দাঁড়িয়ে থাকে। সাতটা-পনেরো ; তুষার-কুয়াসার মধ্যে দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে।

ইউরঘিসের গলায় একটা আওয়াজ এসে যায়, লাফিয়ে পড়ে ও ছায়া-মূর্তিটির কাছে। না, ভুল হয়নি, ওনাই বটে। ওনা টলতে থাকে। ইউরঘিস ওকে নিজের বক্ষের আশ্রয়ে টেনে নেয়।

"কী হ'য়েছিল ?" চিন্তাভারাক্রান্ত স্বরে ও জিজ্ঞাসা করে—"কোথায় ছিলে ?"

ওনার হাঁপ ধরে গেছে ; দম নিয়ে ওনা বলে ওঠে, "বাড়ী যেতে পারিনি···বরফ—বাস বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু ছিলে কোথায় ?—ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে।

"এক বন্ধু (বান্ধবী)র সঙ্গে তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম," এইটুকু বলেই ও হাঁপায়, "জাডবিয়ার সঙ্গে।"

ইউরঘিস স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু চোখে পড়ে ওনা থরথর করে' কাঁপছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ইউরঘিসের ভয় হয় আবার হয়তো সেই কান্না, সেই ভেঙ্গে পড়া ওনাকে পেয়ে বসবে। ও ভড়কে যায় ; বলে, "হয়েছে কী ? ব্যাপার কী ?"

"বড্ড ভয় পেয়েছিলাম, ইউরঘিস," বলতে বলতে ওনা পাগলের মত ওকে জড়িয়ে ধরে, "কী ভাবনাই যে হয়েছিল !"

আলোটুকুর মধ্যে এসে পড়েছিল ; চতুর্দিক হ'তে লোকের চোখ পড়েছে ওদের ওপর। ওনাকে টেনে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ও চলে যায়। বিব্রতভাবে বলে, "খুলেই বল না, কী হয়েছিল !"

ওনা ফোঁপায় : "ভয় পেয়েছিলাম, সত্যি খুব ভয় পেয়েছিলাম। জানি, কোথায় ছিলাম না-ছিলাম তোমরা জানতে পারবে না ; খুব ভাববে। কিন্তু বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম—ইউরঘিস, ইউরঘিস।"

ওনাকে ফিরে পেয়েছে এই ওর কাছে বড় কথা, আর কিছু ঠিকভাবে ভাববার সময় পর্যন্ত এখন ওর নেই। ওনা অমন ব্যাকুল হ'য়ে পড়বে এতে অস্বাভাবিক কী আছে ; ওনার ভাব সন্ত্রস্ত, কথা অসংলগ্ন—এ

সবের বিশেষ কোন অর্থ থাকতে পারে বলে মনে হ'ল না; ওনাকে ফিরে পেয়েছে, মনের সবটা অধিকার করে' নিয়েছে এই স্বস্তি। সান্ত্বনা না দিয়ে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে—আহা, বেচারা কাঁদুক একটু, কাঁদলে ভয় ঘুচবে, মনটা হাল্কা হবে। এদিকে, প্রায় আটটা বাজে, এখনই কাজে যেতে না পারলে দু'জনেরই এক-এক ঘণ্টার মাইনে কাটা যাবে। তখনও ওনার মুখ ফ্যাকাশে, চোখ ভীত-সন্ত্রস্ত; ঐ অবস্থাতেই ওকে প্যাকিং কারখানার ফটকে ছেড়ে ইউরঘিস চলে যায় সারের কারখানার দিকে।

মধ্যে কিছুদিন কেটে গেল। বড়দিন আর এসে পড়েছে। তুষারপাত বেড়েছে, শীতে হাড়ের ভেতর অবধি জমে আসে। ভোরের অন্ধকার আর তুষারের মধ্যে দিয়ে ইউরঘিস স্ত্রীকে কারখানা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। অবশেষে, একরাত্রে সব কিছুর অবসান হ'ল।

ছুটির তখনও তিন দিন বাকী। এলজাবিয়েটা আর মেয়ারিজা বাড়ী ফিরল, তখন রাত্রি প্রায় দুপুর। ওনার জন্য ওরা অপেক্ষা করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাকে না পেয়ে দু'জনেই বাড়ী ফেরে; আশা করেছিল, সে হয়তো আগেই চলে গেছে। ফিরে দেখলে ওনা আসেনি। শুরু হ'ল মেয়েলী বিলাপের চিৎকার। গেল কোথায়? ওনা যেখানে কাজ করে সে ঘরটা পর্যন্ত দেখে এসেছে—সেখানে জনপ্রাণী নেই। বাইরে তুষারপাত নেই, অন্য রাত্রির চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা সেদিন পড়েনি; তবে, ওনা গেল কোথায়? ব্যাপারটা ভীষণ গোলমেলে ঠেকে।

ওরা ইউরঘিসকে জাগায়; শুনতে শুনতে মেজাজ হ'য়ে যায় গরম! নিশ্চয় জাডবিয়ার সঙ্গে তাদের বাড়ী গেছে, হয়তো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। জাডবিয়াদের বাড়ী কারখানার কাছেই। ভয়ের কিছু নেই, থাকলেই বা কী করা যাবে। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই

হবে। কাজেই ইউরঘিস আবার শুয়ে পড়ল; ওরা আর কিছু বলবার আগেই আবার ওর নাক ডাকতে লাগল।

ভোরে অবশ্য অন্য দিনের চেয়ে ঘণ্টাখানেক আগেই ও বেরিয়ে পড়ল। জাডবিয়া মার্সিঙ্কাস কারখানার ওপাশে হ্যাল্‌ষ্টেড্‌ ষ্ট্রীটে একখানা ঘর নিয়ে থাকে মা আর বোনেদের সঙ্গে। এই একখানা ঘরই সব; এইটেই ওদের বাড়ী। মিকোলাসের হাত কী ভাবে কেটে যায়; কাটা হাত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ক্ষতটা যায় বিষিয়ে। ফলে হাতটা কেটে ফেলতে হয়। ছ'জনের বিয়ের কথাও হাতের সঙ্গে লুপ্ত হ'য়ে যায়। বাড়ীটার পিছন দিকের গলি দিয়ে ওদের ঘরে যেতে হয়; যেতে যেতে ইউরঘিস দেখে জানালার ফুটো দিয়ে আলোর রেখা আসছে, ভেতর হ'তে রান্নারও যেন শব্দ আসে। যাক, সব জেগেছে; সাহস করে' কড়া নাড়ে, আশা করে, ওনাই দোর খুলবে।

জাডবিয়ার একটি ছোট বোন দোরের ফাটল দিয়ে চায়। ইউরঘিস সিধে জিজ্ঞাসা করে, "ওনা কোথায়?"

—"ওনা?" ঘাবড়ে গিয়ে মেয়েটি প্রতি-প্রশ্ন করে।

—"হ্যাঁ ওনা, এখানে নেই সে?"

—"না।"

ইউরঘিস চমকে ওঠে। জাডবিয়াও ফাটলটা দিয়ে উঁকি মারে। ইউরঘিসকে দেখেই আবার সরে যায়—তখনও পুরোপুরি বস্ত্র বদলান হয়নি। পাশে হ'তে বলে, "মনে করো না কিছু, মায়ের খুব অসুখ..."

—"ওনা এখানে নেই, না?" ওর কথা শোনবার মত মনের অবস্থা তখন ইউরঘিসের নয়।

—"না তো, কেন?" জাডবিয়া বলে—"ও এখানে আছে মনে হ'ল কেন? এখানে আসবে বলেছিল নাকি?"

—"না", ইউরঘিস জানায়, "বাড়ী যায়নি ; ভাবলাম, আগের মতই এখানে এসে থাকবে।"

—"আগের মত ?" বিব্রতভাবে জাডবিয়া জিজ্ঞাসা করে।

—"যেবার এখানে রাত্রে ছিল।"

—"উঁহু", বুঝতে ভুল হ'য়েছে বোধ হয়।" জাডবিয়া চটপট উত্তর দেয়, "এখানে তো ও কোনদিন রাত্রে থাকেনি।"

কথাগুলো ঠিকমত ওর মাথায় ঢোকে না। বিস্মিত হ'য়ে যায় ও। কাটাকাটা ভাবে নিজের বিশ্বাসটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়: "কেন ? সেই যে হপ্তা দুই আগে, খুব বরফ প ড়িল যে রাত্রে ?"

—"উঁহু, কোথাও ভুল হ'চ্ছে। ও এখানে আসেনি।"

চৌকাট ধরে' ইউরঘিস নিজেকে সামলে নেয়। গলা পর্যন্ত একটা জ্যাকেট জড়িয়ে নিয়ে জাডবিয়া দোরটা পুরোপুরি খুলে ধরে—ওনা ওর বান্ধবী, ভাবও খুব দু'জনে। বেশ জোরেই বলে, "বুঝতে ভুল হয়নি তো তার কথা ? ওনা হয়তো অন্য কোন—"

—"উঁহু। ওনা এখানকার কথাই বলেছিল। তোমাদের সম্বন্ধে কত কথা বললে—তুমি কেমন ছিলে, কী বলেছিলে—সবই তো। আচ্ছা, ঠিক মনে আছে তোমার ? ভুলে যাওনি তো ?"

—"উঁহু, না," জাডবিয়া জানিয়ে দেয়। কোণ হ'তে রোগীর চিঁ চিঁ শোনা যায়: "জাডবিয়া, বাচ্ছাটাকে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছিস, দোর বন্ধ করে' দে।"

দোরের ফাটলটা দিয়ে ইউরঘিস আরও কিছুক্ষণ অবুঝভাবে দু'-একটা কথা বলে ; কিন্তু কীই-বা আর জানবার আছে ? মাফ চেয়ে ও চলে' যায়।

কারখানার সময়-দপ্তর ছাড়া আর তো কোথাও যাবার নেই। ওর খানিকটা দূরে ও পাহারা দেয়। সাতটা বেজে গেল, তারপরেও প্রায়

এক ঘণ্টা। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওনা যে ঘরটায় কাজ করে, খোঁজ করতে গেল সেখানে। ওদের জমাদারণী তখনও আসেনি। ওরই মধ্যে একজনের অধীনে মজদুরণীরা প্যাকিংএর কাজ করে' চলেছে। বিজলী বাসগুলো "নীচুশহর" (কুখ্যাত পল্লী) হ'তে এসে সার সার দাঁড়িয়ে গেছে; কী একটা দুর্ঘটনার জন্য কাল রাত্রি হ'তে বিজলীপ্রবাহ বন্ধ। বাসও বন্ধ। একটি মেয়ে নিজের কাজে জোর হাত চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরঘিস তাকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ দেখছে কিনা দেখে নিয়ে মেয়েটা দু'-একটা কথার উত্তর দেয়। ইতিমধ্যে গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে একটা ঠেলাগাড়ীওয়ালা এসে যায়। ওনার স্বামী বলে, ইউরঘিসকে ও চেনে—রহস্যটা সম্বন্ধে সে-ও উৎসুক। বলে, "বাসের গোলমালের জন্যেই কিছু হয়ে থাকবে; হয়তো নীচুশহরে গিছ্‌ল—"

—"না! ও কক্ষণো নীচুশহরে যায় না!"

—"হবে হয়তো!"

ইউরঘিসের মনে হ'ল, লোকটা মেয়েটার সঙ্গে যেন চোখে চোখে কথা কয়ে নিলে—ঈষৎ একটা হাসি যেন খেলে গেল। ঝট করে' ইউরঘিস বলে ওঠে, "জান এ সম্বন্ধে কিছু?"

লোকটার খেয়াল হ'ল ওপরওয়ালার চোখ ওরই ওপর। হাতদুটো অমনি গাড়ী ঠেলতে লাগে। যেতে যেতে চাপাস্বরে বলে, "কী জানি বাপু! তোমার বৌ কোথায় যায় না-যায় তার আমি কী জানি!"

ইউরঘিস আবার কারখানার বাইরে ফিরে আসে। সারা সকালটা কেটে যায়। নিজের কাজে যাবার কথা মনে থাকে না। খোঁজখবরের জন্য দুপুরের দিকে একবার পুলিস ফাঁড়িটা ঘুরে আসে। আবার কিছুক্ষণ কারখানার সামনে অপেক্ষা করে। দুপুর গড়িয়ে যায় বিকেলের দিকে। এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, ইউরঘিস বাড়ির দিকের পথ ধরে।

মন্থরগতিতে ও অ্যাশ্‌ল্যাণ্ড অ্যাভেনিউ ধরে চলে। বাসগুলো আবার চলতে আরম্ভ করেছে; প্রত্যেকটায় বাদুড়-ঝোলা হয়ে লোক ঝুলছে। কয়েকখানা চলে গেল। বাস দেখতে দেখতে ওর মনে পড়ে যায় গাড়ীওয়ালার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায় ও বাস-গুলোর ওপর নজর রেখে চলে। চলতে চলতে হঠাৎ ও থমকে দাঁড়ায় একখানা বাস দেখে, অজান্তে গলা দিয়ে একটা অর্থহীন আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

বাসের পিছু পিছু ও দৌড়য়। অনেকখানি ছুটে গেল, বাসের প্রায় পিছু পিছু। সেই ছাতাধরা টুপি, টুপির পাশটাতে কালচে একটা কাগজের ফুল—কিন্তু ওনা না হ'তেও তো পারে! যাকগে, আর ছোটা যায় না! ওনা হলে আর দুটো স্টপেজ পরেই নামবে। সঠিকভাবে জানাটা আর মিনিট কয়েকের ব্যাপার। ইউরঘিস আবার হাঁটতে শুরু করে।

নামল ওনাই। ওনা একটা কোণ ঘুরতেই ইউরঘিস আবার দৌড়তে আরম্ভ করে। মনে সন্দেহের কাঁটা খচখচ করছে, গোয়েন্দাগিরি করতে আজ ওর লজ্জাবোধ হয় না। ওনা আর একটা মোড় ঘোরে, ইউরঘিস আবার একটা দৌড় দেয়। ওনা বাড়ীতে ঢোকে।…এখনই যাওয়া যায় না। মিনিট পাঁচেক ও খানিকটা দূরে পায়চারি করে। আগেতেই মুঠি দুটো শক্ত হয়, দাঁতে দাঁত চেপে বসে। মনের মধ্যে বয়ে' চলে ঝড়।

বাড়ীর মধ্যে ও ঢুকে পড়ে। সামনেই এলজবিয়েটা; ওনার সন্ধানে সেও বাড়ী ফিরেছে! পা টিপে টিপে ও এগিয়ে আসে; ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখে; ইশারাটা—চুপ থাক। ইউরঘিস দাঁড়িয়ে যায়।

একেবারে কাছটিতে এসে ফিসফিস করে' বলে, "শব্দ করো না।"

—"কেন, ব্যাপার কী?" ইউরঘিস জানতে চায়।

—"ওনার যে খুব অসুখ। ঘুমিয়েছে।" বলতে বলতে এলজবিয়েটা হাঁপায়: "ওর মাথা বোধ হয় খারাপ হ'য়ে গেছে। পথ হারিয়ে কাল সারাটা রাত্রি ও পথে পথে ঘুরেছে। বহুকষ্টে চুপ করালাম। এতক্ষণে ঘুমোলো।"

—"ফিরল কখন?"

এলজবিয়েটা বলে, "সকালে তুমি বেরুলে তো, তার খানিকক্ষণ পরেই।"

—"তারপর আবার বেরিয়ে গিয়েছিল?"

—"না! কই, না তো। ও বড্ড দুর্বল যে ইউরঘিস, ও—"

ইউরঘিসের মুখ কঠিন হ'য়ে ওঠে, দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বসে, চাপাস্বরে বলে, "মিথ্যে কথা বলছ তুমি!"

এলজবিয়েটা কেঁপে ওঠে, মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়; বলে, "কেন, কেন? কী হয়েছে?"

আর জবাব না দিয়ে ওকে ঠেলে ইউরঘিস এগিয়ে যায় শোবার ঘরের দিকে। দোর খুললে দেখা যায়, বিছানার ওপর ওনা বসে' আছে; ইউরঘিসকে দেখেই ওর চোখ দুটো ভয়ার্ত হ'য়ে ওঠে। এলজবিয়েটা পিছু পিছু আসছিল। তাকে বাইরে রেখে ইউরঘিস দোর বন্ধ করে' দিলে ভেতর হ'তে। কঠিনস্বরে জিজ্ঞাসা করে, "ছিলে কোথায়?"

ওনার মুখ কাগজের মত শাদা, বিবর্ণ; হাত দুটো কোলের ওপর মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে পড়ে আছে। দু'একবার ও মুখ খুললে, হয়তো উত্তর দেবার জন্য, কিন্তু কিছু শোনা গেল না। তারপরই তাড়াতাড়ি নীচুস্বরে বলে' চলল, "আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, ইউরঘিস। কাল রাত্রে বাড়ির পথ ধরলাম কিন্তু পথ হারিয়ে গেল। কাল সারাটা রাত্রি বোধ হয় খালি হেঁটেছি। এই সকালে বাড়ী ফিরলাম।"

ইউরঘিসের কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় হয়: "তোমার বিশ্রামের দরকার, আবার বেরুলে কেন ?"

ইউরঘিস সোজা ওর চোখের ওপর চেয়েছিল। দেখলে ওর প্রশ্নের ফলে ওনার চোখ দুটো ত্রস্ত হ'য়ে উঠল, চোখদুটোই যেন পথ হারিয়ে অনিশ্চয়তার পথে চলেছে। বলে, "আমি, আমি—আমাকে একবার দোকানে যেতে হয়েছিল—আমি গিয়েছিলাম—"

"মিথ্যা কথা বলছ তুমি।"

ইউরঘিসের দৃঢ়বদ্ধ মুষ্ঠি আরও শক্ত হ'য়ে ওঠে, স্ত্রীর দিকে ও এগিয়ে যায়; হিংস্রভাবে চীৎকার করে' জিজ্ঞাসা করে, "কেন, কেন মিথ্যে বলছ আমার কাছে? কী করে বেড়াচ্ছ যার জন্য আমার কাছে মিথ্যে বলতে হচ্ছে ?"

ভয়ে ওনা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়: "ইউরঘিস, ইউরঘিস, কেমন করে' তুমি এ কথা বললে ?"

"হাঁ, হাঁ, মিথ্যে কথা তুমি বলছ। সেদিন বলেছিলে, জাডবিগার বাড়ী গিয়েছিলে, যাওনি। কাল রাত্রে যেখানে ছিলে, সে রাত্রিটাও সেখানেই কাটিয়েছিলে—নীচুশহরের কোথাও। আমি নিজে তোমায় বাস হ'তে নামতে দেখেছি। ছিলে কোথায় ?"

ওনার ভেতর দিয়ে ও যেন একখানা ছুরি চালিয়ে দেয়। দাঁড়াবার শক্তি যেন ওনার লুপ্ত হ'য়ে আসে। চোখে বিভীষিকার ছায়া। দেওয়াল, দোর, ইউরঘিস—সব যেন ওর চারিদিক ঘোরে। একটা আর্তনাদ করে' ও বাহু বাড়িয়ে দেয় ইউরঘিসের দিকে।

ইচ্ছা করেই ইউরঘিস সরে' যায়,—পড়ুক ও আছাড় খেয়ে। পড়তে, পড়তে ওনা খাটের বাজু ধরে' ফেলে, চোট না লাগলেও, ও আর দাঁড়াতে পারে না; গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে; হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কাঁদতে কাঁদতে ওর হাতে পায়ে টান ধরে, এখনও হাত পা শক্ত হ'য়ে আসে। আগে ইউরঘিস এটাকে বড় ভয় করত। কিন্তু আজ ওনা কেঁদেই চলল, কখনও নিঃশব্দে, কখনও জোরে ; ঝড়ের মুখে পাহাড়চূড়োর গাছের মত শরীরটা ওর বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ওর শরীরের মধ্যে কোথাও যেন একটা যন্ত্রণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে। অন্য সময় হ'লে ইউরঘিস বিচলিত হ'য়ে পড়ত, কিন্তু আজ ও দাঁতে দাঁত চেপে মুঠি শক্ত করে' দাঁড়িয়ে রইল। কাঁদতে কাঁদতে মরে যায় মরুক, ইউরঘিস এবার একটুও টলবে না। মন যাই বলুক, ওর অন্তর কোমল হ'য়ে আসে, রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে—পায়ের কাছে পড়ে পড়ে, অমনভাবে কাঁপছে আর কাঁদছে—সওয়া কঠিন। ভীত ত্রস্ত ভাবে টেটা এলজবিয়েটা ছুটে আসে। ইউরঘিস স্বস্তি বোধ করে, তবু বিশ্রী একটা কথা বলে তার দিকে ঘোরে। হুকুম করে—"বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।" এলজবিয়েটা ইতস্ততঃ করে। ইউরঘিস ওর হাত ধরে টানতে টানতে দোর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দেয় ; দোরটা টিপে বন্ধ করে, তার সঙ্গে আটকে দেয় একটা টেবিল। আবার যেন খানিকটা জোর পায়। ওনার কাছে ফিরে এসে বলে, "জবাব দাও আমার কথার।"

জবাব ওনা দেয় না। ভূতে পাওয়ার মত তখনও ও কেঁদে চলেছে ; মৃগী রোগ ; হাত-পাগুলো যেন জীবন্ত অংশ, যেন নিজ নিজ ইচ্ছায় তারা বিক্ষিপ্ত হ'চ্ছে। দেহের কোথাও একটা কম্পন শুরু হ'য়ে ঢেউএর মত ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিটি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। কিন্তু তবু ও কাঁদছে, গলা রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে বার বার—আবার গলার বাধা ঠেলে ফোঁপানি বেরিয়ে আসে ; যেন সাগরের দুটো ঢেউ, একটার পর একটা উঠছে। হঠাৎ ফোঁপানি থেমে যায়, ও ডাক ছেড়ে কান্না শুরু করে, সেও থামে। তারপরই বিকট হাসি—সে কী আওয়াজ! এতক্ষণ কোনরকমে সহ্য

করলেও, ইউরঘিস আর সহ্য করতে পারে না। ওনার কাঁধ দুটো ধরে' সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, "থাম বলছি, থাম!"

বেদনার্ত চোখ তুলে ওনা ওর দিকে চায়, পরক্ষণেই লুটিয়ে পড়ে ওর পায়ে। পা দুটো শক্ত করে' জড়িয়ে ধরে; চেষ্টা করেও ইউরঘিস পা ছাড়াতে পারে না। মুখটা মেঝেয় ঘষেই চলেছে। সহ্য করা যায় না। জানোয়ারের মত বীভৎসভাবে ইউরঘিস চিৎকার করে' ওঠে, "থাম বলছি!"

এবার যেন কথাটা ওনার কানে গেল। দম বন্ধ করে' নিঃশব্দে পড়ে রইল; শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল কান্নার ধমকে। ক্রমশঃ কাঁপাটাও থেমে আসে; বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায় এমনি নিঃশব্দ আর নিশ্চলতার মধ্যে। ইউরঘিসের মনে হয় ওনা বোধ হয় মরছে। হঠাৎ ক্ষীণকণ্ঠে ওনা বলে ওঠে—"ইউরঘিস, ইউরঘিস!"

"কী?"

ওনা কী বলে দূর হ'তে শোনা যায় না। ইউরঘিস ওর মুখের কাছটিতে ঝুঁকে পড়ে। টুকরো টুকরো কথার ক্ষীণকণ্ঠে ওনা অনুরোধ করছে: "আমায় অবিশ্বাস করো না! বিশ্বাস কর!"

"কী বিশ্বাস করব?"

"বিশ্বাস কর আমি—আমি তোমায় ভালবাসি—তোমার ভালবাসার চেয়ে বড় কিছু আমার জানা নেই। কী করেছি জিজ্ঞাসা করো না। ইউরঘিস, দয়া কর, ক্ষমা কর, ইউরঘিস—এতেই, এতে হ'তেই সবচেয়ে ভাল হবে—"

ইউরঘিস কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে ওনা বিভ্রান্ত-ভাবে বলে' চলে—"উঃ, যদি বিশ্বাস করতে পারতে ইউরঘিস! শুধু যদি বিশ্বাস করতে পারতে! আমার তো কোন দোষ ছিল না! আমি কী করব? আমার যে পথ ছিল না। সব ঠিক হ'য়ে যাবে—

কিচ্ছু না—কোন ক্ষতি নেই এতে। ইউরঘিস, ইউরঘিস, আমার মিনতি, তুমি—"

অত দুর্বল, তবু কোনরকমে এগিয়ে এসে ইউরঘিসের পা দুটো ধরে' ওনা নিজেকে তোলবার চেষ্টা করে; ফ্যাকাশে বিবর্ণ ওর হাতখানা থর থর করে' কাঁপে। ইউরঘিস চেয়ে চেয়ে দেখে কিন্তু উঠতে সাহায্য করে না, বাধা দেবার ক্ষমতাও ওর নেই। ওনা ওঠে। স্বামীর বুকে বুক রেখে স্বামীর মুখের দিকে মুখ তোলে। সেখানে কোন সান্ত্বনা নেই। স্বামীর একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের অশ্রুসিক্ত গালের ওপর রেখে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "বিশ্বাস কর, আমায় বিশ্বাস কর!" এইটুকু বলেই ও আবার নিঃশব্দ বেদনায় কাঁদে।

"না, পারি না," ইউরঘিস গর্জে ওঠে।

তবু ওনা লেপ্টে লেগে থাকে ওর বুকে। কাঁদে। হতাশায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে স্বর। বলে, "একবার ভাব ইউরঘিস, একবার ভাব, তুমি কী করছ! সর্বনাশ হ'য়ে যাবে যে, আমরা ধ্বংস হ'য়ে যাব, ধ্বংস হ'য়ে যাব আমরা। এ কাজ তুমি করো না। না, না, তুমি করো না। আমার কথা শোন, এ কাজ করো না। আমি পাগল হ'য়ে যাব—মরে যাব ইউরঘিস—এ কাজ তুমি করো না—আমার মাথার ঠিক নেই ইউরঘিস, কিছু না এ। তোমার জানবার কোন দরকার নেই। আমরা সুখেই থাকব—এতদিনের মত চিরদিনের মত—দু'জনে দু'জনকে ভালবাসব। কথা শোন ইউরঘিস, দয়া কর, বিশ্বাস কর আমায়।"

ওনার কথা ওর মাথায় ঢোকে না; উৎক্ষিপ্ত করে' তোলে ওর মেজাজ। হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে ওনাকে সরিয়ে দেয়। রুক্ষস্বরে চেঁচায়: "উত্তর দাও—জাহান্নমে যাক তোমার বিশ্বাস করা—উত্তর দাও আমার কথার।"

মেঝেয় পড়ে' ওনা অবিশ্রান্তভাবে কেঁদে চলেছে—যেন একটা অভিশপ্ত আত্মা স্বর্গে মর্তে কোন আশার আলো না পেয়ে ভাষাহীন বিলাপ করে' চলেছে। এ দৃশ্য ইউরঘিস সইতে পারে না। পাশের টেবিলে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বলে, "জবাব দাও।"

নিপীড়িত পশুর মত ওনা কান্নার ভাষাতেই জানায়: "তা পারব না, পারব না।"

"পারবে না, কেন?"—ইউরঘিস আবার গর্জায়।

"কেন, জানি না!"

লাফিয়ে পড়ে ইউরঘিস ওর পাশে। একখানা হাত ধরে' একটা হেঁচ্‌কা টানে দাঁড় করিয়ে দেয় শীর্ণ দেহখানা; মুখখানাকে তুলে ধরে নিজের চোখের সামনে—যেন ওনার চোখ হ'তে ও আসল কথা পড়ে নিতে চায়; "বল, বল," ও হাঁপায়, "বল, কোথায় ছিলে কাল রাত্তিরে! লুকোলে চলবে না।"

কানে কানে বলার মত অতি ক্ষীণ শব্দে অতি ধীরে ধীরে ওনা বলে চলে—"আমি নীচুশহরের একটা বাড়ীতে—"

"কোন্ বাড়ী? কী বলছ?"

ওনা চোখ নামাবার চেষ্টা করে। ইউরঘিস জোর করে' ওর মুখখানা তুলে ধরে' থাকে; রুদ্ধশ্বাসে ওনা বলে, "কুমারী হেণ্ডারসনের বাড়ী!"

প্রথমটা ইউরঘিস কিছুই বুঝতে পারে না। প্রতিধ্বনির মত অর্থহীনভাবে বলে, "কুমারী হেণ্ডারসনের বাড়ী।" তারপর হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের মত ভয়ঙ্কর সত্যটা ওর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে যায়। দুনিয়াটা চক্কর খেয়ে যায়। টলতে টলতে ও পিছোয়। মুখ হ'তে বেরিয়ে আসে একটা আর্তনাদ। দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে; চেপে ধরে কপালের পাশ দুটো। দৃষ্টিহীন চোখে ঘরখানায় চোখ

বুলোয়। কয়েকটা মিনিট কেটে যায়। নিজেকেই যেন বলে, "ভগবান, ভগবান!"

ওর পায়ের কাছে তখন ওনা অস্থিরভাবে ছটফট করছে। ক্ষীণ দেহটার ওপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে' ও ওনার গলা টিপে ধরে। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হ'য়ে গেছে। চীৎকার করে, "কে তোকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে? বল্—শীগ্‌গির!"

ওর হাত ছাড়িয়ে সরে' যাবার চেষ্টা করে ওনা। ইউরঘিস আরও ক্ষেপে ওঠে। ওর মনে হয় হয়তো ভয়ে, হয়তো বা যন্ত্রণার ব্যথায় ওনা ওর হাত ছাড়াতে চায়—কিন্তু ভয় হওয়াই তো উচিত, তাই তো উচিত! কিন্তু ও বুঝল না কী গভীর লজ্জার বেদনায় ওনা সরে' যেতে চায়। তবু বেচারী জবাব দেয়—"কোন্নর"।

"কোন্নর? কোন্নর কে?"

"অফিসার।" রুদ্ধশ্বাসে ওনা বলবার চেষ্টা করে, "সে লোকটা—"

উদ্‌ভ্রান্ত ইউরঘিসের আঙ্গুলগুলো আরও চেপে বসে ওনার গলায়। ওনা নিঃশব্দ, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ওনার মুখের ওপর চোখ পড়তেই ইউরঘিস হাত তুলে নেয়, নইলে হয়ত পারে এখনই ওনা দম বন্ধ হ'য়ে মরে যেত। ওনার চোখ বন্ধ, অতি ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিচ্ছে। শিকারী জানোয়ারের মত ইউরঘিস ওর পাশে বসে অপেক্ষা করছে, ওনার চেতনা ফিরছে কিনা মুখ নামিয়ে লক্ষ্য করছে; ফলে ওরই সশব্দ নিশ্বাস পড়ছে ওনার মুখে।

ধীরে ধীরে ওনা চোখ খোলে। ফিস ফিস করে' ইউরঘিস বলে, "বল, আমাকে সব কথা বল।"

অনড়ভাবে ওনা পড়ে আছে। অতি—অতি ক্ষীণকণ্ঠে কী যেন বলে, ইউরঘিসের নিশ্বাসের আওয়াজেই সে শব্দ ডুবে যায়। ওনার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে' ইউরঘিস শোনে, ওনা

বলছে : "এ কাজ করতে আমি—চাইনি। এ কাজ না করবার চেষ্টা করেছিলাম—চেষ্টা করেছিলাম। যাতে রক্ষা পাই আমরা, তার জন্যই—। এ ছাড়া—পথ ছিল না।"

ঘর নিস্তব্ধ। ইউরষিসের নিশ্বাস ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ওনার চোখ মুদ্রিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়। কিছুক্ষণ পর ওনা অবশভাবে মুদ্রিত চোখে আবার বলে, "ও বললে—চাকরি হ'তে আমায় বরখাস্ত করবে। বললে, আমাদের বাড়ীর সকলেই বরখাস্ত হ'য়ে যাব। কোথাও, এ শহরের কোথাও আর কোন কাজ পাব না। মিথ্যে ভয় ও দেখায়নি; কথার নড়চড় ওর হ'ত না। আমাদের ও ধ্বংস করে' ফেলত, সর্বনাশ করত।"

ইউরষিসের সমস্ত শরীর থর থর করে' কাঁপছে; নিজেকে যেন ধরে' রাখতে পারছে না। কখনও দাঁড়ায়, কখনও দু'পা এদিক-ওদিক ঘুরে নেয়। জিজ্ঞাসা করে, "কবে হ'তে এর শুরু?"

আবিষ্টের মত ওনা বলে, "সেই প্রথম হ'তেই। এটা—এর সবটা ওদের ষড়যন্ত্র—কুমারী হেণ্ডারসনের ষড়যন্ত্র। মেয়েটা আমায় হিংসে করত। আমার ওপর কোন্নরের লোভ ছিল—আমায় ও চাইত। সুযোগ পেলেই বলত। তারপর বলতে লাগল, আমায় ও ভালবাসে। টাকা দিতে চাইতো। কত কাকুতি-মিনতি—ভালবাসি, ভালবাসি। শেষ পর্যন্ত ভয় দেখাতে লাগল। আমাদের সব কিছুই ও জানে, জানত আমরা উপোসের মুখোমুখি বেঁচে আছি। তোমার অফিসার, মেয়ারিজার অফিসার সবাই ওর জানা, চেনা। বললে, আমি রাজী না হ'লে কোথাও আমাদের কারও ঠাঁই হবে না। বললে, আমি,—আমি,—আমাদের সকলেই কাজে থাকবেই। তারপর একদিন ও আমায় চেপে ধরল, কিছুতেই আমায় যেতে দেবে না। ও—ও—"

"কোথায়?"

"হলঘরটায়, তখন রাত্রি, সকলে চলে' গেছে। নিজেকে সেদিন আমি বাঁচাতে পারিনি। তোমার কথা মনে হ'ল, ছেলেটার কথা মনে হ'ল, মনে পড়ল মায়ের কথা, মনে পড়ল ছেলেমেয়ে-গুলোকে। কিন্তু ভয় হ'ল, কাঁদতে পারলাম না, চীৎকার করতে পারলাম না।"

এই একটু আগে ওর মুখ হ'য়ে গিয়েছিল ছায়ের মত ফ্যাকাশে, কয়েকমিনিট পরে সেই মুখ হ'য়ে গেছে রক্তিম। নিশ্বাস নিতে ওর আবার কষ্ট হয়। ইউরঘিস নিঃশব্দে অপেক্ষা করে।

"এ দু'মাস আগেকার কথা। তারপর ও আমায় ঐ বাড়ীটায় নিয়ে যেতে চাইত; চাইত, আমি ওখানেই থাকি। বলত, তা হ'লে আমাদের, আমাদের বাড়ীর কাউকে আর কাজ করতে হবে না। প্রতি সন্ধ্যায় আমায় ওখানে যেতে বাধ্য করত। তোমরা ভাবতে আমি কারখানাতে আছি। তারপর একদিন বরফ পড়ল, আমি আর ফিরতে পারলাম না। কাল রাত্রে বাস বন্ধ হ'য়ে গেল; অতটুকু ছোট্ট একটা ঘটনা—কিন্তু ওরই জন্য আমরা ধ্বংস হ'য়ে যাব। হেঁটে ফেরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। তোমায় জানতে দিতে চাইতাম না। সব—সবই ঠিক হ'য়ে যেত। চলে' যেত আমাদের আগের মতই, তুমি কিছুই জানতে পারতে না। আমার ওপর লোভ ওর কমে আসছিল, ইদানীং আমায় ঘেন্নাই করতে লেগেছিল—কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো আমায় ছেড়ে দিত। শীগ্‌গিরই আমার ছেলে হবে—চেহারা বিশ্রী হ'য়ে যাচ্ছে। এ কথা ও দু'দিন বলেছে, কাল রাত্রেও বলেছে। কাল রাত্রে লাথিও মারলে। এখন—তুমি ওকে খুন করবে, খুনই তুমি করবে। আমরা সকলেই মারা যাব।"

ওনা এতখানি বলে' গেল—গলা কাঁপল না, শরীর কাঁপল না, চোখের পাতাও বন্ধ রইল। মরার মত প্রায় নিস্পন্দ দেহটা পড়ে

আছে। ইউরঘিসও কিছু বললে না। খাটের বাজু ধরে' উঠে দাঁড়াল। ওনার দিকে আর চাইল না, সোজা দোর খুলে বেরিয়ে এল। দোরের বাইরে এলজবিয়েটা ভয়ে এক কোণে লুকিয়েছিল, সে দিকেও ওর চোখ পড়ল না। সদর দরজা খোলা রইল। পথে নেমেই ইউরঘিস ছুটতে লাগল।

ও ছুটেছে, অন্ধ আবেগে, ক্ষুব্ধ মোহগ্রস্তের মত ও ছুটে চলেছে, কোনদিকে দৃক্‌পাত নেই, শুধু ছুটে চলেছে সামনের দিকে। অ্যাশল্যাণ্ড অ্যাভেনিউ-এ এসে পড়েছে। কিন্তু পা আর চলতে চায় না, দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চায়। একখানা বাস যাচ্ছিল, লাফিয়ে উঠে পড়ে ও তাতেই। চোখ লাল, পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত, চুল উস্কোখুস্কো; আহত আবদ্ধ পশুর মত ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। ওর এ অবস্থা বাসের কারও চোখে পড়ল না, পড়লেও হয়তো কেউ গ্রাহ্য করত না; ঐ বেশ, গায়ে অমন গন্ধ—এ সব লোকের হাবভাবও অমনি। লক্ষ্য করবার এতে কী আছে? সম্ভ্রম ও শুচিতা বাঁচিয়ে অন্যান্য যাত্রী ওকে জায়গা ছেড়ে দেয়, অনেকখানি জায়গা পায় ও। বেশ খানিকটা দূর হ'তে হাত বাড়িয়ে কণ্ডাক্টর ওর ভাড়া নেয়। কে ওকে ঘৃণা করল, কে ওর স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে সরে' গেল, কণ্ডাক্টরটাও ঘেন্না করল না-করল, এ সব দেখবার সময় বা মনের অবস্থা ওর ছিল না—অন্তরে জ্বলছে অশান্ত একটা অগ্নিকুণ্ড, তার শিখাগুলো যেন আবরণ ভেদ করে' বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। ওর দেহের ভঙ্গীটাও সেই রকম হ'য়ে আছে—আক্রমণোদ্যত; হাত পা মন সবই যেন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। বাসের গতির সঙ্গে মনের গতিও বেড়ে চলে, কিন্তু দেহটা একটু শান্ত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'য়ে আসে।

বাসটা কারখানার কাছাকাছি আসতেই ও নেমে পড়ে। এবার না ছুটলেও জোরে পা চালায়। লোকে পথ ছেড়ে ওর দিকে তাকিয়ে

থাকে; কোন দিকে, কারও দিকে না চেয়ে ও এগিয়ে চলে। ফটক, ফালি বারান্দাটা থাকে পিছনে পড়ে, ওনা কোথায় কাজ করত ও জানে, ও চেনে ওনার অফিসার কোম্নরকে। ওর জানা আছে কোথায় সে বসে। একটা লাফ দিয়ে ও তার ঘরে ঢুকে পড়ে। গাড়ীতে বোঝাই দেবার ডিপার্ট এটা, লোকটা এ কাজেরও খবরদ'রী করে।

বোঝায়ের কাজ চলেছে জোর, লোকগুলো কলের মত ব্যস্ততা নিয়ে বাক্স আর পিপি তুলছে গাড়ীতে। ইউরঘিস একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়; না, লোকটা এখানে নেই। বারান্দা হ'তে একটা কণ্ঠস্বর কানে এল, তড়িৎবেগে ও ছুটে চলল সেদিকে। পরমুহূর্তে ও দাঁড়িয়েছে অফিসারটির মুখোমুখি।

লোকটা জাতে আইরিশ; বিরাট বপু, লাল টকটকে মুখ; চেহারাটায় আছে আগাগোড়া একটা কর্কশতার ছাপ। তার শ্বাসপ্রশ্বাসে, তার প্রতিটি লোমকূপ হ'তে বেরিয়ে আসে মদের দুর্গন্ধ। ইউরঘিসকে দেখেই ও থমকে দাঁড়িয়ে যায়; মুখে আর রক্তের লেশ থাকে না; বোধ হয় পালাতে চায়, ঘোরেও সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু আর সময় ছিল না—ততক্ষণে ইউরঘিস ওর ওপর লাফিয়ে পড়েছে। চোখমুখ বাঁচাবার জন্যই হয়তো লোকটা দুই হাতে মুখ ঢাকে; কিন্তু হাতুড়ির মত এসে পড়ে মজদুরের মুষ্টি, একটা, দুটো, অসংখ্য—লালে কালোয় মুখখানা হয় বিচিত্র। বিরাট বপুটা আছড়ে পড়ে মেঝের ওপর। বিদ্যুৎবেগে ইউরঘিস ওর বুকের ওপর বসে' সমস্ত শক্তি দিয়ে দু' হাতে গলাটা ওর টিপে ধরে।

ইউরঘিস অনুভব করে, লোকটার দেহ মন আত্মা স্পর্শ—সব কিছুই একটা একটানা বিরাট মহাপাতক। কিন্তু ঘৃণা ওর হয় না এ দেহটাকে স্পর্শ করতে। আঙ্গুলগুলো ক্রমশঃ জোরে, আরও জোরে চেপে বসছে লোকটার গলায়। ইউরঘিসের সমস্ত দেহটা থরথর করে' কাঁপছে—অন্তরে

তখন ওর জেগে উঠেছে দানবের বিক্ষোভ। এরই কামনার ইন্ধন হ'তে হয়েছে ওনাকে—এই বিরাট জানোয়ারটার। কিন্তু সে জানোয়ার এখন ওর শিকার, ওর মুঠোর মধ্যে। ওর চোখের সামনের দুনিয়া যেন রক্তের একটা প্রবাহ, সকল কিছুই ভেসে চলেছে তার ওপর দিয়ে। পৈশাচিক উল্লাসে ও হুঙ্কার ছাড়ে। নিঃশব্দে গলা টিপে বসে' থাকবার অবস্থা ওর নয়। লাফিয়ে উঠে, ঠ্যাং ধরে' লোকটাকে তুলে নেয় কাপড়ের মত—মারে একটা আছাড়, মেঝের ওপর মাথাটা ঠুকে যায়।

আশপাশ নিয়ে জায়গাটায় ততক্ষণে সোরগোল পড়ে' গেছে—মেয়েরা প্রাণপণে চিৎকার করছে যেন তাদেরই কেউ মেরে ফেলছে, কেউ কেউ মূর্ছা গিয়ে চেঁচানি হ'তে উদ্ধার পেয়েছে। পুরুষগুলো ছুটে আসছে হন্তদন্ত হ'য়ে। ইউরঘিস কিন্তু নিজের কাজেই মত্ত, কে এল, কে গেল, কে কী করল ও জানতেও পারলে না। জন ছয় আট লোক ওকে ছাড়াবার জন্য টানাটানি শুরু করেছে। ও বুঝল শিকার হাতছাড়া হ'য়ে যাচ্ছে। এক ঝট্‌কায় লোকগুলোর হাত হ'তে নিজেকে মুক্ত করে' নিয়ে ও দাঁত বসিয়ে দেয় অফিসারটার গালে। তবু লোকগুলো ওকে হেঁচড়ে সরিয়ে নেয়। তখন ওর মুখ হ'তে রক্ত ঝরছে, মুখের সামনেটায় চামড়ার আর মাংসের সুতো ঝুলছে।

জন আষ্টেক মিলে চেষ্টা করতে লাগল ওকে মেঝেয় শুইয়ে রাখবার; কিন্তু সাধ্য কী? টেনে ঠেলে লাথি মেরে লোকগুলোকে বারবার ও সরিয়ে দেয়; মূর্ছিত শিকার সামনেই পড়ে, শিকার ও হাতছাড়া হ'তে দেবে না। কেউ ধরেছে ওর হাত, কেউ পা, কিন্তু ও বাঘের বিক্রমে লড়ে চলেছে। ইতিমধ্যে আরও বহু লোক চলে' এসেছে, সকলেই পড়েছে ইউরঘিসের ওপর। একগাদা শরীর যেন এক জায়গায় ড্যালা পাকিয়ে গেছে—ড্যালাটার প্রাণশক্তি যেন সকলের নীচে, সেই বিরাট ড্যালাটাকে বার বার ওলট-পালট করে' দেয়। ভেতরের উত্তেজনা যতই বেশী হ'ক,

এত লোকের ওজন উপেক্ষা করবার শক্তি তার নেই। ইউরঘিস অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। চ্যাংদোলা করে' ওকে তুলে নিয়ে যায় ওরা কারখানার পুলিস ফাঁড়িতে। সেখানেও ও অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিসের গাড়ী এসে ওকে তুলে নিয়ে যায় যথাস্থানে।

ষোড়শ অধ্যায়

গাড়ীতেই ওর জ্ঞান ফিরে এল; ও তখন শান্ত। শ্রান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। তখনও পুলিসের গাড়ীতেই, গাড়ী ছুটছে। জন ছয় কনষ্টেবল ওর হ'তে সম্ভবমত দূরে বসে' ওর ওপর নজর রাখছে। ইউরঘিস কাজ করে সার-কারখানায়। গায়ে সারের দুর্গন্ধ। কনষ্টেবল হ'লেও ওরা দুর্গন্ধ এড়িয়ে চলে। এদের দেখে ও আর ওঠবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না।

থানা। সার্জেণ্ট ওর নাম-ঠিকানা লিখে নেয়; চেয়ে চেয়ে ও দেখে, ওর নামে মারপিট ও গুণ্ডামির অভিযোগ লেখা হয়। ও প্রতিবাদ করে না। সেলে পোরবার আদেশ হয়; অফিস হ'তে সেলের পথ ওর পরিচিত নয়, এক গলি ধরতে অন্য গলিপথ ধরে। সঙ্গের গুণ্ডা-গুণ্ডা কনষ্টেবলটা গাল দিয়ে ওঠে। ইউরঘিসের গতি মন্থর। কনেষ্টবলটা লাথি মারে। ইউরঘিসের তরফ হ'তে কোন প্রতিবাদ আসে না, চোখ পর্যন্ত ও তোলে না। আড়াই বছর ও এই প্যাকিং-শহরে আছে, এখানকার পুলিস কী চীজ ও জানে। ওদের এই গহনতম নিজস্ব গুহায় ওদের চটানো মানে প্রাণটা ফুঁকে দেওয়া। একটু কসুর হ'লেই দশ বিশটা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে' মুণ্ডুটাকে মণ্ড বানিয়ে দিলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। রিপোর্টটা অবশ্য যাবে যে মাতাল

হ'য়ে পড়ে' গিয়ে ও মাথা ফাটিয়েছে—ঘটনা আর রিপোর্টের তফাৎ কেউ জানবে না, জানবার জন্ম মাথাই বা কে ঘামাচ্ছে !

সেলের কাঁটা-তার-কণ্টকিত লোহার গেটটায় তালা পড়ে। ভেতরে একটা বেঞ্চি। চারদিক দেখে নিয়ে ও বেঞ্চিটায় বসে' হাতের মধ্যে মুখ লুকোয়। ও একা। বিকেলটা, সন্ধ্যেটা, সারা রাতটা ও একা কাটায়, একাকীত্বটুকু সম্পদ বলে' মনে হয়।

বিরাটকায় বন্য জানোয়ার প্রচুর আহারের পর বেশ কিছুক্ষণ থাকে অর্ধনিদ্রিত অর্ধজাগরিত একটা তৃপ্তির মধ্যে, ইউরঘিসেরও অবস্থা তাই। মনটা তৃপ্তিতে পূর্ণ। লক্কড়টাকে লাগান হ'য়েছে বেশ—ওরা ধরে' না ফেললে অবশ্য—! মনটা আফসোস করে, তা হ'লে যা হ'ত। তবু মন্দ হয়নি একেবারে। লোচ্চাটার গলাটেপার অনুভূতি এখনও ওর আঙুলে শিরশির করে। সন্ধ্যা উতরে যায়, রাত গড়ায় গভীরের দিকে। মনটা ঝিম ধরে; চিন্তাটা পরিষ্কার হয়; দেহ-মনে আবার স্বাভাবিক শক্তি ফিরে আসে, কিন্তু তার সঙ্গে আসে উত্তেজনান্তের অবসাদ। সাময়িক আনন্দের পরবর্তী অবস্থাটা স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয় মনের চোখে —অফিসারটাকে ও আধমরা করে' ছেড়েছে সত্য, কিন্তু তাতে ওনার লাভ কী? যে বিভীষিকার মধ্যে ওনা এতদিন কাটিয়েছে সেটা থেকেই গেল, লজ্জার কলঙ্কের এই স্মৃতি আজীবন ওকে ধাওয়া করে' বেড়াবে। অফিসারটাকে ও আধমরা করে' ছেড়েছে, কিন্তু তাতে হ'তে ওনার খাওয়াপরার সুরাহা হবে না, কী খেতে দেবে ওনা ওর ছেলেকে। কাজটা ওনার যাবেই। তারপর? ও নিজে? ওর ভাগ্যে কী আছে খোদ ভগবান্ ছাড়া কেউ জানে না!

অশান্ত মন অস্থির করে' তোলে দেহটাকে, আদ্দেক রাত ও পায়চারি করে সেলটুকুর মধ্যে। তাতেও কি অব্যাহতি আছে? ভবিষ্যতের চিন্তা বিকট হ'য়ে বারবার ওর সামনে দাঁড়ায়। ও-চিন্তার হাত হ'তে

কোথায় পালাবে ও? ঘুমোবার চেষ্টা করে। কোথা ঘুম! মনে হয়, মস্তিষ্কটা বিরাট, তার চিন্তাশক্তির সীমা নেই। ওর পাশের সেলটায় আছে একটা মাতাল; তার জীবনে দুটি আনন্দ, এক নম্বর মদ আর দ্বিতীয় বৌকে ঠেঙান্—সেলে দুটোট বন্ধ! এ পাশের সেলটায় আছে একটা পাগলা—সারাটা রাত চেঁচিয়েই চলেছে। রাত দুপুর পার হ'য়ে যায়। নগররক্ষীরা রাস্তা ঝেঁটিয়ে ধরে' আনে একপাল গৃহহীন ভবঘুরে। বাইরে হু-হু করে' বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া—এদের কারও গায়ে একফালি ত্যানা, কারও আবার তাও নেই। হি হি করে' কাঁপছে সকলেই। পুলিস তাড়াতে তাড়াতে ওদের নিয়ে আসে ইউরঘিসের সামনের বারান্দাটায়। সেখানেও হাওয়া চলছে—এদের খালি পেট, খোলা গা—ঠাণ্ডার আসর জমজমাট। কিন্তু আশ্চর্য এই মানুসের সহশক্তি! ওরই মধ্যে কেউ কেউ শুয়ে পড়ল খোলা মেঝেয়, নাক ডাকতে দেরি হ'ল না। বাকীগুলো হাসিতে গল্পে, খিস্তি করে' ঝগড়া করে' জীবনানন্দ উপভোগ করতে লাগল। সেলের ভেতরের হাওয়া পর্যন্ত ওদের দুর্গন্ধ শ্বাসে ভারী হ'য়ে ওঠে। ওদেরও কিন্তু আভিজাত্যবোধ আছে; ইউরঘিসের গায়ের সারের গন্ধ ওদের কারও কারও নাকে লাগে; ওদের নিজেদের গায়ে ময়লার ও মদের গন্ধ থাকতে পারে, সারের গন্ধ তো নেই। সুতরাং সবিশেষণ শব্দযোজনায় ওরা ওর নরক গমনের ফরমায়েশ দিয়ে দেয়। নরক কেন ইউরঘিস কোথাও চলে না, এক কোণে পড়ে' পড়ে' কপালের পাশ দুটোয় শিরার দপদপানি গোণে।

জেল কর্তৃপক্ষ রাত্রের খাবার পাঠিয়ে দেয়—ওখানকার পরিভাষায় এর নাম—"ধোখা ও ধাপ্পা"—বস্তুটা টিনের রেকাবিতে দেওয়া খানকয় শুকনো রুটির টুকরো আর খানিকটা কফি—এর নাম "সেঁকো", কারণ বন্দীদের শান্ত রাখবার জন্য এতে একটা ওষুধ মেশানো থাকে। ওষুধের ব্যাপারটা জানা থাকলে ইউরঘিস একঢোকেই কফিটা গলাধ করে' ফেলত—

কারণ অবস্থা অসহনীয়, লজ্জায় ক্ষোভে প্রতিটি শিরা-উপশিরা দপদপ করছে। ভোরের দিকে স্থানটা নিঃশব্দ হ'ল; উঠে ও পায়চারি করতে লাগল। মনের মধ্যে মাথা তুলতে লাগল রক্তচক্ষু নিষ্ঠুর একটা দানব—কুটি কুটি করে' ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ওর হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো।

ডারহাম সাহেবের সারের কারখানায় যে কাজ করেছে, দুনিয়ায় এমন কোন নির্যাতন আছে যাতে সে মুষড়ে পড়তে পারে? কারখানার নির্যাতনের পর কোন নির্যাতনকেই সে আর পরোয়া করে না, করতে পারে না। অতীতের স্বেচ্ছাচার, স্মরণাতীত যা ঘটে' গেল, যে ঘটনার স্মৃতি মন থেকে কখনও মুছে ফেলা যাবে না সে সবের তুলনায় কারা-কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার, কারাগারের নির্যাতন অতি তুচ্ছ। চিন্তাটা ওকে পাগল করে' তোলে, আকাশে হাত তুলে ভগবানের কাছে ও প্রার্থনা জানায়—রক্ষা কর, উদ্ধার কর আমায় এ চিন্তা হ'তে—কিন্তু অতীতের ঘটনাকে ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা ভগবানেরও নেই—মুক্তি নেই, উদ্ধার নেই। এ যেন একটা প্রেতাত্মা ওকে অবিরত অনুসরণ করে' চলেছে, কখনও ওর ঘাড়ে চাপছে, কখনও মারছে। তার হাত হ'তে ওকে উদ্ধার করবার কেউ নেই। এমন হবে আগে যদি বুঝত! হাসি পায়—নির্বোধ কাপুরুষ না হ'লে আগে কেউ এ সব ভাবে না। মরীয়া হ'য়ে ও নিজের কপালে ঘুষি মারে—কেন ও ওনাকে ওখানে কাজ করতে যেতে দিলে—ওখানে যাওয়ার পরিণতি যে এই তা তো সবাই জানে—কেন, কেন ও যেতে দিলে ওনাকে! নয় সকলে উপোস করে' মরত ইঁদুরের মত শিকাগো শহরের নর্দমায়, কেন যেতে দিলে ওনাকে। উঃ! মরা—উপোস করে' মরা—তা হ'ত না। না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরা, স্বেচ্ছায় মানুষ পারে না—ও ভাবা যায় না, ভীষণ!

স্পষ্ট করে' ভাবা যায় না এ কথা; যতবারই ভাববার চেষ্টা করে

হাড়ের ভেতর অবধি শিউরে ওঠে। নাঃ, এ বোঝা বওয়া যায় না, এ বোঝার নীচে বেঁচে থাকা যায় না। ওনার আর কেউ রইল না। ইউরঘিস ওকে ক্ষমা করবে, নতজানু হ'য়ে ক্ষমা চাইবে, কিন্তু ওনা আর কোনদিন ওর মুখের দিকে চাইবে না, আগের সেই প্রেমময়ী স্ত্রী আর সে হবে না। এ কলঙ্ক সে বইতে পারবে না—মরবে। উদ্ধারের আর কোন পথ নেই—নেই। ওনার মরাই ভাল।

প্রেতাত্মাটা যদি ছাড়ে তো চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওনার উপবাসক্লিষ্ট মুখখানা—এত স্পষ্ট, এত করুণ, এত নিষ্ঠুর। ওকে কারারুদ্ধ করেছে, দীর্ঘকাল হয়তো পূরে রাখবে, হয়তো কয়েক বৎসর। ভাঙ্গা দেহ, ভাঙ্গা মন নিয়ে ওনা আর কাজে যেতে পারবে না। এলজবিয়েটা, মেয়ারিজা ওদেরও হয়তো কাজ যাবে। নরকের কীট ঐ কোনর ইচ্ছা করলেই ওদের কাজ খতম হ'য়ে যাবে। কাজ না গেলেও বিশেষ লাভ নেই। দু'জনের মজুরীতে কীই বা হবে! ছেলেমেয়েগুলো ইস্কুল ছেড়ে আবার কারখানায় ঢুকলেও সংসার চলবে না—ছেলেমেয়েদের মজুরী দু'জন বড় মানুষের মজুরীর সমান তো হবে না। দু' হপ্তা বাকী পড়ার পর মাত্র গত সপ্তাহে ওরা বাড়ীভাড়া দিয়েছে। এ হপ্তায়ও বাকী পড়বে—ভাড়া দিতে ওরা পারবে না, বাড়ী হাতছাড়া হ'য়ে যাবে—এত খাটুনি, এত চিন্তা, নিজেদের এতভাবে বঞ্চিত করে রাখবার পর বাড়ী হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। কোম্পানীর এজেন্ট গত হপ্তা নিয়ে তিনবার ওদের সাবধান করে' দিয়েছে, ভাড়া দিতে দেরি হ'লে আর সহ্য করা হবে না। অনুচ্চার্য কত কথা ভাববার আছে অথচ ও ভেবে চলেছে বাড়ীটার কথা—এটা হয়তো ওর নীচতা। কিন্তু কী কষ্টটাই না ও করেছে, ও কেন, ওরা করেছে ওই বাড়ীটার জন্য! মাথা গোঁজবার ঐ আশ্রয়টুকুই ওদের জীবিতকালের একমাত্র আশা। ওর পিছনে ওরা ঢেলে দিয়েছে

জীবনের সমস্ত সম্বল। ওরা মজতুর, গরীব, টাকাই ওদের শক্তি, ওদের সত্তা, দেহ, আত্মা—এই টাকাটুকু ওদের বাঁচিয়ে রাখে, এর অভাব হ'লে পোকার মত পটপট করে' ওরা মরে।

সব যাবে; বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে পথে; তারপর খুঁজে নিতে হবে কোথাও একখানা বরফের মত ঠাণ্ডা স্যাংসেঁতে ঘুপ্‌চি ঘর—তারপর জীবনের সঙ্গে যুঝে চলতে পারে বাঁচবে, নয় মরবে। সে রাত্রি, তারপর আরও কত রাত্রি ইউরঘিস ঐ একই কথা ভাবে—না ভেবে যে ও পারে না; ভবিষ্যতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে—ও নিজেই যেন ঐ অবস্থার মধ্যে বাস করছে। প্রথম যাবে আসবাবপত্র, তারপর মুদীর দোকানে ধার পড়বে, শেষে আর কেউ ধারে জিনিস দেবে না। স্তেদ্‌বিলাসের মিষ্টির দোকানখানা আর চলে না তেমন, তবু হয়তো সে ওদের কিছু ধার দেবে। পাড়া-পড়শীও হয়তো একটু-আধটু সাহায্য করবে। নিজে তুঃস্থ অসুস্থ হ'লেও জাড্‌বিয়া লোকের অসময়ে দু'চার পয়সা দেয়, ওদেরও দেবে; ট্যামোস্ত্‌সিয়স কুস্‌ৎস্লেইকা এক রাত্রির বেহালা বাজানোর মজুরীটা ওদের দেবে। ও কারাগার হ'তে না বেরুনো পর্যন্ত এমনিভাবেই হয়তো ওদের চলবে। আচ্ছা, ও যে কারাগারে, এ কথা ওরা জানতে পারবে তো? ওর কোন খোঁজখবর, কোন সন্ধান কি বাড়ীর লোক পাবে? ওরা কি ওর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পাবে? না, ওদের তুর্ভাগ্য ওকে জানতে না দেওয়াও সাজার একটা অ[illegible] কে জানে!

মনের পটে ভেসে ওঠে অমঙ্গলের যত চিত্র। ওনা নির্যাতিতা রুগ্ন, মেয়ারিজা বেকার, তুষারপাতের জন্য ষ্ট্যানিসলোভাসটা কাজে যেতে পারছে না—বাড়ীর সব লোককে পথে বের করে' দেওয়া হ'য়েছে। ভগবান্! ভগবান্! মালিকরা সত্যিই কি এই নিঃস্ব অসহায়

মানুষগুলিকে পথে বের করে' দেবে, সত্যিই কি ওদের মেরে ফেলবে ওরা না খেতে দিয়ে? কেউ কি সাহায্য করবে না? তুষারপাতের মধ্যে পথে ঘুরে ঘুরে ওরা কি জমে' মরে' যাবে? ইউরঘিস নিজে কখনও কাউকে পথে মরে' পড়ে' থাকতে দেখেনি, তবে বাড়ী হ'তে লোককে উচ্ছেদ করতে দেখেছে, তারপর গৃহহারা হ'য়ে তারা কোথায় যে উধাও হ'য়ে গেছে কেউ খোঁজ রাখে নি, অন্ততঃ ইউরঘিস তাদের আর কোন সন্ধান পায়নি। কারখানা অঞ্চলে একটা রিলিফ্ সোসাইটি আর একটা নাকি দান-সমিতি আছে—ইউরঘিস এদের অস্তিত্বের পরিচয় কোনদিন পায়নি। সোসাইটি বা সমিতি কখনো তাদের কাজের বা পরিকল্পনার বিজ্ঞপ্তি দেয়নি; বিজ্ঞপ্তি না পেয়েও যত লোক সাহায্য আর দানের জন্য আসত, তাদেরই ভিড় হয়তো প্রতিষ্ঠান দুটো ঠেলতে পারত না।

ভোর অবধি ওর ঐভাবে কাটে। তারপর আবার চলে পুলিসের গাড়ীতে চড়ে', সঙ্গে চলে মাতাল স্ত্রীঠ্যাঙারেটা, পাগলটা, কতকগুলো ছুটকো মাতাল, কতকগুলো মারপিটের আসামী, দু'জন চোর—মাংসের কারখানা হ'তে সে মাংস চুরি করেছিল, আর একটা সিঁধেল চোর। গাড়ী হ'তে নেমে ওরা ঢোকে একটা হলঘরে, চারিদিকে উঁচু সাদা দেওয়াল, ভেতরের আবহাওয়াটা পচাটে, ভিড়ে ভর্তি। সামনের একটু উঁচু বেদীটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিঙের ওপাশে বসে' আছেন গ্যাঁট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোক, নাকের ওপর লাল লাল গুটি। মোটের ওপর জাঁকজমক আর চেহারায় ভদ্রলোক একটি দ্রষ্টব্য বিশেষ।

এতক্ষণে ইউরঘিস আঁচ করে বিচার হবে। মনে প্রশ্ন জাগে, কিসের বিচার হবে!—অফিসারটা যদি মরে' গিয়ে থাকে, তা হ'লেই বা বিচারের পরিণতি কী হবে? হয়তো ফাঁসি দেবে, ঠেঙিয়েও মেরে ফেলতে পারে—আইন দিয়ে কী করা যায় না-যায় ও কিছুই জানে

না। তবু আড়াইটে বছর কেটে গেল এই প্যাকিংশহরে; এই আদালত সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে এসেছে। লোকমুখে শোনা কথার অভিজ্ঞতা হ'তে ও বুঝে নেয়, বিচারকের আসনে বসে আছে কুখ্যাত কল্লাহান। একে ঘেন্না করে না এমন মানুষ প্যাকিংশহরের মজদুর মহলে নেই।

প্যাকিংশহরে লোকটা প্রথমে পরিচিত ছিল "কল্লাহান ছোঁড়া", তারপর "ভেকভেকে কল্লাহান", কারণ কুকুরের মত ঝগড়া করাই ছিল পেশা। ছেলেবেলায় ও একটা কসাইএর দোকানে চাকরি করত, তারপর কাজ হয় মারপিট করে' বেড়ান। প্রায় কথা কইতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে ও শুরু করে রাজনীতি; সাবালক হবার আগেই পরপর দুটো বেশ পদস্থ চাকরি বাগায়। কারখানার মালিকরা অদৃশ্য হাতের মত থেকে স্কুলি আর কল্লাহানকে দিয়ে প্যাকিংশহরের মজদুর কর্মচারীদের শায়েস্তা রাখত। মালিকদের অদৃশ্য হাত বললে, স্কুলিকে বলতে হয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর কল্লাহানকে তর্জনী। মালিকদের কাছে এদের মত বিশ্বস্ত রাজনীতিজ্ঞ আর হয় না। তথাকথিত এই রাজনীতির মধ্যে ওরা দুটিতে ঘুরঘুর করছে বহুদিন ধরে। শিকাগো শহরে একবার শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়, কল্লাহান সেই সুযোগে নগর সমিতিতে হ'য়ে গেল ব্যবসায়-প্রতিনিধি। ভাগ্য খুলল তখন হ'তে। চাকরি যত বড়ই হ'ক, চাকরি তো! চাকরি ছেড়ে ও মনেপ্রাণে লেগে গেল দলগত রাজ-নীতির ক্ষমতা অধিকারের লড়াইএ। দিনের অধিবাংশ সময় যেত এই পেশাতে, বাকী সময়টা কাটত ওর সাঁতার-খানা (ভাড়াদেওয়া) আর ওর পরিচালিত বেশ্যালয়গুলোর তদারকে। ইদানীং নিজের ছেলেপুলে বড় হ'য়ে ওঠায় সম্মান মর্যাদা প্রভৃতি সম্বন্ধে ওর জ্ঞানটা হ'য়ে উঠেছে বেশ টনটনে; তাই নিজেকে বিচারক করে' নিয়েছে—হওয়াটা ওর পক্ষে কঠিন নয়। মালিকরা জানে ওর গোঁড়ামি, ওর রক্ষণশীলতা,

"পরদেশী"-বিদ্বেষ পর্বতের মত অনড়, কাজেই ওর মত যোগ্য লোক আর কই !

ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দুই ধরে' ইউরঘিস ঘরখানার ওপর-নীচ এপাশ-ওপাশ সব কিছু দেখে। লোকগুলোর দিকেও তাকায়। আশা করেছিল, বাড়ীর কেউ আসবে; কেউ আসেনি; একটু হতাশ হ'য়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কোম্পানীর তরফ হ'তে ওর বিপক্ষে একজন উকিল দাঁড়াল। সংক্ষেপে উকিল জানায়, কোন্নর এখনও চিকিৎসাধীন, এক সপ্তাহের সময় চায়।

"তিনশো ডলার",—নির্বিচারে বিচারক হেঁকে দেয়। ইউঘিসের মগজে তিনশো ডলারের তত্ত্ব ঢোকে না, বোকার মত ও তাকায় একবার বিচারক একবার উকিলের দিকে। বিচারক জিজ্ঞাসা করে, জামিন দাঁড়াবার কেউ আছে? তবু ও হাঁ করে' চেয়ে থাকে। একজন কেরানী ওর পাশে বসে ছিল, সে ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। ইউরঘিস মাথা নাড়ে, উঁহু। জামিনদার থাকা না-থাকার পার্থক্যটা ও ঠিকমত বুঝল না; তা না বুঝুক, ওকে একটা কনস্টেবল ওর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে চলল আদালতের হাজতে। সেখানে বসে' থাকে অন্য বন্দীদের সঙ্গে। আদালতের ছুটি হয়। ওরা আবার ওঠে জেলের গাড়ীতে। একগাদা বন্দী নিয়ে গাড়ী ছোটে শহরের উত্তরদিকের উপকণ্ঠ অভিমুখে। এখানে একটা জেল আছে। এই জেল আর শহরের কারখানার মধ্যের দূরত্ব মাইল দশেক।

কয়েদখানার প্রথম কর্তব্য কয়েদীর দেহতল্লাসী। কয়েদীর পয়সা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্য জিনিসগুলো নিয়ে নেওয়া হয়। ইউরঘিসের পকেটে ছিল পনেরো সেণ্ট্ (পয়সা)। রইল ওরই কাছে। ওখান হ'তে ওকে নিয়ে গেল একটা ঘরে। এখানে হুকুম হ'ল, জামাকাপড় সব খুলে একেবারে দিগম্বর হও। হ'ল। উদ্দেশ্য,

স্নান করাতে হবে। ওই অবস্থায় চলল সরু ফালি একটা বারান্দা ধরে'। বারান্দার একপাশ ধরে' চলে' গেছে অসংখ্য সেল। সেলের মধ্যে হ'তে পুরাতন বন্দীরা জুলজুল করে' চেয়ে দেখে নবাগতদের বা তাদের উলঙ্গ অবস্থাটা; এই দেখাটা ওদের একটা স্ফূর্তি; চলমান দিগম্বরের দিকে সরস মন্তব্য প্রায় প্রত্যেক সেল হ'তেই আসে; তারপর শুরু হয় আলোচনা। ইউরঘিসকে স্নান করান হয়। অর্থাৎ, কয়েক পর্দা পুরু হ'য়ে বসা সার ওর চামড়া হ'তে তোলবার দুশ্চেষ্টা বা দুরাশা। বেড়াল বেঁধে শ্রাদ্ধ! ফল না হ'ক, নিয়মরক্ষা হ'ল। কিন্তু নিয়মরক্ষা হ'ল না সেলে পোরার ব্যাপারে। প্রতি সেলে রাখা হয় দু'জন করে' বন্দী। সর্বশেষে ইউরঘিস একমাত্র কয়েদী, একখানা সেলই ও পেয়ে গেল; রইল একা।

একটা আঙিনা ঘিরে সেলগুলি অর্ধবৃত্তাকারে সাজান; একতলা দোতলা করে' থাকে থাকে সাজান। প্রতিটি সমমাপের—সাত ফুট লম্বা, চওড়া পাঁচ ফুট। জানালার বালাই নেই। একেবারে ছাদের কাছে একটা ঘুলঘুলি আছে, তার মধ্যে দিয়ে আসে একছিটে আলো। মেঝের ওপর পড়ে' আছে একটা গন্ধস মোটা বেঞ্চি। একদিকের দেওয়ালে বেঞ্চিটার চেয়ে একটু বেশী চওড়া দুখানা তক্তা লাগানো আছে, একটার ওপর আর একটা! এ দুটো কয়েদীদের পালঙ্ক। তক্তার ওপর বিছানাও আছে—একখানা করে' খড়ের গদী আর একখানা করে' রঙচটা কম্বল। দুটি বস্তুতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে' সপরিবারে বাস করছে রাজ্যের ছারপোকা, এঁটুলি, উকুন ইত্যাদি ইত্যাদি। বিছানায় এদের উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষা করেছে হরেক রকম উৎকট দুর্গন্ধ। ইউরঘিস একটা গদীর একটু তুলে দেখলে, তক্তাটা আরশুলাবাহিনীর উপনিবেশ! আরশুলাগুলো ভয় পেয়ে একটু নড়ে চড়ে বসে; ইউরঘিস কিন্তু রীতিমত ভড়কে যায়।

খাবার এল। শুকনো রুটি আর মদমেশানো কফি, আর সঙ্গে তরিতরকারীর একটু ঝোল। অন্ত কয়েদীদের অনেকে রেস্তোরাঁ হ'তে খাবার আনিয়ে নেয়, কেউ বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ে, কেউ কেউ তাস খেলে—গাঁটের পয়সা খরচ করতে পারলে সবই হয়। ইউরঘিসের পয়সা নেই; ও একা। ওর সেল অন্ধকার, নিঃশব্দ। বুনো জানোয়ার বন্দী হ'লে দাঁত দিয়ে কাটতে চায় লোহার গরাদে, দাঁত ভাঙ্গে, কস কেটে রক্ত পড়ে, তবু সে মুক্তির চেষ্টা করে। ইউরঘিসের অবস্থা কতকটা ঐ রকম। মুক্তির চেষ্টা অবশ্য ও করে না। অস্থিরভাবে পায়চারি করে সাত ফুটের মধ্যেই। অসহ্য বোধ হ'লে নির্মম ঠাণ্ডা দেওয়ালগুলোয় ঘুষি মারে, হাত কেটে রক্ত পড়ে; বন্দীশালা নির্মাতাদের মতই নির্মম যত বন্দীশালার দেওয়াল। সান্ত্বনা পায় না ইউরঘিস। পায়চারি করে অবিরত। আগের রাত্রির মত যত দুশ্চিন্তা গুঁতোগুঁতি করে ওর তপ্ত মস্তিষ্কটুকুর মধ্যে—চিন্তার চাবুক পড়ে নগ্নপিঠে।

দূরের গির্জায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি বাজে। বারোটা বাজল। আর ঘোরা যায় না। ইউরঘিস শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর, [illegible] রাখল হাতের ওপর। কিন্তু এ কী? পরপর বারোটা শব্দ হ'য়েও তো ঘড়ি থামল না; বেজেই চলেছে যে! আগুন লাগল নাকি কোথাও? সর্বনাশ, জেলে যদি আগুন লাগে! শব্দ যেন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। এই ঘড়িটার আওয়াজে শহরের যত ঘড়ি সব যেন জেগে গেছে। ব্যাপার কী? না, ভীতত্রস্ত আওয়াজ তো এ নয়। একটা যেন সুর আছে—সব ক'টি যেন আনন্দে পাগল হ'য়ে গেছে। ইউরঘিস পড়ে' পড়ে' ভাবে—ব্যাপার কী! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে' যায়—আরে! শুরু হ'ল যে **বড়দিন**!

বড়দিন—ভুলেই গিয়েছিল ও! স্মৃতির বন্যা বাঁধ ভাঙ্গে—ঘূর্ণি

জাগে নূতন স্মৃতির, নূতন দুঃখভরা দিনগুলির। সেই সুদূর লিথুয়ানিয়ায় ওদের বড়দিনের পরব। কতকাল হ'য়ে গেল, কিন্তু মনে হয় এই যেন কালকের ঘটনা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ওদের ঘর—ইউরঘিস ছোট্ট ছেলেটি, ওর হারিয়ে-যাওয়া দাদা আর ওর বাবা ঘরের মধ্যে। সারা দিন, সারা রাত ধরে' তুষারপাত হ'চ্ছে—উঃ, সে কি তুষার পড়া! ঘরখানাই ঢাকা পড়ে' যায়। (খৃষ্ট পুরুতরা বলে সন্ত ক্লজ বড়দিনে ছেলেদের উপহার দেয়—সে ছেলেদের স্বপনবুড়ো।) লিথুয়ানিয়ার সেই সুদূর বনে সন্ত ক্লজ যেত না, উপহারও ইউরঘিসরা পেত না; শিশু-বিশুর আশিসপূত আবির্ভাব সেখানেও হ'ত। প্যাকিংশহরে আসার পরও ওরা বনের পরব সাধ্যমত পালন করেছে। দুঃখভরা জীবনে ঐ ছিল ওদের কথঞ্চিৎ আনন্দ। গত বছর বড়দিনের প্রথম দিনে ও বা ওনা ছুটি পায়নি; ওর সারাটা দিন কেটে গিয়েছিল কারখানার জবাইঘরে, আর ওনা মাংসের টুকরো-গুলোয় মোড়কের কাগজ জড়িয়েছিল। তবু মনে জেগেছিল, আজ বড়দিন। তাই অন্য দিন যেমন ফিরেই শুয়ে পড়ত, সেদিন তা করেনি; ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বড়দিনের বাজার দেখাতে গিয়েছিল। দোকানে দোকানে কত জিনিস সাজানো, কত আলো। কোন দোকান শোকেসে বসিয়ে রেখেছে জীবন্ত রাজহাঁস, কোনটায় চিনির কারুকলা—চিনির কত রকম জিনিসই যে করেছে! কোনটায় বিরাট একখানা কেক, তার ওপর দুটি পরী, কোথাও বা কেকের হরেক রকম জন্তু-জানোয়ার, কে বলবে ওগুলো জীবন্ত নয়; আবার কোনটায় খেলনা আর খেলনা—কত যে খেলনা! মানুষে কি অত খেলনার নাম জানে! সে আনন্দ-উৎসব হ'তে ওরা একেবারে বাদও পড়েনি। একটা বিরাট ঝুড়ি নিয়ে ওরা বড়দিনের বাজার করতে বেরিয়েছিল, বাড়ী ফিরেছিল ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে—কেনেনি কী! কপি, মাংস, মটরশুঁটি, ডাল রুটি,

চিনির পুতুল। পুতুলটা অবশ্য ছেলেদের দেওয়া হয়নি—অতগুলি ছেলের কাকে দেবে? তাই ওরা টাঙিয়ে রেখেছিল ওটা। ছেলেরা লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। ওনা সখ করে একজোড়া দস্তানা পর্যন্ত কিনেছিল, তবে বড়লোকদের দস্তানার মত সব আঙ্গুলের জন্য আলাদা আলাদা খোপওয়ালা দস্তানা নয়, এতে ছিল সব আঙ্গুলগুলোর জন্য একটামাত্র খোপ—কতকটা মোটা কাপড়ের থলের মত; তা হ'ক, দস্তানা তো! গরীবের ওই ঢের।

বছরের অর্ধেক সারের কারখানায়, আর অর্ধেক জবাইখানায় ভূতের মত খাটলেও ইউরঘিসের মন হ'তে বড়দিন মরে যায়নি। বুকটা ধ্বক করে' ওঠে, একটা ব্যথা ওঠে যেন, গলা রুদ্ধ হ'য়ে আসে—সে রাত্রে ওনা বাড়ী ফেরেনি; কিন্তু ও নিয়ে ওরা কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি। এলজবিয়েটা পুরোনো কাগজের দোকান হ'তে ছোপধরা একখানা পট কিনে এনেছিল—তিন পয়সা দাম—কত যত্ন করে' লুকিয়ে এক পাশে নিয়ে গিয়ে ইউরঘিসকে সেখানা দেখিয়েছিল, দেবদূত আর কপোতের ছবি আঁকা—জলজ্বল করছিল তাদের রঙ্। ওরা ঠিক করেছিল দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবে, ছেলেরা দেখবে। ঘটনাটা মনে পড়তে ইউরঘিসের চোখ হ'তে জল গড়িয়ে পড়ে। এবার কি বাড়ীতে বড়দিনের উৎসব হবে? ও জেলে, ওনা অসুস্থ; দারিদ্র্যে দুঃখে হতাশায় বাড়ীটা ছন্নছাড়া হ'য়ে গেছে! ইউরঘিস ভাবে বন্দী করে' রেখেছ রাখ, কিন্তু কানের কাছে পরবের ঘণ্টা বাজিয়ে যন্ত্রণা বাড়াচ্ছ কেন? জেলে একটু শান্তিতে থাকতে দাও। কেন এত নিষ্ঠুর তোমরা!

কিন্তু ওকে সুখ বা দুঃখ দেবার জন্য ঘণ্টা বাজেনি, বড়দিন ওর জন্য তো নয়ই—নগণ্য ইউরঘিসকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে কে? কোন মূল্যই নেই ওর, জঞ্জাল বা মরা কুকুর বেড়ালের মত ওকেও সমাজ দূরে ছুঁড়ে

ফেলে দিয়েছে। কিন্তু কী ভীষণ! না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরছে ওর ছেলে, কিন্তু তাতে কার কী? উৎসবের ঘণ্টা বাজবে! রোগে ধুঁকছে ওর বৌ, বাঁচবে না হয়তো, কিন্তু ওরই কানের কাছে বাজবে বড়দিনের ঘণ্টা! ওর ঘর সংসার ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু সারাটাক্ষণ উৎসবের ঘণ্টা বাজবে! ঘণ্টা বাজবে ওরই কানের পাশে। এ তো বিকট একটা উপহাস!—এইটেই যে ওর সবচেয়ে বড় শাস্তি। হ'ক জেল, ঘর তো বটে; গায়ে মাথায় বরফ পড়ে না এখানে, খেতেও দিচ্ছে ওরা, কিন্তু ও অপরাধী। আর বাইরে তিনটি নিরপরাধ দুর্বল স্ত্রীলোক, ছ'টি অবুঝ নির্দোষ শিশু অনাহারে শীতে শুকিয়ে জমে' মরবে, তাদের আজ একমুঠো চালের ব্যবস্থা করবারও কেউ নেই। উঃ! শাস্তিই যদি দেবার ইচ্ছে ছিল, ওদের জেলে রাখলে না কেন; বাইরে রাখলেই তো ইউরঘিস শীতে গোলামিতে অনাহারে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ করত। কিন্তু দোষী ও, ওকে রাখল সুখে! এ কেমন বিচার!

এই ওদের আইন, এই ওদের ন্যায়। বিক্ষুব্ধ ইউরঘিস সোজা হ'য়ে ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়ায়; দেহ থর থর করে' কাঁপে, বাহু বিস্তৃত করে—ঘৃণায়, বিদ্বেষে ওর অন্তরাত্মা জ্বলে' ওঠে। জাহান্নমে যাক ওরা আর ওদের আইন! আইন!—মিথ্যা, মিথ্যা, জঘন্য পৈশাচিক একটা মিথ্যা চলছে আইনের নামে! ন্যায়! এই কালা, ঘৃণ্যতম 'ন্যায়' চলতে পারে বিকৃত মস্তিষ্কের দুঃস্বপ্নের রাজ্যে, রাক্ষসের রাজ্যে; সভ্য কেন, কোন মানুষের জগতে এই জঘন্য ধাপ্পাবাজি, বিষাক্ত ভণ্ডামি চলা উচিত নয়। এর একটা কথাও আইনের কথা ন্যায়ের কথা নয়, এর সবটুকু পশুশক্তি স্বেচ্ছাচার—দলবদ্ধ অবাধ গুণ্ডামি। জুতোর তলায় ওকে ওরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, শুষে নিয়েছে ওর দেহের সমস্তটুকু শক্তি; ওরাই খুন করেছে ওর বুড়ো বাপকে, শত্রুর নৌকার মত ওর বৌটাকে ওরা ফাটিয়ে ভেঙ্গে ডুবিয়ে দিয়েছে, মানুষের অধিকার, মানুষের সাহস আজ আর ওর

সংসারে নেই; আঘাতে আঘাতে ওর সংসারটাকে ওরা শক্তি-সাহস আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-কামনাহীন এক পিণ্ড করে' দিয়েছে। ওকে যতখানি শোষবার চোষবার ওরা শুষেছে চুষেছে, ওকে দিয়ে আর কোন লাভ হবে না। আজ একে অকেজো, তাই বাধা দিয়েছে ওদের স্বেচ্ছাচারে, তাই ওরা আজ ওর এই হাল করেছে। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন ন্যায়-অন্যায়বোধহীন বুনো জানোয়ারের মত ওকে খাঁচার মধ্যে আটকে রেখেছে—যেন সমাজে ওর কোন অধিকার নেই, ও ভালবাসতে জানে না, ও মানুষ নয়, যেন ওর অনুভূতি পর্যন্ত নেই! জানোয়ারের মত? না, তারও অধম ব্যবহার ওর সঙ্গে ওরা করেছে। শিকারীতে তো দূরের কথা, কোন সাধারণ মানুষও বনের জন্তু ধরবার সময় তার বাচ্ছাগুলোকে শুকিয়ে মরবার জন্য বনেই ফেলে রেখে আসে না।

রাত্রি দুপুর। বাইরে ঘণ্টা বজছে। আর এদিকে নিঃশব্দ অন্ধকার সেলে ইউরঘিসের মনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হ'চ্ছে। ওর মন হ'য়ে উঠছে বিদ্রোহী, আইনবিরোধী; নাস্তিক। সমাজের এই পাপের উৎস কোথায় তা জানবার মত বিদ্যা বা বুদ্ধি তার নেই। মানুষ যে এই ব্যবস্থাকে "প্রথা" বলে' গৌরব বোধ করে তাও সে জানে না; জানে না, এই "প্রথা"-ই তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। শুধু বোঝে, তাকে ক্রমশঃ মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরা হচ্ছে। কিন্তু কী ভাবে ও বুঝবে যে প্যাকিং কারখানার মালিকরা টাকা দিয়ে আইন কিনে রেখেছে, তাদেরই পাশবিক প্রতিহিংসা রূপ পেয়েছে বিচারকের মুখের কথায়। ও বুঝেছে, সারা দুনিয়া ওর শত্রুতা করছে, ওর চরম ক্ষতি করছে—আইন সমাজ মানুষ তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে ওর শত্রুতা করে' চলেছে। জেগে জেগে ও স্বপ্ন দেখে, প্রতিশোধের স্বপ্ন; প্রতিহিংসায়, ঘৃণায়, ক্রোধে সব কিছুকে উড়িয়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে দেবার উৎকট কামনায় মনের গুহা কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণতর হ'য়ে চলে।

"হীনতম চিন্তা, বিষবৃক্ষ যেন,
স্ফূর্তি পায় কারার বাতাসে ;
মানুষের মাঝে যা-কিছু ভাল,
শুধু তাই ঝরে সেথা হতাশে ;
দুর্জয় দ্বার রুদ্ধ, ব্যর্থ-মর্মবেদনায়,
রক্ষীরা সেথা রূপ দেয় যত নিরাশায়।"

বিশ্বের বিচারের ধাক্কায় কোন কবি এইভাবে লিখেছেন :

"জানি না কানুন ন্যায় কিনা
জানি না আইন দুষ্ট কিনা ;
জানি শুধু মোরা কারাবাসী
কারার প্রাচীর সুদৃঢ় কিনা !
নরকে আবরি' কারার ভিতরে
ভালই করেছে এরা,
কারার ভিতরে যা-কিছু করিছে
মানুষ দেবের দৃষ্টি বাহিরে ঘেরা—
ভালই করেছে এরা।"

সপ্তদশ অধ্যায়

পরদিন সকাল সাতটায় ইউরঘিসকে বের হ'তে দেওয়া হয় জল এনে নিজের কারাকুঠুরী সাফ করবার জন্য ; কাজটা ও বেশ মনোযোগ সহকারে করে। অন্য বন্দীরা এটা করতে চায় না ; তাদের কুঠুরী এত নোংরা হ'য়ে থাকে যে শেষ পর্যন্ত প্রহরীদেরই জবরদস্তি করে' পরিষ্কার করাতে হয়। তারপর আরও "ধাপ্পা ও ধোপা" নামক খাদ্য দেওয়া হয় ; এর কিছুক্ষণ পর ব্যায়ামের জন্য লম্বা ঘেরা আচ্ছাদিত

একটা বারান্দায় তিন ঘণ্টার জন্য ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়; ওপরটায় কাঁচের আচ্ছাদন, ভেতরে আলো আসে; একপাশে পুরু মোটা তারের জাল দেওয়া একটা জায়গা; এক ফুট অন্তর ওমনি দু'প্রস্থ জাল; জালের ওদিকটায় বন্দীদের আত্মীয়স্বজনরা আসতে পারে; ইউরঘিসের সঙ্গে অন্যান্য বন্দীরাও বারান্দাটায় হাজির হয়। তাদের কারও কারও আত্মীয়স্বজন এসেছে। উৎসুক আগ্রহ নিয়ে ইউরঘিস তাকিয়ে থাকে—নাঃ, তার কেউ আসেনি।

কুঠুরীতে ফেরবার সময় হ'য়ে আসে। একসঙ্গে সকলে ফিরে যায়; ইউরঘিসের কুঠুরীতে আর একজন স্বাস্থ্যবান, হাস্যানন, সুদর্শন যুবককে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সোনালী গোঁফ ও নীল চোখ নাচিয়ে সে ইউরঘিসকে অভিনন্দন জানায়। ইউরঘিস চুপ মেরে থাকে। সে খানিকক্ষণ ইউরঘিসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে—"এই যে মিতে, নমস্কার!"

"নমস্কার!"—ইউরঘিস জানায়।

"বড়দিনের মদ এটা,—কী বল!"—অপরজন প্রশ্ন করে।

ইউরঘিস মাথা নেড়ে জানায়, "হ্যাঁ।"

নবাগত দেওয়ালে লাগানো খাট অর্থাৎ তক্তা পরীক্ষা করে, কম্বল তোষক পরীক্ষা করে, বলে, "হায় রে, বড় বিশ্রী যে!"

ইউরঘিসের দিকে একচোখ তাকিয়ে নেয়, বলে, "বিছানা দেখে মনে হ'চ্ছে, গত রাত্রে ঘুমোওনি। সহ্য হয়নি এ বিছানা?"

"ঘুমুতে চাইনি আমি গতরাত্রে।"—ইউরঘিস জবাব দেয়।

কবে এলে?"

"কাল।"

লোকটা আর একবার কুঠুরীটা দেখে নেয়; নাক কুঁচকে বলে, "একটা দুর্গন্ধ আসছে। কিসের?"

"আমার।"

"তোমার?"

"হ্যাঁ, আমার।"

"স্নান করায়নি তোমায়?"

"হুঁ, কিন্তু এ ধোয়া যায় না।"

"কী জিনিস?"

"সার।"

"সার! ওরে বাপ্‌স্! কর কী তুমি?"

"কারখানায় কাজ করি; অন্তত পরশু পর্যন্ত করেছি। সার আমার কাপড়েই আছে।"

"আর একটা বাড়ল দেখছি। ভাবি, আমি ওদের সকলের বিরুদ্ধে। কিসের জন্য এনেছে তোমায়?"

"অফিসারকে মেরেছিলাম।"

"তাই বল। কী করেছিল সে?"

"সে—সে আমাকে অপমানিত করেছিল।"

"বুঝেছি। তুমি হ'চ্ছ, যাকে বলে, একজন সংশ্রমিক!"

"তুমি কী?"—ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে।

"আমি?" হাসে লোকটা, বলে, "ওরা তো বলে ভাঙনদার।"

"সে আবার কী?"

"সিন্দুক-টিন্দুক আর কি!"—অপর জবাব দেয়।

"ও!" সবিস্ময়ে ইউরঘিস ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে থাকে, "মানে তুমি ঐ সব ভাঙ, তুমি—তুমি—"

"হ্যাঁ", অপর হেসে উত্তর দেয়, "ওরা তো তাই বলে।"

লোকটার বয়স বিশ-বাইশের বেশী বলে' মনে হয় না (পরে অবশ্য ইউরঘিস জেনেছিল ওর বয়স ত্রিশ); সুদর্শন, লেখাপড়াও জানে

বলে' মনে হয়, মানে যাদের "ভদ্রলোক" বলে, তাদেরই একজন বলে' মনে হয়।

এবার ইউরঘিস প্রশ্ন করে, "তাই জন্যে বুঝি তোমায় ধরে' এনেছে ?"

"না। 'অনিয়মিত আচরণের' জন্যে পাকড়েছে। সাক্ষীসাবুদ কিচ্ছু পাচ্ছে না বলে' ক্ষেপে উঠেছে কর্তারা।"

"নাম কী তোমার ?"

একটু থেমে লোকটা বলে' চলে, "আমার নাম ডুয়ানে—জ্যাক ডুয়ানে। ডজনখানেক আছে—তবে এটা হ'ল আমার দলীয় নাম।" লোকটা বেশ আরাম করে' দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হাঁটু তুলে বসে। মজলিসী তুনিয়াদার লোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই ইউরঘিসের সঙ্গে জমিয়ে নেয় ; ও সামান্য মজতুর বলে' তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য নেই। স্বচ্ছন্দে ইউরঘিসের পেট হ'তে কথা বের করে ; গড়গড় করে' বলে' যায় ইউরঘিস ওর জীবনী, বাদ দেয় খালি শেষেরটা। লোকটা নিজের জীবনের বহু কাহিনী বলে। লোকটা গল্প বলতে ওস্তাদ ; সবগুলো অবশ্য সুশ্রাব্য নয়। কারার এ দিকটায় এসে পড়ায় ওর প্রফুল্লতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে' মনে হয় না। হাসতে হাসতে বলে' যায়, আগেও তু'বার খেটে গেছে। মদ মেয়েমানুষ, পেশাগত হৈ-হল্লা, তারপর মাঝে মাঝে একটু করে' বিশ্রাম দরকার বৈকি !

কুঠরীর সাথী এসে যাওয়ায় ইউরঘিসের কারাজীবন স্বভাবতই একটু বদলে যায়। মুখ গোমরা করে' দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকবার আর উপায় নেই ; লোকটা কথা কইলে, তাকেও কথা কইতে হয়। লোকটার কথার টানে না পড়ে' উপায় নেই, ভারী গপ্পে লোক। তা ছাড়া ইউরঘিস জীবনে এই প্রথম একজন শিক্ষিতের সঙ্গে কথা কইছে। কত নৈশ অভিযান, কত বিপজ্জনক পলায়ন, কত ভোজ, কত

মাতলামোর হুল্লোড়, এক রাত্রে লাখো লাখো টাকা উড়িয়ে দেবার গল্প বলে' চলে ডুয়ানে—সবিস্ময়ে সে সব না শুনে উপায় নেই ইউরঘিসের। ইউরঘিসকে বলে "কেজো গাধা", রসিকতাময় একটা তাচ্ছিল্য, ভালবেসে বোকা ভাবা! সেও এ দুনিয়ায় অন্যায় অনুভব করেছিল, কিন্তু নীরবে সে অত্যাচার সহ্য না করে' প্রতিরোধে দাঁড়িয়েছিল, শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল সময়ই সে আঘাত হেনে চ'লেছে—অবিরাম যুদ্ধ চলেছে তার ও সমাজের মধ্যে। সদাহাস্যময় লুঠেরা সে—লজ্জা বা ভয়ের ধার ধারে না। সকল সময় বিজয়ী সে হ'তে পারে না, কিন্তু পরাজয় মানে তো সকল কিছুর অবসান নয়, তাই পরাজয়ে ও দমে না।

মোটের ওপর লোকটার মন হাল্কা, একটু বেশী রকমের হাল্কা বলে' মনে হয়। সেদিন বা তার পরদিনে একবার বসে' জীবনী বলে না ও, বিভিন্ন সময়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে আসে ওর কাহিনী; কথা কওয়া ছাড়া কাজ নেই ওদের, নিজেদের বিষয় ছাড়া কথা নেই। পূর্বাঞ্চল হ'তে এসেছে ডুয়ানে—কলেজে শিক্ষা পেয়েছিল, পড়ত বৈদ্যুৎ-যন্ত্রবিদ্যা। এই সময় ওর বাপ ব্যবসায়ে ঠোক্কর [illegible]য়ে আত্মহত্যা করে, বাড়ীতে থাকে মা আর ছোট ভাই ও বোন। হ্যাঁ, এর সঙ্গে ওর কী একটা আবিষ্কারও ছিল—জিনিসটা ইউরঘিস ঠিকমত বুঝতে পারে না, খালি বোঝে যে জিনিসটা টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত, বোঝে জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাতে হ'তে কোটি কোটি ডলার লাভ হ'য়েছে। একটা বড় ব্যবসায়ী কোম্পানী জোচ্চুরি করে' এটা তার কাছ হ'তে নিয়ে নেয়, তারপর ওকেই জড়িয়ে ফেলে মিথ্যা মামলায়; ওর আবিষ্কার হ'তে কোটি কোটি ডলার করে সেই কোম্পানী, আর ওদের মিথ্যা মামলায় ওর সামান্য পুঁজি খতম হ'য়ে যায়। তখন অন্যের টাকা নিয়ে ঘোড়দৌড়ে বাজী ধরে' ফের অবস্থার উন্নতি করে' নিতে চায় ডুয়ানে, কিন্তু ঘোড়ার লেজের

টানে এসে পড়ে এই পথে। এ সব বোঝে ইউরঘিস, কিন্তু সিন্দুকভাঙ্গা! সর্বনাশ! কীভাবে করে ডুয়ানে ঐ সব ভয়ানক কাজ! ভাবতেই পারে না যে ইউরঘিস! একটা হ'তেই আর একটা এসে পড়ে—কুঠুরীর সাথী জবাব দেয়—একজনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছিল আর কি। নিজের পরিবার সম্বন্ধে ভাবে না ও?—ইউরঘিস প্রশ্ন করে। কথনো কথনো, অপর জবাব দেয়, তবে সব সময় নয় বা বেশীরভাগ সময়ই নয়, ভাবতে দেয় না সে তার মনকে। ও সব কথা ভেবে লাভ কী? এ জগতে সংসার নিয়ে চলবার অধিকার ওদের নেই, ইউরঘিসও এটা কিছুদিনের মধ্যে বুঝতে পারবে, তথন সেও পরিবার বাঁচানোর লড়াই ছেড়ে নিজে চরে' খাবার ব্যবস্থা করবে।

কুঠুরীর সাথী ইউরঘিসকে শিশুর মত সরল বলে' ধরে' নেয়। দুঃসাহসিক বিভিন্ন কাজের কাহিনী একে বলতে বেশ লাগে ডুয়ানের, এত সরল, এত সহজে বিশ্বাস করে, এত বেশী বিস্মিত হয় কথায় কথায়, এদেশীয় জীবনের পথে একেবারেই নতুন। কাজেই একেবারে মনপ্রাণ খুলে কথা কয় ডুয়ানে, কোন নাম, কোন স্থান, কোন ঘটনা ঢাকবারও প্রয়োজন বোধ করে না সে, বলে' চলে তার জয়-পরাজয়, তার প্রেম, তার হতাশার বিষাদের কাহিনী। অন্যান্য কয়েদীর প্রায় অর্ধেককে চেনে ডুয়ানে, তাদের সঙ্গে ইউরঘিসের পরিচয় করিয়ে দেয়। ওরা হাসতে হাসতে ওকে "কুবেসে" বলে, ওদের স্বরে বা ভাবে ঘৃণা থাকে না, ইউরঘিসও রাগ করে না, হাসিমুখে নামটা সয়ে' যায়।

যে ড্রেনে ইউরঘিস বাস করে, তার ছিটেফোঁটা কথন কথনও গায়ে লেগেছে, এবার এদের নোংরামোতে অবগাহন স্নান করে' নেয়। নগরীর অপরাধের সঞ্চয়স্থল বলা যায় এ কারাগারটাকে—এখানে আছে খুনে, রাহাজান, বিবাহবিশারদ, সিঁধেল চোর, ঠগ, প্রবঞ্চক, জালিয়াৎ, দোকানের শোকেস ভাঙ্গায় বিশেষজ্ঞ "বিশ্বাসী" (অর্থাৎ এদের আস্থত

বস্ত্র রক্ষাকারী), ছিঁচকে চোর, পকেটমার, জুয়াড়ী, মেয়ে-জোগাড়ী, মাতাল, ভিখিরী, লোচ্চালম্পট—এরা খালি আমেরিকান নয়, কালা ধলা, বাদামী হলদে—দুনিয়ার সব জাতের সব বয়সের লোক আছে এদের মধ্যে। পাকা বদমায়েসদের সঙ্গে নির্দোষ লোকও আছে—এরা খুব গরীব বলে' জামিন দিতে পারেনি। খুব বুড়োদের পাশে দশ বছরের কম বয়সের ছোকরা। সমাজদেহের বিরাট ক্ষতের পুঁজ এরা—এদের দৃষ্টি ভয়ানক, এদের সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা হয়। তাদের মধ্যে তাদের জীবন পচে' দুর্গন্ধ ছাড়ছে—এদের কাছে প্রেম পশুত্ব, আনন্দ একটা ফাঁদ এবং ভগবান ভুতুড়ে কাণ্ড। তারা আঙিনায় ঘুরে বেড়ায়, ইউরঘিস ওদের কথা শোনে। ও অজ্ঞ, তারা বিশেষজ্ঞ; তারা দুনিয়ার সব কিছু দেখেছে, প্রায় সব কিছুতেই হাত দিয়েছে। তারা গড়গড় করে' বলে' যেতে পারে, বলে' যেতে পারে কেন, চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে নগরীর অন্তরতম চিত্রটা, সেই হ'ল এ নগরীর আত্মা—সেখানে ন্যায়বিচার, মনুষ্যত্বের মর্যাদা, স্ত্রীলোকের দেহ, পুরুষের আত্মা বাজারে বিক্রি করবার পণ্য, সেখানে অসহ্য চাপে অসংখ্য মানুষ এঁকেবেঁকে চলে, একটু মাথা তোলবার জন্য, বাঁচবার জন্য, আপসে লড়াই করে, লড়াই করে গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া নেকড়ের মত, সেখানে লোভের আগুন জ্বলছেই মানুষকে ইন্ধন করে' সেখানে ড্রেনের মধ্যে কীটের মত নোংরামিতে দুর্গন্ধে দুর্নীতিতে কিলবিল করে' বেড়াচ্ছে মানুষ্যদেহধারীরা। সেই বুনো-জানোয়ারী ওটার মধ্যে এদের অসম্মতিতে এদের জন্ম দেওয়া হ'য়েছে; এর সরিকানার সামিল না হ'য়ে পারে না বলেই এরা এর সরিক; আজ ওরা কারাগারে, এতে ওরা ছোট হয়নি, কারণ সংসারের অন্যায় পাশাখেলায় ওরা পরাজিত তাও সসেভরা পাশা নিয়ে খেলতে বাধ্য করা হ'য়েছে ওদের। এরা চুরি করে আধলা বা পাইপয়সা, তাই কোটি কোটি

ডলারের চোররা ওদের ফাঁদে ফেলে সাধারণ সড়ক থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

এদের অধিকাংশ কথাই ইউরঘিস না শোনবার চেষ্টা করে। ওদের হাসি-তামাসাও বীভৎস, ভয়ে থথিয়ে যায় ও; হাসিঠাট্টায় যোগও দিতে পারে না। ওর মন পড়ে' থাকে দূরে প্রিয়জনদের পাশে। কখনো কখনো মনে হয় বাড়ী হ'তে তারা ওকে ডাকছে, জেল ছেড়ে মন হাজির হয় তাদের মধ্যে, কিন্তু সাথীদের মস্করায় হাসিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে হয় বাস্তবের বন্দীনিবাসে।

এক সপ্তাহ কেটে যায় এদের মধ্যে, কিন্তু বাড়ী হ'তে কোন খবর আসে না। পুঁজি পনের সেণ্টের একটা খরচ করে' [illegible]দের দিয়ে বাড়িতে একখানা পোষ্টকার্ড লিখে কোথায় ও আ[illegible] [illegible]বং কবে ওর বিচার হবে জানিয়ে দেয়। জবাব বা সাড়া অবশ্য [illegible]সে না। শেষ পর্যন্ত বৎসরের শেষ দিনে ইউরঘিস জ্যাক ডুয়ানের কাছে বিদায় নেয়। জ্যাক ওকে নিজের অর্থাৎ ওর রক্ষিতার ঠিকানা দেয়, কথা আদায় করে' নেয় বাইরে ইউরঘিস দেখা করবে ওর সঙ্গে; বলে, কোন দিন হয়তো ইউরঘিসকে গর্ত হ'তে টেনে তুলতে পারবে ও; জানায়, ইউরঘিসকে যেতে দিতে কষ্ট হচ্ছে—ইত্যাদি। পুলিসের গাড়ীতে চেপে ইউরঘিস বিচারাশে চলে বিচারপতি কাল্লাহানের আদালতে।

আদালতে ঢুকে ওর প্রথম আবিষ্কার এলজবিয়েটা ও কোট্রিনা, দূরে সকলের পিছনে দুটীতে ভয়ে বিবর্ণ মুখে বসে আছে। ওর বুক ঢিপ ঢিপ করে, ভয়ে ও ইশারায় পর্যন্ত ওদের ডাকতে সাহস পায় না, এলজবিয়েটার অবস্থাও তাই। বন্দীদের খাঁচায় বসে' বসে' শোকে দুঃখে ও ওদের দেখতে থাকে। লক্ষ্য করে, ওনা ওদের সঙ্গে নেই, না-আসার বিভিন্ন ও ভয়ানক যত কারণ ভাবতে থাকে; এই ভাবতেই

ওর আধ ঘণ্টা কেটে যায়। হঠাৎ ও সোজা হ'য়ে বসে, মুখের ওপর সমস্ত রক্ত ছুটে আসে; একটা লোক আদালতে প্রবেশ করে, ব্যাণ্ডেজের জন্ত মুখখানা দেখা যায় না, তবে মোটা বপুটিকে চিনতে ভুল হয় না ইউরঘিসের। একটা কাঁপুনি পেয়ে বসে ওকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সংকুচিত হ'য়ে আসে, এখনই যেন ও লাফিয়ে পড়বে ওর ঘাড়ে; লোকটা কোনর। ঠিক এই সময় জামার কলারে একটা কড়া হাত অনুভব করে; শোনে, "বস্ এই—বাচ্চা!"

বসে বটে ও, কিন্তু শত্রুর দিক হ'তে চোখ ফেরায় না। হতভাগা এখনও বেঁচে আছে দেখে হতাশা আসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর ব্যাণ্ডেজ-সজ্জিত মুখ দেখে মনটা খুশীও হয়। কোনরের সঙ্গে কোম্পানীর উকিল এসেছে; দু'জনেই জজের রেলিঙের ভেতরে গিয়ে চেয়ারে বসে; তার মিনিট খানেকের মধ্যেই ইউরঘিসের নাম ডাকা হয়; পুলিস শক্ত করে' ওর কলার ও হাত ধরে' নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়, দাঁড় করিয়েও দু'জনে দু'দিক হ'তে শক্ত করে' ধরে' থাকে—নইলে কখন অফিসারের ওপর লাফিয়ে পড়বে ঠিক কী তার!

কোনর সাক্ষীর জন্ত রক্ষিত বেড়ায় প্রবেশ করে, শপথ গ্রহণ করে, নিজের কাহিনী পেশ করে; নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইউরঘিস শোনে। কোনর বলে, তার ডিপার্টের পাশের ডিপার্টে আসামীর বৌ কাজ করত; অবাধ্যতার জন্য তাকে বরখাস্ত করা হয়; তার আধ ঘণ্টা পরেই ওকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে' মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়, শ্বাসরোধ করে' মেরে ফেলবার চেষ্টা করা হয়। ঘটনার সাক্ষীও সে এনেছে—

"সম্ভবতঃ ও সবের দরকার হবে না", মন্তব্য করে' জজ ইউরঘিসের দিকে ফেরেন—"বাদীকে আক্রমণ করেছিলে স্বীকার কর?"

"ওকে?" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে ইউরঘিস।

"হ্যা।" জজ জানান।

"আমি মেরেছিলাম, আজ্ঞা।" ইউরঘিস স্বীকার করে।

ওর হাতে জোর একটা খোঁচা মেরে পাশের অফিসার শেখায়, "হুজুর বল।

"হুজুর।"

"ওঁর শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলে?"

"হ্যা, আজ্ঞা, হুজুর।"

"আগে কখনও গ্রেপ্তার হয়েছিলে?"

"না, আজ্ঞা, হুজুর।"

"তোমার বক্তব্য কী আছে বল?"

ইউরঘিস ইতস্ততঃ করে। কী আছে ওর বলবার? আড়াই বৎসর এদেশে থেকে কাজ চালাবার মত ইংরেজী শিখেছে ও, কিন্তু সে ইংরেজী দিয়ে "বৌকে ফোসলান ও ভয় দেখানর" বিবৃতি দেওয়া যায় না। তবু বলবার চেষ্টা করে দু' একবার, কথা বেধে যায়, সারের গন্ধে জজ নাক সিঁটকোন, ও থেমে যায়। তখন ও চেষ্টা ছেড়ে বলে, যথেষ্ট ইংরেজী জানে না ও, ভাষায় কুলোচ্ছে না। সুসজ্জিত, গোঁফে মোম লাগান এক যুবক উঠে বলে, "যে ভাষা জান তাতেই তোমার বক্তব্য বলতে পার, অনুবাদ করে' দেব আমি।"

ইউরঘিস আরম্ভ করে। ওর ধারণা ওকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হবে। বলে, ওর বৌএর অবস্থার সুযোগ নিয়ে কীভাবে অফিসারটা প্রথম প্রথম কথা পাড়ে, তারপর ভয় দেখায় ওর কথায় রাজী না হ'লে চাকরি খেয়ে দেওয়া হবে। কথাগুলি অনুবাদক অনুবাদ করে' দিতেই জজ বাধা দেন, "ও বুঝেছি।" সেদিন অনেক মামলা করতে হবে তাঁকে, তা ছাড়া কোথায় যেন যেতে হবে তাঁকে তার জন্য মোটর গাড়ী নীচে হাজির হ'য়েছে ইতিমধ্যেই, এত গ্যাজর গ্যাজর শোনবার অবসর নেই

তাঁর, বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি, তোমার বৌএর কাছে কুপ্রস্তাব করলেন ইনি, আর সে তখনই সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে নালিশ করতে পারল না, কাজও তো ছাড়তে পারত ?"

কতকটা ঘাবড়ে গিয়ে ইউরঘিস ইতস্ততঃ করে, ও ব্যাখ্যা শুরু করে, ওরা ভারী গরীব, কাজ পাওয়া বড় কঠিন—

বিচারক কাল্লাহান বলেন, "বুঝেছি, কাজেই তুমি ঠিক করে' ফেললে পিটতে হবে, কী বল ?" বাদীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, "ওর কথায় কি কোন সত্য আছে কোনর মশায় ?"

"একবিন্দু না, হুজুর ; ব্যাপারটা ভারী বিরক্তিকর, কোন মেয়ে শ্রমিককে বরখাস্ত ক'রতে হ'লেই ওরা এমনি একটা গল্প খাড়া করে, ভারী বিরক্তি—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি।" জজ বলেন, "জানি, প্রায়ই শুনতে হয় এ সব। ব্যাটা আপনাকে খুবই মেরেছে মনে হ'চ্ছে, অ্যাঁ! খরচাসহ ত্রিশ দিন। হুঁ, পরের মামলাটা—"

বিব্রতভাবে ইউরঘিস এতক্ষণ শুনছিল বা হয়তো শুনছিল না, চেয়েছিল খালি। পুলিস ওকে নিয়ে যাবার জন্য টানলে ওর খেয়াল হ'ল শাস্তিদান হ'য়ে গেছে। বুনোর মত ও তাকায়। একবার নিজেই হাঁপায়—"ত্রিশ দিন!" জজের দিকে ঘুরে পাগলের মত বলে, "আমার সংসারের কী হবে ? আমার স্ত্রী আছে, শিশু ছেলে আছে, হুজুর, তাদের টাকা-পয়সা নেই,—হা ভগবান, না খেয়ে মারা পড়বে সব!"

"ভদ্রলোককে মারবার আগে এ সব ভাবলে ভাল করতে।" শুষ্কভাবে জানিয়ে দিয়ে জজ অন্য কয়েদীর দিকে ফেরেন।

ইউরঘিস হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু পুলিস ততক্ষণে ওর কলারে পাক দিতে আরম্ভ করেছে, আর দাঁড়ালে হয়তো মারবে, তাই শান্তভাবে ইউরঘিস ওদের টেনে-নিয়ে-যাওয়া পথে চলে। ঘরের অন্য

কোণে এলজবিয়েটা ও কোট্রিনা দাঁড়িয়ে উঠেছে, ভয়ে ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে আছে; ওদের দিকে যাবার একটা চেষ্টা করে ইউরঘিস, কলারে আর একটা পাক পড়ে, আর চেষ্টা করলে দম বন্ধ হবে। চেষ্টা ছেড়ে দেয় ও। একটা কুঠরীতে অন্যান্য কয়েদীরা অপেক্ষা করছিল, সেখানে ওকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আদালত বন্ধ হ'লে ওরা ওকে অন্যান্য কয়েকটী বন্দীর সঙ্গে "কালা মেয়ারিয়া" গাড়ীতে বন্ধ করে।

এবার ওকে নিয়ে যাওয়া হয় "সুন্দরী কন্যা" কারাগারের দিকে, ছোট জেল, এখানে "রাঁধুনে জেলার" বন্দীদের রাখা হয়। ছোট হ'লেও নোংরামি ও ভিড়ের দিক হ'তে আগেরটাকে ছাড়িয়ে যায় এ জেল; সেখানকার পকেটমার, জোচ্চোর, ছিঁচকে চোর, বৃত্তিহীন পথবাসী, ফড়ে' প্রভৃতি চুনোপুঁটিদের এখানে রাখা হয়। কুঠরীর সাথীরূপে ইউরঘিস পেলে একজন ইটালীয়কে, লোকটা ফলের ফেরীওয়ালা ছিল; পুলিসের নিয়মিত প্রাপ্যটা দিতে পারেনি বলে' ওকে গ্রেফতার করা হয়, বে-আইনীভাবে বড় ছুরি রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করে' কারাদণ্ড দেওয়ানো হ'য়েছে। লোকটা মোটেই ইংরেজী জানে না; কথা জমে না। কয়েকদিন পরে তাকে ওখান হ'তে সরিয়ে নরওয়েদেশীয় একজন নাবিককে ওর সাথী করে' দেওয়া হ'ল; মদ খেয়ে মারামারি করবার সময় ওর একটা কানের খানিকটা কাটা যায়; মদ না খেয়েও ঝগড়াটে স্বভাবটা বজায় থাকে; ইউরঘিস শোয় ওপরের তক্তায়, সে নীচেরটায়; ইউরঘিস নড়লেই নীচেরটায় আরশুলা ঝরে, আর তারস্বরে সে গালাগাল দেয় ইউরঘিসকে। সমস্ত দিন বন্দীদের দিয়ে পাথর ভাঙ্গান হয় এই যা রক্ষা, নইলে এই বুনো জানোয়ারের সঙ্গে এক কুঠরীতে থাকা অসম্ভব হ'ত।

ত্রিশ দিনের দশটা দিন এইভাবে কেটে যায়, বাড়ীর কোন খবর

আসে না। এপার দিনের দিন একজন রক্ষী এসে খবর দেয় ইউরঘিসকে, কে ওকে দেখতে এসেছে। ইউরঘিস ফ্যাকাশে মেরে যায়; হাঁটু দুটো ঠক ঠক করে' কাঁপে, চলাই মুস্কিল হ'য়ে পড়ে ওর পক্ষে।

একটা লম্বা বারান্দা ও একপ্রস্থ সিঁড়ি পার হ'য়ে সাক্ষাতের কক্ষে আসতে হয়; এরও একপাশে তারের জালি; দূর হ'তে দেখা যায় তারের ওপাশে কে যেন বসে' আছে, ও কাছে আসতেই ওদিকের মানুষ লাফিয়ে ওঠে—এ যে ষ্ট্যানিসলোভাস! বাড়ী হ'তে একজনকে কাছে পেয়ে এত বড় জোয়ান লোকটা ভেঙ্গে পড়ে যেন, হাঁটুর কাঁপুনি বেড়ে যায়, কপাল ঘামে, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' দুর্বলভাবে জিজ্ঞাসা করে, "হুঁ কী খবর?"

ষ্ট্যানিসলোভাসও খুব ভড়কে গেছে; ভয়ে কথা বেরোয় না; কোন-রকমে বলে, "ওরা আমায় বলতে পাঠালে—"

"কী?"

ষ্ট্যানিসলোভাস তখন রক্ষীটার দিকে চেয়ে আছে; ইউরঘিস আশ্বাস দেয়, "তা থাকুক। কেমন আছে সব?"

বাচ্চা বলে, "ওনার খুব অসুখ। আমরা উপোস করছি। ভাবলাম, তুমি একটা বিহিত করতে পারবে।"

ইউরঘিস চেয়ারটাকে আরও শক্ত করে' ধরে; কপালে মোটা মোটা ঘর্মবিন্দু দেখা দেয়; একটা ঢোক গিলে বলে "আমি—আমি কোন বিহিত করতে পারব না।"

রুদ্ধশ্বাসে বালক বলে' চলে, "ওনা সমস্ত দিন নিজের ঘরে শুয়ে থাকে, কিছু খায় না, সারাদিন খালি কাঁদে। কী হ'য়েছে তাও বলে না, কাজেও যায় না, খালি কাঁদে। কিস্তীর টাকার জন্য ক'দিন আগে লোক এসেছিল; খুব রাগারাগি করলে, আবার গত

সপ্তাহে এসেছিল লোকটা; বললে, আমাদের বাড়ী হ'তে বের করে' দেবে। আর মেয়ারিজা—"

কান্নায় স্বর বন্ধ হ'য়ে যায় বালকের, বলবার চেষ্টা করেও যেন বলতে পারে না।

"কী হ'য়েছে মেয়ারিজার?" চীৎকার করে ওঠে ইউরঘিস।

"মেয়ারিজার হাত কেটে গেছে; এবার খুব খারাপ হ'য়ে কেটেছে; সারছে না; ঘা'টা সবুজ হ'য়ে যাচ্ছে; কারখানার ডাক্তার বলেছে হাতটা—হাতটা হয়ত কেটে ফেলতে হবে। মেয়ারিজা তাই সমস্তক্ষণ কাঁদে; ওর টাকাও ফুরিয়ে এসেছে। আর আমরা কিস্তীর টাকা সুদের টাকা দিতে পারছি না। আর একটুও কয়লা নেই, খাবারও কিছুই নেই আর; দোকানদারটা বলছে—"

বালকের অশ্রু এবার কান্নায় রূপান্তরিত হয়; ইউরঘিস গর্জন করে' ওঠে, "বল্ বল্।"

"বলছি, বলছি। সমস্তক্ষণ খুব ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকে। গত রবিবার খু-উ-ব বরফ পড়েছিল—তাই আমি সোমবার কাজে যেতে পারিনি।"

"ভগবান!" ইউরঘিসের মুখ হ'তে বেরিয়ে যায়; লাফিয়ে এগিয়ে যায় ও বালকের অভিমুখে। ঐ বরফের জন্যই এ দু'জনের মধ্যে একটা অমুক্ত শত্রুতা আছে; বালকের আঙুল জমবার পর হ'তে ইউরঘিস প্রতিবারই ওকে ঠেঙিয়ে কাজে পাঠিয়েছে। আজ জালের এপাশ হ'তে গর্জন করে, "শয়তান বজ্জাত কোথাকার! তার মানে চেষ্টাই করিসনি।"

"হ্, করেছিলাম—চেষ্টা করেছিলাম!" কাঁদতে কাঁদতে বালক জানায়, "সমস্তক্ষণ, দু' দিন চেষ্টা করেছিলাম। আমার সঙ্গে এলজবিয়েটাও ছিল, সেও যেতে পারেনি। খুব পুরু হ'য়ে বরফ পড়েছিল, আমরা হাঁটতেই পারিনি। তার ওপর, দু'দিন ধ'রে কিছু

খেতে পাইনি। কী ভীষণ ঠাণ্ডা সেদিন…! তিন দিনের দিন ওনাও আমার সঙ্গে গিয়েছিল—"

"ওনা!"

"হুঁ। সেও কাজে যাবার চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা করতে হ'য়েছিল যে ওকে; সকলে যে উপোস পাড়ছিলাম। কিন্তু তখন ওর চাকরি চলে' গেছে।"

ইউরঘিসের চোখের সামনে জগতটা ঘুরপাক খায়, প্রকাণ্ডভাবে ও হাঁপাতে থাকে। আহত পশুর মত তীক্ষ্ণ আওয়াজে প্রশ্ন করে, "সেখানেই ফের কাজ করতে গিয়েছিল?"

ভয়ে ভয়ে ওর দিকে চেয়ে বলে, "চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা করবে না কেন ইউরঘিস?"

বার কয় জোর নিশ্বাস টেনে ইউরঘিস বলে, "বল্—বলে' চল্।"

"আমিও ওনার সঙ্গে গিয়েছিলাম, কিন্তু মিস্ হেণ্ডারসন ওকে আর কাজে ফিরে নিল না। কোনরও ওনাকে গালাগাল দিলে। এখনও তার মুখে পটি লাগান আছে। কেন তাকে মেরেছিলে, ইউরঘিস?" (ছেলেটা জানে এর পিছনে একটা মজাদার রহস্য আছে; পুরো ব্যাপারটা জানে না; জিজ্ঞেস ক'রেও তৃপ্তিজনক জবাব পায় না কারও কাছে)।

ইউরঘিস কথা কয় না, কইতে পারে না; চোখদুটো ওর যেন ঠিকরে বের হ'য়ে আসে। বালক বলে' চলে, "ওনা অন্য কাজ জোগাড়ের চেষ্টা করছে, কিন্তু বড্ড দুর্বল হ'য়ে পড়েছে বলে' দাঁড়াতে পারে না। আমার অফিসারও আমাকে ফিরে নেবে না; ওনা বলছিল আমার অফিসারটা কোনরকে চেনে, তাই আমায় কাজে নেবে না আর। ওদের সকলেরই এখন আমাদের ওপর রাগ। তাই আমি এখন ভাইয়েদের ও কোট্রিনাকে সঙ্গে নিয়ে নীচুশহরে কাগজ বেচতে যাই।"

"কোট্রিনাও ?"

"হুঁ, সেও তো কাগজ বেচছে। ও মেয়ে কিনা, তাই ওর বেশী বিক্রি হয়। শীতটা খুব বেশী পড়েছে বলে' রাত্রে বাড়ী ফিরতে যা কষ্ট হয় ইউরঘিস। এক-একদিন ওরা বাড়ীই আসতে পারে না। আজই তো আমি ওদের খুঁজতে যাব ; ওদের পেলে ওদের সঙ্গেই ঘুমোব ; ফিরতে বড্ড দেরি হ'য়ে যায়, তা ছাড়া ওখান হ'তে বাড়ী যা দূর। হেঁটে যেতে হবে আমাকে, এ জায়গাটা কোথায় আমি জানি না, কীভাবে কোন্ দিক দিয়ে বাড়ী ফিরব তাও জানি না ; খালি মা বললে, যা, ইউরঘিস খবর জানতে চায় তো,...তা ছাড়া তোমায় ওরা জেলে পুরেছে, তুমি কাজ করতে পারছ না, তোমার ছেলে-বৌকে খাবার পরবার জন্য এরা কিছু দিতে পারে তো। সমস্ত দিন হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছি, সকালে খালি একটুকরো রুটি খেয়েছিলাম, ইউরঘিস। ঝোলের ডিপার্ট বন্ধ করে' দিয়েছে, তাই মায়েরও কাজ নেই। মা লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে, তারা দু'-এক টুকরো খাবার দেয়। কাল বেশী পায়নি তো, তাই। কাল মা'র আঙুলে খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল, আজ তাই কাঁদছিল মা—"

কাঁদতে কাঁদতে বালক বলে' চলে, চেয়ার বা টেবিল শক্ত ক'রে ধরে' ইউরঘিস শুনে যায় ; একটা কথা কয় না ; মনে হয় ওর, এখনই বোধ হয় মাথাটা ফেটে যাবে। মনে হয় ওর ওপর গাদা গাদা বোঝা চাপান হ'চ্ছে, সেই চাপে ওর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। দুঃস্বপ্নে মানুষ যেমন পোড়ে অথচ আওয়াজ করতে বা হাত তুলতে পারে না, ওরও সেই অবস্থা ; ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে অথচ একটা শব্দ করতে পারে না, প্রতিকারের জন্য ওর অত শক্তিশালী হাত একটুও তুলতে পারে না। মনে হয় আর একটু বোঝা চাপলেই ও মরে' যাবে, আর সইতে পারছে না ও। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ই ষ্ট্যানিসলোভাস তার শেষ প্রশ্ন করে, "তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে না ইউরঘিস ?"

ইউরঘিস মাথা নাড়ে, না।

"এরা তোমায় কিছু দেবে না?"

ইউরঘিস আবার মাথা নাড়ে, না।

"কবে বেরিয়ে আসবে?"

"আরও তিন হপ্তা বাদে।"

একটু থেমে, চারিদিক দেখে নিয়ে বালক বলে, "তা হ'লে আমি যাই, অ্যাঁ?"

ইউরঘিস মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, যেতে পারে সে। হঠাৎ খেয়াল হ'য়ে যায়; পকেট হ'তে পুঁজি চোদ্দটা সেণ্ট বের করে' বলে, "নিয়ে যা, এগুলো দিস ওদের।"

সেণ্ট ক'টি নিয়ে বালক পকেটে রাখে; বলে, "আমি তা হ'লে যাই, ইউরঘিস?" টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলেটা। শক্ত করে' টেবিল-চেয়ার ধরে' ইউরঘিস দাঁড়িয়ে থাকে, মাথার ভেতরের মত দেহও তখন ঘুরপাক খাচ্ছে। রক্ষী ওর হাত স্পর্শ করে, বাস্তবে ফিরে আসে তখন ইউরঘিস—নিঃশব্দে চলে' যায় ওর পাথর ভাঙ্গার কাজে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আশা অনুযায়ী ত্রিশ দিন পরেই ইউরঘিস জেল হ'তে বের হ'তে পারে না। ওকে জেলে পোরার জন্য আদালতের খরচ বা তকলিফ্ হয়েছে, তার দাম দেড় ডলার ওকেই দিতে হবে; ওর টাকাপয়সা নেই, কাজেই আর তিন দিনের মেহনত দিয়ে পুরিয়ে দিতে হবে মূল্যটা। কিন্তু এ খবরটুকু ওকে দেবার খেয়াল হয়নি কারও। ত্রিশ দিনের দিন আশায় বুক বেঁধে ও মুক্তির অপেক্ষা করে; সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হ'য়ে

যায়, তবু ওকে মুক্ত করে না; ভাবে, কাল সকালে ছেড়ে দেবে। সকালে আবার ওকে পাথর ভাঙতে লাগায়; এবার ও প্রতিবাদ করে, উত্তরে ওরা ঠাট্টা করে, মারতে আসে। প্রথমে মনে হয়, দিন গুণতে ওর ভুল হ'য়েছে বোধ হয়। কিন্তু আরও এক দিন গড়িয়ে যায়। এবার ও মুক্তির আশা ছেড়ে দেয়। শেষে সত্যিই একদিন রক্ষী এসে ওকে মুক্তির সংবাদ দেয়। কয়েদীর পোষাক ছেড়ে ও ওর সার-মাখা পোষাক পরে' নেয়। ওর পিছনে জেলের ফটক বন্ধ হয়।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ও, বিশ্বাস করতে পারে না যে ও সত্যিই মুক্ত হ'য়ে গেছে; বিশ্বাস করতে পারে না ওর মাথার ওপর মুক্ত আকাশ, সামনে মুক্ত পথ, মুক্ত মানুষ ও—মুক্ত! শীতের গুঁতোয় দাঁড়িয়ে থাকা কিন্তু চলে না, পা চালিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি।

গত রাত্রে গুরু তুষারপাত হ'য়েছে; এখন অল্প অল্প তুষারবৃষ্টি হ'চ্ছে, তার সঙ্গে চলেছে চামড়াভেদী হাওয়া। কোর্টকে "দেখে নেবার জন্য" বেরোবার সময় উপর-কোটটা নেওয়া হয়নি; পুলিসের গাড়ীতে চলবার সময়ই অবস্থা নাজেহাল হয়েছিল ওর, এখন আরও সঙ্গীন হয়; ওর পোষাক-আশাক কস্মিনকালেও পর্যাপ্ত গরম ছিল না, এখন তো তা ছিঁড়ে আরও পাতলা হ'য়ে গেছে, বৃষ্টিতে ভিজে তাও স্যুটপুট করে; পা দুটো কোনরকমে বরফের কাদা ঠেলে ঠেলে চলে, কিন্তু শীত ঢোকে একেবারে হাড় পর্যন্ত; ফুটো ফুটো জুতোর ভেতর বরফের টুকরো ঢুকে পা দুটো প্রায় জমে' আসে।

জেলে ইউরঘিস পর্যাপ্ত খাবার পেয়েছে; শিকাগো এসে যত কাজ করেছে তার মধ্যে জেলের কাজটাই হাল্কা এবং কম কষ্টকর; তবু ও শক্তসমর্থ হয়নি; ভাবনা-চিন্তা-শোকে দেহ মন দুই-ই অবসন্ন, দুর্বল। এই বৃষ্টি এই ঠাণ্ডা তাই সহ্য করা কঠিন হ'য়ে পড়ে; কাঁধ দুটো কুঁচকে, পকেটের মধ্যে হাত পুরে স্যুটপুট করে' চলে। এ অঞ্চলটায় এখনও

বসতি হয়নি, খোলা মাঠ, জলনিকাশের বড় খাল আর রেলপথ—বাতাসের চলাচলের পক্ষে অবাধ উন্মুক্ত স্থান; সেইটিই সবচেয়ে বড় বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রহীন এই মানুষটার পক্ষে।

বিভিন্ন পথ ধরে' কিছুক্ষণ চলবার পর ইউরঘিস একটা ছেলের দেখা পায়, ছেলেটা পুরনো ন্যাকড়া কাগজ প্রভৃতি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ইউরঘিস ডাকে, "ও ছেলে!"

ছেলেটি একটু চোখ কুঁচকে চায় ওর দিকে, ইউরঘিসের মাথা ন্যাড়া, জেল হ'তে বেরনর চিহ্ন। ছেলেটা ওকে জেলঘুঘু ধরে' নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কী চাই উ?"

একটু কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করে ইউরঘিস, "কারখানায় যাও কোন্‌দিকে?"

"যাই না আমি।"

এমন জবাব আশা করেনি ইউরঘিস, এরপর কী বলবে ভেবে পায় না। এদিক-ওদিক চেয়ে নরম স্বরে বলে, "বলছিলাম কি, কারখানার দিকে যাবার পথটা জান?"

"তা হ'লে তাই বল না কেন!" বলে' ছেলেটা উত্তর-পশ্চিমের দিকে হাত তুলে বলে, "অই দিকে।"

"কতদূর?"

"কে জানে! তা মাইল বিশেক হবে।"

"বিশ মাইল!" আঁতকে ওঠে ইউরঘিস, বিশ মাইল! এইভাবে এই বিশ মাইলের প্রতিটা আঙুলপরিমিত স্থান ওকে পায়ে হেঁটে চলতে হবে; জেল হ'তে বের করে' দিয়েছে ওরা, বাড়ী ফেরবার ভাড়া দেয়নি।

কিন্তু ভেবে লাভ নেই, জোর পা চালিয়ে দেয় ও; কিছুক্ষণ হাঁটতেই শরীরটা একটু গরম হয়, তাছাড়া চিন্তার গহনে হারিয়ে যায় ও, বাইরের

বরফ, ঠাণ্ডা, হাওয়া, বৃষ্টি সবই যেন লুপ্ত হ'য়ে যায়। কত ভয়ানক ভয়ানক কল্পনা ক্ষণে ক্ষণে ওকে জ্বেলে অস্থির করে' তুলেছে, আজ তারা ওর এই একাকিত্বে ভিড় করে' আসে চারিদিক হ'তে। কাছে যেতে না পারবার যন্ত্রণা আর নেই, এখন গেলেই ও সংসারের সব কিছু দেখতে পাবে, বাড়ীর দিকে মন উড়ে চলে, তার সঙ্গে তাল রেখে পাও যেন উড়ে চলে; মধ্যে মধ্যে বিশেষ কোন চিন্তায় পকেটের মধ্যে হাতের মুঠো শক্ত হয়, দাঁতে দাঁত চেপে বসে—দৌড়ে যেতে চায় ও। ওনা—খোকা—সংসার—বাড়ী সব কিছু সম্বন্ধে এখনই ও সব কথা জানতে পারবে। ও চলেছে তাদের উদ্ধার করতে—ও যে মুক্ত এখন। ওর হাতের মালিক এখন ও নিজে, এই হাতের শক্তি দিয়ে ও দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়বে ওদের জন্য।

ঘণ্টাখানেক এইভাবে চলবার পর ওর মনে হয়, শহরের দিকে না গিয়ে ও যেন শহর হ'তে দূরে চলে' যাচ্ছে; জেলের পর আধপাকা রাস্তা ছিল তবু, এখন চলেছে খালি মেঠো কাঁচা পথ, দু'ধারে বরফঢাকা প্রান্তর, বাড়ীঘরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। দাঁড়ায় একটু। ভাগ্য ভাল ঐ পথে খড়ের গাড়ী হাঁকিয়ে একজন চাষী এসে যায়। তাকে থামিয়ে ইউরঘিস জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, কারখানা অঞ্চল কি এই দিকে যেতে হবে?"

"ও সব কারখানা ফারখানা কোথায় আছে তা জানি না; তবে শুনেছি ঐ শহরের ভেতর কোথায় আছে। তুমি তো শহরে যাবার উল্টো পথটাই ধরেছ।"

বড় অবসন্ন বোধ করে ইউরঘিস; বলে, "কিন্তু বললে যে আমায় এই পথে।"

"কে বললে?"

"একটা ছেলে।"

"মস্করা করেছে হয়তো তোমার সঙ্গে। কিন্তু আমিও তো পথটা ঠিক চিনি না। যেখান হ'তে এসেছ সেখানে ফিরে গিয়ে কোন পুলিসকেই জিজ্ঞেস করা ভাল। তা আমার গাড়ীতে উঠতে পার; গাড়ীটায় অবিশ্যি বোঝা বেশী দেওয়া হ'য়েছে, তা হ'ক, চেপে যাও।"

গাড়ীতে আর চাপে না ইউরঘিস, গাড়ীর পিছু পিছু চলে। দুপুর নাগাদ শিকাগো চোখে পড়ে; পথের পাশে আর মাঠ নেই, শুরু হ'য়েছে শহরতলীর খানখন্দভরা সড়ক আর ছোট ছোট দোতলা বাড়ী; পায়ে পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বরফ-কাদা, কোথাও হোঁচট খায়, কোথাও পড়ে' যায়। দু'চারখানা বাড়ীর পর পর একটা করে' রেলপথ রাস্তা পার হ'য়ে গেছে, সেইগুলোতেই হোঁচট খেতে হয় বেশী; কখন কোন বাড়ীর পিছন হ'তে হুস করে' এক-একখানা ইঞ্জিন বেরিয়ে পড়ে, পাশ দিয়ে বড় বড় বোঝাই ট্রাক যায় কাদাজলের ঢেউ উঠিয়ে; সামনে দিয়ে মালগাড়ী গেলে পথিকদের অপেক্ষা করতে হয় কাদায় দাঁড়িয়ে, অস্থির হ'য়ে ওঠে ইউরঘিস, একটা মুহূর্তও দাঁড়াতে ইচ্ছে হয় না; কখন রেল ও দু'দিকের মোটরে রাস্তা জমে' যায়, ড্রাইভাররা পরস্পরকে গালাগাল করে, ছাতা নিয়ে পথে নেমে সংকট ত্রাণের পথ খোঁজে; আর ইউরঘিস কোন গাড়ীর তল দিয়ে, কোনটার পাশ কাটিয়ে প্রাণ হাতে করে' এগিয়ে যায়।

পথে একটা জমাট নদীর ওপর দিয়ে কথা একটা পুল পার হয় ও। নদীর ওপর বা কিনারায় বরফও সাদা নয়, আকাশ হ'তে বৃষ্টি পড়ছে ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে; ইউরঘিসের মাথা থেকে ধোঁয়ামিশ্রিত জলের ধারা নেমে আসে। এর পর শহরের ব্যবসা অঞ্চল; সংকীর্ণ রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার অন্ত নেই; পা হড়কে পড়ে' যায় ঘোড়াগুলো, ওঠে হাঁকডাকে, আবার টানে; স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে পথ ছেড়ে ফুটপাথে ওঠে, সেখানকার ভিড় এড়াতে

আবার কখনো পথে নেমে যায়। দু'দিকে খুব উঁচু উঁচু ইমারত, সংকীর্ণ পথ তার মধ্যে নালার মত দেখায়; পথে গাড়ী ঘোড়ার আওয়াজ, ব্যবসাদারদের দুনিয়াভোলা হাঁকডাক দু'পাশের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয়; এখানকার লোকগুলো অবিরত অত্যন্ত ব্যস্ত, কিছু বা কারও দিকে চাইবার সময় নেই তাদের। এই জনারণ্যেও ইউরঘিস বনচারীর মত একা চলে; সে বিদেশী, ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড়, শুষ্ক বিবর্ণ চিন্তিত মুখ চোখ—সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কথা; কিন্তু তার দিকেও চাইবার অবসর নেই কারও।

একটা পুলিস পথ দেখিয়ে বলে' দেয় আরও পাঁচ মাইল যেতে হবে। শুরু হয় কারখানা অঞ্চল, নোংরা ঘিঞ্জি মদের দোকানের সারি, বহু গাড়ী চলায় কদর্য পথ; পার হয় কয়লাগাদা রেলের আঙিনা। এও পিছনে পড়ে' থাকে। চকা জন্তুর মত ইউরঘিস মাথা তুলে হাওয়ার গন্ধ শোঁকে, বাড়ীর গন্ধ পায় যেন। বিকেল গড়িয়ে গেছে, খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি জ্বলে' যাচ্ছে ওর, দোকানে দোকানে খাবার আমন্ত্রণ ও তালিকা ঝুলছে; কিন্তু সে সব ওর জন্য নয়।

খাস বড় কারখানা অঞ্চল এসে যায় এবার। আকাশে ধোঁয়ার কৃষ্ণ নদী, বাতাসে গোরু-শূকরের কাতর ধ্বনি আর বহু দুর্গন্ধের মিশ্রণে তৈরী মহাদুর্গন্ধ। ভিড়ভারাক্রান্ত বাস চলে। ইউরঘিস আর লোভ সামলাতে পারে না; খুব ভিড়ভর্তি একখানা বাসে চেপে একজন যাত্রীর পিছনে লুকিয়ে পড়ে; কণ্ডাক্টর দেখতে পায় না। দশ মিনিটের মধ্যে ও নিজের বাড়ীর রাস্তায়, নিজের বাড়ীতে পৌঁছে যায়।

কোণ দিয়ে ঘোরবার সময় ছুটে চলে ও। কিন্তু বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আশপাশের বাড়ীগুলো দেখে, দোকানখানা ভাল করে' দেখে নেয়। না, ভুল তো হয়নি; সেই বাড়ীই তো বটে; কিন্তু—কিন্তু এর রঙ্ বদলে গেছে যে!

আরও দু'পা কাছে আসে। হ্যাঁ, এই বাড়ীই বটে, পাংশুটে রঙ ছিল আগে, এখন হলদে হ'য়ে গেছে। আগে জানালার পর্দাগুলো লাল ছিল, এখন হ'য়েছে সবুজ। আগাগোড়া নতুন রঙে রঙান। অদ্ভুত তো!

পথের অপর প্রান্ত ধরে' ইউরযিস আরও কাছে যায়। হঠাৎ একটা বিকট ভয় ওকে চেপে ধরে। হাঁটু দুটো থর থর করে' কাঁপে, মনের মধ্যে সকল চিন্তা গুলিয়ে যায়। নতুন রঙ, পুরোনো পচা তক্তার জায়গায় নতুন তক্তা—মানে, সেই দালাল! ওপরের চালের একখানা তক্তা সরে' গিয়ে এতদিন কত জল পড়েছে, ঘরের ভেতরটা ভেসে গেছে, জল ধরবার জন্য বাটি কড়াই গামলা পেতেছে, সে সবও ভরে' গেছে বারবার, ভিজে বিছানাপত্র নিয়ে সারা রাত্রি বসে' থাকতে হ'য়েছে; দেওয়ালের পলেস্তরা খুলে পড়েছে অথচ টাকা ছিল না বলে' সারাতে পারেনি, নিজেও সারাবার সময় পায়নি; আজ সে ছেঁদা মেরামত হ'য়ে গেছে। সবই নতুন, সুন্দর, চকচকে!

ওরই সামনে দোর খুলে যায়। প্রাণপণ শক্তিতে নিশ্বাস টানে ইউরযিস। বেরিয়ে আসে মোটাসোটা সুন্দর একটি ছেলে, এমন ছেলে তো ওর বাড়ীতে কখনও ছিল না।

মোহগ্রস্তের মত ইউরযিস ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকে। ছেলেটা নাচতে নাচতে নেমে আসে, একতাল বরফ কুড়িয়ে এগিয়ে আসে রেলিঙের দিকে, সেখানে ঠেস দিয়ে বরফের বল তৈরী করতে লাগে। একবার চোখ তুলতেই ইউরযিস চোখে পড়ে' যায়; ওকে দেখে ছেলেটার দৃষ্টি সংকুচিত, শত্রুভাবাপন্ন হয়—বোধ হয় ভাবে, ইউরযিস বলটা কেড়ে নিতে পারে। ইউরযিস ওর দিকে এগিয়ে আসে; একবার যেন পালাবার ইচ্ছা হয় ছেলেটার, কিন্তু পালায় না, সমুখ-সমরের জন্যই হয়তো প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এগোবার সময় পা টলে ইউরখিসের; কোনরকমে রেলিঙটা ধরে' ফেলে বলে, "কী—কী করছ এখানে?"

"বল। কী বলছ তুমি?"

"তুমি—এখানে কী করছ তুমি?"

"আমায় বলছ?" বিস্মিতভাবে ছেলেটী প্রশ্ন করে, "আমি এখানে থাকি যে।"

ইউরখিস হাঁপায়, "এখানে থাক তুমি?" রক্তশূন্য হ'য়ে যায় ওর মুখ, আরও জোরে রেলিংটা চেপে ধরে, "তোমরা এখানে থাক। তা' আমার পরিবার কোথায়?"

"তোমার পরিবার?" ছেলেটী প্রতিধ্বনি করে।

এবার শক্তপায়ে এগিয়ে আসে ইউরখিস; নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করে' বলে, "আমি—আমার বাড়ী এটা।"

ছেলেটী চটপট দোরের কাছে উঠে গিয়ে হাঁক ছাড়ে, "মা, ওমা, এই দেখ, একটা লোক বলছে এ বাড়ীটা তার।"

বিরাটবপু এক আইরিশ স্ত্রীলোক দোরের কাছে বেরিয়ে আসে; জানতে চায়, "কী ব্যাপার?"

তার দিকে ফিরে ইউরখিস চ্যাঁচায়, "আমার পরিবার কোথায়? আমি যে তাদের এখানে রেখে গিয়েছিলাম। এটা আমার বাড়ী। কী করছ তোমরা এখানে?"

ভয়ে বিস্ময়ে স্ত্রীলোকটী ওর দিকে চেয়ে থাকে, ওর চেহারা ও পোষাক দেখে ভাবে, ভাল এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। ভয়ে ভয়ে মেয়েটী প্রতিধ্বনি করে, "তোমার বাড়ী!"

আর্তনাদ করে' ওঠে ইউরখিস, "আমার বাড়ী। বলছি, আমি এখানে থাকতাম।"

মেয়েটী উত্তর দেয়, "ভুল হ'য়েছে তোমার। এখানে কেউ থাকত

না। এটা নতুন বাড়ী। ওরা তাই বলেছে। ওরা—"

পাগলের মতই এবার চীৎকার করে ইউরখিস, "আমার পরিবারের লোকদের নিয়ে কী করেছে ওরা?"

মেয়েটী যেন কিছু কিছু বুঝতে পারে, 'ওদের' কথায় হয়তো সন্দেহ ছিল ওর। বলে, "তোমার পরিবারের লোকজন কোথায় আছে জানি না তো। মাত্র তিন দিন আগে আমি বাড়ীখানা কিনেছি, তখন এখানে কেউ ছিল না, ওরা বললে বাড়ীখানা আনকোরা নতুন। তুমি কি সত্যিই এটা কখনো ভাড়া নিয়েছিলে?"

প্রশ্নের ঢঙে হাঁপায় ইউরখিস, "ভাড়া? কিনেছিলাম আমি। এর দাম দিয়েছিলাম। আমিই এর মালিক হয়েছিলাম। আর ওরা—ভগবান্! সত্যিই তুমি জান না আমার পরিবারের লোকজন কোথায়?"

অতি কষ্টে মেয়েটী ওকে বুঝিয়ে দেয়, এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই সে জানে না। ইউরখিসের মগজ তখন ভণ্ডুল হ'য়ে গেছে, অবস্থাটা কিছুতেই ও ঠিকমত বুঝতে পারে না। ওর পরিবারবর্গকে যেন মুছে ফেলা হ'য়েছে এ দুনিয়া হ'তে, তারা যেন স্বপ্নের জীব, এ বসুন্ধরায় তাদের যেন কখনো অস্তিত্বই ছিল না। মনে হয় ওর ও হারিয়ে গেছে—হঠাৎ ম্যাজস্কিয়েনী বুড়ীর কথা মনে পড়ে' যায়, এই তো কাছাকাছিই থাকে। সে নিশ্চয়ই জানে, নিশ্চয়ই জানে। বিনা বাক্যব্যয়ে এক দৌড় দেয় ও।

বুড়ী নিজেই বেরিয়ে আসে। ইউরখিসের ঐ মূর্তি, ঐ দৃষ্টি দেখে বুড়ী চমকে ওঠে। হ্যা হ্যা, জানে বৈকি! ওর পরিবারবর্গ এখান হ'তে চলে' গেছে। চলে' ঠিক যায়নি, ভাড়া দিতে পারেনি বলে' তাদের দূর করে' দেওয়া হ'য়েছে, বাড়ীটা ফের রঙ্ করে' গত সপ্তাহে ফের বেচা হ'য়েছে। কেমন আছে তারা সেটা অবশ্য বুড়ী জানে না; তবে

কোথায় আছে তা বলতে পারে। শিকাগো এসে প্রথম যেখানে ওরা উঠেছিল, না?—হুঁ, সেই অ্যানিয়েল জুকিয়েনের বাড়ীতে উঠেছে গিয়ে ফের। ভেতরে আসবে না, ইউরঘিস? একটু বিশ্রাম করে' যাক না? হ্যাঁ, বড় বিশ্রী তো বটেই—জেল না হ'লে কি আর এমন হয়!

ইউরঘিস আবার ফেরে, টলতে টলতে চলে। বেশীদূর কিন্তু আর যেতে পারে না; কোণটা ফিরেই রেষ্টুরেন্টের দোরে বসে' পড়ে। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না, হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে হু হু করে' কেঁদে ফেলে।

ওদের বাড়ী! ওদের বাড়ী!! শেষ হ'য়ে গেছে বাড়ীর পালা। দুঃখে হতাশায় রাগে শরীরটা যেন টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। কোন বিবেচনা ওকে শান্ত করতে পারে না; কল্পনা নয়, এ বাস্তব, ওর বাড়ীতে অন্য লোক সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছে, নিজের বাড়ীতে ওকে আর এরা ঢুকতে দেবে না। এ অমানুষিক, পৈশাচিক ব্যাপার হ'তে পারে না, সত্যি হ'তে পারে না। উঃ, ঐ বাড়ীর জন্য কী কষ্টই না সে সয়েছে! খালি কি ও? কী ভোগান্তিই না ভুগেছে সকলে ঐ বাড়ীটার জন্য; তার ওপর টাকাই কি কম দিয়েছে এই বাড়ীটার জন্য!

বুকমোচড়ান সেই সব ব্যথা আবার ফিরে আসে। দুনিয়ায় ওদের সম্বল ছিল মাত্র তিনশোটি ডলার! তাও কি একার, সকলের কাছে কুড়িয়ে মিলিয়ে, তবে তিনশো! না খেয়ে মরা আর টিঁকে যাওয়ার মধ্যে এই তিনশো ডলার পাঁচিলের মত দাঁড়িয়েছিল। তারপর মাসের পর মাস সে কি পরিশ্রম করে' ওরা মাসিক কিস্তী সুদ, খাজনা, বীমার টাকা, অন্যান্য দাবী, মেরামতী খরচ জুগিয়ে এসেছে—কী করেনি ওরা এই বাড়ীর জন্য! এই বাড়ীর জন্য ওরা ওদের জীবন পণ রেখেছিল, চোখের জলে আর ঘামে মিশে গেছে খাটতে খাটতে, সেই টাকা দিয়ে ওরা বাড়ীর ধার শোধ করে' এনেছে—শুধু কি তাই, রক্ত জল করে'

খেটেছে ওরা এই বাড়ীর দেনা শোধবার জন্য। এই বাড়ীর দেনা শোধবার জন্য অ্যান্টেনাস ডারহ্যামের নরকে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়ে, নইলে তো আজও সে শক্ত সমর্থ হ'য়ে বেঁচে থাকত। ওনা তার শক্তি দিয়েছে, সামর্থ্য দিয়েছে, নিজেকে ধ্বংস করেছে এই বাড়ীর জন্যই। ওর নিজের অবস্থাও তো তাই; তিন বছর আগে ও ছিল শক্ত সমর্থ জোয়ান, আর আজ ভগ্ন রুগ্ন শিশুর মত কাঁদছে কাঁপছে বসে' বসে'। এই লড়াইএ সর্বস্ব পণ করেছিল ওরা; কিন্তু হেরে গেল, হেরে গেল ওরা, হেরে গেল! আজ পর্যন্ত যা কিছু দিয়েছে এর জন্য তাও গেল, তার প্রতিটী পাই নষ্ট হ'য়ে গেল, একটী আধলাও তার আর ফেরত পাবে না। বাড়ীটাও গেল। যেখান হ'তে যাত্রা শুরু সেখানেই ফিরে আসতে হ'ল; কিন্তু যাত্রার দিন কিছু সঞ্চয় ছিল, শক্তি ছিল, আশা ছিল। আর আজ? সামনে অনাহার, শীত, জমে' মরবার সম্ভাবনা।

সমগ্র সত্যটা ওর চোখের সামনে আজ উদ্‌ঘাটিত হয়, ও নিজেই বুঝতে পারে, বিভিন্ন ঘটনা পর পর জুড়ে যায় মনের চোখের সামনে; এই সব লুব্ধ শকুনি ওকে ধরে' ওর অন্তর পর্যন্ত কুরে কুরে খেয়েছে, খেয়েছে আর ওকে ঠাট্টা করেছে। ভগবান! তোমার রাজ্যে এই দানবীয়তা, এই পৈশাচিকতা, এত ঘৃণ্য লোভ মানুষের! অজ্ঞ, অরক্ষিত, পরিত্যক্ত ও আর ওর পরিবারবর্গ, শিশু অসহায় স্ত্রীলোক, তারা চেয়েছে ভগবানের এ পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকতে; আর তাদের ভক্ষকরা ওদের রক্তপিপাসু হ'য়ে অবিরাম ওদের পিছু পিছু ওদের চারিদিকে ঘুরছে। সেই প্রথম সুন্দর বিজ্ঞাপনটা, সেই মিষ্টিমুখো দালাল! সুদ, বীমা, খাজনা আরও কত দাবী, ওসব জানলে এ ফাঁদের মধ্যে ওরা মাথা গলাত না, এ সব দেবার ক্ষমতাও ওদের ছিল না, দেবার চেষ্টাও করত না। তারপর এই কারখানার মালিকরা, তাদের মালিকরা,—সেই মালিকদের

ফিকিরফন্দী, তাদের কত কসরৎ—কারখানা বন্ধ করে' দেওয়া, চাকরির কম্‌তি সৃষ্টি করা, কাজের ঘণ্টা ঠিক না রাখা, কাজের অসহনীয় গতি বাড়ান, মজুরী কাটা, দাম বাড়ান। প্রকৃতি—তাও কি কম নিষ্ঠুর ওদের প্রতি—শীত বা গরমের প্রতিকার করবার ক্ষমতা নেই ওদের, অথচ তারই মধ্যে বাস করতে হবে। এই শহর, এই দেশ, এই আইনকানুন রীত-রেওয়াজ সবই অতি—অতি নিষ্ঠুর হ'য়েছে ওদের প্রতি। এর কিছুই ওরা বোঝে না, অথচ এই না-বোঝার জন্য কোন ক্ষমা নেই। এ সব-কিছু একই কোম্পানীর লাভের জন্য করছে, আর ওরা সেই কোম্পানীর লাভের শিকার। সর্বত্র সব সময়ে বহুরূপে এব কোম্পানী শিকার ধরবার জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে। সকলের শেষে জঘন্য এই অবিচার, সময় ও সুযোগ বুঝে বাড়ী হ'তে দূর করে' দিয়েছে ওদের, আবার সে বাড়ী আর একটা শিকারের সামনে ধরা হ'য়েছে। আর ওরা? ওরা কিছুই করতে পারবে না; আইন ওদের বিরুদ্ধে, এ সমাজব্যবস্থার সমগ্র যন্ত্রটাই ওদের পেষবার জন্য, এ যন্ত্র চলছে ঐ মালিকদের স্বার্থে, হুকুমে। এত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ইউরঘিস যদি একখানা হাতও তোলে, তাহ'লে নিমেষমধ্যে সেই জানোয়ারের খাঁচা জেলে আবার ওকে এই মালিকরা বন্দী করে' দেবে।

উঠে চলে' যাওয়া তো পরাজয় স্বীকার করে' নেওয়া, নবাগতদের হাতে এটা ছেড়ে যাওয়া। তা ও যাবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে' বসে' ও হয়তো ঐভাবে ভিজত আর কাঁপত, কিন্তু মনটা হঠাৎ বাড়ীর দিক হ'তে পরিবারের দিকে ফিরে যায়। ভাবে, এর চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য হয়তো সামনে আছে। আর অপেক্ষা না করে' ও উঠে পড়ে, ক্লান্তপদে সম্মোহিতের মত এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

অ্যানিয়েলের বাড়ী এখান হ'তে দু' মাইল; এইটুকু পথ যেতে এত কষ্ট আর কখনও হয়নি ইউরঘিসের। এ পথও শেষ হয়। চোখে

পথে পূর্বপরিচিত বিশ্রি সেই বাড়ীখানা। মুহূর্তের অবসাদ দূর হ'য়ে যায় যেন; এক দৌড়ে গিয়ে ও দোরের কড়া নাড়ে।

অ্যানিয়েল বুড়ী নিজেই দোর খোলে। বয়সে বাতে বুড়ী আরও এতটুকু হ'য়ে গেছে; মুখের চামড়ার রঙ্ হ'য়েছে শুকনো মাছের চামড়ার মত; সেই কোঁচকান চামড়ার ভেতর হ'তে কুত্‌কুতে চোখ ছুটো ট্যাট প্যাট করে' চায়; ইউরথিসকে চিনেই বুড়ী চমকে ওঠে।

প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ইউরথিস জিজ্ঞাসা করে, "ওনা আছে এখানে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"কেমন—", কী বলতে যাচ্ছিল ইউরথিস, বলা হয় না আর, দোরের বাজু ধরে' নিজেকে কোনরকমে খাড়া রাখে। বাড়ীর ভেতরের কোন এক কক্ষ হ'তে যন্ত্রণায় তীব্র একটা আর্তনাদ শোনা যায়—আওয়াজটা ওনার।

ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য ইউরথিসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন বিবশ হ'য়ে যায়। তারপরেই এক লাফে বুড়ীর পাশ দিয়ে গিয়ে পৌঁছয়।

ঘরটা অ্যানিয়েলের রান্নাঘর। এখানে জন ছয় স্ত্রীলোক ভয়ে বিবর্ণ-মুখে ভাবডুব হ'য়ে বসে' আছে। এদেরই মধ্যে অতি ক্ষীণকায়া কদর্যমূর্তি একজন দাঁড়িয়ে ওঠে, একটা হাত ব্যাণ্ডেজ করা—মেয়ারিজা বলে' একে চেনাই কষ্টকর হ'য়ে ওঠে ইউরথিসের। ওর চোখ খোঁজে ওনাকে; কিন্তু এদের মধ্যে ওনা নেই; ফ্যাল ফ্যাল করে' ওদের দিকে চেয়ে থাকে, আশা করে ওরাই বলবে। আতঙ্কগ্রস্ত নির্বাক হ'য়ে ওরা বসে' থাকে, ভীতত্রস্ত চোখে ওর দিকে চায়, কথা কয় না। এরই মধ্যে আর একটা আর্ত চীৎকার শোনা যায়।

দোতলার পিছনের ঘর হ'তে আওয়াজটা আসছিল। আবার কয়েকটা লাফে উঠে যায় ও ঘরখানার সামনে; এক ধাক্কায় দোরটা খুলে যায়, সেখান হ'তে একখানা মই উঠে গেছে চিলেকোঠা পর্যন্ত, ঐ

চিলেকোঠা হ'তেই শব্দ আসছে। উঠতে গিয়ে বাধা পায় ইউরখিস; পিছন হ'তে ডান হাতখানা দিয়ে মেয়ারিজা ওর একখানা হাত ধরে' ফেলে বলে, "না না, তুমি যেও না, ইউরখিস, তোমার যাওয়া চলবে না। এ ছেলে—।"

"ছেলে!" প্রতিধ্বনি করে' ওঠে ইউরখিস, "কে, অ্যাণ্টেনাস?"

"না। নতুন।"

"নতুন ছেলে!" হাত পা অবশ হ'য়ে আসে যেন ইউরখিসের; মইটা ধরে' কোনরকমে আত্মরক্ষা করে' নেয়। "নতুন ছেলে!" ভূত দেখার মত মেয়ারিজার দিকে ও চেয়ে থাকে। বলে, "কিন্তু এখনও তো সময় হয়নি!"

"তা জানি," মাথা নাড়ে মেয়ারিজা, "কিন্তু হ'য়েছে।"

আবার ওনার তীব্র একটা আর্তনাদ শোনা যায়, এ শব্দে কুঁচকে ওঠে ইউরখিস, ফ্যাকাসে হ'য়ে যায় ওর মুখের রং। আর্তনাদটা ক্রমশঃ কান্নায় নেমে আসে; ওনা বলছে, "ভগবান, উঃ—মরতে দাও, আমায় মরতে দাও!" মেয়ারিজা তাড়াতাড়ি ইউরখিসকে ধরে' ফেলে বলে, "চলে' এস, পালিয়ে এস।"

ইউরখিসকে ও টানতে টানতে ফের রান্নাঘরে নিয়ে আসে; চলবার শক্তিও আর নেই ইউরখিসের, মেয়ারিজা ওকে একরকম বয়ে' নিয়ে আসে। বিভীষিকার ঝড়ে ওর আত্মার স্তম্ভগুলো সব পড়ে' ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। একখানা চেয়ারে ও কাঁপতে কাঁপতে বসে' পড়ে, বসেও কাঁপে, মেয়ারিজা তখনও ওকে ধরে' থাকে। অন্য মেয়েরা ভয়ে বোবা বনে' যায়।

আবার ওনার আর্তনাদ শোনা যায়, এখান হ'তেও আওয়াজটা কী ভীষণ স্পষ্ট। লাফিয়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে ইউরখিস জিজ্ঞেস করে, "কতক্ষণ ধরে' এমন চলছে?"

"[illegible] না," মেয়ারিজা জানায়। [illegible] ইঙ্গিত পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, "তুমি বাইরে যাও কিছুক্ষণের জন্য, একটু পরে এস, তুমি এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না। সবই ঠিক আছে। এটা—"

"ওর কাছে আছে কে?" ইউরঘিস জানতে চায়। উত্তর দিতে মেয়ারিজা ইতস্ততঃ করছে দেখে ফের বলে, "কে আছে ওর কাছে?"

"ও—ও ঠিকই আছে। ওর কাছে এল্‌জবিয়েটা আছে।"

"কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু জানে এমন কেউ, একটা ডাক্তার?" জিজ্ঞেস করতে করতে ও মেয়ারিজার হাতখানা চেপে ধরে। মেয়ারিজা এবার ভয় খেয়ে যায়, গলা বসে' যায় ওর, ভয়ে ভয়ে বলে, "আমাদের একটাও টাকা নেই।" কিন্তু এইটুকু বলে' ও সাহস পায় না; হিংস্র জন্তুর মত ইউরঘিস চেয়ে আছে দেখে বলে, "সব ঠিক আছে ইউরঘিস, সব ঠিক আছে। তুমি চলে' যাও এখন হতে, চলে' যাও—আর কিছুক্ষণ যদি অপেক্ষা করতে!"

আবার ওনার আর্তনাদ; যেন পাগল হ'য়ে ওঠে ইউরঘিস। এর সমস্ত কিছুই ওর কাছে নতুন, কাঁচা বিভীষিকা—বজ্রপাতের মত এসে পড়েছে ওর ওপর। অ্যান্টেনাসের জন্মের সময় ও কারখানায় ছিল, কিছুই জানত না এ সবের; সব চুকেবুকে গেলে এসেছিল। কিন্তু এখন আর ও নিজেকে ধরে' রাখতে পারছে না। মেয়েরা ভয়ে বিভ্রান্ত, একের পর এক তারা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে, এ কিছু না, সব মেয়েকেই এ সহ্য করতে হয়, মেয়েদের ভাগ্যই এই। শেষ পর্যন্ত ওরা ওকে একরকম ঠেলেঠুলেই বের করে' দেয়; বাইরে বৃষ্টিতে পাগলের মত পায়চারি করে, টুপিহীন মাথায় অঝোর ঝরে বৃষ্টি ঝরে। রাস্তা হ'তেও ওনার আওয়াজ শোনা যায়, তাই পালিয়ে যায় সেখান হতে' অনেকখানি দূরে, কিন্তু দূরে গিয়েও স্বস্তি পায় না, আবার ফিরে আসে।

পনের মিনিটের মধ্যে ও আবার দরজায় ধাকাধাকি শুরু করে, দোর ভেঙে যাবে ভয়ে ওরা দোর খুলে দেয়।

কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে ওকে বোঝান মুস্কিল। সব ঠিক আছে কী করে' জানল ওরা, ওরা তো সব এখানে বসে' বসে' জটলা করছে, ওদিকে সে যে মরছে, কেন মরতে চাইছে, মনে হ'চ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। শুনুক না একবার ওরা, শুনতে পাচ্ছে না! এ পৈশাচিক ব্যাপার; এর প্রতিকার নিশ্চয়ই আছে, এ চলতে দেওয়া যেতে পারে না। ডাক্তার আনবার চেষ্টা করেছিল ওরা? পরে কী দেবে বললেও তো চলতে পারত—

"তা পারতাম না ইউরঘিস। একটা পয়সা নেই হাতে। কীভাবে যে বেঁচে আছি!" মেয়ারিজা এবার প্রতিবাদ করেই জানায়।

"কিন্তু আমি তো কাজ করতে পারি। আমি টাকা রোজগার করতে পারি"—ধমক দিয়ে ওঠে ইউরঘিস।

"তা ঠিক, কিন্তু তুমি যে জেলে ছিলে। কখন ছাড়া পাবে, জানব কেমন করে' আমরা? মুফৎ তো কেউ কাজ করবে না।" মেয়ারিজা বলে' চলে, একটা ধাত্রী আনবার চেষ্টা করেছিল ওরা, কিন্তু ধাত্রীরা দশ, পনের এমন কি পঁচিশ ডলার নগদ চেয়েছিল। "কিন্তু আমার কাছে মাত্র পঁচিশ সেণ্ট আছে, আর যা কিছু ছিল আমার সবই তো খরচ করেছি। ব্যাঙ্কে আর কিছুই নেই। যে ডাক্তারটা আমায় দেখছিল, তার কাছেও ধার দাঁড়িয়ে গেছে; সে হয়তো ভাবছে আমি তার টাকা মেরে দেব। অ্যানিয়েলের কাছেও দু'সপ্তাহের ভাড়া বাকী পড়েছে, সে বেচারা নিজেই উপোস পাড়ছে, ওকেই হয়তো বাড়ী হ'তে উঠিয়ে দেবে। বাঁচবার জন্যে ধার ভিক্ষে সবই করেছি—আর কী করব?"

"ছেলেরা?" ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে।

"তিন দিন ধরে' বাড়ী আসছে না তারা," মেয়ারিজা জানায়, "এত

খারাপ আবহাওয়া। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে তারা যে কিছুই জানে না, এ যে হঠাৎ হ'ল, আমাদের হিসাবের ছ'মাস আগেই।"

টেবিল ধরে' দাঁড়িয়েছিল ইউরখিস। মাথাটা ওর ঝুঁকে আসে, বাহু পর্যন্ত হাত কাঁপে, মনে হয়, এখনই হয়তো পড়ে' যাবে। হঠাৎ অ্যানিয়েল নিজের নোংরা পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে আসে তড়বড় করে'; একটা নোংরা ন্যাকড়া বের করে' বলে, "কিছু টাকা আছে আমার, দেখ ইউরখিস, দেখ।"

গিঁঠ খুলে ও বের করে চৌত্রিশ সেণ্ট; সেগুলি দিয়ে বলে, "এগুলো নিয়ে গিয়ে তুমি নিজে একবার চেষ্টা কর ইউরখিস," সবলের দিকে চেয়ে বলে, "দাও না তোমরাও কিছু কিছু; একদিন ও ফিরে দেবেই। নিয়ে এখন তো যাক, পুরুষমানুষ অন্য জিনিস ভাবতে পারবে; কাউকে আনতে না পারলেও ক্ষতি নেই। ততক্ষণে এদিকে সব শেষ হ'য়ে যাবে।"

অন্য মেয়েরাও পকেট খুঁজে নিজ নিজ পুঁজি দিয়ে দেয়, কারও কাছে পুরো একটা সেণ্টও নেই, তাই দেয় ওরা। পাশের বাড়ীর মিসেস্ ওল্‌স্‌জিউস্কির স্বামী দক্ষ শ্রমিক, রোজগার বেশী, বেশী মদও খায় তবু সে প্রায় আধ ডলারের মত দেয়, সবটা মিলিয়ে এক ডলার পঁচিশ সেণ্ট ওঠে। সেগুলোকে ইউরখিস পকেটে পোরে, কিন্তু পকেট ছাড়ে না, মুঠো করে' পকেটের মধ্যেই ধরে' থাকে। সাহস পায়। এক দৌড়ে বেরিয়ে যায় এবার।

ঊনবিংশ অধ্যায়

অ্যাভেনিউতে একটা মদের দোকানের ওপর তিনতলার একটা জানালা হ'তে একখানা সাইনবোর্ড ঝুলছে বা দুলছে "ম্যাডেম হন্ট্, ধাত্রী"। নীচে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে হাত আঁকা আর একখানা সাইনবোর্ড; ঘিঞ্জি সিঁড়ি; এক-এক লাফে ইউরঘিস তিনটে করে' সিঁড়ি পার হ'য়ে যায়।

ধাত্রী হন্ট্ তখন শূকরমাংস ও পেঁয়াজ ভাজছিলেন; ধোঁয়া বের হ'বার জন্য দোরটা একটু ফাঁক করে' রাখা হ'য়েছে। অধৈর্য ইউরঘিস একটা টোকা মারতেই আধাখোলা কপাট পুরোপুরি খুলে যায়। শ্রীমতী তখন ঊর্ধ্বমুখিনী হ'য়ে একটা কালো বোতল উজাড় করলেন মুখের ভেতর। ফস্ করে' বোতল রেখে ফিরে দাঁড়ান শ্রীমতী; দৃ[illegible]ত একটা ঝাপ্টা খায় যেন ইউরঘিস; শ্রীমতী সাগরদোলায় দোলা[illegible]ন নৌকার মত এগিয়ে আসেন; ঘরের আসবাবগুলো তাঁর চলার প্রভাবে আওয়াজ করে, ঠোকা লাগে বাসনে বাসনে। কালো কালো দাঁত বের করে' বলেন—"কী চাই?"

দৌড়ে এসেছে ইউরঘিস এতখানি পথ, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে এতগুলো সিঁড়ি, হাঁফ ধরে' গেছে; চটপট কথা কইতে পারে না; শ্মশানচারীর মত দেখতে লাগে ওকে চোখের চাহনিতে, বেশে, হাবভাবে; কোনরকমে বলে, "আমার স্ত্রী···শীগ্গির আসুন।" শ্রীমতী কড়াই হাতেই এগিয়ে এসেছিলেন, সেটাকে এবার ধীরে সুস্থে পাশে রেখে, হাত মুছে বলেন, "মানে, এটা প্রসবের জন্য আমাকে যেতে হবে, উ?"

"হুঁ।"

"এইমাত্তর একটা প্রসব করিয়ে আসছি। এখনও একটা দানা দিতে পারিনি মুখে। তা' যদি, ধর, খুব কঠিন…"

"হুঁ, হুঁ, অবস্থা খুব খারাপ।"

"তা হ'লে অবশ্য…আ, হ্যাঁ, তা দেবে কত ?"

"আমি…আমি…কত নেবে তুমি ?" আপনি বলায় ভদ্রতা ভুলে যায় ইউরযিস।

"পচিঁশ ডলার।"

ইউরযিসের মুখ ভোঁতা হ'য়ে যায়। বলে, "অত আমি দিতে পারব না।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শ্রীমতী ওকে লক্ষ্য করছিলেন; প্রশ্ন করলেন, "কত দিতে পারবে ?"

"এখনই দিতে হবে—নগদ ?"

"হুঁ। আমার সব গাহকেই তাই করে।"

"আমার—আমার—আমার কাছে তো বেশী টাকা নেই," কাতুর আর্তস্বরে বলে' চলে ইউরযিস, "আমি ছিলাম—আমি বিপদে পড়েছিলাম, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তোমার পাওনা আমি মিটিয়ে দেব, পাই পয়সাটী পর্যন্ত মিটিয়ে দেব, ক্ষমতা হ'লেই দিয়ে দেব। আমি খাটতে পারি—"

"কী কাজ কর ?"

"এখন কোন কাজ নেই, চাকরি গেছে। তবে আমি—"

"নগদ কত আছে তোমার কাছে ?"

উত্তর দেওয়া মুস্কিল হ'য়ে পড়ে ইউরযিসের পক্ষে। তবু বলে, "সওয়া এক ডলার।"

শ্রীমতী হেসে ফেলেন, বলেন, "সওয়া এক ডলারের টুপীই পরি না আমি।"

কাতরভাবে ভগ্নস্বরে ও আবেদন জানায়, "এর [illegible] যে আমার নেই। কাউকে পেতেই হবে আমার—নইলে [illegible] বৌ মরে' যাবে। অন্য কোন উপায় নেই আমার—আমি—"

শ্রীমতী ইতিমধ্যে ফের তাঁর মাংস-পেঁয়াজী উনুনে চড়িয়েছেন; সেখানকার ধোঁয়া ও শব্দের মধ্য হ'তে মুখ ফিরিয়ে বলেন, "থাকগে, এখন নগদ দশ ডলার দাও। পরের মাসে বাকীটা [illegible] দিও।"

"কিছুতেই যে অত দিতে পারব না, নেই আমার [illegible] অত টাকা। বললাম যে মাত্র সওয়া এক ডলার আছে আমার কাছে।"

কাজে মন দিয়ে শ্রীমতী বলেন, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। ও সব আমাকে ঠকাবার ফন্দী। তোমার মত অত বড় একটা মদ্দ, কী কারণে তার কাছে মাত্র সওয়া ডলার থাকবে, শুনি?"

এর সামনে ইউরঘিস নতজানু হ'তেও তৈরী হ'য়ে যায়; বলে, "জেলে যেতে হ'য়েছিল আমায়—তার আগেও আমার টাকাকড়ি কিছু ছিল না, আমার পরিবারের লোকদের উপোস পাড়তে হ'য়েছে—"

"তোমার বন্ধুবান্ধব তো আছে, তাদের তো আজ সাহায্য করা উচিত।"

"তারাও তো সব গরীব," উত্তর দেয় ইউরঘিস, "তারাই [illegible]কে এই সওয়া ডলার দিয়েছে; করবার যা ছিল সব করেছি।"

"বেচবার মত আর কিছু নেই তোমার কাছে?"

"কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই আমার, বলছি না তোমায়, কিছুই নেই আমার।"

"তা হ'লে ধার করতে পার না? তোমার পাড়ার দোকানদাররা তোমায় বিশ্বাস করে না?"

ইউরঘিস মাথা নাড়ে, "না।"

শ্রীমতী বলেন, "আমি গেলে তুমি খুশী হবে, তা জানি; আমি

দিয়ে তোমার স্ত্রী, তোমার শিশুকে বাঁচিয়ে দেব—তারপর তোমার মনে হবে এটা কিছু না। তাদের যদি এখন হারাও কী অবস্থা হবে তোমার? আর এই যে আমাকে দেখছ, নিজের কাজ বাবা আমি খুব জানি। এই বাড়ীরই অন্য ধাইদের কাছে তোমায় পাঠাতে পারি, তারা বলবে দেখ—"

কতকটা অনুরোধের ভঙ্গীতেই মহিলা তাঁর খুন্তিটা বারবার ইউরঘিসের মুখের দিকে নাড়ছিলেন, কিন্তু তাঁর কথাগুলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সইবার ক্ষমতা ইউরঘিসের ছিল না; "হুঃ" বলে' হতাশায় সে হাত দুটো ছুঁড়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়; বলে, না না না, ওসব শুনে আমার লাভ নেই।"

পিছন হ'তে শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়: "আচ্ছা যাও, তোমার জন্য পাঁচ ডলারেই করে' দেব আমি।" বলতে বলতে তিনি ইউরঘিসের পিছু ধরেন, যুক্তি দিয়ে বোঝান: "এ দরেও রাজী না হ'লে বলব, তোমার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এর কমে এই বৃষ্টিবাদলার দিনে তুমি আর কাউকে পাবে না, তা বলে' দিচ্ছি। এত কমে এ কাজ জীবনে করিনি আমি। ঘরের ভাড়া দিতে পারিনি—"

রাগে ইউরঘিস কী একটা খিস্তি করে; ধাত্রীর কথায় বাধা পড়ে; চীৎকার করে ইউরঘিস: "না থাকলে দেব কোথা হ'তে? জাহান্নমে যাক্। থাকলে তোমায় দিতাম, নিশ্চয়ই দিতাম, বুঝেছ? নেই আমার, নেই।" বলেই ও তর তর করে' আবার নামতে থাকে। অর্ধেক সিঁড়ি নেমে গেছে, পিছন হ'তে হঠাৎ চেঁচায়, "দাঁড়াও। যাব আমি যাব, ওপরে এসে দাঁড়াও।" ধাত্রীর ঘরে আবার ফিরে আসে ইউরঘিস।

বিষণ্ণকণ্ঠে ধাত্রী বলে, "কা'রও কষ্টের কথা ভাবা ভাল নয়। যা কিছু তা নিয়ে যাওয়াও যা, মুফৎ যাওয়াও তাই, তবু আমার যা করবার তা করব। কত দূর তোমার বাড়ী?"

"এখান হ'তে তিন-চারখানা বাড়ী পরেই।"

"তিন-চারখানা! তার মানে আমি ভিজে যাব। হায় ভগবান্! আরও বেশী পাওনা উচিত ছিল। মাত্তর একটা ডলার আর পঁচিশ্টে সেণ্ট্, তাও আবার এই দিন! কিন্তু বুঝছ তো, পারলেই আমার বাকী পঁচিশ ডলার দিয়ে দেবে।"

"যত শীগ্গির পারি।"

"এই মাসের মধ্যেই তো?"

"হ্যাঁ, এক মাসের মধ্যেই। যা বলবে, তাই। চল এখন।"

শ্রীমতী এবার বলেন, "কই, তোমার সওয়া ডলার কই?"

ইউরঘিস ওর ধারকরা সঞ্চয় টেবিলের ওপর রেখে দেয়, হণ্ট্ একটী একটী করে' সেগুলি গুণে তুলে রাখে। আবার হাত মুছে বহির্গমনের যোগ্য বেশভূষা করতে আরম্ভ করে; অত মোটা মানুষ, নড়তে চড়তেও কষ্ট হয় ওর; তবে মুখ ওর কামাই যায় না। ইউরঘিস ঘরে বসে' আছে, সেজন্য শ্রীমতীর বেশ খোলা-পরায় কোন ব্যাঘাত হয় না, ফেরবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। গাত্রাবরণ জোটে তো টুপি পাওয়া যায় না; তারপর ছাতাটা যে কোথায় রেখেছেন ছাই! এর পর আছে হাত-থলে, তার টুকিটাকি জিনিসগুলো কোথায় যে ছড়ান আছে! সেগুলো এক করে' পুরতে হয় থলেয়; ইতিমধ্যে ইউরঘিসের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়। পথে বেরিয়ে চলতে চলতে শ্রীমতী বারবার পিছিয়ে পড়েন; ইউরঘিস দু'-চার পা এগিয়ে যায় আর ফিরে চায় শ্রীমতীর দিকে, যেন ইচ্ছা দিয়েই ও শ্রীমতীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু ম্যাডেম হণ্ট্ অতিকষ্টে পদক্ষেপ করেন, আর নিশ্বাস নেবার জন্য একবার করে' দাঁড়ান।

বাসায় পৌঁছয় শেষ পর্যন্ত ওরা। তখনও প্রসব হয়নি; ওনার কান্না শোনা যায়। ডাক্তার টেবিলের সামনে থলেটা রেখে শ্রীমতী

তাঁর থলে থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বের করতে থাকেন—খানিকটা হাঁসের চর্বি, পুরোনো একটা পোষাক ইত্যাদি। যতবার এই চর্বি ব্যবহার হয়, ততবারই নাকি ধাত্রীর কপাল ফেরে; এজন্ত ওরা এই চর্বিটা নোংরা জামাকাপড়ের সঙ্গে কোন কুলুঙ্গি বা অমনি কোন জায়গায় মাসের পর মাস বছরের পর বছর পুরে রাখে।

সন্ধ্যার পর ওরা ওকে মইএর কাছে নিয়ে যায়; নীচে হ'তে ইউরথিস শোনে শ্রীমতী বিলাপ করছেন: "হা ভগবান্! আমায় কেন এখানে এনেছে গা। মই দিয়ে আমি উঠতে পারব না; ও চিলে-কোঠার ঘুলঘুলি দোর দিয়ে ঢোকা আমার কম্ম নয়! দেখব কি? চেষ্টাই করব না আমি; তার থেকে এখানে দাঁড়িয়েই তো আমি আত্ম-হত্যা করতে পারি! প্রসবের জায়গা বটে বাবা, একেবারে উই চিলেকোঠা—তাও আবার মই দিয়ে উঠতে হবে। লজ্জা হয় না গা তোমাদের?" দোর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল ইউরথিস; শ্রীমতীর বিলাপ বা তিরস্কারে ওনার গোঙানি চাপা পড়েছিল; কোন্‌টা ভাল বা বেশী খারাপ কে জানে! ইউরথিস শ্রীমতীর আলাপই শোনে।

অতিকষ্টে অনেক বুঝিয়ে অ্যানিয়েল ধাত্রীকে শান্ত করে; আর একবার মই আরোহণের ব্যবস্থা হয়। দু'এক পা উঠে ধাত্রী সাবধানী প্রশ্ন করেন, "দেখ বাপু, চিলেকোঠার মেঝে ঠিক আছে তো?" অহেতুক কথা নয়। মেঝেটার অর্ধেক আলগা আলগা করে' তক্তা পাতা আছে আর অর্ধেকটার আছে আ-ঢাকা কড়িবরগা। কোন-রকমে একবার পা হড়কালে আর দেখতে হবে না! তার ওপর ওপরটা অন্ধকার! কেউ আগে আগে একটা বাতি নিয়ে গেলে ভাল হয়। আরও বেশ কিছুক্ষণ কথাকাটাকাটি চলে; পরবর্তী অধ্যায়টা ইউরথিসের মনে থেকে যায়—হাতীর মত গোদা গোদা দুটো পা ঘুলঘুলি দোর দিয়ে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। সে পদযুগল একবার ভেতরে

পড়তেই চিলেকোঠাটা কেঁপে ওঠে। ইউরথিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে —কী হয়, কী হয়!

অ্যানিয়েল এসে ওর হাত ধরে, বলে, "খুব করেছ তুমি, আর কী করবে! যাও এবার এখান হ'তে, আর তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই। বাইরে যাও।"

"কোথায় থাকব আমি?"

"তার আমি কি জানি! যাবার আর কোন জায়গা না থাকে পথে যাও। যাও তুমি, যাও।"

মেয়ারিজা ও অ্যানিয়েল ওকে একরকম ঠেলেই বাড়ী হ'তে বের করে' দেয়। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; বৃষ্টির বদলে তুষারপাত সুরু হ'য়ে গেছে; বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানে জমে' যাওয়া। ও জামা-কাপড়ে আর এ শীত মানায় না; না দাঁড়িয়ে থেকে পকেটে হাত পুরে ও পা চালিয়ে দেয়। সকাল হ'তে খাওয়া হয়নি, দুর্বল অসুস্থ বোধ করে ও। হঠাৎ মনে পড়ে' যায়, মদের যে দোকানটায় বসে' ও টিফিন খেত, সেটা এখান হ'তে বেশী দূর নয়; দোকানের মালিক হয়তো দয়া করতে পারে, কোন বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হ'য়ে যেতে পারে। দ্রুত পা চালিয়ে দেয় এবার।

"কি হে জ্যাক!"—দোকানদার অভ্যর্থনা করে। বিদেশী ও অদক্ষ শ্রমিকদের ওরা জ্যাক বলে, "গিয়েছিলে কোথায় এতদিন?"

ইউরথিস সোজা মদের বারের দিকে এগিয়ে গড়গড় করে' বলে' চলে, "জেলে ছিলাম। বেরিয়ে সোজা আসছি। সমস্তটা পথ হেঁটে এসেছি। একটা আধলা নেই পকেটে। সকাল হ'তে কিছুই খাইনি। আমার বাড়ীটা গেছে; স্ত্রী অসুস্থ। সব দিক হ'তেই আমি মাটি হ'য়ে গেছি।"

দোকানদার ওর নোংরা বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে;

ইউরঘিসের ঠোঁট দুটো তখন ঠকঠক করে' কাঁপছে। দোকানদার একটা বোতল এগিয়ে দেয় ওর দিকে, বলে, "টান।"

ইউরঘিস বোতলটা ভাল করে' ধরতে পারে না, ভীষণ হাত কাঁপে। দোকানদার বলে, "ভয় কী! টান, টান!" বড় একটা গেলাসে ঢেলে সমস্ত মদটা সে ঢক ঢক করে' গিলে ফেলে; দোকানদারের ইঙ্গিত অনুযায়ী খাবারের জানালার দিকে চলে' যায়; সব কিছু চাইতে সাহস হয় না; প্রচুর পরিমাণে সস্তা খাবার নিয়ে ও ঠুসে ঠুসে খায়। খাওয়ার শেষে কৃতজ্ঞতা জানাবার একটা চেষ্টা করে, কিন্তু কথা ফোটে না। সে চেষ্টা ছেড়ে ও ঘরের মধ্যে অবস্থিত বড় লাল চুল্লটার পাশে গিয়ে বসে' পড়ে।

এ কঠিন দুনিয়ায় অতিভাল মানুষের সয় না। ইউরঘিসেরও এত আরাম সইল না। আগুনের তাপে ইউরঘিসের জামা হ'তে ভাপ উঠতে থাকে, আর তার সঙ্গে ছড়াতে থাকে সারের দুর্গন্ধ। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কারখানার ছুটি হবে, মজদুররা এখানে খেতে আসবে, কিন্তু ইউরঘিসের গন্ধে ঘরখানা মৌ মৌ করতে থাকলে কেউ এখানে ঢুকবে না। তা' ছাড়া আজ শনিবারের রাত্রি; মজদুর পরিবারগুলি আজ দোকানে খানাপিনা করবে, তারপর রাত্রি দুটো পর্যন্ত দোকানের পিছনের 'হলে' তাদের নাচগান চলবে। দোকানদার দু'একবার কাশে; ইউরঘিস নড়ে না। শেষ পর্যন্ত দোকানদারকে বলতেই হয়, "কিছু মনে করো না জ্যাক, তোমায় যে এবার উঠতে হয়।"

ভেসেবেড়ান মনুষ্যজঞ্জাল দেখে দেখে এ দোকানদারের অভ্যাস হ'য়ে গেছে, নতুনত্ব নেই আর তার কাছে; এর মত কত জ্যাককে সে প্রতিদিন "গরম" করে' দেয়—এরই মত কদর্য, নিঃস্ব, পরিত্যক্ত তারাও। কিন্তু তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে; কিন্তু ইউরঘিস এখনও

হাল ছাড়েনি, এখনও লড়ছে; ওর আত্মমর্যাদাবোধ এখনও নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। দোকানদারের কথায় লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করে' উঠে পড়ে। এতদিন ও মদ না খাক, এ দোকানের খাবার খেয়েছে অনেক; সুদিন এলে আবার ভাল খদ্দের হ'তে পারে। দোকানদার বলে, "লড়ছ দেখছি। ঠিক আছ। এদিকে এস।"

দোকানের পিছনে মদ রাখবার কুঠুরীতে যাবার একটা চতুর্দিক-ঢাকা সিঁড়ি আছে; তার দুই প্রান্তে তালাবদ্ধ দু'টী দোর। কোন খরিদ্দারের টাকা এবং রাজনৈতিক মতবাদ থাকলে দোকানদার তাকে নিরাপদে এখানে আশ্রয় দেয়। আজ ইউরঘিসকে ঢুকিয়ে দেয় এই সিঁড়িপথে। রাত কাটাবার ব্যবস্থা হয়।

মদে শরীরটা একটু গরম হ'য়েছিল সত্যি, কিন্তু এতে ক্লান্তির পর ঘুম পাড়াবার মত পরিমাণ নয় তার। জামা প্যাণ্টও ভিজে। সিঁড়ির মধ্যে গুটিসুটি হ'য়ে শুয়ে পড়ে ইউরঘিস, তন্দ্রা আসে হয়তো একটু, কিন্তু সে কতক্ষণ, শীতে তখনই আবার চমকে উঠে বসে। পাতলা দেওয়াল ও দোরের বাইরে চলে নাচগান হাসিহল্লা, ইউরঘিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে—তা হ'লে এখনও ভোর হয়নি। সময় কাটে। নাচগান বন্ধ হয়। ওর ভয় হয়, এবার হয়তো ওকে বের করে' দেবে। আরও সময় যায়, ওকে বের করে' দিতে আসে না কেউ। আশংকা হয়—ভুলে গেল নাকি ওকে?

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সময় যেন আর কাটতে চায় না; ঘুম আসে না, চুপ করে' এভাবে বসে' থাকাও অসম্ভব। উঠে ও দোরে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করে। দোকানদার জেগেই ছিল; মজদুর পাড়ায় মদের দোকানে শনিবারের রাত্রি, খদ্দের আসার আর বিরাম নেই। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে ভদ্রলোক দোর খুলে দেয়: "কী খবর?"

"বাড়ী যেতে চাই আমি," ইউরগিস জানায়, "স্ত্রীর জন্য ভাবছি; আর থাকতে পারছি না এখানে।"

"আগে বলনি কেন? ভেবেছিলাম যাবার জায়গাই নেই তোমার, বাড়ী তো দূরের কথা!"

তখন ভোর চারটে, তখনও বাইরেটা গাঢ় অন্ধকার। রাত্রে চার-পাঁচ ইঞ্চি তুষারপাত হ'য়েছে; এখনও প্রবল তুষারপাত চলেছে। এসব দেখবার সময় নেই ইউরগিসের, বেরিয়েই ও এক দৌড় দেয়।

অ্যানিয়েলের দোর তখনও বন্ধ হয়নি; ওপরের ঘরে একটা বাতি জ্বলছে, পর্দা টানা, শার্শি লাগান। দৌড়েই ঢোকে ও রান্নাঘরে। মেয়েরা তখনও তেমনি ঠেসাঠেসি ক'রে ব'সে আছে; কেউ কথা কয় না; ইউরগিস যেতে ওরা একবার চোখ তোলে কিন্তু কথা কয় না। ইউরগিস আওয়াজ দেয়—"হুঁ!"

কোন সাড়া আসে না মেয়েদের তরফ হ'তে। ফের জিজ্ঞেস করে ও, "খবর কী?" মেরারিজা ওর কাছাকাছি বসেছিল, শান্তস্বরে জানায়, "এখনও হয়নি।"

"এখনও না?" তীব্র চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করে ইউরগিস।

মেরারিজা মাথা নাড়ে, না। বোবার মত তাকিয়ে থাকে ইউরগিস। বুদ্ধি জোগায় না, জিজ্ঞেস করে, "ওর গোঙানি শুনছি না তো আর?"

"অনেকক্ষণ হ'ল চুপ ক'রেছে।"

এই সময় চিলেকোঠা হ'তে কণ্ঠস্বর শোনা যায়: "কই গা, শুনছ?" মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন দৌড়ে যায়, মেরারিজা ওকে আটকায়, "তুমি যেও না ইউরগিস।" দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে; ওপর হ'তে কথা শোনবার জন্য কান পেতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে হপ্টের মই বেয়ে নামবার শব্দ শোনা যায়, গজর গজর করতে করতে শ্রীমতী

নামছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি নেমে আসেন এ ঘরে—ক্ষোভে দুঃখে প্রায় রুদ্ধশ্বাস। তাঁর দিকে একবার চেয়েই ইউরখিসের মাথা ঘুরে যায়; শ্রীমতীর দেহের উর্দ্ধভাগ অনাবৃত, তাঁর হাতে মুখে কাপড়চোপড়ে রক্তারক্তি। হপ্‌ট্ জোর জোর নিশ্বাস টানেন, সকলের দিকে তাকান, বলেন, "আমার যথাসাধ্য আমি ক'রেছি। আর কিছু করবার নেই, করে' লাভও নেই।"

পুনরায় ঘর নিঃশব্দ হ'য়ে যায়। ধাত্রী বলেন, "আমার কোন ত্রুটি নেই। তোমাদের ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল। আমি যখন এলাম তখনই বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, তার আগেই ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল।" আবার ঘর নিঃশব্দ হ'য়ে যায়। একখানা হাতের সর্বশক্তি দিয়ে ইউরখিসকে ধরেছিল মেয়ারিজা।

হপ্‌ট্ অ্যানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন মদ আছে? ব্র্যাণ্ডি?"

অ্যানিয়েল মাথা নাড়ে, নেই।

"হা ভগবান্!" বিলাপ করেন হপ্‌ট্, "এমন মানুষ এরা! কিছু খেতে তো দেবে! কাল সকাল হ'তে পেটে একটা দানা পড়েনি। এদিকে খেটে খেটে প্রাণ যাবার উপক্রম। এ জানলে, ঐ টাকায় কি আর আসতাম আমি!" বলে' আর একবার চারিদিকে তাকিয়ে নেন, ইউরখিস চোখে পড়ে; তাকে দেখেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ফিরে আসে, তর্জনী নেড়ে সাবধান করে' দেন, "এ যাই হ'ক, আমার পাওনা তোমায় ঠিকই দিতে হবে। অত দেরীতে আমাকে ডাকতে গিয়েছিলে, তাতে আমার তো কোন দোষ নেই, দেরীর জন্যই তো তোমার স্ত্রীকে ভাল করতে পারলাম না, আমার দোষ কী? ছেলে যদি একটা হাত আগে বের করে' ভূমিষ্ঠ হ'তে চায় সে কি আমার দোষ? তাই তো তাকে বাঁচাতে পারলাম না। সারাটা রাত্রি দাঁতে একটা দানা না কেটে আমি খেটেছি! আর খেটেছি ঐ ঘরে, ওখানে কুকুরেরও প্রসব হওয়া

উচিত নয়। পকেটে দুটো টুকরো রুটি এনেছিলাম তাই রক্ষে, নইলে না খেয়েই মরতে হ'ত।"

নিশ্বাস নেবার জন্য শ্রীমতী একবার থামেন। মেয়ারিজা লক্ষ্য করে ইউরঘিসের দেহের অত বড় খাঁচাটা থরথর করে' কাঁপছে, কপালে বড় বড় ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে, আস্তে বলে, "ওনা কেমন আছে ?"

"কেমন আছে !" প্রতিধ্বনি করেন হস্ট্, "একা একা মরবার জন্যই তো ফেলে রেখেছিলে, আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, কেমন আছে ? বলেই তো দিয়েছি, পুরুত ডাকতে পার। কাঁচা বয়েস মেয়েটার, চিকিৎসা হ'লে সেরে উঠত, আবার গায়ে জোর পেত, কতদিন বাঁচত। লড়েছে বটে মেয়েটা—খুব লড়েছে—এখনও কাঠ মড়া হয়নি।"

"মড়া !" তীক্ষ্ণ শব্দ বেরিয়ে যায় ইউঘিসের মুখ হ'তে।

রাগতভাবে শ্রীমতী বলেন, "মরবে তো বটেই। ছেলেটা তো মরেই গেছে।"

এবার আর ইউরঘিসকে রোখা যায় না; একদৌড়ে ও চিলে-কোঠায় উঠে যায়, সারা রাত্রি জলে' জলে' বাতিটা শেষ হ'য়ে এসেছে, অস্থির শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে আলোয় দেখা যায় একটা কোণে রাশিকৃত ছেঁড়া ন্যাকড়া ও কম্বলের মধ্যে একটা শায়িত দেহ, মাথার দিকে একটা ক্রুশ দাঁড় করান, তার পাশে একজন পুরোহিত বসে' আছেন; তার খানিকটা দূরে একটা কোণে গুটিসুটি মেরে বসে' এল্‌জ্‌বিয়েটা কাঁদছে। ওনার দেহটা একটা কম্বল দিয়ে ঢাকা, খালি মুখ ও একখানা বাহু অনাবৃত হ'য়ে আছে। চামড়ায় হাড়ে লেগে গেছে, চামড়ার রঙ্ খড়ির মত সাদা—অন্য কোথাও দেখলে ইউরঘিস এ কংকালকে চিনতে 'পারত না। মৃতের মত পড়ে' আছে ওনা। ইউরঘিসের অন্তর মোচড় দিয়ে ওঠে, দেহের পাশে বসে' ব্যথিত হৃদয়টাই প্রকাশ করে, "ওনা ! ওনা !"

ওনা নড়ে না। ওনার একখানা হাত তুলে নেয় ইউরঘিস; আকুলভাবে বলে, "আমার দিকে চাও ওনা! কথা কও! আমি ইউরঘিস! তোমার ইউরঘিস ফিরে এসেছে! কথা কও ওনা, কথা কও!"

আঁখিপল্লব যেন ঈষৎ আন্দোলিত হয়। মহাআগ্রহে ও আবার ডাকে, "ওনা! ওনা!"

হঠাৎ ওনার চোখ খুলে যায়, মুহূর্তের জন্য। একমুহূর্তের চাহনি; কিন্তু তাতেই যেন ওকে চিনতে পেরেছে; অনেক দূর, বহু দূর হ'তে যেন এ পরিচয়ের দৃষ্টি আসছে—সেখানে ওনা একা দাঁড়িয়ে আছে। ও বাহু বাড়ায়, আকুল আগ্রহে ডাকে। এক নব ব্যাকুলতা জন্ম নেয় ওর বুকে, হৃদয়তন্ত্রী যেন টুকরো টুকরো হ'য়ে যায় ওর। কিন্তু সবই বৃথা হ'য়ে যায়—দূরে সরে' যায় ওনা, অনেক দূরে চলে' যায় ওর কাছ হ'তে। অসহ্য হৃদয়বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে ইউরঘিস, ভাষাহীন কান্নায় কাঁপতে থাকে অতবড় দেহটা; মৃতের মুখ ভাসিয়ে দেয় ও তপ্ত অশ্রুতে। ওনার হাত দু'টো চেপে ধরে, নাড়া দেয় ওর অসাড় দেহটাকে বারবার, ক্ষুদ্র হাল্কা দেহটা তুলে নিয়ে বারবার বুকে চেপে ধরে। ওনা কিন্তু সাড়া দেয় না—সে চলে' গেছে—চলে' গেছে ওনা।

কথাটা ওর অন্তরে ঘণ্টাধ্বনির মত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে চলে—নেই, নেই! সে ধ্বনিতে হৃদয়ের কত বিস্মৃত তন্ত্রী অনুরণিত হ'য়ে ওঠে; অন্ধকারের ভয়, শূন্যের ভয়, ধ্বংসের ভয় ছায়ামূর্তির মত নৃত্য করে মনের মাঝে। ওনা নেই, মরে' গেছে, মরে' গেছে ওনা। ওনাকে আর কখনও দেখতে পাবে না ও, কখনও শুনতে পাবে না ওনার কণ্ঠস্বর। একাকিত্বের হিমশীতল একটা বিভীষিকা যেন ওকে পেয়ে বসে। দেখে, সকলের হ'তে দূরে ও বসে' আছে, আর দূরে এই সংসার ছায়ার মত, চঞ্চল স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র শিশুর মত

ও যেন হারিয়ে গেছে, একান্ত আপনার জনটীকে বারবার আকুল হৃদয়ে ডেকে চলেছে, কিন্তু সাড়া নেই, উত্তর নেই, ওরই ধ্বনি হতাশার প্রতিধ্বনিত হ'য়ে হ'য়ে ফিরে আসে বারবার; অশান্ত দুরন্ত অবুঝ এ শিশু তবু আহ্বান জানায়।

একটীমাত্র শব্দ, কিন্তু কী ভীষণ করুণ সে ধ্বনি! নীচে মেয়েরা আরও ভয় পেয়ে যায়, আরও ঘেঁষাঘেঁষি করে' বসে তারা। ওদিকে কোন সান্ত্বনা মানতে চায় না ইউরঘিস, কোন শব্দ শোনে না। পুরোহিত ওর কাঁধে হাত রেখে কী বলে ফিস ফিস করে', ওর কাণে কিন্তু কিছুই ঢোকে না। অতিদূরের ছায়াপথ ধরে' পলায়মান আত্মার পিছু পিছু ছুটে চলেছে ও তখন।

ঐ ভাবেই ও পড়ে' থাকে। ধূসর উষার আলো প্রবেশ করে সে চিলেকোঠাটুকুতেও। পুরোহিত চলে' গেছে, মেয়েরা চলে' গেছে—ইউরঘিস তখনও পড়ে' আছে সেই শীতল অসাড় কংকালখানা নিয়ে—ওর চাঞ্চল্য অনেকাংশে কমে এসেছে, কিন্তু ধীর একটানা বিলাপ ওর থামেনি—ওর ওনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—এ শত্রুকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, তবু ও লড়বে এই অদৃশ্য শয়তানের সঙ্গে। এক-একবার একটু দূরে সরে' এসে মৃত মুখখানা দেখে—ভাবলেশহীন বিবর্ণ সে মুখের দৃশ্য সইতে পারে না, আবার হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে থাকে। এ চিন্তাটা সহ্য করতে পারে না ও—মরে' গেছে, মরে' গেছে!! আর ওনা? ওই অতটুকু, বয়স বোধ হয় আঠারও হয়নি; জীবন ওর সুরুই হয়নি—তাকে এইভাবে ক্ষতবিক্ষত করে' নির্যাতন করে' হত্যা করা হ'ল!

ভোর গিয়ে সকাল হ'য়েছে; ইউরঘিস টলতে টলতে নেমে এসে রান্নাঘরে ঢোকে; ওর মুখও মৃতের মতই ক্যাকাসে, দৃষ্টি বুদ্ধিহীন। আরও কয়েকজন প্রতিবেশী এসেছে, তারা ওর দিকে চেয়ে থাকে, কথা

কয় না। ও-ও কথা কয় না। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' বাহুর মধ্যে মুখ লুকোয়।

এর কয়েক মিনিট পরে বাইরের একটা ধাক্কায় সদর দোরটা খুলে যায়, ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপ্টা আসে—তারই সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে ঢোকে কোট্রিনা, ঠাণ্ডায় নীল হ'য়ে গেছে; ঢুকেই বলে, "ফিরে এসেছি আবার! অতি কষ্টে—"

ইউরঘিসকে দেখে কথা আর শেষ করা হয় না ওর। একে একে সকলের মুখের দিকে চেয়ে ও বোঝে, কিছু একটা ঘটে' গেছে, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, "কী হ'য়েছে?"

কেউ জবাব দেবার আগেই ইউরঘিস ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ধমকায়, "ছি'লি কোথায়?"

"ভাইয়েদের সঙ্গে কাগজ বেচছিলাম।"

"পয়সা আছে তোর কাছে?"

"আছে।"

"কত?"

"প্রায় তিন ডলার, ইউরঘিস।"

"দে আমাকে।"

ওর ভাবভঙ্গীতে ভয় খেয়ে গিয়েছিল মেয়েটা; ইউরঘিস আবার ধমক দেয়, "দে বলছি।" কোট্রিনা পকেট হ'তে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধা সঞ্চয় বের করে। বিনা বাক্যব্যয়ে এটা নিয়ে ইউরঘিস বাড়ী হ'তে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে।

তিনটি বাড়ী পরেই একটা মদের দোকান। সেখানে ঢুকেই ও ফরমায়েশ করে, "হুইস্কি!" একটা বোতল আসে। দাঁতে কেটে ন্যাকড়ার গিটটা খুলে ফেলে একটা আধ ডলার ফেলে দেয়। বলে, "কত করে' বোতল, মাতাল হ'তে চাই আমি।"

ত্রিংশ অধ্যায়

অত বড় একটা মরদ তিন ডলারে বেশীক্ষণ মাতাল হ'য়ে থাকতে পারে না। সেটা ছিল রবিবারের সকাল; সোমবার সন্ধ্যায় ওর নেশা কেটে যায়; অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে ও; অথচ তিন-তিনটে ডলার খরচ করে' ও না হ'তে পারল মাতাল, না পারল এক মুহূর্তের জন্ত শোকের হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ করতে।

ওনাকে এখনও কবর দেওয়া হয়নি; পুলিসকে অবশ্য খবরটা দেওয়া হ'য়েছে; ভিখিরীদের কাফনে, ভিখিরীদের কবরখানায় তারা ওকে কবর দেবে। তা দিক; তবু একটু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা তো করতে হয়, সেটা মুফৎ হবার নয়; এলজ্‌বিয়েটা এজন্ত প্রতিবেশীদের দোরে দোরে ভিক্ষা করতে বে'রিয়েছে; ছেলেগুলো চিলেকোঠায় পড়ে' পড়ে' উপোস পাড়ছে, মৃত্যুর জন্ত হয়তো বা অপেক্ষা করছে। আর ও, ইউরগিস? অপদার্থ নচ্ছার ওদেরই পয়সা উড়িয়ে বেড়াচ্ছে মাতলামো করবার জন্ত!—অ্যানিয়েল জানিয়ে দেয়। ও সব গ্রাহ্য না করে' ইউরগিস চুল্লির দিকে এগিয়ে যায়, অ্যানিয়েল বাধা দেয়, তার রান্নাঘরে আর সে ইউরগিসকে দুর্গন্ধ ছড়াতে দেবে না। ওনার জন্ত সে তার অন্ত ভাড়াটিয়াদের এক ঘরে পুরেছিল; কিন্তু আর না; ওরা ভাড়া নিয়েছে চিলেকোঠাটা, সেখানে থাকতে পারে ও—তাও বেশী দিন নয়, দু'-এক দিনের মধ্যে কিছু ভাড়া দিতে না পারলে, সেটাও ছেড়ে যেতে হবে।

বিনাবাক্যব্যয়ে ইউরগিস রান্নাঘর ছেড়ে, পাশের ঘরটার জন ছয় ঘুমন্ত ভাড়াটিয়াকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে যায়। চিলেকোঠার ঘরখানা

অন্ধকার, বাতি কেনবার পয়সা নেই; তার ওপর বাইরে পথের মতই ভেতরটা ঠাণ্ডা। শব হ'তে যতদূরে সম্ভব একটা কোণে বসে' বসে' মেয়ারিজা অ্যাণ্টেনাসকে চুপ করাবার চেষ্টা করছে। আর একটা কোণে ইউৎসাপাস সারাদিন খেতে পায়নি বলে' কাঁদছে। মেয়ারিজা ইউরঘিসকে একটা কথাও বলে না; মার-খাওয়া কুকুরের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ইউরঘিস শবের কাছে বসে' পড়ে।

নিজের নীচতা ও ছেলেদের ক্ষুধার কথাই হয়তো ভাবা উচিত ছিল ওর; কিন্তু ও ভাবে ওনার কথা, শোক-বিলাসে আবার ভাসিয়ে দেয় নিজেকে; আর কোন শব্দ করতে লজ্জা হয়, চোখের জল ফেলতেও পারে না; অন্তরবেদনায় আবিষ্ট হ'য়ে ও শুধু নিঃশব্দে নিশ্চল হ'য়ে বসে' থাকে। এখন, ওনা চলে' যাবার পর ও বুঝতে পারে ওনাকে কী গভীরভাবেই না ও ভালবাসত—আজ ও এখানে বসে' আছে ওনার পাশে; কাল সকালে ওনাকে নিয়ে চলে' যাবে, তারপর এজীবনে আর ও ওর ওনাকে দেখতে পাবে না। ওর অন্তরের যে প্রেমকে সকলে অভুক্ত রেখে পিটিয়ে অসাড় করে' রেখেছিল, সে প্রেম আজ আবার চেতনা ফিরে পায়—স্মৃতির বন্যাদ্বার খুলে যায়; মিলনের বিগত দিন[illegible]লি জীবন্ত হ'য়ে ফিরে আসে। মনে পড়ে, লিথুয়ানিয়ার মেলায় প্রথ[illegible]র্শন, ফুলের মত ফুটফুটে মেয়েটী, পাখীর মত তার কলগুঞ্জন; বিবাহের পর প্রথম দিনগুলি মনে পড়ে—কত কোমল ওনার দেহ-মন, কী অগাধ বিস্ময়ভরা ওর অন্তর; প্রথম দিনের কথাগুলি আজও যেন কানে বাজে, ওনার প্রেমাশ্রুতে সিক্ত গণ্ড আজও সিক্ত মনে হয়। দারিদ্র্য ও ক্ষুধার নিষ্ঠুর দীর্ঘসংগ্রামে ইউরঘিসের কোমল প্রেম-প্রীতি পাষাণ হ'য়ে গিয়েছিল, ওনা কিন্তু বদলায়নি, চিরদিনই ওর অন্তর থেকে গিয়েছিল কোমল প্রেমাকুল—একটু ভালবাসার জন্য সে বারবার বাড়িয়েছে তার কোমল বাহু, কত কাতরতা, কত বিনয়! অথচ কি কষ্টই না সে

পেয়েছে—অসহ্য কষ্ট ভুগে গেল। হৃদয়হীনতায়, নিষ্ঠুরতায়, দুর্ব্যবহারে ইউরখিসও যেন সে সময়টা নিজেকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ওর বলা প্রতিটী নিষ্ঠুর কথা আবার ফিরে আসে, ছুরির মত বিদ্ধ করে ওর অন্তরকে; তার প্রতিটী স্বার্থপরতা আজ নিদারুণ যন্ত্রণা হ'য়ে ফিরে আসে। আজকের এই প্রেম, এই আসক্তি, এই ব্যাকুলতা আর সে জানবে না, শুনবে না, বড় দেরী—বড় দেরী হ'য়ে গেছে! হৃদয় আজ প্রকাশের পথ পায় না, বিস্ফোরিত হ'বার উপক্রম হয়, কিন্তু কোন উপায় নেই, আজ সেই ওনারই পাশে ও বসে' ব্যাকুল বাহু বাড়ায় তাকে একটীবার কাছে পাবার জন্য, কিন্তু ওনা আজ বহুদূরে, মরণের মুখে। মৃত্যু! এর প্রতিকারহীন চরম নির্মম আঘাতের বিভীষিকায় আর্ত্তনাদ করে' উঠতে চায় ওর অন্তর; তবু ও নিঃশব্দ, বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয় কপালে আত্মদমনের চেষ্টায়—কিন্তু নিজের প্রতি ঘৃণার জোরে একটা নিশ্বাস নিতে বা ফেলতেও সাহস হয় না ওর।

অনেক রাত্রে এল্‌জ্‌বিয়েটা ফিরে আসে; ভিক্ষে করে' পুরুতের মজুরী ও তুলেছিল, পথেই সেটা দিয়ে এসেছে—বাড়ী ফিরে ছেলেদের খিদে দেখে আর থাকতে না পেরে খরচ করে' ফেলে এই ভয়ে পথেই কাজ চুকিয়ে এসেছে। ভিক্ষে করতে করতে কার কাছে একটুকরো পচা রুটিও পেয়েছিল, সেইটুকু দিয়ে ছেলেদের চুপ করায়; ছেলেদের কাছে ওই-ই রাজভোগ, ঐটুকু খেয়েই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। তখন এল্‌জ্‌বিয়েটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নিঃশব্দে ইউরখিসের পাশে বসে।

এল্‌জ্‌বিয়েটা ওকে তিরস্কারের একটা শব্দও বলে না; মেরিজা এবং এল্‌জ্‌বিয়েটা আগেই ঠিক করেছিল, ধমকাধমকি করা হবে না ইউরখিসকে, ওর মৃতা স্ত্রীর পাশে বসে' ওরা ওর কাছে শুধু আবেদন জানাবে। এল্‌জ্‌বিয়েটা ইতিমধ্যেই অশ্রুর দ্বার রুদ্ধ করে' দিয়েছে, ভীতির ভিড়ে শোক আর হৃদয়ে বসবার স্থান পায়নি। একবার

একটা ছেলেকে কবর দেবার পর আঘাত ও পেয়েছিল বেই, কিন্তু বিশ্রাম পায়নি ; পর পর আরও তিনটীকে কবর দিয়ে . কবর দেবার পরই অন্তগুলিকে বাঁচাবার লড়াইয়ে মন-প্রাণ পে দিয়েছে। এলুজ্‌বিয়েটা অনেকাংশে আদিম এককোষী জীবের সঙ্গে তুলনীয়া ; কেঁচোর মত অর্ধেক কেটে দিলেও ও বেঁচে থাকে ; মুরগীর একটীর পর একটী বাচ্ছা কেড়ে নিলেও সে শেষটীর লালনপালনে আত্মনিয়োগ করে। প্রকৃতিবশেই এলুজ্‌বিয়েটা এভাবে চলতে পারে, এ অন্যায় অবিচার নিয়ে ও অভিযোগ করে না, ধ্বংস ও মৃত্যুর রাজে চ থাকা বা রাখার চেষ্টারও মূল্য যাচাই করে না।

ওর এই সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান দিয়েই ও বোঝায় রঘিসকে, চোখের জলে মিনতি জানায়। ওনা মারা গেছে সত্যি, কি অন্তগুলি বেঁচে আছে, তাদের তো বাঁচাতে হবে। নিজের সন্তানদে জন্য ও বলছে না ; যেমন করেই হ'ক ও নিজে আর মেয়ারিজ্ঞা এ মানুষ করে' তোলবার চেষ্টা করবে ; কিন্তু ইউরঘিসের নিজে ছেলে অ্যান্টেনাস তো আছে। ও তো ওনারই দান, ওরই মধ্যে র স্মৃতি বেঁচে আছে, রত্নের মত ওকেই তো রক্ষা করতে হবে ঘিসের, মরদের মত না দাঁড়ালে চলবে কেন ? আজ ওনা বেঁচে থ কলে, এখন কথা কইতে পারলে, ইউরঘিসকে কী করতে বলতো তা তো বোঝে ও। ওনার এভাবে মৃত্যু সত্যিই ভয়ানক, কোন সান্ত্বনাও নেই এর, কিন্তু জীবনে সুখ কী পেয়েছে একটা দিন ? তাইতো ও চলে' গেল। ওনাকে আজ ওরা কবর দিতে পারছে না, ওনার জন্য একটা দিন যে শোক করবে, সে সময়ও ওদের নেই, এ দুঃখ রাখবার কি স্থান আছে ? দুঃখে বুক ফাটলেও সইতেই হবে, ও:দের কপালই যে এই। এই ভোগান্তিতেই কি শেষ ? হাতে একটা পয়সা নেই, অথচ এতগুলি মুখে আহার দিতে হবে, নইলে এই কাচ্চাবাচ্চাগুলি যে না খেয়েই মরবে !

রোজগার না করলে তো ওদের চলবে না। ওনার কথা ভেবেও কি ও মরদের মত শোকতাপ ভুলে দাঁড়াতে পারবে না? বাড়ী গেছে, বিপদও গেছে। খরচ কমে' গেল। এখন বড় ছোট সকলে মিলে কাজ করলে ভাবনা কি ওদের, কিসের অভাব? কত ব্যগ্র হ'য়ে এল্‌জ্‌বিয়েটা ওকে এইভাবে বুঝিয়ে চলে। এল্‌জ্‌বিয়েটার সামনে বাঁচবার লড়াই। ইউরখিস মদ খেয়ে মাতলামো করবে এ ভয় ওর নেই, কারণ মদ খাবার টাকা নেই ইউরখিসের; ওর ভয় জোনাসের মত ইউরখিসও ওদের ছেড়ে পালাতে পারে।

কিন্তু ওনার মৃতদেহের সামনে ইউরখিস ওনার ছেলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা হয়তো চিন্তা করতে পারবে না। হাঁ, ইউরখিস প্রতিশ্রুতি দেয়, অ্যাণ্টেনাসের জন্যই ও খাটবে। অ্যাণ্টেনাসকে ও মানুষ ক'রে' তুলবেই, কালই চাকরী নেবে, ওনার দেহ কবর দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। ওরা ওকে বিশ্বাস করতে পারে। যা থাকুক কপালে, কথা ও রাখবেই।

হৃদয়ব্যথা মাথাব্যথা সব নিয়েই পরদিন প্রত্যুষে ও কাজের খোঁজে বেরিয়ে যায়। পুরানো কাজ ফিরে পায় কিনা খবার জন্য সিধে গ্রাহামের সার-কলে যায়। কিন্তু অফিসার ওকে দেখে মাথা নাড়ে, নাঃ, ওর জায়গায় লোক নেওয়া হ'য়ে গেছে, আর অন্য চাকরী তো খালি নেই।

"খালি হবে বলে' মনে হয় কি আপনার?" ইউরখিস জিজ্ঞাসা করে, "তা হ'লে নয় অপেক্ষা করি।"

"না, অপেক্ষা করে' লাভ নেই তোমার। এখানে তোমার কিছু হওয়া সম্ভব নয়।"

বিভ্রান্তভাবে চেয়ে থাকে ইউরখিস, "ব্যাপার কী? ঠিকমত করিনি আমি আমার কাজ?"

উপেক্ষভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে অফিসার বলে, "বললাম তো, তোমার কিছু হবে না এখানে।"

কথাটার ভয়াবহ মানে যেন বুঝতে পারে ইউরঘিস; বুকটা দমে' যায়; ধীরে ধীরে ও স্থানত্যাগ করে। ফটকের বাইরে তুষারের মধ্যে ও অন্যান্য বুভুক্ষু হতভাগ্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে। অভুক্ত অবস্থায় এখানে দুটি ঘন্টা ও অপেক্ষা করে অন্যদের সঙ্গে; লোক নেবার সময় পার হ'য়ে যায়; লাঠিপেটা করে' পুলিস ওদের নিত্যকার মত বিতাড়িত করে। সেদিন আর ওর তরে কোন কাজ নেই।

কারখানা অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে অনেকের সঙ্গেই ওর আলাপ হ'য়ে গেছে। পরিচিত মদের দোকানদার ওকে এক গেলাস মদ আর একটুকরো স্যাণ্ডউইচ ধারে বিক্রি করে, ইউনিয়নের বন্ধুরা দু'চার পয়সা ধারও দেয়। ফলে এটা ওর কাছে জীবন-মরণ সমস্যা হ'য়ে দেখা দেয় না; আরও হাজার হাজার লোকের মত এইভাবে সমস্ত দিনটা আশেপাশে ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দিয়ে কাল আবার আসতে পারবে। এভাবে কয়েকটা সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া খুব কষ্টকর নয়। ওদিকে এল্‌জ্‌বিয়েটা ভিক্ষে করবে, ছেলেরা যা আনবে তা দিয়ে আ নয়েল ও ক্ষুধাকে কোনপ্রকারে রুখে রাখা যাবে।

কঠিন ঠাণ্ডায় এইভাবে একটা হপ্তা কাটাবার পর জোন্সের একটা প্যাকিং কক্ষে ও সুযোগ পেয়ে যায়। একজন 'প্রধান' ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ইউরঘিস ডেকে জানায় কাজ চায় ও।

"গাড়ী ঠেলতে পারবে?"

অফিসারের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ইউরঘিস জবাব দেয়, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নাম কী তোমার?"

"ইউরঘিস রুদকস।"

"কারখানায় কাজ করেছ আগে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথায়, কোথায় ?"

"দু' জায়গায়। ব্রাউনের হত্যামঞ্চে আর ডারহামের সার-কলে।"

"সেখানে চাকরি গেল কেন ?"

"প্রথমটায় আহত হ'য়ে অসুখে পড়েছিলাম, দ্বিতীয়টায় এক মাসের মেয়াদ হ'য়েছিল।"

"ঠিক আছে। আমি তোমায় সুযোগ দেব। কাল সকাল সকাল এসে মিঃ টমাসকে খুঁজো।"

সুখবর নিয়ে বাড়ীমুখো দৌড়য় ইউরঘিস, কাজ পেয়ে গেছে ও, অবরোধের অবসান হ'য়েছে। পরিবারের অবশিষ্টাংশ সে রাত্রে মনের আনন্দে আনন্দের উৎসব করে। পরদিন কারখানা খোলবার আধ ঘণ্টা আগেই ইউরঘিস ফটকের সামনে হাজির হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রধান বেরিয়ে আসে; ইউরঘিসকে চোখে পড়তে কপাল কুঁচকে বলে, "ও, কাল তোমায় কথা দিয়েছিলাম কাজ দেব, তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হুঁ, দেখ বাপু, কিছু মনে করো না, তোমায় ে ার মত কোন কাজ তো নেই এখানে।"

ইউরঘিস ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়, "ব্যাপার কী ?"

কিছুই না; তোমায় লাগাতে পারি এমন কোন কাজই নেই।"

সার-কলের অফিসারের চোখের দৃষ্টি এর চোখে—সেই ঘৃণা, সেই শত্রুতামাখা দৃষ্টি। আর বাক্যব্যয় বৃথা বুঝে, নিঃশব্দে ও স্থানত্যাগ করে।

মদের দোকানে দোস্তরা ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়— কালাফিহরিস্তে নাম উঠে গেছে—হায় রে বেচারা! কী করেছিল ও, প্রশ্ন হয়—

অফিসারকে পিটেছিল! ও খোদা! বোঝ এখন! এবার ওর প্যাকিংশহরে কাজ খোঁজাও যা, শিকাগোর মেয়র হবার চেষ্টা করাও তাই। কাজ খুঁজে এত সময় নষ্ট করল কেন? প্রতিটি কারখানা, প্রতিটি অফিসে ছোট হ'ক বড় হ'ক প্রতিটি জায়গায়, মালিকরা ওর নাম একটা গোপন তালিকায় লিখে রেখেছে। খালি কি এখানে? দূরদূরান্তরের ছোট-বড় সব শহরে ছোট-বড় সকল রকম কারখানায়ও সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে ওর নাম পাঠান হ'য়ে গেছে। ওকে অভিযুক্ত করা, শাস্তি দেওয়া হ'য়ে গেছে—এর বিচার নেই, আপীল নেই। এই সব মালিকদের যেখানে একটু হাত আছে সেখানে আর ও কাজ পাবে না। খুশী হ'লে এ সব ও পরখ করে' দেখতে পারে, ওর মত হাজারো আদমী এমন চেষ্টা করে' সত্যিটা হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছে। একথাটা ওখানে কখনো খোলাখুলি বলা হবে না, আজ যেমন বলেছে, ব্যস ঐটুকুই! কাজের বেলা দেখবে সর্বত্রই এক—ওকে চায় না। নাম লুকিয়েও লাভ নেই—মালিকদের বহু টিকটিকি এজন্য নিযুক্ত আছে; নাম ভাঁড়িয়ে কোথাও কাজ পেলেও তিন দিনের বেশী কাজ রাখতে পারবে না। একটা লোকের জন্য এত করে কেন? একটাই তো উদাহরণ, এই উদাহরণ দিয়ে ওরা ইউনিয়নের উস্কানি, রাজনৈতিক অসন্তোষ প্রভৃতি চেপে রাখতে পারে; একটার জন্য ওরা একটা সম্পত্তি খুইয়ে দিতে পারে।

সংবাদটা ও গৃহপরিষদে নিয়ে যায়। বড় নিষ্ঠুর সংবাদ! এই অঞ্চলেই ও ঘর বানিয়েছিল। অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিল এই পরিবেশে, গড়ে' উঠেছিল বন্ধুবান্ধব পরিচিতের একটা সমাজ, অথচ এখানে ও কাজ পাবে না, সব দোর বন্ধ ওর কাছে। প্যাকিংশহরে কারখানা ছাড়া আর কিছু নেই—কারখানায় কাজ না দেওয়া মানে এখান হ'তে তাড়ান ওকে; আর-একবার বাড়ী হ'তে উঠিয়ে দেওয়া।

সেদিনকার সমস্ত দিনটা ও অর্ধেক রাত্রি তুটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে। নীচুশহরে ছেলেদের কাজের জায়গার কাছাকাছি গেলে স্থবিধা হ'তে পারে, কিন্তু এদিকে মেয়ারিজা সেরে উঠছে, এ অঞ্চলে সে একটা কাজ পেলেও পেতে পারে। দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য প্রণয়ীর সঙ্গে হপ্তায় একবারের বেশী আর দেখাই হয় না; এখান হ'তে চলে' গেলে সেটুকুও খতম হবে; প্রণয়ীকে একেবারে ছেড়ে যেতেও মন সরে না মেয়ারিজার। তার ওপর, এলজবিয়েটা ডারহামের অফিস ঝাঁট দেবার একটা কাজ নাকি পেলেও পেতে পারে, এই রকম একটা কথা শুনেছে, তার জন্য অপেক্ষা করা তো উচিত। ভেবে চিন্তে ঠিক হয়, ইউরগিস একা নীচুশহরে গিয়ে একটা কাজের চেষ্টা করবে, কাজ পেলে তখন পরামর্শ করে' যা হয় ঠিক করা যাবে। কিন্তু সে যে অচেনা জায়গা; ধার দেবার কেউ নেই, ভিক্ষে করলে জেলে যেতে হবে! স্থির হয়, প্রতিদিন ও ছেলেদের কারও সঙ্গে দেখা করে' তাদের রোজগার হ'তে পনেরো সেণ্ট্ করে' নিয়ে দিন গুজরান করবে। এতে আর কতক্ষণ লাগবে? তারপর সমস্ত সময়টা ও আরও হাজার হাজার কর্মহীন ভাগ্যহীন বুভুক্ষু কুটোর মত দোকানে হোটেলে কারখানায় কাজ খুঁজে বেড়াবে। আর রাত্রে? কোন দোরের সিঁড়ি, কি মোটরের তলায় তুপুর রাত্রি পর্যন্ত লুকিয়ে থেকে কোন ইষ্টিশন ঘরে ঢুকে পড়বে, সেখানে মেঝের ওপর একখানা খবরের কাগজ বিছিয়ে ওরই মত অন্য জঞ্জালদের মধ্যে পোকামাকড়দের সঙ্গে তামাক ও মদের তুর্গন্ধে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

আরও তুটো সপ্তাহ ও হতাশা-পিশাচের সঙ্গে লড়াই করে। একদিন একটা গাড়ী বোঝাইয়ের কাজ পেয়ে গেল, তাতে আধ রোজ হ'ল, আর একদিন এক মহিলার একটা বাক্স বয়ে' দিলে। এই রোজগার তুটো হ'তে ওদের থাকবার মত একখানা ঘরে রাত্রে মাথা

গোঁজবার এবং কোন কোন সকালে সাথীদের চোখের সামনে একখানা খবরের কাগজ কিনে কাজের খোঁজে লেগে যাবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল; অন্যরা বাইরে ঠাণ্ডায় জমে' মরে, সকালে ঘুরে বেড়ায় কে একখানা খবরের কাগজ ফেলে দেবে তারই আশায়। খবরের কাগজে ও কর্মখালির বিজ্ঞাপনও দেখে; বিজ্ঞাপন দেখে চাকরি খোঁজার সুবিধা হয় না, অনর্থক সময় শক্তি ও উৎসাহ নষ্ট হয়। এসবের অধিকাংশই কর্মখালির নামে কোম্পানীর সামনে ভিড় করিয়ে নিয়ে বিজ্ঞাপনের কাজ ক'রে' নেওয়া—ভোগান্তি হয় এই সব অজ্ঞ নিঃস্ব বেচারীদের। ইউরঘিসের খালি সময় নষ্ট হয়, কারণ নষ্ট করবার মত অন্য কিছু নেই ওর। যখনই কোনো মিষ্টিমুখো দালাল বিস্ময়কর কাজ পাইয়ে দেবার কথা বলে, ইউরঘিস মাথা নাড়ে, প্রয়োজনীয় টাকা তার নেই; দালাল ব্যাখ্যা করে—ফোটো রঙাতে পারলেই ওর এবং ওর পরিবারের সকলে "মোটা রোজগার" করতে পারবে; ইউরঘিস মাথা নাড়ে, জমা দেবার দুটো ডলার যে তার নেই!

ইউনিয়ন কালের একজন পুরাতন পরিচিতের সঙ্গে দৈবাৎ ওর দেখা হ'য়ে যায়, তার মারফৎ একটা কাজেরও সন্ধান এসে যায়। লোকটি বিপুল "কৃষক সমবায়ে" কাজ করে, সেখানেই কাজে যাচ্ছিল, পথে ইউরঘিসের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। সে-ই ইউরঘিসকে সঙ্গে যেতে বলে, অফিসারের সঙ্গে তার ভাল পরিচয় আছে, ইউরঘিসের জন্য সুপারিশ করবে। ওর সঙ্গে চার পাঁচ মাইল হেঁটে, বন্ধুর জোরে ফটকের বুভুক্ষবাহিনী পেরিয়ে ও ভেতরে চলে যায়। 'প্রধান' ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, বিভিন্ন প্রশ্ন করে' বলে, ওর জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করে' দিতে পারবে।

এ দৈবাৎ যে কতবড় দৈবাৎ ইউরঘিস তা সেদিনই আন্দাজ করতে পারে না, ধীরে ধীরে বোঝে; স্বদেশপ্রেমিকরা, সমাজসংস্কারকগণ

সগর্বে এই "কৃষক" কারখানাটিকে আদর্শস্থানীয় বলে' দেখান। এরা এদের কর্মচারীদের জন্য ভাবে, এদের কারখানার ঘরগুলো বড়, আলো-বাতাস আছে, মজদুরদের জন্য একটা সস্তা লাভহীন ভোজনাগার রেখেছে, একটা পাঠাগারও আছে, মজদুরণীদের বিশ্রামের জন্য ভব্য স্থানও আছে। প্যাকিংশহরের কারখানাসুলভ বহু নোংরা ও নোংরামিরও এখানে অভাব। আস্তে আস্তে ইউরঘিস এগুলি আবিষ্কার করে—এমন যে হ'তে পারে একথা ও কখনো কল্পনাও করেনি, এ ওর স্বপ্নের অতীত; শেষ পর্যন্ত নব কর্মস্থলটিকে স্বর্গ বলে' মনে হয় ওর।

এই বিপুল প্রতিষ্ঠান প্রায় সাড়ে পাঁচশো বিঘা জমির ওপর স্থাপিত, কাজ করে পাঁচ হাজার কর্মচারী, বৎসরে তিন লক্ষাধিক কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী হয়, দেশে ব্যবহৃত অধিকাংশ কৃষি যন্ত্রপাতি এখানেই তৈরী হয়। এ সবের কমই দেখতে পায় ইউরঘিস, তৈরী করে দক্ষ শ্রমিকরা, প্যাকিংশহরের মত এখানেও দক্ষ শ্রমিক আছে; শস্যকাটা একটা যন্ত্রের শত শত অংশ এক-একজনে তৈরী করে না; প্রতিটি পর পর কয়েক হাজার শ্রমিকের হাত পেরিয়ে যায়। ইউরঘিস যেখানে কাজ করে, সেখানকার যন্ত্রটা শুধু দু' বর্গ ইঞ্চি ইস্পাত কাটে; সারিবদ্ধভাবে ইস্পাতের টুকরোগুলো গাদা-গাদা হ'য়ে আপনাআপনি এগিয়ে আসে, তদারককারী শ্রমিক সেগুলিকে নিয়মিত সারিতে সাজিয়ে দেয় আর মধ্যে মধ্যে কাটা খণ্ডগুলি ধরবার পাত্র বদলে দেয়। একটি মাত্র বালক এ যন্ত্রটার খাদ্য যোগায়, তার চোখ ও চিন্তা নিবদ্ধ হ'য়ে আছে ঐ যন্ত্রমুখে; অতি দ্রুত আঙুল চালিয়ে টুকরোগুলোকে সে এগিয়ে দিচ্ছে, টুকরোর সঙ্গে টুকরোর ঠোকায় নিয়মিত একটানা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে, রাত্রে ধাবমান ডাকগাড়ীর ঘুমোবার ঘর হ'তে এই রকম একটানা আওয়াজ পাওয়া যায়। এও অবশ্য "ফুরোন" কাজ; তা ছাড়া যন্ত্রটার

গতি এমনভাবে রাখা হ'য়েছে যাতে মানুষের হাত যত দ্রুত চালান সম্ভব তত দ্রুত চালিয়ে যেতে ছেলেটা বাধ্য হয়। প্রতিদিন তাকে এগিয়ে দিতে হয় এমনি ত্রিশ হাজার খণ্ড, বৎসরে নয় দশ লক্ষ—জীবনে কত তার হিসাব দেবতারাই দিতে পারেন। তার পাশে ঘূর্ণ্যমান শাণচক্রসমূহের সামনে একদল লোক মাথা ঝুঁকিয়ে বসে' শস্যকাটা যন্ত্রের ফলায় শাণ দিচ্ছে; ডান হাতে একটা ফলা তুলে নিয়ে শাণ-পাথরের ওপর প্রথম একটা প্রান্ত তারপর আর একটা প্রান্ত চাপ দিলেই শাণ দেওয়া হ'য়ে যায়, বাঁ হাতে সেটা পিছনের ঝুড়িতে চালান হ'তে হ'তে আর একটা উঠে আসে ডান হাত দিয়ে। এই দলের একজন ইউরঘিসকে জানায়, গত তের বছর ধরে' সে প্রতিদিন তিন হাজার ফলায় শাণ দিচ্ছে। পাশের ঘরটায় আছে আশ্চর্যজনক একটা যন্ত্র। এটা লম্বা লম্বা লোহার শিক ধীরে ধীরে গিলে নিচ্ছে; সেগুলোকে ঠিক মাপমত টুকরো টুকরো করে' কেটে, প্রতিটি টুকরোর মাথা তৈরী করে' অপর প্রান্ত ঘষে স্থচালো করে' তার ওপর প্যাচ কেটে পুরো বল্টু বানিয়ে বের করে' দিচ্ছে—শস্যকাটা যন্ত্রে লাগালেই হ'ল। অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন অংশগুলিকে বিরাট বিরাট রঙের ডাবায় ডোবান হ'চ্ছে, সেখান হ'তে যাচ্ছে শুকোতে, শুকিয়ে তারে-ঝোলান গাড়ীতে চ'ড়ে চলেছে আর একটা ঘরে—এখানে লাল ও হলদে রেখা টানা হ'চ্ছে তাদের ওপর—যাতে মাঠে জিনিসটা দেখতে চমৎকার হয়, দেখলে আনন্দ হয়।

ইউরঘিসের বন্ধু কাজ করে ওপরতলার ঢালাই ঘরে, কলের একটা অংশ ঢালাই করা তার কাজ। সে একটা লৌহগ্রাহিকায় (পাত্রে) কালো বালি ঠেসে ঠেসে পুরছে, আরও শক্ত হ'বার জন্য সেটাকে পাশে সরিয়ে রাখছে, শক্ত হ'লে তার ওপর ঢেলে দেওয়া হ'চ্ছে গলিত লোহা। ঢালাইএর ওপর—অর্থাৎ যতগুলি ঐ অংশ নির্দোষভাবে তৈরী করতে পারবে, তার ওপর ওর মাইনে। ওর অর্ধেক কাজ বাতিল হ'য়ে যায়

প্রতিদিনই। ওর মত আরও কয়েক ডজন লোক এমনভাবে কাজ করছে যেন পালে পালে ভূত চেপেছে ওদের ঘাড়ে। ইঞ্জিনের চালক-দণ্ডের মত হাত দুটো এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে, কেশরের মত কালো লম্বা লম্বা চুলগুলো পিছনে উড়ছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরুচ্ছে, আর মুখের ওপর দিয়ে গড়াচ্ছে ঘামের নদী। ছাঁচে বেলচা বেলচা বালি পোরবার পর হাত বাড়াচ্ছে দুরমুসটার জন্য—এত তাড়াতাড়ি হাত চলছে যে দেখলে মনে হয় দ্রুত নৌকার দাঁড় টানতে টানতে হঠাৎ চোখে পড়ে গেছে—এই ধাক্কা লাগল একটা ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে! দাঁড় ছেড়ে হাত উঠল পাহাড়ের মাথায় ডাণ্ডা ধরতে—ঠিক সেইভাবে বেলচা ছাড়ে আর দুরমুস ধরে। সারাটা দিন লোকটা এইভাবে খেটে চলেছে, তার একমাত্র চিন্তা কীভাবে ঘণ্টায় সাড়ে বাইশ সেণ্টের জায়গায় তেইশ সেণ্ট্ রোজগার করা যায়। তারপর গণনাকারী সেগুলি গুণে হিসাব পাঠাবে, তখন সদাহাস্যময় মালিকরা বড় বড় ভোজসভায় এই হিসাব দেখিয়ে বক্তৃতা দেবেন, "আমাদের দেশের শ্রমিকরা অন্য যে কোন দেশের শ্রমিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কর্মদক্ষ!" এ পৃথিবীতে আমরা (মার্কিনরা) যদি শ্রেষ্ঠ জাতি হই, তা হ'লে তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে আমরা আমাদের মজুরীজীবীদের ডাণ্ডস মেরে মেরে এই গতিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পেরেছি। অবশ্য আমাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক আরও বস্তু আছে—যেমন মদের দরুণ জাতীয় খরচ আমাদের বাৎসরিক সওয়া একশো হাজার কোটি ডলার; প্রতি দশ বৎসরে খরচাটা দ্বিগুণিত হয়।

একটা যন্ত্র লোহার পাত্ কাটছে, আর একটা হ'তে বিরাট একটা হাতুড়ি পড়ছে কাটা পাতের ওপর, তার এক আঘাতেই পাতটা মার্কিন কৃষকের শস্যকাটা যন্ত্রের ওপর বসবার আসন হ'য়ে যাচ্ছে। তারপর সেগুলো চড়ছে ঠেলাগাড়ীতে; ইউরঘিসের কাজ এই ভর্তি গাড়ী ঠেলে

আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া; এখানে বিভিন্ন অংশ জুড়ে গোটা যন্ত্রটা তৈরী করা হ'চ্ছে। তার কাছে এ ছেলেখেলা; এজন্য ও দৈনিক মজুরী পায় এক ডলার পঁচাত্তর সেণ্ট্। পরের শনিবারেই ও অ্যানিয়েলের চিলেকোঠার ভাড়া পঁচাত্তর সেণ্ট্ দিয়ে দেয়; ওর কারাবাসের সময় বড় কোটটা বন্ধক পড়েছিল, সেটাও ছাড়ান হয়।

শেষেরটায় বড় উপকার হয় ওর। মাঝ-শীতে এ অঞ্চলে বড় কোট নইলে বাঁচা কঠিন। তার ওপর ওকে হয় গাড়ীতে নয় হেঁটে পাঁচ ছ' মাইল পথ যেতে এবং আসতে হয়; রেলের পথ; এ পথের অর্ধেক একদিকে আর অর্ধেক অন্যদিকে; আইন অনুযায়ী দুটো পথের টিকিট একই সঙ্গে দেওয়া উচিত; রেল কোম্পানী আইন এড়ায় পথের দুটো অংশ আলাদা আলাদা কোম্পানীর অধীন—এই অজুহাত দেখিয়ে। কাজেই গাড়ীতে যেতে হ'লে পথের প্রতি অংশের জন্য ইউরঘিসকে দশ সেণ্ট বা ওর আয়ের শতকরা দশ ভাগ এই ক্ষমতার কাছে সেলামী দিতে হয়; কয়েক বৎসর পূর্বে রেল কোম্পানী জনসাধারণের বিপুল বিরোধিতা সত্ত্বেও শহর সভাটি 'খরিদ' করে নেয়, তার পর হ'তেই এর ক্ষমতা অপ্রতিহত। কাজের পর বেরিয়ে পায়ে চললে খানিকটা ক্লান্তি ঘোচে, সকালে কাজে আসবার সময় অন্ধকার ও ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকে পথটা, তখন জোরে চললে গা গরম থাকে, ইউরঘিস তাই হেঁটেই যাওয়া-আসা করে বেশীর ভাগ সময়। পথের বাস্ কোম্পানীর ব্যবসাটাও একচেটে; বাসে যাত্রী কিছু কম হ'লেই, তারা বাসের সংখ্যা এমন কমিয়ে দেয় যে, বাস ব্যবহারে বাধ্য যাত্রীরা ভেতরে অসম্ভব ঠাসাঠাসি করবার পর বাইরে পাশাপাশি ঝোলে বাসের প্রায় তিনদিকে, অনেকে বরফঢাকা ছাদেও উঠে পড়ে। ভিড়ের জন্য বাসের দোর বন্ধ করা যায় না কখনো, ফলে ভেতরটা বাইরের মতই ঠাণ্ডা থাকে। অন্যান্য আরও অনেক মজদুরের মত ইউরঘিস ভাড়ার

পয়সা দিয়ে মদ খায়, মদ কিনলে মুফং কিছু খাবার মেলে; এ দুটো পেটে পড়লে হেঁটে যাবার শক্তিও হয়, আরামও পাওয়া যায়।

ডারহামের সার-কল হ'তে যে মুক্তি পেয়েছে তার কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ইউরঘিস আবার মনে বল পায়, মনে মনে পরিকল্পনা আঁটে। বাড়ী গেছে, কিন্তু ভাড়া সুদ বীমা প্রভৃতির দুর্বহ বোঝাও গেছে; এবার ভাল হ'য়ে মেয়ারিজ্জা কাজে লাগলে সুখেই আবার সংসার চলবে; বরং কিছু জমবে। কারখানার যে অংশে ইউরঘিস কাজ করে সেখানে ওরই মত আর একজন লিথুয়ানীয় কাজ করে; সমস্ত দিন বল্টু তৈরী করার পর রাত্রে সে বই খাতা নিয়ে ইংরেজী লেখাপড়া শিখতে যায় একটা সরকারী ইস্কুলে; তার আটটি ছেলেমেয়ে; এ রোজগারে চলে না; তাই শনিবারের অর্ধেক এবং পুরো রবিবার সে পাহারাদারের কাজ করে—তাতে পাঁচ মিনিট অন্তর একটি বাড়ীর দু'পাশের দুটো সুইচ টিপতে হয় ওকে—এক পাশ হ'তে অন্য পাশে যেতে লাগে দু' মিনিট, বাকী তিনটে মিনিট ও যাওয়া-আসার পথে বই পড়ে' নেয়। সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইউরঘিসের হিংসে হয় লোকটাকে দেখে—দু' তিন বছর আগে ঠিক এই রকম স্বপ্ন ও নিজেও তো দেখত। আজই বা সেটা অসম্ভব কিসে? আবার আজ চেষ্টা করতে পারে ও; তারপর যদি সুযোগ সুবিধা পায়, মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, তা হ'লে ও-ও একদিন দক্ষ শ্রমিক, এমন কি অফিসারও হ'য়ে যেতে পারে, এখানে দু'চারজন হ'য়েছেও। এ অঞ্চলে পুলিন্দা বাঁধবার দড়ি তৈরী করে একটা বড় কারখানা; ধর, সেখানে মেয়ারিজ্জার একটা চাকরি হ'য়ে গেল! তা হ'লে ওরা এ অঞ্চলে উঠে আসতে পারবে। তখন লেখাপড়া শেখবার সত্যিই একটা সুবিধা হবে ওর। এই ধরণের আশা নিয়ে বাঁচার একটা অর্থ হয়, এমন একটা কাজ যেখানে মানুষের মত ব্যবহার

পাওয়া যায়! ভগবান দিন দিলে ও দেখিয়ে দেবে, ওর মধ্যেও কৃতজ্ঞতা আছে। এ চাকরিটা আঁকড়ে থাকবার কত মতলবই আঁটে ও মনে মনে—আবার নিজের মতলব আঁটা দেখে আপন মনে আপনি হাসে।

এখানে কাজের ন'দিনের দিন বিকেলবেলা ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় টাঙানো বড় কোটটা ফটকের পাশের পোশাক ঘর হ'তে ও আনতে গেছে। দেখে ফটকের কাছে উদ্বিগ্ন একটা জনতার জটলা চলছে। এগিয়ে ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে জানে, 'কাল হ'তে ওদের কারখানাটা পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে'।

একবিংশ অধ্যায়

এইভাবেই মালিকরা এ কাজটি করেন। আধ ঘণ্টা আগেও মজুরীজীবীদের সাবধান করে' দেওয়া হয় না—হঠাৎ নোটিশ ঝুলল, কারখানা বন্ধ! অন্য মজদুরদের কাছে ইউরঘিস শোনে, এখানে আগেও এ রকম হ'য়েছে, আজ হ'ল, ভবিষ্যতেও চিরকাল এমনি হবে। জগতে যত শস্যকাটা যন্ত্র লাগতে পারে, সবই ওরা তৈরী করে' ফেলেছে, দু'-চারটে এখন ক্ষয়ে' ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত মালিকরা কারখানা বন্ধ করে' অপেক্ষা করবে! দোষ কারুরই না—এ বস্তুর দস্তুরই এই; হ্যাঁ, হাজার হাজার মেয়ে মরদকে এই মাঝ-শীতে পথে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল; কিছু জমিয়ে থাক খেয়ে বাঁচ, নয় মর। এমনিতেই তো শহরে কয়েক লক্ষ কর্মহীন গৃহহীন বুভুক্ষু ঘুরে বেড়াচ্ছে—বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত তাদের দলে জুগিয়ে দেওয়া হ'ল আরও হাজার পাঁচ!

বকেয়া সামান্য মাইনেটা পকেটে পুরে ইউরষিস 'বাড়ী' ফেরে—অভিভূত মুষড়ে-পড়া অবস্থা। চোখের ওপর হ'তে আর একটা পর্দা সরে' যায়, চল্‌তি পথের ওপর আর একটা খাল বদন ব্যাদান করে! কী মূল্য এই মালিকদের সদয় ব্যবহারের, শিষ্ট আচরণের?—চাকরিটা তো গেল! দুনিয়ায় যত দরকার তার চেয়ে বেশী শস্যকাটা যন্ত্র ওরা তৈরী তো করিয়ে নিলে! কী নারকীয় রসিকতা এদের—অতি নিপুণভাবে অতি দ্রুত দেশের প্রয়োজনীয় শস্যকাটা যন্ত্র তৈরী করার জন্যই এদের বেকার হ'য়ে না খেয়ে মরতে হবে!

বুকভাঙ্গা এই হতাশা জয় করতে ওর পুরো দুটো দিন লেগে যায়। মদ খেতেও পায় না এবার—এলজবিয়েটা ওর সমস্ত টাকা নিয়ে রেখে দিয়েছে; এতদিন ধরে' ইউরষিস্‌কে দেখছে, ওর রাগের দৌড় সে জানে; কাজেই রেগে চাইলেও একটা আধলা সে বের করবার পাত্রী নয়। বিষণ্ণ ক্ষুব্ধভাবে চিলেকোঠাতেই ও বসে' থাকে, কী হবে কাজ খুঁজে! এই তো কাজের হাল! কাজ শেখবার আগেই কাজ ছুটে যায়! কিন্তু টাকা ফুরিয়ে আসে আবার, অ্যান্টেনাসের খিদে কিন্তু কমে না। কাজেই আবার ওকে বেরুতে হয়।

আবার দশ দিন ধরে' পেটে খিদে নিয়ে দেহ ক্লান্ত করে' শহরের সড়ক-অলি-গলি সর্বত্র যে কোন রকম একটা কাজের খোঁজে ও বেড়াতে লাগল। ও কাজের চেষ্টা করে দোকানে, আড়তে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, কল-কারখানায়, পোস্তায়, ডকে, রেলের মালখানায়—সর্বত্র। কোথাও কোথাও দু'-একটা চাকরি খালি থাকেই, কিন্তু এক-একটা শূন্য পদের জন্য শত শত জোয়ান গুঁতোগুঁতি করে, ও আর সুবিধা পায় না। রাত্রে এখন শোয় লোকের দোরে, বারান্দার নীচের ঘুপচিতে, কোন চালা বা গাড়ীবারান্দায় পুলিস এড়িয়ে; তাও কপালে সইল না; শীতের শেষ-দিকেই বেজায় ঠাণ্ডা পড়ে' গেল, সূর্যাস্তেই তাপমানের পারা নামে

শূন্যের পাঁচ ডিগ্রী নীচে, রাত্রে আরও নামে, যত রাত্রি বাড়ে পারা ততই নামতে থাকে। বন্য জানোয়ারের মত ইউরঘিস লড়াই করে হ্যারিসন ষ্ট্রীটের বড় পুলিস-থানা-বাড়ীটায় ঢোকবার জন্য—এখানে একফালি সিঁড়িতে আরও দু'জনের সঙ্গে লাগালাগি করে' শুয়ে পড়ে।

আজকাল ওকে প্রায়ই লড়তে হয়,—শোবার একটু জায়গা করে' নেবার জন্য, উমেদারদের ভিড়ে সামনে দাঁড়াবার জন্য, তা ছাড়া [illegible]বাসী বুভুক্ষুদের নিজস্ব মারামারি তো আছেই। রেলযাত্রীর মোট বওয়ার কাজটা আগেই বিক্রী হ'য়ে থাকা জিনিস কিনতে যাওয়ার মত ব্যাপার; যেই একটা মোট ও ধরেছে অমনি আট-দশজন ছেলে বুড়ো জোয়ান একসঙ্গে ছোঁ মেরে পড়ল ওর ওপর—তখন মোট বওয়া দূরে থাকে, প্রাণটা বাঁচাতে পারলেও বাঁচে। পুলিসকে তারা সব সময়ই "চৌরস" করে' রেখেছে, ওর সেখানে টুঁ শব্দটি করা চলবে না, পুলিসের সাহায্য পাওয়া তো পরের কথা!

ছেলেদের কাগজ বেচার দাক্ষিণ্যটুকু না পেলে ইউরঘিসকে নির্ঘাৎ না খেয়েই মরতে হ'ত; তাদের এ দাক্ষিণ্যটুকু নিয়মিত বা নির্[illegible]ত নয়। এ শীত ছেলেরা সইতে পারে না; তাদেরও প্রতিদ্বন্দ্বী অ[illegible]—অবিরত সেখানেও মারামারি কাড়াকাড়ি, পয়সাকড়ি ছিনিয়ে নেওয়া সেখানেও আছে, আইনও ওদের বিরুদ্ধে। ছোটটি অর্থাৎ বিনিমাস বয়সে এগারো বছরের হ'লেও দেখতে আট বছরের মতটি হ'য়ে আছে; একদিন কড়া মেজাজের এক বৃদ্ধা ওকে রাস্তায় থামিয়ে ধমকালেন, ঐটুকু বয়সে কাগজ বেচা! এখনই এ বজ্জাতি না ছাড়লে তিনি পুলিস ডেকে দেবেন। একদিন রাত্রে অদ্ভুত একটা লোক কোট্রিনার হাত ধরে' টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে অন্ধকারের দিকে—এই অভিজ্ঞতা হ'তে এত ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে বেচারী যে ওকে ও-কাজে আর লাগিয়ে রাখাই মুস্কিল।

শেষে এক রবিবারে ওর মনে হয় আর কাজের চেষ্টা করে' লাভ নেই; চুরি করে' করে' বাসে চেপে ও বাসায় ফেরে। ফিরে দেখে সকলে ওর জন্য তিন দিন ধরে' অপেক্ষা করছে—ওরা নাকি ওর একটা কাজের সন্ধান পেয়েছে।

সে এক কাহিনী। বাচ্ছা ইউৎসাপাসটা ক্ষিধেয় পাগল হ'বার উপক্রম হয়। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে একঠেঙে ঐ ছেলে ঝাঁটার একটা ডাঁটি জোগাড় করে' তাতেই ভর দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। অন্যান্য ছেলের সঙ্গে মিশে ও-অঞ্চলের প্রান্তে অবস্থিত মাইক স্কুলির জঞ্জালস্তূপে হাজির হয়। এখানে প্রতিদিন বড়লোকদের মহল্লা লেক (হ্রদ) অঞ্চল হ'তে কয়েক শত গাড়ীভর্তি জঞ্জাল আনা হয়; এই সব জঞ্জালের মধ্যে রুটির টুকরো, আলুর খোসা, আপেলের মধ্যেটা, মাংসের হাড় প্রভৃতি খাদ্য শীতে আধ-জমা হ'য়ে থাকে, নষ্ট হয় না। ছেলেরা এগুলি বের করে' পেট ভরায়। ইউৎসাপাস আকণ্ঠ গিলে, একখানা খবরের কাগজে মুড়ে অ্যাণ্টেনাসের জন্যও ওর উপাদেয় খাদ্যচয়ন নিয়ে আসে। তখন বাড়ীতে কেউ ছিল না; সেগুলো ও অ্যাণ্টেনাসকে খাওয়াতে থাকে; খাওয়ান ও খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে এমন সময় এলজবিয়েটা বাড়ী ফেরে। ছেলের ব্যবস্থা দেখে বেচারী ভয়ে মরে; ময়লা গাদা হ'তে তুলে আনা এই খাবার খেয়ে ছেলে দুটো যে নির্ঘাৎ মরবে। রাত্রি কেটে যায়, মরা তো দূরের কথা, ওদের পেটগারাপও হয় না। সকালে উঠেই ইউৎসাপাস আবার কান্না জোড়ে; গত দিন কোন ক্ষতি হয়নি দেখে এবং এদের খামাবার কোন পন্থা না থাকায় এলজবিয়েটা ছেলেকে ময়লা গাদায় খাবার খোঁজবার অনুমতি দেয়। এদিনও একটা কাঠি দিয়ে ময়লা সরিয়ে ও খাবার খুঁজছিল এমন সময় রাস্তা হ'তে একটি মহিলা ওকে ডাকেন; "সত্যি মা, কী সুন্দর বড়ঘরের মেয়ে, কত ভাল!" কী পাখীর জন্য ও খাবার

খুঁজছে জিজ্ঞাসা করেন। ওর নিজের জন্য শুনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের সব কথা জেনে নেন, কেন ও ঝাঁটার ডাঁটি ব্যবহার করে, কী জন্য ওনা মারা গেল, কীভাবে ইউরঘিসকে জেলে যেতে হ'ল, মেয়ারিজার অসুখটা কী প্রভৃতি সব কিছুই। কোথায় ওরা থাকে তাও তিনি শেষে জানতে চান; যাবার সময় বলে' যান, একদিন তিনি ওদের বাড়ী আসবেন, ওকে আর ঝাঁটার ডাঁটি ব্যবহার করতে হবে না, তিনি ওকে একটা বগল লাঠি কিনে দেবেন। কী সুন্দর মহিলা, তাঁর টুপির ওপর একটা পাখী বসে' আছে, গলায় জড়ান লম্বা একটা লোমের সাপ।

ঠিক পরদিন সকালে মহিলাটি ওদের বাসায় হাজির; মই বেয়ে ওপরে ওঠেন; বসতে দেবার বা বসবার জায়গার অভাব, দাঁড়িয়েই থাকেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরখানা দেখেন; মেঝেয় ওনার রক্ত তখনও চড়বড় করছে—দেখে চমকে ওঠেন তিনি। তিনি ওদের বুঝিয়ে দেন—তিনি "বসতিকর্মী", কাছাকাছি অ্যাশল্যাণ্ড অ্যাভেনিউতে থাকেন। এলজবিয়েটা বাড়ীটা চেনে, তার নীচেতলায় একটা খাবারের দোকান আছে তো? কে যেন এলজবিয়েটাকে ওখানে যেতে বলেছিল, কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই এলজবিয়েটা যায়নি; কারণ, ওর ধারণা এ স[illegible]কান ধর্মীয় সংস্থা, ওদের পুরুত চান না ওরা গিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত ধর্ম-সংগঠনে মাথা গলাক। ওখানে থাকে তো ধনীরাই, গরীবরা কিভাবে দিন-গুজরান করে জানবার কৌতূহল নিয়েই ওঁরা ওখানে বাস করতে আসেন, কিন্তু এসব জেনে ওঁদেরই বা কী লাভ হবে, আর এদেরই বা কী উপকার হবে, বোঝা ভার। ক্যাঁট ক্যাঁট করে' স্পষ্ট কথা বলে' চলে এলজবিয়েটা। মহিলাটি একটু বিব্রত বোধ করেন, কী বলবেন বুঝতে পারেন না। মানুষের সহৃদয়তায় এদের আর বিশ্বাস নেই, এলজবিয়েটা মন্তব্য করে, নরককুণ্ডের কিনারায় দাঁড়িয়ে ভেতরে বরফের দু'-চারটে টুকরো ছুঁড়লে কি নরকের জ্বালা কমে, মা? মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর

কী ভীষণ বিদ্বেষ!—তরুণীটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবেন, উত্তর দিতে না পেরে মৃদু মৃদু হাসেন।

উপকার না হ'ক, গল্প করবার লোক তো একজন পাওয়া গেছে, তাতেই খুশী এলজবিয়েটা। ওদের দুখের টুকরি উজাড় করে ও এঁর কাছে—ওনার কী হয়েছিল, জেলের ব্যাপার, বাড়ী হারানোর কথা, মেয়ারিজার দুর্ঘটনা, ইউরঘিস কেন কাজ পাচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনতে শুনতে তরুণীর চোখ দুটি বাষ্পাকুল হ'য়ে ওঠে, গল্প শেষ হ'বার আগেই কান্না আর সামলাতে পারেন না, এলজবিয়েটার কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকেন; অত ময়লা যে এলজবিয়েটার পোশাক, উকুনে ভর্তি, সেদিকেও আর খেয়াল থাকে না তরুণীর। ইনি এভাবে কেঁদে ফেলবেন, এলজবিয়েটা আশা করেনি, ভারী অপ্রস্তুত হ'য়ে যায় সে; তরুণী কিন্তু আরও বলবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন ওকে। এ সবের পরিণতিস্বরূপ তিনি এদের একগাদা ভাল ভাল খাবার আনিয়ে দেন আর ইউরঘিসের জন্য একখানা চিঠি লিখে দিয়ে যান; চিঠিখানা ইউরঘিস নিয়ে যাবে এক ভদ্রলোকের কাছে, তিনি দক্ষিণ শিকাগোর বিরাট বিরাট কারখানাগুলির অন্যতম একটি কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মহিলাটি বলেন, "ইউরঘিসকে সে নিশ্চয় একটা কাজ দেবে।" ঈষৎ হেসে আরক্ত মুখে মন্তব্য করেন, "নইলে তাকে আমি বিয়েই করব না!"

ঐ সব ইস্পাত কারখানা এখান হ'তে পনেরো মাইল দূরে; এখানেও একটা পথকে দুটো দেখিয়ে, দুটো মালিকানা দেখিয়ে নিরুপায় যাত্রী-সাধারণের কাছ হ'তে দুনো ভাড়া আদায়ের যথারীতি প্যাঁচ মালিকরা কষে' রেখেছেন। রাত্রির অন্ধকারে ইউরঘিস সেখানে নামল গিয়ে—দূরদূরান্তর পর্যন্ত আকাশ-ছোঁওয়া চিমনি আর চিমনি—এগুলি হ'তে

আকাশের বুক রাঙিয়ে উঠছে লাল শিখা; কারখানাসমূহ নিয়েই একটা আলাদা শহর গড়ে' উঠেছে, তার চতুর্দিকে একটা বেষ্টনী; বেষ্টনীর প্রধান ফটকে ইতিমধ্যেই শতাধিক বুভুক্ষু কর্মপ্রার্থী কাজের আশায় দাঁড়িয়ে গেছে। ভোর হয়, আলো ফোটে, সিটি বাজে—অমনি হাজার হাজার লোক রাস্তার ওপাশের খাবারের দোকান হ'তে, বোর্ডিং বাড়ী বাসা প্রভৃতি হ'তে দ্রুত এগিয়ে আসে, ছুটন্ত গাড়ী হ'তে লাফিয়ে নেমে আসে কত লোক—ভোরের কোমল আলোতে মনে হয় মাটির তল হ'তে হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তে জন্মলাভ করছে। ফটকের ওপর দিয়ে মানুষের স্রোত বয়ে' যায় ভেতরদিকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাতে ভাটা পড়ে; শান্ত্রী ফটকে পায়চারি করে, বিলম্বাগত দু-চারজন করে' ভেতরে ঢুকে যায়, বাইরে ঠাণ্ডায় অধৈর্য বেকাররা নড়াচাড়া করে' শরীর গরম রাখে।

ইউরঘিস তার মূল্যবান চিঠিখানি তোরণরক্ষীর হাতে দেয়; লোকটা রাগীস্বভাবের, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে ইউরঘিসকে নানা প্রশ্ন করে—তার একমাত্র জবাব, কিছুই জানে না সে। বুদ্ধি করে' ইউরঘিস চিঠিখানা খামে পুরে গালামোহর করে' নিয়ে গিয়েছিল। কী আর করবে তোরণরক্ষী, উদ্দিষ্টের কাছে পাঠিয়ে দেয় খামখানা। দূত ফিরে এসে বলে, ইউরঘিসকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। ইউরঘিস গটগট করে' ভেতরে চলে' আসে। একমুহূর্ত আগের সাথীরা যে বাইরে থেকে গেল, বাইরে হ'তে লুব্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে, এজন্য ওকে দুঃখিত বোধ হ'ল না।

বিরাট বিরাট কারখানাগুলিতে তখন কেবল কাজ শুরু হ'চ্ছে, তারই বিভিন্ন শব্দ আসে। দিনের আলোর জোর বাড়ার সঙ্গে দৃশ্যটা সরল সাধারণ হ'য়ে আসে—বড় বড় ইমারত চতুর্দিকে, তাদের মধ্যে মধ্যে লম্বা লম্বা চারদিকঘেরা চালা, রেলপথের শাখা সর্বত্র, মধ্যে মধ্যে

একটা করে' ছোট ছোট ষ্টেশন, আর আকাশ জুড়ে তরঙ্গসঙ্কুল ধোঁয়ার সমুদ্র। ফটকের বাইরে পথের একপাশে রেলের আঙিনা, তাতে ডজনখানেক লাইন পাতা আছে, অপর দিকটায় একটা হ্রদ, এখানে ষ্টীমার আসে কারখানার মাল নিতে।

পাক্কা দুটি ঘণ্টা ইউরঘিসকে অপেক্ষা করতে হয়, বসে' বসে' ও দেখে আর হিসাব করে, এটা এই, ওটা ওই। দু' ঘণ্টার পর ওকে ডেকে নিয়ে যায় কারখানার ভেতর একজন সময়রক্ষীর কাছে। তিনি জানান, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এখন কাজে ব্যস্ত আছেন, তবে সময়রক্ষী সাহেবই ওকে একটা চাকরি দেবার চেষ্টা করবেন। আগে কখনো ইস্পাতের কারখানায় কাজ করেনি ও? তবে বলছে, যে কোন কাজ করতে রাজী? বেশ, তা হ'লে চেষ্টা করে' দেখছেন ওঁরা।

ওকে নিয়ে সময়রক্ষী কারখানার বিভিন্ন অংশে ঘুরতে লাগলেন, ইউরঘিস দেখতে লাগল অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য। ওর ভয় হয়, এখানে কি কাজ করতে পারবে! শব্দে কানে তালা লেগে যায়, বজ্ররবে দুম-দাম হাতুড়ি পড়ছে, একই সঙ্গে ওরই চারিদিকে সাবধানী সিটি বাজছে, ক্ষুদে ক্ষুদে ইঞ্জিন যেখানে-সেখানে, তাদেরই-বা আওয়াজ কত রকমের—হুসহাস্ করে' যেখান-সেখান হ'তে বেরিয়ে যেখানে সেখানে চলে' যাচ্ছে, ওরই পাশ দিয়ে ফুটন্ত সাদা লোহা যাচ্ছে, সে সবের ওপর ছোট ছোট বিস্ফোরণ হয়, ফুল্‌কি ছড়ায় চারিদিকে, চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাদের তীব্র আলোয়, তাদের তাপে মুখ ঝলসে যায় যেন ওর। এখানকার মজুরগুলো কালিঝুলি মাখা, চোখ বসা, গিঁটে গিঁটে নীরস গড়ন তাদের; ভয়াবহ বেগে কাজ করে' চলেছে সকলে, পাশে প্রলয় হ'য়ে গেলেও তাদের চোখ তুলে চাইবার সময় নেই। এদিকে, ত্রস্ত শিশু যেমনভাবে ধাত্রীকে ধরে' ধরে' এগোয়, ইউরঘিসও তেমনি সঙ্গীর হাত ধরে' থাকে ভয়ে ভয়ে। সময়রক্ষী এক-একজন প্রধানকে

ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, একজন অদক্ষ শ্রমিককে কাজে লাগাতে পারবেন? প্রশ্ন ও উত্তর—দুই-ই তাজ্জব করে' দেয় ইউরঘিসকে—এত লোকের মধ্যে আর একজন লাগবে কি লাগবে না!

থিয়েটার বাড়ীর মত বড় গম্বুজওয়ালা একটা বাড়ীতে ওকে নিয়ে যায়, এখানে জ্বলছে বেসেমার ফারনেস্, তৈরী হয় পুরু পুরু ইস্পাতের পাত (বিলেট)। এটা থিয়েটার হ'লে যেখানে ব্যালকনি হ'ত সেখানে এরা দাঁড়ায়, তার উল্টো দিকটায় যেখানে মঞ্চ থাকত সেখানে অতি বিরাট বিরাট তিনটে কড়াই—একেবারে দানবীয় ব্যাপার! দুনিয়ার যত ভূত-প্রেত-পিশাচ এই তিনটে কড়াইএর রান্না খেয়ে শেষ করতে পারবে না! এতে কিন্তু খাবার জিনিস ফুটছে না, ফুটছে লোহা, সাদা, চোখ ঝলসে যায় এতদূর হ'তেই, ছিটকে ছিটকে উঠছে, গর্জনও তাদের তেমনি—এগুলো যেন অগ্নিগিরির মুখ। পাশাপাশি দাঁড়িয়েও না চেঁচালে কেউ কারও কথা শুনতে পায় না। কড়াই হ'তে গলিত আগুন লাফিয়ে উঠে নীচে বোমার মত ছিটিয়ে পড়ে, সেই সব জায়গাতেই শ্রমিকরা বেপরোয়া কাজ করছে, এখান হ'তে দেখে বেপরোয়া বলে' মনে হয়; তাদের যা হবে হ'ক, এত দূর হ'তেই ভয়ে ইউরঘিসের বুকের ধুকধুকুনি থেমে আসে। ক্ষীণ সিটি বাজিয়ে একটা ক্ষুদে ইঞ্জিন কড়াইগুলোর কাছে একটা গ্রাহিকায় কিছু ঢেলে দিয়ে যায়; আবার একটা সিটি বাজে, এবার কড়াইগুলোর সামনে আসে একটা মালগাড়ী। হঠাৎ একটা ঐ দানবীয় কড়াই একটু উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, অমনি ছিটকে বেরিয়ে আসে একঝলক গলিত আগুন। এটাকে একটা দুর্ঘটনা ভেবে ইউরঘিসের হাত-পা পেটে ঢুকতে থাকে; তারপর পড়তে থাকে শ্বেত শিখার একটা স্বর্ণপ্রভ স্তম্ভ, চতুর্দিকের বাতাসও যেন আর্তনাদ করে, এতবড় কক্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ, তাদের

আলোয় সব কিছুই আবৃত হ'য়ে যায় দৃষ্টিপথ হ'তে; চেয়ে থাকা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে; অথচ না দেখেও উপায় নেই। চোখে আঙ্গুল চাপা দেয় ইউরঘিস, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে দেখে অপার্থিব শ্বেতবর্ণের জীবন্ত গলিত অস্থির লোহার স্রোত নেমে আসছে। সে স্রোতের পাশে পাশে সৃষ্টি হয় রামধনু, স্রোতের ওপর খেলা করে রামধনুর রঙ্। স্রোতের রঙ্ কিন্তু সাদাই থেকে যায়; জীবনস্রোতের মত এ স্রোতও যেন দুর্জ্ঞেয় এক উৎস হ'তে নেমে আসছে, এর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, মানবাত্মা ভয় পায় সত্য, কিন্তু পালিয়ে থাকতে পারে না, যেতে চায় এর উৎস বহুদূরের সেই দেশে যেখানে ত্রাস ও সৌন্দর্য পাশাপাশি বাস করে।...কড়াই খালি হ'য়ে আবার সোজা হ'য়ে বসে। ইউরঘিস স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে—যাক, কেউ আহত-নিহত হয়নি! সঙ্গীর সঙ্গে বাইরের রৌদ্রে বেরিয়ে আসে।

আরও দু'চার জায়গা ঘুরে ওরা আসে রেল লাইন তৈরীর জায়গায়। আনমনে চলছিল ইউরঘিস, পিছনে একটা গাড়ীর শব্দ হতেই পাশে লাফিয়ে পড়ে। মানুষের দেহের মত মোটা ও লম্বা একখণ্ড তপ্ত সাদা লোহা নিয়ে গাড়ীখানা ওদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সামনে সজোরে ধাক্কা খায়। ধাক্কার ফলে ভেতরের লোহাটা লাফিয়ে পড়ে পাশের ঝোলান একটা মঞ্চে; অমনি ইস্পাতের আঙ্গুল ও বাহু এগিয়ে এসে সেটাকে ধরে' দেয় আখ পেষাইয়ের মত একটা কলে, বেলনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায় খণ্ডটা খানিকটা লম্বা ও পাতলা হ'য়ে, আবার ইস্পাতের হাতগুলো সেটাকে আর দুটো বেলনার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, কয়েকবার ধরে' এই রকম চলে, লোহাটা লম্বা একটা রেল লাইনের আকার পায়; জিনিসটাকে দেখে জীবন্ত বলে' মনে হয়—এ সব শাস্তি যেন সে পোয়াতে চায় না, এঁকে বেঁকে, নড়ে', পাক খেয়ে ও যেন আপত্তি জানায় এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে, কিন্তু মানুষের মতই ও

যেন পড়েছে ভাগ্যের হাতে, অব্যাহতি নেই, ভাগ্য নিজের খেয়ালমত ওকে গড়ছে পিটছে। লাইনটা ততক্ষণে লাল হ'য়ে এসেছে, শেষ যন্ত্রটা হ'তে সেটা বেরিয়ে আসে এঁকাবেঁকা হ'য়ে। এবার এটা ঠাণ্ডা হ'লে ঠিক আকারমত কেটে লাইন পাতলেই হ'ল।

কতকগুলো মজদুর কাকডাণ্ডার সাহায্যে হ'য়ে-যাওয়া লাইন বয়ে' নিয়ে যাচ্ছে, এখানে আর একজন লোকের প্রয়োজন। ইউরঘিস কাজ পেয়ে যায় এখানেই। কোট খুলে ও তখনই কাজে লেগে যায়।

ওদের পারিবারিক আস্তানা হ'তে এখানে আসতে দৈনিক দু' ঘণ্টা সময় এবং সাপ্তাহিক খরচ এক ডলার কুড়ি সেণ্ট্; শক্তি সময় এবং অর্থ কোন দিক হ'তেই এটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই পরদিন ও একেবারে বিছানাটা জড়িয়ে নিয়ে কারখানায় হাজির হয়, একজন সহকর্মী পোলদেশীয় এক বাসাওয়ালার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়; রাত্রি পিছু দশ সেণ্ট্ করে' ভাড়া লাগবে, তা লাগুক, ওখানেই ও থেকে যায়। খায় মুফৎখানা দোকানে, অর্থাৎ মদ কিনলে খাবারও পায়। রোজগারের প্রধান অংশটা নিয়ে পারিবারিক আস্তানায় ফিরে যায়। এলজবিয়েটা ভয় পেয়ে যায়, এভাবে থাকতে থাকতে ওদের ছেড়ে থাকাই অভ্যাস হ'য়ে যাবে শেষ পর্যন্ত; হপ্তান্তে ছেলেকে একবার দেখলে কি আর আকর্ষণ বেঁচে থাকবে! অথচ এর চেয়ে ভাল অন্য কোন ব্যবস্থাও মাথায় আসে না। ইস্পাতের কারখানায় মেয়েদের কাজ পাবার কোন কথাই ওঠে না। মেয়ারিজা আবার চাকরি করবার যোগ্য হ'য়েছে; মাংসের কারখানাগুলোরই কোথাও চাকরি পেয়ে যাবে আশায়-আশায় চাকরি পাবার আগেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠছে।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ইউরঘিসের অসহায় ও বিভ্রতভাব কেটে যায়;

এর বিস্ময় এর বিভীষিকা স্বাভাবিক হ'য়ে আসে; চতুর্দিকে বিকট আওয়াজ হ'চ্ছে কি হ'চ্ছে না সে খেয়ালও থাকে না; অন্ধ আতঙ্ক কেটে যায়, অন্যান্যের মত সেও বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে, কাজের মায়ায় অন্যান্যের মত সেও নিজের চিন্তা করবার সময় পায় না। এ কাজে যে ওদের এত আকর্ষণ থাকতে পারে, ভাবতেও বিস্ময় লাগে; এতে ওদের কোন সরিকানা নেই, ঘণ্টা হিসাবে মজুরী পায়, অতিরিক্ত আকর্ষণের জন্য অতিরিক্ত মজুরী পাবার আশা নেই; এও জানে—জখম হ'লে ওদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে, তারপর কেউ ওদের মনেও রাখবে না। তবু ওরা বিপজ্জনক খাটপথে যাওয়া-আসা করে, ঝুঁকি এবং বিপদ যতই থাক ওরা অধিকতর কার্যকরী ও দ্রুত পদ্ধতিতে কাজ করে। ওর কাজ পাওয়ার চতুর্থ দিনে ইউরঘিস দেখলে একটা লোক একখানা গাড়ীর সামনে সামনে ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল, একখানা পা ছাতু হ'য়ে গেল। তিন সপ্তাহ ওখানে থাকবার পর এর চেয়ে আরও ভয়ানক দুর্ঘটনা দেখলে ও। ইটের এক সার ফারনেস্ আছে, তাদের ফুটোফাটল দিয়ে ভেতরে গলিত সাদা লোহা দেখা যায়; এদের মধ্যে কোন-কোনটা ফেঁপে ফুলে উঠেছে বেশ বিপজ্জনকভাবেই, তবু মজদুররা নীল চশমা পরে এগুলোর দোর খোলে, বন্ধ করে। একদিন সকালে ইউরঘিস ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছে, একটা ফারনেস্ বিস্ফোরিত হ'ল, দু'জন শ্রমিকের ওপর গলিত অগ্নিবৃষ্টি হ'ল; লোক দুটো আর্তনাদ করে' গড়াগড়ি দিতে লাগল; কেউ সাহায্য করতে যায় না দেখে ইউরঘিস ছুটে গেল ওদের সাহায্য করতে, ফলে ওর একখানা হাতের ভেতর দিকের অনেকখানি চামড়া উবে গেল। এর জন্য কোন ধন্যবাদ নেই, কারখানার ডাক্তার এসে ক্ষতটির পটি বেঁধে দিলে; আট দিন ও বিছানায় পড়ে' রইল, আট দিনের মজুরী কাটা গেল।

অতি অতি সৌভাগ্যবলে এলজবিয়েটা তার বহু-অপেক্ষিত কাজটা

পেয়ে গেল; প্যাকিং কারখানার কোন অফিস ভোর পাঁচটায় ঝাড়ু দিতে হবে। আহত ইউরঘিস বাড়ী ফিরে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ল; দিনরাত্রির খানিকটা ঘুমোন আর খানিকটা অ্যাণ্টেনাসের সঙ্গে খেলা করা হ'ল ওর কাজ। ইউংসাপাস দিনের বেশীরভাগ সময় ময়লাগাদায় খাবার খোঁজে, এলজবিয়েটা ও মেয়ারিজা বেড়ায় কাজের খোঁজে; খালি ভোরের কাজটুকু নিয়ে তো এলজবিয়েটার চলবে না।

অ্যাণ্টেনাস এখন দেড় বছরেরটি; কথা-কওয়া একটা কল যেন! খুব তাড়াতাড়ি কথা শিখছে; প্রতি শনিবারে ফিরে ইউরঘিস ওর মুখে এত নতুন কথা শোনে যে মনে হয় নতুন আর একটা ছেলে দেখছে। ওর কথা শুনতে শুনতে ইউরঘিস সব ভুলে যায়, আনন্দে চীৎকার করে, "প্যাল'ক। মুমা! টু মানো সজির ডেলে!" (দেখ! মা! একটা ক্ষুদে শয়তান!) এই বাচ্ছাটাই এখন ইউরঘিসের একমাত্র আনন্দ, ওর আশা, ওর জয়গৌরব। অ্যাণ্টেনাস যে ছেলে হ'য়েছে এও ভাগ্য বলতে হবে! এটুকুন বাচ্ছা কিন্তু কী শক্ত হাত-পা, বাঘের মত ক্ষিধে। কিছুতেই ওর ক্ষতি করতে পারেনি, কিছুতেই পারবে না, এরই মধ্যে ও সকল কষ্ট সকল বঞ্চনা সহ্য করেছে, তার ফলে আরও শক্ত হ'য়েছে, জীবনকে আরও দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে, কী তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, সর্বগ্রাসী কী দুর্বার ওর আগ্রহ! অতি দুরন্ত ছেলে—সামলানোই মুস্কিল, কিন্তু ছেলের বাপ ওর দুরন্তপনায় রাগ করে না, হাসে। যত লড়াইয়ে হবে ততই তো ভাল, মানুষ হ'য়ে ওঠবার আগেই তো লড়াই শুরু হবে।

পয়সা থাকলেই রবিবারের খবরের কাগজ কেনা স্বভাব হ'য়ে গেছে ইউরঘিসের। মাত্র পাঁচ সেণ্ট দাম, তাতেই বগলভর্তি! পৃথিবীর যত সংবাদ শিরোপংক্তিতে সাজানো থাকে, ধীরে ধীরে বানান করে' সেগুলো

ও পড়ে, বড় বড় শব্দ থাকলে ছেলেদের সাহায্য নেয়। লড়াইয়ের খবর, মৃত্যু, হত্যা—এত রোমাঞ্চকর আগ্রহজনক খবর ওরা রোজ শোনে কী করে' ভাবতে বিস্ময় লাগে ইউরঘিসের। গল্পগুলো নিশ্চয় সব সত্যি, এ ধারার এত গল্প কি কেউ বানাতে পারে, তা ছাড়া তাদের জীবন্ত ছবিও থাকে। এক-একখানা কাগজ এক-একটা সার্কাসের মত। একখানা কাগজ হাতে থাকলে মদ খেয়ে হুল্লোড় করার আনন্দ পাওয়া যায়। অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত মূর্খ অজ্ঞ শ্রমিকের কাছে এর চেয়ে উপভোগ্য আর কিছু হ'তে পারে না। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর সে নিরানন্দ একঘেয়ে হাড়পেষা কাজ করে' চলে, প্রকৃতির সবুজের রাজ্যে চোখ ফেরাবার অবসর পায় না একদিনের জন্য, জীবনে উৎসব নেই আনন্দ নেই, মদ ছাড়া কল্পনা উজ্জীবিত করবার দ্বিতীয় বস্তু নেই এই সব শ্রমিকের জীবনে, একখানা খবরের কাগজই ওদের সামনে খুলে দেয় বৈচিত্র্যের দ্বার। অন্যান্য বহু জিনিসের মধ্যে এ সব কাগজে অনেক হাসির ছবি থাকে, এই সব ছবি দেখে অ্যাণ্টেনাস কী খুশী যে হয়! ঐটুকুন ছেলে কিন্তু ছবিগুলি বেশ জমিয়ে রাখে, বাপ এলেই বের করে' আনে, ছবির কথা বলতে হবে ওকে। কত রকম জীবজন্তুর ছবি, অ্যাণ্টেনাস তাদের প্রত্যেকের নাম জানে না; মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে সুন্দর আঙুল দিয়ে ছবিগুলি ও সকলকে দেখায়। কোন ছবির গল্প সহজবোধ্য হ'লে ইউরঘিস ছেলেকে বলে, ছেলে জেদ ধরে, "আবার"; ফের বলতে হয়। তখন অ্যাণ্টেনাস তার আধ-আধ কথায় আরও কত কথার সঙ্গে মিশিয়ে গল্পটা সম্পূর্ণ অর্থহীন করে' দেয়, হাসির খোরাক হয় সকলের। এটা ওর বাহাদুরি! গল্প কেন, শুধু ওর কথা কওয়ার ভঙ্গীতেই ও মানুষকে হাসিয়ে পাগল করতে পারে। এর ওপর আছে ওর নিজস্ব সৃষ্ট দুনিয়াছাড়া অদ্ভুত অসম্ভব সব শব্দ। প্রথম যেদিন ও "হতভাগা" বলে, ওর বাবা সেদিন হাসতে হাসতে চেয়ার হ'তে

গড়িয়ে পড়ে আর কি! আর পায় কে অ্যান্টেনাসকে! তখন হ'তে ওর কাছে সব মানুষ, সব জিনিস "হতভাগা"!

হাতটা সরাতেই ইউরঘিস বিছানা বেঁধে আবার ওর লাইনটানার কাজে চলে' যায়। এপ্রিল মাস এসে গেছে, তুষারবৃষ্টির স্থলে এখন ঠাণ্ডা জলবৃষ্টি হয়। অ্যানিয়েলের বাড়ীর সামনের কাঁচা রাস্তা হ'য়ে গেছে ছোটখাট একটা নদী। ইউরঘিস বাড়ী ফেরে এই জলকাদা ঠেলে ঠেলে, বেশী অন্ধকার থাকলে কোমর পর্যন্ত কাদায় আটকে যাবারও আশঙ্কা থাকে। এ সব ও গ্রাহ্য করে না—এ তো গ্রীষ্ম আসার পূর্বাভাস। ছোট একটা কারখানায় মেয়ারিজা মাংসছাঁটাইএর কাজ পেয়ে গেছে; নিজেকেই সান্ত্বনা দেয় ইউরঘিস, খুব শিক্ষা হয়ে গেছে, আর কোন দুর্ঘটনার কাছাকাছি ও যাবে না, তা হ'লে রোজগার থাকবে, দুঃখের দিন দূর হ'তে বেশী সময় লাগবে না। আগামী শীতের আগেই আবার টাকা জমিয়ে ওরা ভাল আরামদায়ক একটা আস্তানা খুঁজে নিতে পারবে। ছেলেদের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে তখন স্কুলে ভর্তি করে' দেওয়া যাবে; দারিদ্র্যের জন্য প্রফুল্লতাহীন যে কঠোরতা ওদের জীবনে এসেছে, সচ্ছলতার সেবায় সেটাও কেটে যাবে। এইভাবে ইউরঘিস আবার স্বপ্ন দেখে, সুন্দর জীবনের কল্পনা করে।

সেটা একটা শনিবারের বৈকাল; আকাশের বুক জুড়ে মেঘ, জোর বৃষ্টি পড়ছে, মেঘের একপাশ দিয়ে ম্লান একটু সূর্যরশ্মি পড়েছে ধরিত্রীর বুকে; বাস হ'তে লাফিয়ে নেমে ইউরঘিস বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। আকাশের প্রান্তে একটা রামধনু, আর একটা রামধনু ওর বুকে—সামনে ছত্রিশ ঘণ্টার ছুটি, সময়টা কাটবে অন্তরের আত্মীয়দের সঙ্গে। বাড়ী চোখে পড়তে দেখে দোরের সামনে একটা ভিড়। ভিড় ঠেলে ভেতরে আসে; অ্যানিয়েলের রান্নাঘরেও উত্তেজিত স্ত্রীলোকদের ভিড়। জেল থেকে যেদিন ও ফেরে, যেদিন ওর ওনা

মারা যায় সেদিনও ঠিক এমনি একটা ভিড় ছিল এই রান্নাঘরে; কথাটা মনে পড়তেই বুকটা ধ্বক করে' ওঠে; চীৎকার করে' ওঠে, "কী হ'য়েছে?"

শ্মশানের মত নিঃশব্দ হ'য়ে যায় ঘরখানা; সকলেই বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে ইউরঘিসের দিকে। ফের ও চীৎকার করে' ওঠে, "হ'য়েছে কী?"

চিলেকোঠা হ'তে মেয়ারিজার কণ্ঠস্বরে কান্নার শব্দ আসে; দৌড়ে চলে ইউরঘিস সেই দিকে। এবার ওর হাত চেপে ধরে অ্যানিয়েল, "না, না, তুমি ওপরে যেও না।"

"কেন? কী হয়েছে?" গর্জন করে' ওঠে ইউরঘিস।

কাতরকণ্ঠে জবাব দেয় বুড়ী, "অ্যাণ্টেনাস! মারা গেছে অ্যাণ্টেনাস! রাস্তার জলে ডুবে গিয়েছিল।"

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অদ্ভুতভাবে সংবাদটা শোনে ইউরঘিস। মড়ার মত সাদা হ'য়ে যায় মুখখানা, নিজেকে সামলাবার জন্য আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, হাত দুটো ক্রমশঃ দৃঢ়তরভাবে মুষ্টিবদ্ধ হয়, দাঁতে দাঁত চেপে বসে। অ্যানিয়েলকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে পরের ঘরে চলে' যায়, সেখান হ'তে সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠায় ওঠে।

এক কোণে একখানা কম্বল পড়ে' আছে, তার নীচে একটা দেহ চাপা থাকতে পারে বলে' মনে হয়, পাশে এলজবিয়েটা পড়ে' আছে, কাঁদছে, না মূর্ছা গেছে বোঝা যায় না। মেরারিজা বদ্ধ পশুর মত ঘরখানার এদিক হ'তে ওদিক ঘোরে, হাত মোচড়ায়, কাঁদে। ইউরঘিস আরও শক্ত করে মুঠি দুটো, কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করে, "এটা হ'ল কেমন করে?"

আপন শোকে মগ্ন মেয়ারিজা ওর প্রশ্ন শুনতে পায় না। আরও কঠোরভাবে ইউরঘিস তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে মেয়ারিজা, "ফুটপাথ হ'তে পড়ে' গিয়েছিল।" ফুটপাথ, পথ ও বাড়ীর মধ্যে পচা তক্তা দিয়ে মাচার মত করে' তৈরী করা হয়েছিল; কাদা ধুয়ে গিয়ে পথটা গভীর হওয়ায় ফুটপাথটা এখন পথ থেকে অন্ততঃ পাঁচ ফুট উঁচু হ'য়ে আছে।

"গেল কীভাবে ওখানে?"—জানতে চায় ইউরঘিস।

"গিয়েছিল, খেলতে গিয়েছিল", মেয়ারিজা কাঁদে, স্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে, "ওকে ধরে' রাখতে পারিনি আমরা। কাদাতেই আটকে গিয়েছিল।"

"ঠিক জান, মরে' গেছে?"

"হ্যাঁ। ডাক্তার ডাকিয়েছিলাম আমরা।"

কয়েক মুহূর্ত ইউরঘিস বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন কী করবে ভাবে। কোণের কম্বলটার দিকে একবার চায়। কথা কয় না আর, কাঁদে না, চোখের জলও পড়ে না একফোঁটা। ফিরে মই ধরে' নেমে যায়। ওর আগমনে রান্নাঘর আবার স্তব্ধ হ'য়ে যায়। ও কোনদিকে চায় না, সদর দোর দিয়ে বেরিয়ে পথ ধরে' হাঁটতে শুরু করে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ও নিকটতম মদের দোকানে ঢুকেছিল, পকেটে এক হপ্তার মজুরী থাকা সত্ত্বেও এবার আর ও মদের দোকানে ঢোকে না; সোজা হেঁটে চলে। জল কাদা ঠেলে হেঁটেই চলে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা সিঁড়িতে বসে' হাতের মধ্যে মুখ লুকোয়; আধ ঘণ্টা যাবৎ নিঃশব্দে ঐভাবে বসে' থাকে; এক-একবার নিজেকেই যেন বলে, "মারা গেছে! মারা গেছে!"

শেষে আবার উঠে পড়ে। আবার হাঁটতে লাগে, হেঁটেই চলে।

সন্ধ্যা হয়, অন্ধকার হয়, হেঁটেই চলেছে ও। এক জায়গায় পথে রেলপথে কাটাকাটি হ'য়েছে, রেলের ফটক বন্ধ হ'য়ে আছে, এখানে ওকে থামতে হয়। গাড়ী আসে, লম্বা মালগাড়ী, সশব্দে এগিয়ে চলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও দেখে; হঠাৎ একটা বাঁধনছেঁড়া ইচ্ছা জাগে মনে; বহুদিন হ'তেই ইচ্ছাটা অব্যক্ত অপরিচিত হ'য়ে লুকিয়ে-ছিল ওর বুকে, আজ সে ইচ্ছা হঠাৎ প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে। গুমটি ঘর পেরিয়ে গাড়ীর সঙ্গে এগিয়ে চলে; নির্জন স্থানে একখানা খালি মালগাড়ী লক্ষ্য করে' লাফ মারে; কিনারাটা ধরেও ফেলে ঠিক; একটা হেঁচকা দোলায় দেহটা গাড়ীর ভেতর চালিয়ে দেয়। মালগাড়ী ছুটে চলে।

একটা ষ্টেশনে গাড়ীখানা থামে; থামার সঙ্গে সঙ্গে ও একলাফে নেমে আশ্রয় নেয় গাড়ীর নীচের শিকগুলোর ওপর। আবার গাড়ী ছাড়ে। এবার যুদ্ধ শুরু হয় ওর অন্তরের সঙ্গে। আবার দাঁতে দাঁত চেপে বসে—ও কাঁদেনি, কাঁদবে না, একফোঁটা চোখের জলও না! শেষ হ'য়ে গেছে, চুকে গেছে, ও-ও শেষ করে' দিয়েছে, আবার কিসের! কাঁধের পাশ দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে ও এগিয়ে যাবে, ও সবের বাঁধন একেবারে ছিঁড়ে ফেলবে, ফেলবে কেন, এখনি এই রাত্রে ও ছিঁড়ে ফেলছে। একটা কুশ্রী দুঃস্বপ্ন শেষ হ'য়ে গেল, বাঁচল ও, কাল সকাল হ'তে ও নতুন মানুষ হবে! তবু মনের কোণে ব্যথিত অন্তরের অশ্রু জমে' ওঠে—অমনি ও নিজেকে ধমকায়, গুঁড়িয়ে দিতে চায় সমস্ত দুর্বলতা, সকল স্নেহ প্রেম বাৎসল্য!

নতুন জীবন লাভের জন্য ও লড়াই করে; দুর্বলতা, হ্যাঁ দুর্বলতা বৈকি, দুর্বলতা আসে মরীয়া হ'য়ে, ও দাঁতে দাঁত পেষে, ধমকায় নিজেকে। গাধা, নির্বোধ বানিয়েছিল নিজেকে একটা! নিজে ও ক্ষইয়ে দিয়েছে, ভেঙ্গে ফেলেছে, অভিশপ্ত এই দুর্বলতার জন্যই

তো, আজ সব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়েছে ও, শেকড় শাখা সব আজ উৎপাটন করবে—সব! আর অশ্রু নয়, দুর্বলতা নয়, যথেষ্ট হ'য়েছে—এরাই ওকে বিক্রি করে' দিয়েছিল গোলাম করে'! এবার ও মুক্ত হ'তে চলেছে, ভাঙ্গতে চলেছে ওর শেকল, আজ ও মানুষের মত দাঁড়িয়ে লড়বে। শেষ হ'য়ে গেল তাতে ও খুশীই হ'য়েছে; আসতই তো একদিন, সে শেষ আজ এল, ভালই হ'ল। এ দুনিয়া স্ত্রীলোক বা শিশুর জন্য নয়, যত শীঘ্র তারা সরে যায় ততই ভাল। আজ অ্যান্টেনাস যেখানে আছে সেখানে কষ্ট আছে কিনা ও জানে না, থাকলে এ দুনিয়ায় যে কষ্ট, যে লাঞ্ছনা সে ভুগত, সে কষ্ট সেখানে থাকতেই পারে না, বেঁচে গেছে বেচারা। আর ওর বাবা ওর সম্বন্ধে শেষ ভাবা ভেবে নিয়েছে, আর ভাবছে না, না এবার নিজের সম্বন্ধে ভাববে; ভাববে এই নিষ্ঠুর অত্যাচারী ব্যর্থকারী দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য।

এইভাবে এগিয়ে চলে ও হৃদয়-উদ্যানের প্রতিটি পুষ্প উৎপাটিত পদদলিত করে'। বজ্রগর্জনে কান ঝালাপালা করে' গাড়ী এগিয়ে চলে, মুখে চোখে ধুলোর ঝাপ্টা লাগে, রাত্রিভোর মাঝে মাঝে গাড়ীখানা থামে, তবুও আঁকড়ে ধরে' থাকে ও বসবার জায়গাটুকু; যতদূর পারে ও এইভাবে যাবে, পালিয়ে যাবে; প্যাকিংশহর হ'তে যত দূরে যেতে পারবে হৃদয়ের বোঝা ততই কমবে ওর।

গাড়ী থামলেই তপ্ত মৃদু হাওয়া লাগে চোখে মুখে, হাওয়ায় টাট্‌কা মেঠো বাস, ফুল ও লবঙ্গের গন্ধ। বুক ভরে' ও নিশ্বাস টানে, আনন্দে বুক ভরে' যায়, আবার গ্রামাঞ্চলে এসেছে! বাস করতে চলেছে ও গ্রামেই। ভোর হয়, ক্ষুধার্ত চোখ দিয়ে ও গাড়ীর তল হ'তে মাঠ বন নদ-নদীর দৃশ্য উপভোগ করে। আর শিক ধরে' শিকের ওপর বসে' থাকা কঠিন হ'য়ে পড়ে। এবার গাড়ী থামলে, গুড়ি গুড়ি ও বের হ'য়ে

পড়ে। গাড়ীর কর্মচারীদের একজন ওকে দেখে ফেলে, দূর হ'তেই ঘুষি পাকিয়ে গালাগাল দেয়। তার দিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে' হাত নেড়ে দিয়ে ইউরঘিস মাঠের পথ ধরে।

আজীবন গ্রামে বাস করে' আসছে ও, আর গত তিন বৎসর ধরে' না দেখেছে একটা গ্রাম্য দৃশ্য, না শুনেছে একটা গ্রাম্য শব্দ। জেল হ'তে বেরিয়ে গ্রামের পথে ও অবশ্য হেঁটেছে, কিন্তু চিন্তাক্লিষ্ট মন নিয়ে কিছুই দেখা হয়নি তখন, আর বেকার অবস্থায় কোন কোন রাত্রি পার্কে কাটিয়েছে, এ ছাড়া সত্যি সত্যি এ তিন বছর একটা গাছও দেখেনি ও। আজ ও আকাশচারী বিহঙ্গের মত মুক্ত; চলতে চলতে থামে, প্রতিটি নতুন দৃশ্য দেখে, বিস্মিত হয়, উপভোগ করে। দেখে গরুর পাল, মেঠো ফুল, গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পাখী গান গায় তাও দেখে ও।

একটা খামারে পৌঁছয়, আত্মরক্ষার্থে একখানা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ভেতরে যায়, খামারের মালিক-চাষীটি তখন গাড়ীর চাকায় চর্বি দিচ্ছে। স্বচ্ছন্দে বলে ইউরঘিস, "দেখ, কিছু জলখাবার চাই আমি।"

"কাজ করতে চাও?" প্রশ্ন করে চাষী।

"না, কাজ আমি করব না।" জানিয়ে দেয় ইউরঘিস।

"তা হ'লে এখানে কিছু পাবেও না।" চাষীও বলে দেয়।

"দাম দেব আমি।"

"ও", ঠাট্টা করে চাষী, "কিন্তু আমরা সকাল সাতটার পর কাউকে জলখাবার দিই না।"

এবার গম্ভীর হ'য়ে ইউরঘিস বলে, "দেখ, বড় ক্ষিধে পেয়েছে আমার, কিছু খাবার কিনতে চাই।"

ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে চাষী বলে, "ঐ মেয়েলোকটাকে বলগে যাও।"

মেয়েলোকটার সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ আছে। এক ডাইম (দশ সেণ্ট) দিয়েই ইউরঘিস দু' টুকরো পুরু পুরু স্যাণ্ডউইচ, খানিকটা পাই আর দুটো আপেল পেয়ে যায়। পাইটা বয়ে' নিয়ে যেতে অসুবিধা, তাই সেটাই খেতে খেতে ও ফের চলা শুরু করে। কয়েক মিনিট পরে একটা নদীর ধারে পৌঁছয়; এখানে একটা বেড়া পেরিয়ে একটা বনপথ ধরে। বনের মধ্যে একটা ফাঁকা ছায়াময় জায়গা পেয়ে খেতে বসে' যায়, নদীর জলে তৃষ্ণা মেটে। ব্যস, আর কোন কাজ নেই, শুয়ে শুয়ে মহানন্দে ও আকাশ দেখে। ঘুম পায়, ছায়ার দিকে একটু গড়িয়ে গিয়ে লাগিয়ে দেয় এক ঘুম।

মুখের ওপর প্রখর সূর্যকিরণ পড়তে ও জেগে ওঠে। উঠে বসে' আড় ভেঙ্গে স্রোতের দিকে চেয়ে বসে' থাকে। দেখতে দেখতে বিস্ময়কর একটা বুদ্ধি খেলে যায় ওর মাথায়! গোটা শরীর জলে ডুবিয়ে স্নান করে' নিলে হয় তো! খোলা জল, কারও অধিকারভুক্ত নয়, কেউ কিছু বলবে না। সারা শরীর ডুবিয়ে অবগাহন স্নান, চমৎকার! লিথুয়ানিয়া ছেড়ে আসার পর আর ও ডুব দিয়ে স্নান করেনি!

ইউরঘিস প্রথম যেদিন প্যাকিংশহরে আসে, সেদিন চাষী বা মজুরের পক্ষে যতখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভব ততখানি পরিচ্ছন্ন ও ছিল। পরে রোগে, ঠাণ্ডায়, ক্ষিধেয়, হতাশায়, কাজের নোংরামিতে, বাড়ীর নোংরায়, পোশাকের উকুনে ও ময়লায় স্নান করার অভ্যাস শিকেয় ওঠে; গ্রীষ্মকালে ও গামলায় দেহের যে অংশগুলো ঢুকতে পারে তাই ধুয়েই স্নানের কাজ সারত। জেলে ঝরণা-কলের জলে একবার স্নান হ'য়ে গিয়েছিল, তারপর আর স্নান করেনি—আজ ও স্নান করবে, সাঁতার কাটবে।

জল হিমশীতল নয়, স্নান করতে আরাম লাগে। কিছুক্ষণ মনের

আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটে। তারপর হাঁটুজলে বসে' বালি দিয়ে ঘষে' ঘষে' গায়ের ময়লা তুলতে লাগে···ধীরে ধীরে দেহের প্রতিটি অংশের ময়লা তোলে; পরিষ্কার হ'তেই লেগেছে যখন, পুরো পরিষ্কার হ'য়ে দেখবে, পরিষ্কার থাকতে কেমন লাগে। লম্বা কালো চুলেও বালি ঘষে; মাথা হ'তে গাদা গাদা খুস্কি ও ময়লা বেরিয়ে আসে; বারবার ও বহুক্ষণ ধরে' জলের তলে মাথা ডুবিয়ে বসে' থাকে। তখনও সূর্যের তাপ আছে দেখে, পার হ'তে জামা-কাপড় এনে প্রতিটিকে আলাদা আলাদা করে' ধুতে বসে কচ্‌লে কচ্‌লে; স্রোতের সঙ্গে ভেসে যায় ময়লা চর্বি, আনন্দে ও হাসে; সারের কবল হ'তে মুক্তি পাবে এমন স্বপ্নও দেখে।

শুকোবার জন্য সেগুলো টাঙিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে, আর একটা লম্বা ঘুম হ'য়ে যায়। জাগল যখন তখন জামা-কাপড় প্রায় শুকিয়ে এসেছে, ওপর দিকটা তো শুকিয়ে খরখর করছে, নীচের দিকটাই যা একটু ভিজে ভিজে আছে। তা থাক, আর বসে' থাকা যায় না; ধোয়া শুকনো জামা প্যান্ট পরে' ও আবার যাত্রা করে। সঙ্গে ছুরি ছোরা নেই, হাতের জোরেই মোটা একটা লাঠি ভেঙ্গে সশস্ত্র হ'য়ে নিয়ে আবার রাস্তা ধরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা খামারে হাজির হয়। নৈশ আহারের সময় হ'য়ে গেছে; চাষী তার রান্নাঘরের দোরে বসে' হাত ধুচ্ছিল। ইউরঘিস আবেদন করে, "আজ্ঞে, কিছু খেতে পাব? দাম দেব'।"

চাষী চটপট উত্তর দেয়, "ভবঘুরেদের আমরা গেলাই না। বেরিয়ে যা!"

বিনা বাক্যব্যয়ে ইউরঘিস বেরিয়ে যায়। খামারের বাইরের ক্ষেতে চাষী হালে পীচ চারা পুঁতেছিল; ইউরঘিস তাদের এক সারি, মোট শতখানেক, শেকড়সুদ্ধ উপড়ে দেয়। এই হ'ল ওর জবাব।

এখন হ'তেই ও লড়তে লেগেছে; কেউ আঘাত করলেই ও প্রত্যাঘাত করবে।

একটা বাগান পেরিয়ে ছোট্ট একটু জঙ্গল, সেটা পেরিয়ে রবিশস্যের একখানা ক্ষেত, এটার পর রাস্তা; ইউরঘিস এই রাস্তা ধরে। অল্পদূর গিয়ে আর একটা খামার নজরে পড়ে। আকাশে একটু একটু মেঘও করেছে, তাই এখানে খালি খাবার না চেয়ে ও আশ্রয়ও চায়। চাষী ওর দিকে সন্দেহের চোখে চাইছে দেখে ও বলে, "ঐ খড়ের গাদাটাদা কোথাও শুতে পেলেই আমার চলবে।"

"কে জানে বাপু! তামাক খাও নাকি?"

"মাঝে মধ্যে। তা বাইরে খেয়ে আসব।"

চাষী রাজী হয়। ইউরঘিস তখন জিজ্ঞাসা করে, "কত লাগবে এর জন্য? আমার কাছে বেশী পয়সা নেই।"

"খাবারের জন্য তো হিসেবে দাঁড়াচ্ছে কুড়ি সেণ্ট," চিন্তিত মুখে চাষী জানায়, "আর শোবার জন্য আমি কিছু নেব না।"

আর বাক্যব্যয় না করে' দু'জনে ভেতরে যায়। চাষী, চাষীর বৌ আর আধ ডজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে ও খেতে বসে। পদে পরিমাণে স্বাদে এ খাবার ইউরঘিসের কাছে ভোজ; তার ওপর একজগ দুধ। ইউরঘিস তার কুড়ি সেণ্ট সুদে আসলে উসুল করে' নেয়। বিয়ের দিনের পর এমন খাবার আর ও খায়নি। এদের প্রত্যেকেই অতি ক্ষুধার্ত হ'য়েই খেতে বসেছিল; খেতে খেতে তাই কথা কওয়া হয়নি। খাবার পর ওরা সিঁড়িতে বসে' তামাক খায় আর আলাপ-পরিচয় করে। চাষীর প্রশ্নের উত্তরে ইউরঘিস জানায় শিকাগোর কারখানায় ও কাজ করত; চলে' এসেছে।

"যাবার কোন লক্ষ্যস্থল নেই।"

চাষী বলে, "এখানেই থেকে যাও না। আমার কাজ করবে।"

"ঠিক এখনই কাজ করবার ইচ্ছে নেই।" জবাব দেয় ইউরঘিস।

"ভাল মাইনে দেব হে," ইউরঘিসের বিরাট দেহটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে যোগ করে, "দিন এক ডলার, তার ওপর খাওয়া থাকা। এদিকটায় মজুর পাওয়া বড় মুস্কিল।"

"শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই তো?" তাড়াতাড়ি ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে।

"না না, এই নভেম্বরের পর আর তোমায় রাখতে পারব না আমি। অত জমি তো আমার নেই।"

"চাষ ফুরুলে তোমার ঘোড়াগুলোকে বরফের মধ্যে চরে' খেতে তাড়িয়ে দাও বুঝি!" (ইউরঘিস আজকাল নিজের কথা ভাবতে শিখেছে।)

চাষী কথার খোঁচাটা বুঝতে পারে, বলে, "না, ঠিক এ কথা তো নয়, তোমার মত শক্তসমর্থ মানুষ শীতকালে শহরে কি অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিতে পারবে না?"

"হুঁ," উত্তর দেয় ইউরঘিস, "সকলেই এইভাবে ভাবে; এই ভেবেই সব শহরে ভিড় করে, তারপর সেখানে যখন প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্য ভিক্ষে কি চুরি করতে হয়, তখন আবার মালিকরা প্রশ্ন করেন, গ্রামে যাও না কেন, সেখানে লোকের বড় অভাব।"

বহুক্ষণ ধরে' চাষী চিন্তা করে। শেষে বলে, "টাকা ফুরুলে কী করবে? তখন কাজ করতে হবে কি হবে না?"

"ফুরুক, তখন দেখা যাবে।"

লম্বা একটানা একটা ঘুম দিয়ে নেয় ইউরঘিস। সকালে উঠে জব্বর একটা জলখাবার আর এক কাপ কফি। ইউরঘিসের যুক্তি হয়তো চাষীর মনে চিড় কেটেছিল, তাই জলখাবারের দাম নেয় মাত্র পনেরো সেণ্ট। খাবার পর ইউরঘিস আবার পথে নামে।

এইভাবে শুরু হয় ওর ভবঘুরে জীবন। শেষ চাষীটির মত এত ভাল ব্যবহার প্রায়ই কেউ করে না; তাই ঘুমোবার জন্য ও কোন বাড়ীর দিকে বড় একটা ঘেঁষে না, ফাঁকা আকাশের তলে মাঠে পড়ে' ঘুম লাগায়। বৃষ্টিবাদল হ'লে একটা প'ড়ো বাড়ী খুঁজে নেয়, না পেলে রাত্রি পর্যন্ত গাছের তলে অপেক্ষা করে' লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে যায় কোন খড়ের গাদার দিকে; বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চাষীর কুকুর ওর গন্ধ পাবার আগেই ও খড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে; এর পরও কুকুরগুলো টের না পেলে আরামে একটু ঘুম দিয়ে নেয়, আর টের পেলে চমৎকারভাবে রণনীতি অনুসরণ করে' ও পশ্চাদপসরণ করে; লিথুয়ানিয়ার সেই শক্তিশালী ইউরঘিস আর নেই, তা না থাক, হাত দুটোয় এখনও যা জোর আছে তার এক ঘায়ের বেশী দু' ঘা খেতে পারে এমন কম কুকুরই আছে এ সব খামারে।

এর অল্পকাল পরে মাঠে জাম, বৈঁচি প্রভৃতি নানারকমের ফল ধরতে লাগে, বাগানে বাগানে আপেল, ক্ষেতে ক্ষেতে আলু। অভাব কী ওর! দিনের বেলা নিশানা করে' রাখে, রাত্রে এসে পকেট পুরে নিয়ে যায়। দু'বার দুটো মোরগও ধরেছিল, একটা পুড়িয়ে খায় একটা প'ড়ো বাড়ীতে আর একটা নদীর ধারে নির্জন একটা জায়গায়। এ সব উপায় ব্যর্থ হ'লে সাবধানে পয়সা খরচ করে, কিন্তু চিন্তা করে না; কারণ, জানে প্রয়োজন হ'লেই ও এ অঞ্চলে রোজগার করতে পারবে। আধ ঘণ্টা কাঠ চোপালেই ওর একবেলার খাবার মত রোজগার হ'য়ে যায়। ওর হাতের জোর এবং কুড়ুল চালাবার কায়দা দেখে চাষীরা ওকে রাখবার চেষ্টায় ঘুষস্বরূপ অনেক সময় বেশীই দেয়।

ইউরঘিস কিন্তু থাকে না। এখন ও মুক্ত মানুষ, ও আজ "নিরুদ্দেশের সমুদ্রযাত্রী"! পুরাতন "ভ্রমণ-তৃষ্ণা" ঢুকেছে ওর রক্তের মধ্যে, বন্ধনহীন জীবনের আনন্দ, সন্ধানের আনন্দ, সীমাহীন

আশা করবার আনন্দ ওকে পেয়ে বসে। দুর্ঘটনা ঘটে, অসুবিধাও হয় অনেক, কিন্তু সর্বদাই একটা-না-একটা নতুন কিছু সামনে থাকেই। বছরের পর বছর যে একই জায়গায় রুদ্ধ হ'য়ে ছিল, বস্তি আর কারখানা ছাড়া আর কিছু দেখেনি, হঠাৎ সে ছাড়া পেয়ে গেছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, প্রতিমুহূর্তে নতুন মানুষ নতুন দৃশ্য দেখবার স্বাধীনতা এসেছে, ওর কাছে এর মূল্য অনেক। আজীবন ও করেছে কী? একই কাজ সমস্ত দিন ধরে' একটানা করে' গেছে, তারপর খুব ক্লান্ত হ'লে শুয়ে ঘুমিয়েছে, আবার সকালে উঠে সেই একই কাজ ধরেছে। আর আজ? হুকুম করবার কেউ নেই, যখন যে কাজ খুশী করছে, ইচ্ছে না হ'লে কিছুই করে না; সামনে একঘেয়েমো নেই, প্রতিঘণ্টায় একটা-কিছু নতুন অজানা আশা-না-করা আনন্দ, আনন্দমাখা কাজ অহরহ সামনেই।

আবার ফিরে আসে ওর হৃতস্বাস্থ্য, যৌবন, শিরায় শিরায় নবজীবনের স্পন্দন, আসে দৈহিক শক্তি; এরা আসে বন্যার মত সহসা প্রবল বেগে, চমকিত হ'য়ে যায় ও, পাগল করে' দেয় ওকে; এই শক্তি এই প্রাণ এই যৌবন হারিয়েই তো ও এতদিন দুঃখ করেছে, আজ অযাচিতভাবে তারা ফিরে আসে, ভাবনাচিন্তাহীন শৈশব, ওর মৃত শৈশব যেন আবার ফিরে আসে, নতুন মিলনের আনন্দে হাসে, হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানায়। মুক্ত বায়ু, প্রচুর খাদ্য, খুশীমত ব্যায়াম, যখন খুশী ঘুম, ঘুম হ'তে জেগে কাজের পিছনে দৌড়নো নেই, নির্দিষ্ট কোন কাজ নেই, নবলব্ধ এই শক্তি নিয়ে ও কী করবে ভেবে পায় না; শুরু করে' দেয় পথচলা, গলা ছেড়ে দেশের বহু-আগে-শেখা গান ধরে' পথ চলে। থেকে থেকে অ্যান্টেনাসের কথা মনে পড়ে' যায়, তার কথা আর শুনতে পাবে না, সে মুখ আর এ জীবনে দেখতে পাবে না, আবার সচেতন হ'য়ে মন হ'তে ঝেড়ে ফেলে

এ দুর্বলতা; কখনো ওর বাহুমাঝে ওর ওনা ফিরে আসে, বাহু বাড়িয়ে দেয় ও ওনার দিকে; ঘুম ভেঙ্গে যায়, চোখের জলে ভিজে যায় মাঠের মাটি! সকালে উঠে ধুলোর মতই ঝেড়ে ফেলে এ চিন্তা, জোর পা চালায় কিছুক্ষণ—লড়তে হবে তো এ জগতের সঙ্গে!

কোথায় আছে বা কোথায় চলেছে, এ সব প্রশ্ন ও কাউকে করে না; জানে, দেশটা বিশাল, ওর সামনে হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে এমন আশঙ্কা নেই। সঙ্গী সাথী? ইচ্ছে করলেই অনেক পাওয়া যায়; ওরই মত ভবঘুরে অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দলে মিলে যেতে কোন বাধা নেই। এ পেশায় ও নতুন, অন্যেরাও পেশাদার ভবঘুরে গোষ্ঠী নয়; তাদের কলাকৌশল তারা সাদরে শিখিয়ে দেয় ওকে—কোন্ কোন্ শহর ও গ্রাম এড়িয়ে চলা ভাল, বেড়ার গোপনচিহ্নসমূহ কী ভাবে চিনতে ও জানতে হয়, কখন ভিক্ষে আর কখন চুরি করতে হয়, আবার একই সঙ্গে দুটোই কীভাবে প্রয়োগ করতে হয়, ইত্যাদি। কখনো কখনো এদের দলে ও মিশে যায়, বনের মধ্যে তাঁবু পড়ে, রাত্রে বেরিয়ে যায় চুরি-ডাকাতির জন্য; তার পরও হয়তো কেউ থেকে যেতে অনুরোধ করে তাদের দলে; কয়েক সপ্তাহ ধরে' আবার শুরু হয় ওদের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। নিজের নিজের জীবনী-বিনিময় চলে চলার পথে।

এদের মধ্যে পেশাদার ভবঘুরেও আছে, তারা জীবনে এ ছাড়া কিছু করেনি, এদের চালচলন সবই জঘন্য। অধিকাংশই ছিল মজদুর, ইউরথিসের মত জীবনের সাথে সংগ্রাম করে' দেখেছে এ লড়াইএ জিততে ওরা পারবে না, তাই লড়াই ছেড়ে পথ ধরেছে। পরে আর এক ধরণের লোকের সঙ্গে ওর আলাপ হ'ল—এরা মজদুর সেনা, সমাজের বাড়তি বভুক্ষু বেকার সেনা এরা; গৃহহীন, কিন্তু ভবঘুরে নয়, কাজ খোঁজে ওরা, ক্ষেতের কাজই পছন্দ করে,

বহু দূরদূরান্তর ঘুরে বেড়ায় কাজের খোঁজে; এদেরই দল হ'তে পাকা ভবঘুরে বেরিয়ে আসে। প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে ওদের জন্ম, দুনিয়ার যত উপরি কাজের ভার ওদের ওপর; ওরা অবশ্য এটা বোঝে না, খালি বোঝে অবিরত ওরা কাজ খুঁজছে কিন্তু ওদের এড়িয়ে কাজ খালি পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রীষ্মে সুদূর দক্ষিণের টেক্সাসের চাষে রোপন-বপনের কাজ পায়, তারপর ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে উত্তর দিকে চলতে থাকে, শস্য কাটার সময় পৌছে যায় উত্তরে; ফসল উঠে গেলে, বনে বনে গাছ কাটার কাজে লেগে যায়, সেখানে কাজ না পেলে গিয়ে ওঠে শহর-বন্দরে, কাজ না পেলে এতদিনের রোজগারের সঞ্চয় ভেঙ্গে খায়, নয় যখন যা কাজ জুটে যায়—যেমন, জাহাজঘাটায় মাল তোলা-নামানো, বরফ কাটা, বরফ সরান, খাল-নালা খোঁড়া ইত্যাদি হঠাৎ-এসে-যাওয়া কাজ করে ওরা; কাজের চেয়ে লোক বেশী হ'য়ে গেলে দুর্বলগুলো একই "প্রকৃতির কঠোর নিয়মে" অনাহারে ও ঠাণ্ডায় মারা পড়ে।

জুলাইএর শেষাশেষি মিসৌরিতে এসে ইউরঘিস ফসল কাটার কাজ পায়। তিন চার মাস ধরে' চাষীরা এ ফসল তৈরী করেছে, এখন বাড়তি লোক লাগিয়ে চটপট এ ফসল কাটিয়ে নিতে না পারলে সব পরিশ্রম ও আশা বরবাদ হ'য়ে যাবে। বাড়তি লোক ওরা লাগায় অবশ্য এক সপ্তাহ, বড় জোর দু' সপ্তাহের জন্য। সারা অঞ্চল জুড়ে তাই চাষীদের মধ্যে মজুরের জন্য হাহাকার পড়ে' যায়। শহরে শহরে দালাল কোম্পানী গড়ে' ওঠে শহরের মজুর ঝেঁটিয়ে গ্রামে পাঠাবার জন্য, প্রচারের ঠেলায় গাড়ী গাড়ী কলেজী-ছাত্র এসে যায় ফসল কাটতে, তাতেও না কুলোলে উদ্‌ভ্রান্ত চাষারা ট্রেন থামিয়ে গায়ের জোরে মজুর-শ্রেণীর লোকদের ধরে' এনে কাজে লাগিয়ে দেয়। জোর করে' ধরে' কাজে লাগায় বলে' মজুরী কম দেয় তা নয়, দিন দু' ডলার আর

খাওয়া থাকা দেয়, ভাল মজুর হ'লে আড়াই ডলার তিন ডলার খালি মজুরীই দেয়।

ফসল কাটার নেশা এখন এ সব অঞ্চলের আকাশে ভাসে ; যার মধ্যে একটুও শক্তি আছে, সে এ নেশা এড়িয়ে থাকতে পারবে না। ইউরঘিস একটা দলে ভিড়ে পড়ে, কাজ চলে ভোর হ'তে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত, দিন আঠারো ঘণ্টা এইভাবে একটানা কাজ চলে দু'টি সপ্তাহ। এই দু' সপ্তাহের সঞ্চয়, ওর আগের কষ্টের [illegible] সম্পদ্ বলেই হয়তো গণ্য হ'ত, কিন্তু এখন ও কী করবে এই সঞ্চয় নিয়ে ? একটা ব্যাঙ্কে অবশ্য এটা রাখতে পারে, এবং ভাগ্য ভাল হ'লে [illegible] দরকারমত ফেরতও পেতে পারে। ইউরঘিস এখন নিরাপদ মানুষ, কাজ কি ওর ব্যাঙ্কে হুণ্ডিতে বা চেকে ? পরিভ্রমণ করছে ও একটা মহাদেশ, মানবে কেন ও ব্যাঙ্কের বাঁধন ? সঙ্গে নিয়ে বেড়ালে একদিন-না-একদিন এ টাকাটা চুরি যাবেই যাবে ; কাজেই যতক্ষণ পারে এটা উড়িয়ে ফুর্তি কুড়িয়ে নেওয়াই সর্বোত্তম পন্থা। নিজের দলটির সঙ্গে পাশের একটা শহরে চলে' যায় এক শনিবার ; ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে [illegible] শুরু হয়, মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা চায় ; কোথা যায় ? ঢুকে পড়ে সদলবলে একটা মদের দোকানে ; ওকে কেউ খাওয়ায়, ও আবার আর একজনকে খাওয়ায়, চলে নাচগান ফুর্তি ; দোকানের পিছন হ'তে গোলগাল হাসিমুখী একটি মেয়ে ইউরঘিসের দিকে হাসি মারে চোখের মারফৎ, ইউরঘিসের বুকটা ধড়াস্ করে' ওঠে, কী যেন একটা আটকে যায় গলার ভেতর ! না ভেবেই ও মাথা নেড়ে ডাকে মেয়েটাকে, দু'বার ডাকবার প্রয়োজন হয় না, মেয়েটা এসে ওর পাশে বসে' যায় ; আরও মদ চলে। তারপর মেয়েটার সঙ্গে ও চলে' যায় ওপরতলার একখানা ঘরে ; আদিম চিরকালের একটা বন্যপশু গর্জন করে' জেগে ওঠে ওর অন্তরে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে জাগে স্মৃতি ও সরম ; তাই আরও

স্ত্রী-পুরুষ হুল্লোড় করে' এসে ওদের ঘরে ঢুকতে ও স্বস্তি পায়; রাত্রিটা কেটে যায় বিশৃঙ্খল ফুর্তির দাপট আর অবারিত লাম্পট্যে; বাড়তি মজদুর সেনার পিছনে পিছনে আর একটি সেনা ফেরে, এরাও "প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মে" বাঁচবার তাগিদেই ফিরে বেড়াচ্ছে—এরা নারী! আনন্দসন্ধানী ধনীর অভাব নেই দুনিয়ায়, তাদের দৌলতে এই নারী বাহিনীর সদস্যারা যতদিন যৌবন ততদিন লুঠে নেয় আরাম আয়াস বিলাস আর জীবিকার প্রাচুর্য্য; যৌবনে ভাটা পড়ে, আখের ছিবড়ে ফেলে দেয় ধনীরা—এরা তখন ঘোরে উট্‌কো মজদুর ফৌজের পিছু পিছু; কখনো কখনো এরা নিজেরাই জীবিকার সন্ধানে এ পথের পথিক হয়, মদের দোকানদাররা বখরায় ব্যবসা ফাঁদে ওদের সঙ্গে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরে বড় বড় দালাল কোম্পানীর মারফৎ এদের চলাচল হয়; এই সব কোম্পানীই মজদুর ও রাণ্ডী ফৌজের ব্যবসা চালায় একসঙ্গে একই পথে। এদের চালান দেওয়া হয় ফসল কাটার সময় মফঃস্বল শহরে, বন কাটার সময় বনের তাঁবুতে, আবার বুভুক্ষ ফৌজ শহরে এলে শহরে। কোথাও হয়তো বিশেষ কাজ পড়ল—যেমন, রেলপথ পাতা, ক্যানেল খোঁড়া, কি বাঁধ বাঁধা, কি পূর্তবিভাগের অন্য কোন কাজ, সেখানেও এই নাঙ্গাভুখা ফৌজের সঙ্গে চালান দেওয়া হয় রাণ্ডী ফৌজগুলি; অস্থায়ী কুটীর ওঠে, তাঁবু পড়ে, নয় মদের দোকানে 'আশ্রয়' জুটে যায় এদের, এক ঘরেই হয়তো দশ-বারোজন থেকে গেল—তাতে কি—'প্রাকৃতিক ব্যাপার'!

সকালে উঠে ইউরঘিস দেখলে পকেট ফোক্কা—অভিযোগ নেই, আবার পথ; মনে মনে দুর্বল, বিরক্ত বোধ করে ও—তখনই মনে পড়ে এ ওর নতুন জীবন, কোমল চিন্তার স্থান নেই আর ওর বুকে। গর্দভ বানিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, কিন্তু আর তার চারা নেই, ভবিষ্যতে

আর এমনটা করে' না ফেলে এইটুকু খেয়াল রাখতে পারলেই যথেষ্ট। হেঁটেই চলে, মুক্ত হাওয়ায় ও ব্যায়ামে মাথাধরা ও অবসাদ কেটে যায়, ফুর্তি ও শক্তি ফের ফিরে আসে। এরকমটা বার বার ঘটছে ওর জীবনে, এখনও ভাবাবেগে চালিত হয়, ফুর্তিটাকে পেশাদার ফুর্তিবাজদের মত বেঁধে রাখতে পারে না এখনও। পথের পথিক থাকাই যাদের পেশা, ঠিক তাদের মত হ'তে ওর এখনও অনেক দেরি—মদ ও মেয়েমানুষের পিয়াস তীব্র হয়ে উঠলেই তারা কাজ করতে নামে, মৌতাতের মূল্য উঠলেই কাজ ছেড়ে ফুর্তিতে মেতে যায়—কাজ করার ওদের একটিই উদ্দেশ্য।

ইউরঘিস কিন্তু চেষ্টা করেও ওদের মত হ'তে পারে না, সব কিছুর মধ্যেই বিবেকের জ্বালা জেগে যায়; অপরাজেয় এই বিবেক, অব্যাহতি নেই এরহাত হ'তে; আশাতীত স্থানে এর অভ্যুদয় হয়, একে কখনো কখনো মদে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে ও।

সে রাত্রে ও তখন আছে একটা শহরের বাইরে; ঝড় উঠল, বৃষ্টি নামল; আশ্রয়ের চেষ্টা করল ও ছোট একটা বাড়ীতে। বাড়ীটা ওরই মত একজন স্লাভ্ জাতীয় মজদুরের, শ্বেত রাশিয়া হ'তে নতুন এসেছে এদেশে। দেশী ভাষায় সে ইউরঘিসকে স্বাগত জানায়, রান্নাঘরে চুল্লির পাশে গরম হ'য়ে নেবার আমন্ত্রণ জানায়। বাড়তি বিছানা নেই, তবে চিলেকোঠায় খড় আছে, তাই দিয়ে বিছানার কাজ চলে' যাবে। তার গৃহিণী রান্না করছে, ছেলেরা মেঝেয় খেলা করছে। চুল্লির পাশে বসে' ইউরঘিস ও গৃহস্থ নিজেদের দেশ নিজেদের ফেলে-আসা কাজকর্ম নিয়ে গল্পসল্প করে। খাওয়ার পর তামাক টানতে টানতে আমেরিকা সম্বন্ধে গল্প হয় ওদের, কে কী ভাবে দেখেছে দেশটাকে। কী একটা কথা বলতে বলতে ইউরঘিস মধ্যপথে থেমে যায়—গৃহিণী তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রকে স্নান করাতে বসে। এত রাত্রে! ব্যাপার কী?

শীত আসতেই গৃহিণী দেশের অভ্যাসমত সারা শীতের মত ছেলের গায়ের সঙ্গে জামা সেলাই করে' দেয়; আমেরিকার আবহাওয়া তো দেশের আবহাওয়া নয়, বাচ্ছাটার সারা গায়ে ঘা দেখা দেয়। ডাক্তার বলেছে, প্রতি রাত্রে গা খুলে স্নান করাতে, তা হ'লে নাকি ঘা সারবে! বোকা মেয়েমানুষ তো, ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করেছে! গৃহস্থ হাসে।

ইউরঘিস ওর ব্যাখ্যার একটা কথাও হয়তো শোনেনি; একদৃষ্টে ছেলেটার দিকে চেয়েছিল। এক বৎসরের নাদুস-নুদুস ছেলেটি, কী সুন্দর মোটা মোটা নরম নরম হাত পা, চোখের মণি কয়লার মত কালো। ঘায়ের জন্য ওর বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'চ্ছে বলে' মনে হয় না, স্নানের আনন্দেই মশগুল; হাত পা ছুঁড়ে জল ছিটিয়ে, থপ থপ করে' মায়ের মুখের ওপর মেরে, হেসেই আকুল! গামলার মধ্যে মা ছেলেকে বসিয়ে ছেড়ে দেয়; সে কি আনন্দ! গলা হ'তে অদ্ভুত একটা শব্দ করে' আনন্দ প্রকাশ করে আর খুশীমত জল ছিটোয় মুখে মাথায় মেঝেতে। দুটো একটা কথা ফুটেছে ছেলেটার—রুশ ভাষার শব্দ, এর কিছু কিছু ইউরঘিসও জানে, শিশুমুখের বিচিত্র আধ-আধ ধ্বনিতে মনে পড়ে' যায় নিজের শিশুটির কথা—বুকে যেন ছুরি বেঁধে। বুকের উপর হাত দুটি ভেঙ্গে নিঃশব্দে বসে' থাকে ও, কিন্তু বুকের মধ্যে জমে ঝড়, চোখের পিছনে জমে অশ্রুর বন্যা। শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে ও সংযত রাখতে পারে না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। লজ্জায় দুঃখে মুখের ওপর হাত চাপা দেয়; গৃহস্থদম্পতি বিস্ময়ে ভয়ে সারা! একদৌড়ে ইউরঘিস বেরিয়ে যায় বৃষ্টির মধ্যে।

নির্জন রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে হাঁটে ও—কিছুদূর হাঁটবার পর একটা বনে পৌঁছয়; এখানে লুকিয়ে ও কাঁদে—কান্নায় বুক বুঝি টুকরো টুকরো হ'য়ে যাবে। স্মৃতির কবরখানা খুলে যায়, ওর প্রাক্তন জীবনের ভূতগুলো বেরিয়ে চাবুক মারে ওকেই—কী তীব্র অন্তরবেদনা, কী

হতাশা! ওরই প্রাক্তন মূর্তি, ওনা, ওদের শিশু আজকের ইউরঘিসের কাছে ফিরে আসবার জন্য হাত বাড়ায়—কিন্তু আজ আর ও ফিরে যেতে পারবে না, দৃশ্যটা বিভীষিকার মত ভেসে ওঠে। ওর আর তাদের মধ্যে অতল এক গহ্বর—তারা ডাকছে কিন্তু যাবার পথ নেই, শক্তি নেই। চিরতরে তারা সরে' গেছে ওর কাছ হ'তে—নিজের নীচতায়, নিজের জঘন্যতায় নিজেরই দম বন্ধ হ'য়ে আসে ওর!

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হেমন্ত এসে গেছে, খড়ের গাদায় ঢুকলে আর শরীর গরম থাকে না; ফলে ব্যোম হ'য়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ ঘুচে যায়। ইউরঘিস আবার শিকাগোয় ফেরে। আরও হাজার হাজারের মত সেও নিজেকে ধোঁকা দেয়, ভিড় হবার আগেই পৌঁছলে কাজ পেলেও পেয়ে যেতে পারে! জুতোর ভেতরে লুকোনো পনেরো ডলার সযত্নে মজুদ আছে: মদের দোকানদাররা এটুকু টের পায়নি, বিবেকের খোঁচায়ও এটা জমেনি, শীতে না খেয়ে মরবার ভয়ে এটুকু থেকে গেছে।

আবার ভ্রমণ চলে, আরও অনেকের সঙ্গে, মালগাড়ীতেই। কর্তারা দেখতে পেলে চলন্ত গাড়ী হ'তেই ওদের টান মেরে ফেলে দেবে, এ ওরা জানে; তবু ঐভাবে না গেলে বহুৎ ভাড়া লেগে যাবে। শিকাগোতে নেমেই ও সাথীদের ছেড়ে পালায়—তাদের পকেট ফোক্কা, ওর ট্যাঁক ভারী, একসঙ্গে থাকলে ট্যাঁকটা গড়ের মাঠ হ'তে বেশী সময় লাগবে না; এক মাসে ঢের শিখেছে ও, সে সব বিদ্যে কাজে লাগায় এখন, বাঁচতেই হবে; আর যে মরবে মরুক, ও বাঁচবে। রাত্রি ভাল থাকলে পার্কে, খালি মোটরে, ট্রাকে, বাক্সে বা ঐ রকম সুবিধাজনক কোন জায়গায় ঘুম মারে, আর বৃষ্টিবাদলা হ'লে কোন বাসাবাড়ীর দেওয়ালে লাগান তক্তা ভাড়া নেয় দশ সেণ্ট দিয়ে কিংবা কোন হলে

বসে' কাটাবার জন্যে তিন সেণ্ট ভাড়া দেয়। মুফৎখানার দোকানে অর্থাৎ পাঁচ সেণ্টের মদ কিনলে যেখানে মুফৎ ভোজ্য পাওয়া যায় সেই সব দোকানে পেট ভরায়, পাঁচ সেণ্টের এক আধলাও বেশী খরচ করে না। এইভাবে থাকলে দু'মাস কি তারও বেশী ওর চলে' যাবে, তার মধ্যে কি একটা কাজ জুটবে না? খুব জুটে যাবে। শহরে এসে সাফ-সুতরো থাকবার স্বভাবটা ওকে ছাড়তে হয়, প্রথম রাত্রের বাসা হ'তেই উঠে আসে উকুন বোঝাই হ'য়ে! শহরের কোথাও, এক হ্রদ ছাড়া, মুখ ধোবার পর্যন্ত একটা জায়গা নেই, স্নান তো পরের কথা। আর কয়েকদিনের মধ্যে সে হ্রদও বরফের ময়দান হ'য়ে যাবে।

প্রথম চেষ্টা করে ইস্পাতের কারখানায়, তারপর সারের কারখানায়। দুটোর কোথাও আর "ওর চাকরি" খালি নেই, ভর্তি হ'য়ে গেছে। মাংসের কারখানাগুলোর দিক মাড়ায় না ও; নির্ঝঞ্ঝাট একা আছে, একাই থাকতে চায়; নিজে রোজগার করবে, নিজে খাবে থাকবে, ভাগীদার আবার কেন? দোকান, রেষ্টুরেণ্ট, হোটেল, কারখানা সব কিছুতেই পায়ের কাদা দেয় ও কাজের খোঁজে, সর্বত্রই ওর আগেই সেখানে দশ-বিশ হ'তে একশো-দেড়শো উমেদার জমে' থাকে। চাকরির খোঁজে ও শহরের এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন টহল দেয়; খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনও দেখে মাঝে মধ্যে। কিন্তু আর যাই করুক মিষ্টিমুখো দালালদের খপ্পরে আর ও পড়ছে না। "মুসাফির জীবনে" এদের কাহিনী সবই শুনেছে।

মাসখানেক খোঁজাখুঁজির পর একখানা খবরের কাগজ মারফতই ও একটা কাজ পেয়ে যায়। "একশো লোক চাই"-এর বিজ্ঞাপন; প্রথমতঃ ব্যাপারটাকে ও ধোঁকাই ভেবে নিয়েছিল, তবু জায়গাটা কাছাকাছি দেখে গিয়ে হাজির হয়। তখন দীর্ঘ একটা লাইন হ'য়ে গেছে; কী আর করবে ও, লাইনের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ে; পাশের

গলি হ'তে একখানা ট্রাক বেরোয়, লাইনটা ভেঙ্গে যায়, সুযোগ পেয়ে যায় ইউরঘিস, লাফিয়ে গিয়ে সামনের একটা জায়গা নিয়ে নেয়। অন্যান্যরা ওকে লাইন হ'তে বের করে' দিতে চায় ঠেলে—হুজ্জুতি পেয়েছে নাকি ও! ইউরঘিস গালাগাল খিস্তি চেঁচামেচি এমনভাবে শুরু ক'রে দেয় যাতে পুলিসের দৃষ্টি পড়ে এদিকে; উ..., তাহ'লে সকলকেই পেটনের চোটে "লাশ" করে' দেবে। অন্য... জায়টা সয়ে' যায়।

ঘণ্টা দুই ঐভাবে গুঁতোগুঁতি করার পর সাক্ষাতের ঘ... ঢুকতে পায়। বিপুলবপু একটা আইরিশ দেখা করছে এদের সঙ্গে।

প্রশ্ন হয়: "আগে শিকাগোয় কাজ করেছ?"

এক মাসে বুদ্ধি বেড়েছে বলেই হ'ক বা মা বাণী কণ্ঠে ... বলেই হ'ক, ইউরঘিস জবাব দেয়, "আজ্ঞে না, হুজুর।'

"আসছ কোথা হ'তে?"

"ক্যানসাস্ শহর হ'তে হুজুর।"

"কোন প্রশংসাপত্র আছে?"

"না, হুজুর। অদক্ষ শ্রমিক আমি। কাজের এই হাত দু'...না ছাড়া আর কিছু নেই আমার, হুজুর।"

"কঠিন পরিশ্রমের কাজ, খাটিয়ে লোক চাই আমি। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে টেলিফোনের তার বসাতে হ... তোমার হয়তো পোষাবে না।"

"আমি রাজী, হুজুর, যে কোন কাজ পেলেই আমার চলবে হুজুর। মাইনে কত?"

"ঘণ্টা পিছু পনেরো সেণ্ট।"

"আমি রাজী হুজুর।"

"বেশ, ঐ ওখানে গিয়ে নাম লেখাও।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই শহরের পথের বহু নীচে ও সুড়ঙ্গ কাটতে লেগে যায়। টেলিফোন তারের পক্ষে অদ্ভুত সুড়ঙ্গ, আট ফুট উঁচু আট ফুট চওড়া। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, পাহাড়ের নীচে মাকড়সার জালবিশেষ! ইউরঘিস ওদের দলটার সঙ্গে তলে তলে আধ মাইল হেঁটে গিয়ে ওদের কাজের জায়গায় পৌঁছয়। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—তলে বিজলী বাতি, সংকীর্ণ মাপের রেলপথ পর্যন্ত।

প্রশ্ন করবার জন্য ইউরঘিস ওখানে যায়নি, এ সব নিয়ে মাথাও ঘামায় না। প্রায় পুরো একটি বৎসর পরে ও সমস্ত ব্যাপারটার মতলব বোঝে। নগর-সভা একটা ছোট নিরাপদ নির্দোষ প্রস্তাব গ্রহণ করে—সেই অনুযায়ী একটি কোম্পানী নগরের নীচে টেলিফোন "নালী" খোঁড়বার অধিকার পায়, আসলে কিন্তু তার ফলে একটা বিরাট কোম্পানী গড়ে' ওঠে, সমগ্র শিকাগোর নীচে একটা ভূগর্ভ রেলপথ খোলবার ব্যবস্থা হয়। মাল যাতায়াত করবে। শহরে মালিকদের মিলিত একটা সঙ্ঘ গড়ে' উঠেছে, এর পিছনে বহু লক্ষ কোটি ডলারের শক্তি; উদ্দেশ্য মহৎ—শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিকে চটকে দিতে হ'বে। মালবাহীদের ইউনিয়নই ওদের মাথা ধরিয়েছিল; এখন এই ভূগর্ভ রেলপথ দিয়ে সব কারখানা, ষ্টেশন ও গুদামের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে টুঁটি টিপে ধরতে পারবে ওরা মালবাহী ইউনিয়নের। মধ্যে মধ্যে পৌর পরিষদে একটু আধটু গুজব ওঠে, একবার একটা অনুসন্ধান সমিতি পর্যন্ত গড়ে' উঠেছিল—কোথা হ'তে মোটা মাপের বাঁহাতি খয়রাৎ হ'য়ে যায়—ব্যস, সব ঠাণ্ডা; রেলপথের কাজ এগিয়ে চলে। একদিন কিন্তু সমগ্র শহরটা জেগে উঠল; রেলপথ তখন তৈরী হ'য়ে গেছে। সে এক কেলেঙ্কারি! আস্তে আস্তে সবই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে;—পৌরপ্রতিষ্ঠানের নথিপত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যা-তা ক'রে বানানো হ'য়েছে, আরও বহু প্রকারের মহৎ কার্য কর্তারা সমাধা ক'রে রেখেছেন—শিকাগোর বড় বড় পুঁজি-

পতিদের জেল হ'য়ে গেল—অবশ্য সত্যি নয়, রূপকভাবে! অল্ডার-মেনরা বিবৃতি দিলেন, তাঁরা শিশুর মত নির্দোষ, এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ জানতেন না—খালি তাঁদেরই একজনের মদের দোকানের পিছনের আঙিনা হ'তে সুড়ঙ্গের প্রধান প্রবেশপথ নেমে গেছে!

নতুন একটা পথে ইউরঘিসকে কাজে লাগান হয়। বুঝে নেয় ও সারা শীতটা এ কাজ চলবে, অর্থাৎ ওর চাকরি থাকবে; মহানন্দে সেদিন মাতলামি "প্রভৃতি" করে' নেয় রোজগারের এক অংশ দিয়ে, রোজগারের বাকীটা দিয়ে ঘুমোবার জায়গা ভাড়া করে' নেয়—নীচেতলার একটা ঘরে আরও চারজনের সঙ্গে শোবার সৌভাগ্য। এর সাপ্তাহিক ভাড়া এক ডলার, আরও চার ডলারের বিনিময়ে সুড়ঙ্গমুখের কাছে খাবার ব্যবস্থাও করে' ফেলেছে। ফলে হপ্তায় চার ডলার করে' জমে' যাবে—অচিন্তনীয় ব্যাপার ওর পক্ষে। প্রথমে অবশ্য ওর ব্যবহার্য খনন-হাতিয়ার ওকে নিজেকেই কিনতে হয়, জুতোটারও আর কিছু নেই, ভারী এক-জোড়া বুট কিনতে হয়, পুঁজি ফ্লানেল শার্টটা সারা শীত পরে' পরে' ফর্দাফাই করেছে, কাজেই আর একটা ফ্লানেল শার্টও কিনতে হয়। এক সপ্তাহ ধরে' ভাবে—একটা ওভারকোট কিনবে কি কিনবে না। বোতামের ফেরীওয়ালা একটা ইহুদি ছিল ওদের পাশের ঘরে, ভাড়া না দিয়ে এবং একটা ওভারকোট রেখে লোকটা মারা যায়; বাড়ী-ওয়ালী কোটটা ধরে' থাকে ভাড়া বাবদ, এটা অবশ্য ইউরঘিস কিনতে পারে; ভেবে চিন্তে ঠিক করে, দিন কাটবে তো মাটির তলে, রাত্রি কাটবে বিছানায়; কোট কী হবে? কোট আর ও কেনে না।

সিদ্ধান্তটা খারাপই দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত, কোটের খরচ বাঁচাতে গিয়ে রোজ ছুটতে হয় মদের দোকানে। তা ছাড়া কাজে নামে সকাল সাতটায়, বেরিয়ে আসে সাড়ে-পাঁচটার পর, দুপুরে আধ ঘণ্টা খাবার ছুটি পায়, সেটা ভেতরেই সেরে নেয়, ফলে রবিবার ছাড়া সূর্যের মুখ আর দেখা হয় না;

সন্ধ্যার পর ও একটু আলোতে উত্তাপে বসবে, দুটো গালগল্প করবে, কি একটু আধটু গান শুনবে বসে' এমন জায়গা নেই ওর ; আর বাড়ী নেই, নেই স্নেহ-ভালবাসা, আছে সাথীত্বের উপহাস, কদর্য জীবনের যত সঙ্গী। রবিবারে গির্জাগুলো অবশ্য খোলা থাকে, কিন্তু এমন গির্জা কোথায় আছে যেখানে ধার্মিকরা দুর্গন্ধ ও উকুনে ভরা মজদুরকে দেখলে বিরক্ত হবে না, পাশে হ'তে সরে' যাবে না! অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরের নিজস্ব কোণটুকু অবশ্য আছে, একটা জানালা আছে একপাশে, তার হাতখানেক দূরে একটা দেওয়াল ; খোলা সড়ক-ও খোলা আছে, রবিবারে ভোরবেলা বেড়াও কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু সেখানে হু-হু করে' বয়ে' চলেছে হিমেল বাতাস। এ সব ছেড়ে দিলে থাকে মদের দোকান—সেখানে বসতে হ'লে মদ খেতে হবে। মাঝে মাঝে মদের ফরমায়েশ দিলে ও আদরণীয় অতিথি ; পাশা কি তেলচিটে তাসের জুয়ো খেলো, কি চটচটে ময়লা টেবিলে স্রেফ টাকারই জুয়ো খেলো, কেউ কিচ্ছু বলবে না ; মদের ছোপধরা "ক্রীড়ামোদী পত্রিকা" আছে, কত খুনের খবর, মেয়েদের আধা ন্যাংটা ছবি—দেখ কেন বসে' বসে', কোন আপত্তি নেই কারও। ভারবাহীদের ইউনিয়ন ভাঙবার জন্য শিকাগোর ব্যবসায়ীদের এই মহান কাজে ও লেগে থাকতে পায় ছ' সপ্তাহ, সে ছ সপ্তাহের জীবন ওর এইভাবে কাটে।

যে কাজের উদ্দেশ্য এই এবং যে কাজ চলে গোপনে, তার শ্রমিকদের মঙ্গলের চিন্তা করবার দরকারই মালিকরা বোধ করে না। সুরঙ্গ কাটতে গড়ে দিন একটা জীবন যায়, আহতের হিসাবই নেই ; তবে কাছাকাছির জন বারো শ্রমিক ছাড়া এ সবের খবর অন্য শ্রমিকেরা পায় না। এরা খননের জন্য নতুন একরকম কল বসিয়েছে, আগের দিনের মত বারুদ দিয়ে মাটি ওড়ায় না, কাজেই শব্দ বা হৈ-চৈএর কিছুই নেই ; খালি কোথাও কোথাও ছাদ ধ্বসে' পড়ে' থাম্বা পড়ে' যায়, আর রেলপথ তৈরীর

স্বাভাবিক দুর্ঘটনাগুলো। একদিন সন্ধ্যায় কাজের পর ওঠবার জন্য ইউরঘিস এগিয়ে আসছে; তলের একটা মোড়ে একখানা ইঞ্জিন ও একটা গাড়ী এগিয়ে আসে, লাইন খোলা ছিল না, ধাক্কা খেয়ে লাইনচ্যুত হয়, ইউরঘিসের একটা কাঁধে ধাক্কা লাগে; সজোরে ছিটকে পড়ে পাশের কংক্রিটের দেওয়ালে; তারপর কী হয় ও জানে না—অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে' যায়।

জ্ঞান হ'ল একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর মধ্যে, বাইরে ছুটির দিনের উৎসবমত্ত জনতা আনন্দে বাজার করে' বেড়াচ্ছে, তারই মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গাড়ীখানা। শিকাগোর একটা আ[illegible]িক হাসপাতালে ওকে পৌঁছে দেওয়া হয়; এখানে একজন তরুণ ডাক্তার [illegible] হাড় বসিয়ে দেয়; তারপর ওকে স্নান করিয়ে একটা খাটিয়ায় শুই[illegible] দেওয়া হয়, সেখানে ওর মত আরো জন কুড়ি বা আরও বেশী জখম কু[illegible]জুর শুয়ে আছে।

বড়দিনটা কাটে ওর হাসপাতালেই। আমেরিকা[illegible] যতগুলি বড়দিন ও কাটিয়েছে তার মধ্যে এইটেই কাটে সবচে[illegible] [illegible]নন্দে বা শান্তিতে। এই হাসপাতালের ডাক্তাররা গরীব রোগীদে[illegible] ওপর নানা রকম মারাত্মক গবেষণা করে' হাত পাকায়—কাগজে কাগজে বহুদিন ধরে' এ অভিযোগ হয়েছে, কয়েকবার "অনুসন্ধান"ও হ'য়ে গেছে। ইউরঘিস এসব কিছু জানে না। টিনের "সশস্য মাংস" ও "ভাজা মাংস" ওদের খেতে দেওয়া হয়—এই একটিমাত্র অভিযোগ ডাক্তারদের বিরুদ্ধে; প্যাকিংশহরের মাংসের কারখানায় যে কাজ করেছে, সে তার কুকুরকেও এ মাংস খাওয়াবে না। ওখানে কাজ করবার সময় ইউরঘিস ভাবত, কোথায় বিক্রি হয়, কে কেনে এই সব মাংস! এখন বোঝে, এগুলি কেনে সরকারী আমলারা আর ঠিকেদাররা। এর সাধারণ নাম "ঘুষমাংস"। এ মাংস খেতে হয় সৈনিক, নাবিক, কয়েদী,

হাসপাতালের রোগী, ঠিকের লাগান কুলিমজুর প্রভৃতিকে; বা যে কোন জায়গায় খাবার দেবার সর্তে কলে লাগান হয়, বন কাটতে, পাহাড় ভাঙতে যে সব কুলি নিয়ে যাওয়া হয়, সে সব জায়গায় অন্য খাবার না বেচে এই "খাদ্য" বেচা হয়।

ছ' সপ্তাহ পরে ইউরখিসকে হাসপাতাল হ'তে খালাস করবার সময় হ'য়ে যায়; হাতে তখনও ও জোর পায়নি, বাইরে গিয়ে খেটে খেতে ও পারবে না; তবু ওকে যেতে হবে কারণ ও গেলে একটা খাটিয়া খালি হবে, আর একজন আহত চিকিৎসিত হ'তে পারবে। ও খাটতে পারবে না, সঞ্চয় নেই, বাঁচবার অন্য কোন উপায় নেই ওর—হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, তার মনিব কোম্পানী বা শহরের অন্য কোন লোকেরও এ নিয়ে কোন ভাবনাচিন্তা নেই।

ও আহত হয় এক সোমবারে; আগের শনিবারে হপ্তার মাইনে পেয়েছিল, আগের সপ্তাহের খাওয়ার খরচ, বিছানাভাড়া প্রভৃতি মিটিয়ে দিয়ে বাকীটা উড়িয়ে দিয়েছিল মদের দোকানে। পকেটে এখন মজুদ সম্পত্তি পঁচাত্তরটি সেণ্ট, আহত হ'বার দিনের কাজের দ… কোম্পানীর কাছে পাওনা দেড় ডলার। কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ করলে কিছু খেসারৎ হয়তো পেতে পারে; ও সব আইন ও জানে না, ওকে এটা বলে' দেওয়াও কোম্পানীর ব্যবসায়ের অন্তর্গত একটা কাজ নয়। অফিসে গিয়ে সেদিনের মাইনে আর ওর হাতিয়ার নিয়ে চলে' আসে; পঞ্চাশ সেণ্টের বিনিময়ে সেগুলো বন্ধক দিয়ে দেয়। তারপর চলে বাড়ীওয়ালীর কাছে, সে ওর জায়গা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে, অন্য বিছানা খালি নেই; পথ ধরে ও ওদের ইদানীংকার খাবারের দোকানের দিকে; দোকানের মালিকা কয়েকটা প্রশ্ন করে' অবস্থাটা ভেবে নেয়—খেয়েছে এখানে মাত্র ছ' সপ্তাহ, আরও মাস দুই খাটতে পারবে না; চটপট

সিদ্ধান্ত হ'য়ে যায়, এমন লোককে বিশ্বাস করে' ধারে খেতে দেওয়া যায় না।

ভয়াবহ অবস্থায় ইউরথিস পথে বেরিয়ে আসে। প্রচণ্ড তুষারপাত চলেছে বাইরে, খোলা মুখটা জমে' যাবার উপক্রম ; গায়ে ওভারকোট নেই, অসহ্য বোধ হয় এ শীত ; অথচ যাবার যায়গা নেই, গায়ে জোর নেই ; পকেটে সম্বল মাত্র দু' ডলার পঁয়ষট্টিটী সেণ্ট্ ; আর সামনে দীর্ঘ-দিনের নিশ্চিত বেকারী, ক' মাস যে আর একটি আধলা রোজগার করতে পারবে কি না,-কে জানে! আগে হ'লে বেশী তুষারপাতেও একটা আশা থাকে লোকের দোরের সামনে হ'তে তুষার সরাবার কাজে মজুর লাগায় ; আজও লাগিয়েছে, অন্য লোক সজোরে কাজ করে' চলেছে, গলায় বাঁধা বাঁ হাতখানি নিয়ে ও ধীরে ধীরে চলে আর ওদের কাজ করতে দেখে। গাড়ীতে মাল বোঝাই দেওয়া, কি কারও মাল বয়ে' দেবার কাজ ও এখনও করতে পারবে না ; খবরের কাগজ বেচার কাজে বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মারামারি করতে হয়, সে ক্ষমতাও আর ওর নেই। চলতে চলতে ভাবে ও এই সব কথা, আর আতংকে ভরে' ওঠে ওর অন্তরাত্মা—সে আতংক বর্ণনা করবার শব্দ নেই কোন ভাষায়। ও যেন জংগলের অধম জানোয়ার—অন্যান্য জানোয়ারের সঙ্গে লড়তেও হবে, আবার লড়বার শক্তিও নেই। দুর্বল বলে' কেউ অনুকম্পা করবে না ওকে। এ লড়াই একটু আসান করবার জন্য কেউ একটা আঙুল তুলেও ওকে সাহায্য করবে না। ভিক্ষা ব্যবসায়েও ওর সামনে বহু বাধা—এটা ও আবিষ্কার করে পরে।

প্রথমটায় এই শীতের কবল হ'তে অব্যাহতি পাবার কথা ছাড়া ও অন্য কিছু ভাবতে পারে না। বহুবার-যাওয়া একটা মদের দোকানে ঢুকে এক গেলাস মদ খেয়ে নেয়, চুল্লির পাশে দাঁড়াবার একটু অধিকার হয় ; আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে আর ভাবে এই বুঝি বের

হ'য়ে যেতে বলে। অলিখিত আইনে এক গেলাস মদ কেনার জন্য এতক্ষণ দাঁড়াতে পাওয়া যায়, তারপর হয় আরও মদ কিনতে হয়, নয় বেরিয়ে যেতে হয়। পুরোনো খদ্দের বলে' ইউরঘিস নয় নিয়মের একটু বেশী দাঁড়াতে পারে; পুরোনো খদ্দের হ'লেও গত দু' সপ্তাহ এ দিকটা মাড়ায়নি; ফলে, ওকে বোধ হয় খরচের খাতায় লিখে রেখেছে এরা। নিজের "দুর্ভাগ্যের কথা" জানিয়ে অনুরোধ করতে পারে ও, কিন্তু তাতে বিশেষ উপকার হবার আশা নেই। যে সব মদওয়ালার এ সব শুনে দয়া হবে, এমন দিনে তার দোকান ভবঘুরে, ভিখিরী, বেকার আর রুগ্নে ভর্তি হ'য়ে যাবে।

কাজেই ওখান হ'তে বেরিয়ে ইউরঘিস আর একটা নিকেল খরচ করে আর একটা মদের দোকানে; একটু মদ খাবার,—ক্ষিধেটা চনচনে হ'য়ে ওঠে, মাংসের গন্ধ ক্ষুধাটাকে আরও দুর্দমনীয় করে' তোলে। কিছু খাবার কেনে। সামান্য খাবার, খেতে আর কতক্ষণ। খাবার নিয়ে খাবার পর আর বসে' থাকা যায় না। বেশী খরচ করার কল্যাণে এবার ওকে তাড়াতাড়ি বের করে' দেয়। এবার যায় কোথায়! আগেকার দিনে একজন বোহেমিয় মজদুরের সঙ্গে বেশ্যাপল্লীতে যেত একটা মেয়েমানুষের খোঁজে। এখানকার মদওয়ালা ওকে বসে' থাকতে দেবে, এ আশা বৃথা। অতি নিম্নশ্রেণীর দোকানগুলোর দোকানদাররা বরফে জলে ভেজা দেখলে মায়া হয় এমনি দু'একজনকে ডেকে ভেতরে বসিয়ে রাখে—তাতে খদ্দের আকৃষ্ট হয়। সারাদিন কাজের পর ছুটি পেয়ে হৃষ্টচিত্ত কোন মজদুর হয়তো দোকানে ঢুকল; মদের ফরমায়েশ দেবার পর চোখ পড়ল বুভুক্ষু বেচারীটির দিকে; চোখের সামনে এমন একজনকে উপেক্ষা করে' গিলে যাওয়া মুস্কিল; মজদুরটী বললে, "কি হে ইয়ার, কী ব্যাপার?" বুভুক্ষু তার দুঃখের কাহিনী পাড়ল; মজদুর বললে, "খুব ঘা খেয়েছ দেখছি; এস, হ'য়ে যাক এক গেলাস, গরম হ'য়ে

উঠবে।" বুভুক্ষু আলাপী হ'লে, আরও এক-এক গেলাসের বরাৎ হয়; তার ওপর দু'জনে একই দেশের হ'লে, কি একই কারখানায় কাজ করে' থাকলে আলাপ জমে' ওঠে, খাবারেরও ফরমায়েশ হ'য়ে যায় কখন কখন। দু' ঘণ্টা পর্যন্ত এইভাবে অনেকক্ষেত্রে কেটে যায়; ওদের গল্পের ফাঁকে দোকানদার এক ডলার রোজগার করে' নেয়। এ সব ইচ্ছাকৃত ষড়্‌যন্ত্র বলে' মনে হ'তে পারে, কিন্তু এ রকম না ক'রেও এই সব ছোটখাট দোকানদারের উপায় নেই; এদের ওপরস্তরের ব্যবসায়ীরা যে দুঃখে ভেজাল দেয়, এরাও সেই দুঃখেই এই ব্যবসা ফাঁদে—একজন না করে, অন্য অনেকে করবে; ফলে চোলাইদারদের কাছে ঋণের দায়ে অল্পদিনের মধ্যে দোকান লাটে উঠবে।

বুভুক্ষু বসিয়ে রাখার এই বাজার সেদিন আগেই ভর্ত্তি হ'য়ে গিয়েছিল; ইউরঘিস আর ঠাঁই পেলে না। দিনের বেলাটুকুই গরম থাকবার জন্য ওকে ছ'টী নিকেলমুদ্রা খরচ করতে হ'য়েছে, এখন সন্ধ্যা আর ভিখিরীদের আস্তানা ষ্টেশনবাড়ীগুলো খুলবে সেই মধ্যরাত্রে। শেষ একটা দোকানে ওর ভাগ্য খুলে যায়, একজন কর্মচারীর সঙ্গে ওর আগে হ'তে আলাপ ছিল, লোকটা ওকে পছন্দও করে; আজ সে ইউরঘিসকে একটা কোণের টেবিলে ঝিমোবার অধিকার দিয়ে দেয়, সেও অবশ্য মালিক না আসা পর্যন্ত। মালিক আসে, উঠতে হয় ইউরঘিসকে। কর্মচারী খবর দেয় দু'চারখানা বাড়ীর পরের একটা বাড়ীতে ধর্মসম্বন্ধীয় কী একটা উৎসব আছে—গৃহহীন বহু বুভুক্ষু আজ সেখানে আশ্রয় ও উত্তাপের জন্য জুটবে।

ইউরঘিস সিধে সেই উৎসব-বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দেয়; বাড়ীটার সামনে একটা বিজ্ঞপ্তি—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় খুলবে। ততক্ষণ? খানিকটা করে' দৌড়য় আর একটা দোরের আড়ালে আশ্রয় নেয়। এত ক'রেও এক ঘণ্টার মধ্যে জমে' যাবার অবস্থা হয় ওও।

যা হ'ক ঘোর খুললে, কেন্ন হাত ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকলেও, ও অন্যান্যদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে' ভেতরে ঢুকে মধ্যের বড় চুল্লিটার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আটটার মধ্যে হলঘরখানা জনারণ্য হ'য়ে যায়; এত শ্রোতা পাওয়া যে কোন বক্তার পক্ষে গৌরবের কথা। অরণ্যে গাছগুলো একটু ফাঁক ফাঁক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এখানে ঘোর পর্যন্ত ওরা গায়ে গায়ে স্যাপ্টালেপ্টে হ'য়ে লেগে থাকে। মঞ্চের ওপর কৃষ্ণপোষাকপরিহিত তিনজন বক্তা, তাঁদের সামনে একটী তরুণী পিয়ানো বাজাচ্ছেন। ছিপছিপে গড়নের, কাল চশমা পরা একজন বক্তা (কী একটা গানের পর) কী যেন বিড় বিড় করে' বলে' চলেন। ইউরখিস ঘুমোয় না, কারণ ঘুমোলেই বিশ্রীভাবে ওর নাক ডাকে, আর নাক ডাকলেই এরা ঘাড় ধরে' বের করে' দেবে। এখন বের করে' দেওয়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সামিল।

ধর্মাধ্যাপক প্রচার করছিলেন "পাপ ও মুক্তি", ঈশ্বরের অসীম করুণা আর মানুষের দুর্বলতার প্রতি তাঁর মার্জনা। প্রচারকের কণ্ঠে গভীর আগ্রহ, উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু শুনতে শুনতে ইউরখিসের অন্তর ঘৃণায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। কী জানে এ পাপ আর দুর্দশার? চমৎকার ইস্ত্রীকরা কাল কোট গায়ে, গলায় কড়কড়ে সাদা কলার, পেট ভর্তি, গা গরম—বক্তৃতা দিচ্ছেন পাপ আর দুর্দশার! বক্তৃতা আবার মারছেন কাদের কাছে?—শুধু বেঁচে থাকবার জন্যই যাদের অবিরাম লড়তে হচ্ছে, ক্ষুধা ও শৈত্যের দানবীয় মুষ্টিতে যাদের জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে বক্তৃতা মারছেন পাপের, দুর্দশার! এ রকম ভাবা হয়তো অন্যায়; কিন্তু ইউরখিসের মনে হয়, যে-জীবনের আলোচনা এরা করছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংস্পর্শ এদের নেই, যোগ্যতা নেই এদের এ সমস্যা সমাধান করবার; তাই বা কেন?

এরাই তো সমস্যার একটা অংগ—মানুষকে পেষবার থেঁৎলে দেবার এই যে সমাজব্যবস্থা এরা তার সক্রিয় অংশ! এরা বিজয়ী উদ্ধত অধিকারীদের লোক; এদের বক্তৃতাবাজী করবার হলঘর আছে, ঘুমোবার ঘর আছে, আড্ডা দেবার আস্তানা আছে, দেহ চাঙ্গা রাখবার জন্য আছে আগুন পোষাক, পেট পুরে খাবার জন্যে খাবার আছে, আর সকলের ওপর আছে পকেটভর্তি টাকা—এ সবের দৌলতে ধর্ম্ম প্রচার করছে বুভুক্ষুদের কাণে, সবিনয়ে শুনতেই হবে বুভুক্ষুদের! এঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন বুভুক্ষুদের আত্মার উদ্ধারার্থে! এদের আত্মার উদ্ধার হ'তে বাধা যে কোথায় তা অতি অতি নির্বোধও জানে—আত্মার খাঁচা এই দেহটাকে একটু ভব্যভাবে রাখবারই ব্যবস্থা করতে পারে না ওরা!

এগারটায় সভা শেষ হয়; বিরক্ত জনতা লাইন বেঁধে হলঘর হ'তে বেরিয়ে যায়—বের হ'বার সময় প্রাণ খুলে গালাগাল দিতে দিতে চলে পাপীতাপীর জন্য অনুশোচনকারী মঞ্চের ওপরের ঐ লোক ক'টীকে। ষ্টেশনঘর খুলতে এখনও এক ঘণ্টা; কী করে ইউরঘি এই একটা ঘণ্টা, ওভারকোট নেই, দীর্ঘ রোগভোগে দেহ দুর্বল, এ ঠাণ্ডা সইবার ক্ষমতা তো ওর নেই। একটা ঘণ্টার মধ্যেই ওর মরবার হাল হয়। দেহের মধ্যে রক্ত-চলাচল অব্যাহত রাখবার জন্য প্রাণপণে দৌড়য় ও; বারটার কাছাকাছি এসে হাজির হয় ষ্টেশনঘরের কাছে; বন্ধ দোরের সামনে তখন বিরাট জনতার ভিড়। এটা উনিশ শো চার সালের জানুয়ারী মাস; দেশের তখন নাকি অতি দুঃসময়; প্রতিদিনই কাগজে খবর বের হয়, আজ এ-কারখানা বন্ধ হ'ল—কাল ও-কারখানা। পণ্ডিতরা হিসাব করলেন শীত শেষ হ'বার আগেই পনের লক্ষ লোককে বেকার করা হ'য়েছে। কাজেই মাথা গোঁজবার সম্ভাব্য

সকল স্থানই তখন পূর্ণ হ'য়ে গেছে; মাথা গোঁজবার একটু আস্তানার জন্য এই সব মানুষ গুঁতোগুঁতি মারামারি করে হিংস্র বন্য পশুর মত। ঘরটা ঠাসা ভর্তি হ'য়ে গেলে দোর বন্ধ করে' দেওয়া হয়, তখনও অর্ধেক লোক বাইরে; ভাঙ্গা হাত নিয়ে ইউরঘিসও ভেতরে ঢোকবার মত হিংস্রতা প্রকাশ করতে পারেনি, বাইরে থেকে গেছে। এবার একমাত্র পন্থা কোন বাসাবাড়ীতে দশ সেণ্ট দিয়ে শোবার মত একটু জায়গা ভাড়া করা। রাত্রি সাড়ে বারটা পর্যন্ত সভা ও সড়কে নষ্ট করে' দশ সেণ্ট খরচ করতে বড় লাগে ইউরঘিসের; ভাড়া ও যত দেরীতেই নিক, বাসার মালিকরা বের করে' দেবে কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়—উঠতে দেরী করলে দেওয়ালে লাগান তক্তার ঠেকো খুলে দেবে, শায়িত সশব্দে পড়বে ভূতলে।

এ হ'ল একটা দিন, এই ধারায় শীত চলল চৌদ্দ দিন ধরে' এক-টানা। ছ' দিনের মধ্যেই ইউরঘিস কপর্দকশূন্য হ'য়ে যায়। এবার বুকের ধুকধুকুনিটুকু বজায় রাখবার জন্যই ওকে ভিক্ষেয় বেরোতে হয়।

শহরের কর্মচাঞ্চল্য সুরু হ'লেই ওর কার্যারম্ভ হয়। একটা মদের দোকান হ'তে বেরিয়ে ভালভাবে দেখে নেয়, কাছেপিঠে কোন পুলিস আছে কিনা; না থাকলে, সম্ভাব্যমূর্তি লোক দেখলেই সামনে গিয়ে নিজের দুখের কাহিনী বলে' চলে, শেষে আবেদন জানায় একটা নিকেল কি একটা ডাইম (দশ সেণ্ট)-এর জন্য। কপাল ভাল হ'লে একটা পেয়ে যায়, পেলেই আর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ঢোকে 'কার্যারম্ভ স্থলে', দেহটা গরম রাখতে হবে তো। ভিক্ষাদাতা ওর কীর্তি দেখে জোর প্রতিজ্ঞা করে কোন ভিখিরীকে আর কখন ভিক্ষে দেবে না। ভিক্ষাদাতা একবার ভাবে না, কোথা যাবে এ ভিখিরী, ও অবস্থায় পড়লে সে নিজে কোথায় যেত। মদের দোকানে ঐ দামে রেষ্টরেণ্টের চেয়ে সস্তা ভাল খাবার পাওয়া যায়, মদটা এসে যায় ফাউ হিসাবে,

এতে শরীরটা গরম থাকে, চাঙ্গা হয়; তা ছাড়া আগুনের ধারে বসে' কোন সাথীর সঙ্গে আরামে গল্প করতে পারে, আপনি শরীর মচমচে গরম হ'য়ে যায়। এই সব মদের দোকানে ও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; ভিখিরীদের ভিক্ষালব্ধ পয়সা হ'তে এই সব দোকানের ভাল আয় হয়, তাই ভিখিরীদের বসতে খেতে এরা সাদরেই দেয়; খুব ভাল লাগে ইউরখিসের। কে করবে এত ভিখিরীদের জন্য? নিজে করত ও?

সার্থক ভিখিরী হ'বার সকল সম্ভাবনাই ছিল ইউরখিসের; ভাঙ্গা হাত, রোগক্লিষ্ট দেহ, ওভারকোট নেই, অতিময়লা অপর্যাপ্ত পোষাক, করুণা উদ্রেক করাবার সকল হাতিয়ারই ওর আছে। কিন্তু হায়, এক্ষেত্রেও সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, খাঁটি মালের ব্যবসায়ী ভেজাল-বিশারদ শিল্পীর নকল মালের চকমকানির কাছে মার খেয়ে যায়! নকলেরই জিত হয়। এ পেশায় ইউরখিস তো সবে শিক্ষানবীশ, সুসংগঠিত বৈজ্ঞানিক পেশাদারী ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে কেন ও! সবে হাসপাতাল হ'তে বেরিয়ে এসেছে, এ কাহিনী তো বহুবার বহুজনের কাছে বলা হ'য়ে গেছে, তা ছাড়া এ তথ্য আর ও প্রমাণ করবে কীভাবে? একটা হাত ঘাড়ে বাঁধা—এ কৌশল দেখলে নিয়মিত ভিখিরীর বাচ্চা ছেলেরাও হাসবে। রক্তশূন্য বিবর্ণ ও? এর জন্য রাসায়নিক রং পাওয়া যায়। শীতে কাঁপে ও?—সুসংগঠিত ভিখিরীদের কাঁপা, দাঁত ঠক্‌ঠকানি দীর্ঘদিন ধরে' শিক্ষা দেওয়া হয়। ওভারকোট নেই?—পেশাদাররা অতি কৌশলে অতি ছিন্ন সূতী পোষাক এমনভাবে পরে' থাকে যে ভেতরের পুরো পশমী পোষাক নজরেই পড়ে না, মনে হয় সূতী একটা শার্ট আর সূতী একটা প্যান্ট, তাও ছেঁড়া, ছাড়া আর কিছু নেই ওদের। এই সব পেশাদার মহাত্মাদের অনেকের আরামপ্রদ আবাস আছে, সুখী পরিবারবর্গ আছে, ব্যাঙ্কে আছে হাজার হাজার ডলার জমা। এ বৃত্তিতে অনেকে এখন অবসর গ্রহণ করে' অন্যদের সাজান, রং

খাথান, শল্যবিদ্যার প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা ছোটদের দলকে শিক্ষা দিয়ে সংগঠিত করছে। অনেকের দুটো হাতই অটুট আছে, পাঁজরের পাশে হাত দুটো শক্ত করে' বেঁধে আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় তুলোর হাত, ভাড়া করা একটা রুগ্ন ছেলে আগে আগে একটা মগ নিয়ে চলে। কারও কারও পা নেই, তারা গাড়ীতে বসে' চাকা ঠেলে ঠেলে নিজেদের চালিয়ে নেয়, অনেকে আবার প্রকৃতির অনুগ্রহে অন্ধ, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে ছোট ছোট সুন্দর কুকুর। এ সব সৌভাগ্য যাদের হয়নি তারা নিজেদের একটা অংগ পংগু করেছে, দেহের প্রকাণ্ড একটা স্থান পুড়িয়ে নিয়েছে কিম্বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে' বীভৎস ক্ষত তৈরী করে' নিয়েছে। হঠাৎ পথিকের সামনে এগিয়ে আসে দগ্‌দগে ঘাযুক্ত একটা আংগুল, ঘায়ে পচন ধরেছে, কারও অন্য কোন অংগের লাল বড় ক্ষত নোংরা ব্যাণ্ডেজের বাইরে আধখানা বেরিয়ে আছে। এরা শহররূপ এই পচা পুকুরের পচা তলানি, এই সব হতভাগ্য বৃষ্টিভেজা স্যাঁতসেতে বস্তীতে, নয় "পচা মদের ডোবায়" বা আফিম চণ্ডুর আড্ডায় রাত কাটায়, সঙ্গে থাকে শেষ অবস্থায় এসে গেছে এমন সব বেশ্যা; এরা বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিভিন্ন বয়স কাটিয়ে শেষে ছিল হয়তো কোন চীনের সঙ্গে, সেও শেষে বের করে' দিয়েছে, এখন সাথী হ'য়েছে এই সব জঞ্জালের। প্রতিদিন পুলিস এদের শত শতকে ধরে' নিয়ে যাচ্ছে, পালবন্দী করে' পুরছে বন্দীশালায় বা ক্ষুদ্রাকার নরকে; একসঙ্গে এই সব জীব পাশব কদর্যতা, হিংস্র মুখ, কুষ্ঠ প্রভৃতি জঘন্য রোগ নিয়ে মহানন্দে হাসছে, হল্লা করছে, মাতলামো করছে, কখন কুকুর কখন বেড়াল কখন বাঁদরের মত ডাকছে, কেউ কেউ আবার বিকারের ঘোরে নিজেদেরই আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

তবু রাত্রির বাসস্থানের ভাড়াটুকু এবং এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা অন্তর মদের পয়সা এইভাবে ওকে তুলতেই হবে, এতে অক্ষম হ'লে শাস্তি পেতে হবে; সে শাস্তি মৃত্যু। দিনের পর দিন মেরুদেশতুল্য এই প্রচণ্ড শীতে ঘুরে বেড়ায়, তিক্ততায় হতাশায় ভরে' যায় বুকখানা। সভ্যতার এই দুনিয়ার এই নগ্ন রূপ আগে যে ভাবে দেখেছে, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, সভ্যতার এ দুনিয়ায় একমাত্র পশুশক্তি ব্যতীত আর কিছুই গণ্য নয়; এ সভ্যতার সমাজ-ব্যবস্থায় একদল সব-কিছুর অধিকারী, তারা তাদের অধিকার ব্যবহার করছে অধিকারহীনদের পায়ের তলায় চেপ্টে রাখবার জন্য। ইউর্গিস এই অধিকারহীনদেরই একজন; বাইরের এ বিশ্ব তার কাছে বিরাট একটা কারাগার, বন্দী ব্যাঘ্রের মত সে এর একটার পর একটা গরাদে ভাঙবার চেষ্টা করছে, প্রতিটীই তার শক্তির চেয়ে অনেক শক্ত। লোভের হিংস্রযুদ্ধে ও পরাজিত, তাই আজ ওকে চরম দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে; সমগ্র সমাজটা একাগ্র আগ্রহে চেয়ে আছে যেন এ শাস্তি হ'তে ও অব্যাহতি না পায়। যে দিকেই তাকায় শুধু দেখে সামনে কারার বেষ্টনী আর পিছনে শত্রুর দৃষ্টি। গণ্ডেপিণ্ডে গিলে গিলে পুলিসগুলো ফুলে ঢাঁই হ'য়ে আছে, তাদের চোখের সামনে পড়লে ও সংকুচিত হ'য়ে যায়, কারণ ও বা ওর মত লোক সামনে পড়লে পুলিসের বেটন উদ্যত হ'য়ে ওঠে; মদের দোকানে যতক্ষণ ও থাকে, দোকানদার ততক্ষণ নজর রাখে ওর ওপর, পয়সা দেবার পর হ'তে না ওঠা পর্যন্ত হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। পথের ধাবমান জনতা ওর আবেদনে কর্ণপাত করে না, ওর অস্তিত্ব নিস্কে

তারা মাথা ঘামায় না; তারপর ও জোর করে' তাদের সামনে গিয়ে পড়লে তারা বিরক্ত হয়, ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে বন্য বর্বরের মত। কোথাও ওর তরে একটুকু ঠাঁই নেই, যে দিকে দৃষ্টি ফেরায় ও সেখানেই দেখতে পায় ঐ এক কথা, ওর তরে ঠাঁই নেই। এই সত্যটা ওর চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যই সব-কিছু তৈরী হ'য়েছে—বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় তাদের দোর, দোরে খিল, বড় বড় জানালা, তাতে লোহার গরাদে। বড় বড় দোকান, বিশ্বের পণ্য সাজান তাদের মধ্যে, সেখানেও ঐ লোহার বেষ্টনী, ব্যাংকগুলোর অকল্পনীয় ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য পোরা রয়েছে অন্ধকার সিন্দুকের মধ্যে। কা'র বিরুদ্ধে এই পাহারা!

এই অবস্থার মধ্যেই ইউরঘিসের জীবনের বোধ হয় সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে' যায়। বেশ রাত্রি হ'য়েছে, বরফ পড়ছে; বরফে বরফে দেহ প্রায় ঢাকা পড়ে' গেছে, হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কনকন করে। থিয়েটার-প্রত্যাগতদের ভিড়ে ঢোকবার চেষ্টা করে, ভিড়ে একটু কম শীত লাগে; বেপরোয়াভাবে পুলিসের সামনে গিয়ে পড়ে, মনের মধ্যে উঁকি মারে অদ্ভুত একটা আশা—গ্রেফতার করলে ভাল হয়। কিন্তু একবার একটা কনস্টেবল্ ওর দিকে এগিয়ে আসতেই, পাশের গলি ধরে' ও চম্পট দেয়; কিছুদূর গিয়ে ঘুরে দেখে পুলিস আসছে কিনা। পুলিস নয়, অন্য একটা লোক আসছে।

ইউরঘিস যথারীতি ওর বাঁধাগৎ শুরু করে' দেয়, "দয়া করে' আমার রাত্রের ভাড়াটা দেবেন, মালিক? আমার হাত ভেঙে গেছে, খেটে খেতে পারি না, পকেটে একটা আধলা নেই। আমি সত্যিকারের শ্রমিক, হুজুর, আগে কখনও ভিখ্ মাগিনি। এতে আমার অপরাধ নেই, হুজুর—"

অপর পক্ষ কথা না কওয়া পর্যন্ত ইউরঘিস সাধারণতঃ বলেই চলে; কিন্তু এই অপর পক্ষটী কথাই কয় না, দম নেবার জন্ত ইউরঘিসকে থেমে পড়তে হয়। লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এতক্ষণে ইউরঘিস লক্ষ্য করে লোকটার পা' টলছে। "ক্যা বলছ তুমি?" মোটা ভ্যাবভেসে গলায় জিজ্ঞাসা করে লোকটা।

এবার ইউরঘিস ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে' বলে ওর গৎটা। কিন্তু পুরো বলা হয় না, লোকটা এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে—"আরে দোস্ত, ঠোক্কর খেয়েছ—হিক্—অ্যাঃ!" কথা কয় আর হিক্কা ওঠে।

লোকটা ক্রমশঃ ইউরঘিসের গলা জড়িয়ে ধরে, "আরে ইয়ার, আমি নিজেই ঠোক্কর খাচ্ছি। বড় পাজি এ বুড়ী ছনিয়াটা।"

কথা কইতে কইতে ওরা একটা বাতির কাছে এসে যায়। ইউরঘিস লোকটার দিকে চায়; লোক বলা যায় না, কাঁচা তরুণ, বয়স বড় জোর আঠার, কচি মুখ, চমৎকার দামী পোষাক গায়ে, লোমের কলারবসান কোমল ওভারকোট, মাথায় রেশমের টুপি; মদে চুর। ইউরঘিসের দিকে বন্ধুর মতই দরদভরা দৃষ্টিতে চায়। বলে, "ওহে বন্ধু আমিও বড় কষ্টে পড়েছি। আমার বাপ মা বড় নিষ্ঠুর, নইলে কি আর তোমার কষ্ট রাখি আমি! কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"হাসপাতালে ছিলাম।"

"হাসপাতাল!" হাস্তমুখরিত হ'য়ে যুবক মন্তব্য করে, "খুব খারাপ। আমার মাসী পোলী—হিক্—মাসী পোলীও হাসপাতালে আছে—হিহি—এই বয়সে মাসীর ছেলে হবে—ভারী বিশ্রী, যমজ ছেলে। তোমার কী হ'য়েছে?"

"হাত ভেঙে গিয়েছিল—"

"ও," ছোকরা সহানুভূতি মাখিয়ে দেয়, "এটা খুব খারাপ নয়, সেরে যাবে। আরে দোস্ত, আমার হাত যদি কেউ ভেঙে দিত! কী মজা

হ'ত! জাহান্নমে যাক! সেবাশুশ্রূষা—হিক্—আরে ধরো আমাকে, ইয়ার! তা কী করতে বল তোমার জন্য?"

"আমি ক্ষুধার্ত, মালিক।"

"খিদে পেয়েছে! তা, পেট পুরে খেয়ে নিচ্ছ না কেন?"

"পয়সা নেই, হুজুর।"

"পয়সা নেই! ও হো হো! ঠিক দোস্ত আছ আমার, আমারও নেই। কিস্সু নেই—একদম ফক্কা! বাড়ী যাচ্ছ না কেন? তা হ'লে তো তুমি আর আমি একই হ'য়ে যাই।

"বাড়ী নেই?! শহরে নতুন এসেছ, অ্যাঃ! মাইরী ভারী বিশ্রী! তাথেকে আমার সঙ্গে আমার বাড়ী চল,—হুঃ, মাইরী বলছি ভারী মজা হবে। আমার সঙ্গে বাড়ী —হিক্—যাবে, আমার খাবার খাবে, আমার সঙ্গে খাবার খাবে। বড্ড একা ইয়ার—কেউ নেই বাড়ীতে। কর্তা বিদেশে গেছে, ববি গেছে তার মধুচন্দ্রে, মাসীর যমজ ছেলে—হে হেঃ—হচ্ছে—হেচ্ছে, সব জাহান্নমে গেছে, কেউ নেই। বল মাইরী, বল তুমিই বল, মদ না খেয়ে কেউ পারে এতে? খালি বুড়ো হ্যাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবার এগিয়ে দেয়; আর কেউ নেই, ভাল লাগে একা খেতে? আরে ভাই, তাই তো ক্লাব পেঁদিয়ে বেড়াই। কর্তা বলে ক্লাবে ঘুমোতে পাবে না, আরে ইয়ার, বলব কি, রোজ রাত্রে বাড়ী ফিরতে হয়। শুনেছ কখন এমন আজব কথা, শুনেছ? বললাম, 'সকালে এলে হবে না?', বলে, 'আজ্ঞে না, প্রতিরাত্রে, নয় টাকা বন্ধ।' কর্তা আমার এমনি! মন আর নরম হয় না, মাইরী। বুড়ো হ্যামকে—হিক্—নজর রাখতে বলেছে আমার ওপর, চাকররা গোয়েন্দাগিরি করছে আমার ওপর—সহ্য হয়, বল দোস্ত, তুমিই বল। আমার মত—হিক্—শান্তশিষ্ট চমৎকার ছেলে আর তার বাবাটা তাকে—ওপ্!—শান্তিতে রেখে ইওরোপ যেতে পারে না। আচ্ছা আপনিই বলুন তো মশায়, লজ্জা হওয়া

উচিত নয় বাবাটার। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেই হবে, মাইরী বলছি, জমাটি একদম মাটি হ'য়ে যায়। এখন বিপদ তো ঐ, এইজন্য আমি এখন এখানে বেড়াচ্ছি। পালিয়ে এলাম, কিটী কাঁদতে লাগল, কে ওর ভ্যাজর ভ্যাজর—হিক্—নিয়ে মাথা ঘামায় বল তো ইয়ার। বললাম, 'বেড়ালবাচ্চী, যাচ্ছি', বললে, 'রোজ এস, সকাল সকাল এস'; কর্তব্য, বাবা, কর্তব্য ছাড়া আমি থাকি না, যেখানে কর্তব্য সেখানেই আমি থাকি। প্রেয়সী বিদায়, বিদায়—হিক্—বিদায় প্রেয়সী, প্রিয়তমা আমার।"

শেষের কথাগুলো নিয়ে ছোকরা গান গাইতে গাইতে ইউরঘিসের গলা ধরে' কাঁদতে সুরু করে। ইউরঘিস এদিকে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চায়, কেউ এসে পড়লেই সেরেছে আর কি! ভাগ্যিস, কেউ এসে পড়েনি তখনও!

"ঠিক পালিয়ে এলাম", ছোকরা ফের বলতে লাগে, "পালিয়ে! আমার ইচ্ছে—হিক্—হলে কেউ আমাকে রুখে রাখতে পারে না। ফ্রেডি জোন্স সে বাচ্ছা নয়, হুঁ হুঁ বাবা! বাড়ী আমি নিয়ে যাচ্ছি না আমার সঙ্গে। কী ভেবেছ আমায়? মাতাল ভাবছ আমাকে, অ্যাঁ? মোটে না! তোমায় আমি চিনি বেড়ালবাচ্চী, চিনি তোমায়! তোমার চেয়ে—হিক্—বেশী মদ খেয়েছি আমি। বললে, 'না প্রিয় না।' বলবে, আলবৎ বলবে। কিটী কি যে-সে মেয়ে! ভারী চমৎকার! 'আমি আমার ফ্ল্যাটে থাকছি আর তুমি এই ঠাণ্ডায় অন্ধকারে বেরিয়ে যাবে।' 'কাব্যি লেখ কিটি', বলে' দিলাম। বললে, 'না প্রিয়, ঠাট্টা নয়। গাড়ী ডেকে দেব একখানা?' কেন? আমি—হিক্—নিজে গাড়ী ডাকতে পারি না? নিশ্চয় পারি, বাজী রাখ! বল ইয়ার বল, বলতেই হবে তোমাকে, আমার সঙ্গে বাড়ী গিয়ে খাবার খাবে না? চল মাইরী, লক্ষী ছেলের মত চল, যেতেই হবে। হিক্—তুমিও আমারই মত মুস্কিলে

পড়েছ, আমার অবস্থাটা বুঝবে না? মাইরী বলছি, ভারী ভাল লোক তুমি। চল দোস্ত চল। বাড়ীতে আজ রোশনাই হবে, দু'জনে ফুর্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেব, নরক গুলজার করব আমরা—হা হা হা—হিক্। কর্তার হুকুম বাড়ীতে যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ যা খুশী তাই করব, মাইরী বলছি, ভগবানের দিব্বি! হো হো লা লা ···"!

গলিপথে তারা বাহুতে বাহু জড়িয়ে এগিয়ে চলে; বিমূঢ় ইউরঘিসকে ছোকরা ঠেলেই নিয়ে চলে একরকম। ইউরঘিস ভাবে, কি করা যায়! এই সঙ্গীর সঙ্গে জনপূর্ণ কোন স্থান দিয়ে এগোন যাবে না; গেলে সকলের নজর পড়বে এদিকে, থামাবে ওকেই। এদিকেও দু'-একজন যাচ্ছে, কিন্তু তুষারপাতের জন্য তারা নিজেদের নিয়েই বিব্রত, এদের দিকে তাকাবার মত অবস্থা নয় তাদের।

হঠাৎ থেমে যায় ইউরঘিস, জিজ্ঞাসা করে, "খুব দূর নাকি তোমার বাড়ী?"

"খুব নয়। ক্লান্ত হয়েছ? বহুৎ আচ্ছা! ডাক একখানা গাড়ী; ডাক, ডাকতেই হবে তোমাকে।" শক্ত করে' ইউরঘিসকে এক হাতে ধরে' অন্য হাত দিয়ে সে নিজের পকেট হাতড়ায়, বলে, "তুমি গাড়ী ডাক, আমি ভাড়া দেব, কেমন হবে বল তো ইয়ার?"

ভেতরের কোন্ পকেট হ'তে একতাড়া নোট বের করে। এত নোট ইউরঘিস জীবনে দেখেনি, চোখ দুটো ওর বড় বড় হ'য়ে যায়।

ফ্রেডি বলে, "অনেক মনে হ'চ্ছে, অ্যাঁ! কী বোকা মাইরী তুমি! সব অল্প টাকার। এক সপ্তাহের মধ্যে ফক্কা হ'য়ে যাব, মাইরী বলছি। আবার সেই পয়সা, বিশ্বাস কর, মাইরী বলছি, তার আগে—হিক্—কর্তা বলেছে—হিক্—একটা আধলা দেবে না, মাইরী বলছি। পাগল হ'য়ে যায় না মানুষ এতে? বল, তুমিই বল ইয়ার! আজই বিকালে তার কাছে সাগরপারী তার পাঠিয়েছি, তাই—হিক্—বাড়ী ফিরছি।

বলে' দিলাম, 'অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি, বংশের—হিক্—মর্যাদার মুখ চেয়ে কিছু রুটি পাঠিয়ে দাও আমায়। ক্ষুধার তাড়নাতেই তোমার কাছে যেতে হবে আমাকে'। মাইরী বলছি এই তার—হিক্—করে' দিলাম। সত্যি বলছি, টাকা যদি না পাঠায়, নিশ্চয় তাহ'লে ইস্কুল ছেড়ে দেব।"

এই ক্ষুদ্র ভদ্রলোকটি বকর বকর করে' চলে—এদিকে উত্তেজনায় ইউরখিস কাঁপতে লেগেছে। ভাবে নোটের তাড়াটা নিয়ে চম্পট দিলে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে এ জিনিসটা ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না। করবে তাই? এর পিছু লেগে থাকলে এর চেয়ে বেশী লাভ কী হবে? কিন্তু জীবনে ও কোন অন্যায় করেনি; সেই জন্যই আজ একটু বেশীক্ষণ ইতস্তুতঃ করে' ফেললে। ফ্রেডি একখানা নোট আলাদা করে' নিয়ে বাকীটা প্যান্টের পকেটে পুরে দেয়।

সেখানি ইউরখিসের দিকে বাড়িয়ে ছোকরা বলে, "নাও, ধর দোস্ত ধর।" একটা মদের দোকানের ছিটকে-পড়া আলোয় ইউরখিস দেখে নোটটা একশো ডলারের।

অপর বলে, "তুমিই নাও এটা। গাড়ীর ভাড়া দিয়ে দাও, আর ভাঙানীটা তুমিই রেখে দিও—অত—হিক্—হিসেব ঢোকে না আমার মাথায়। কর্তাও তাই বলে, কর্তা ঠিক বোঝেন! কর্তার মাথায় খুব ব্যবসাবুদ্ধি, মাইরী বলছি, বাজী রাখতে পারি! বলে' দিলাম, বেশ বাবা বেশ, তুমিই সার্কাস চালাও, আমি টিকিট আদায় করি। তাইতো পোলী মাসীকে লাগিয়েছে আমার ওপর নজর রাখবার—হিক্—জন্য; পোলী তো এখন হাসপাতালে, যমজ বাচ্ছা হ'চ্ছে তার—হে হে হে—আর আমি ঘোটিং কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। এ—ই, ওহে! ডাক ডাক।"

একটা গাড়ী যাচ্ছিল। গলা ছেড়ে ডাকে ইউরখিস; গাড়ীখানা পাশে এসে দাঁড়ায়। ফ্রেডি ঢুকে যায় টলতে টলতে; ইউরখিসও ঢুকতে যায়, গাড়োয়ান ধমকে ওঠে, "এই ভাগ্!"

ইউরঘিস ইতস্ততঃ করে; কিন্তু ওর সঙ্গী ভেতর হ'তে গর্জায়, "কী হ'ল, অ্যাই হ'ল কী, অ্যাই?" গাড়োয়ান চুপ মেরে যায়। ইউরঘিস ঢুকে পড়ে গাড়ীতে। ফ্রেডি হ্রদের পারের একটা ঠিকানা বলে' দেয়, গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। ছোকরা হেলান দিয়ে বসে ইউরঘিসের ওপর; তৃপ্তিতে আনন্দে বক বক করে খানিকক্ষণ, তারপর গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে। ইউরঘিস ভাবে, এই সুযোগে ও নোটের তাড়াটা নিতে পারবে না? সঙ্গীর পকেট খুঁজতে ভয় হয়, গাড়োয়ানও নজর রাখতে পারে। থাকগে, একশো তো নিরাপদ, ওতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এক ঘণ্টা কি তার কিছু পরে গাড়ী থামল। বাড়ীর সদর হ্রদের দিকে, হ্রদ হ'তে রক্তজমান হাওয়া বইছে। গাড়োয়ান বলে, "এসে গেছি।" ইউরঘিস ওর সঙ্গীকে জাগায়। চমকে জেগে ওঠে ফ্রেডি।

"হোই, কোথা এলাম? এ কি? তুমি কে হে, উঁ? ও, হ্যা মনে পড়েছে। ভুলেই গিয়েছিলাম—হিক্—ভুলেই গিয়েছিলাম ইয়ার। বাড়ী এসে গেছি আমরা? লে, তাই মানলাম। চলে' এস—বাড়ী আমাদের—হ'লই বা কুঁড়ে! চালাও।"

ওদের সামনে গ্র্যানিটের বিরাট একটা স্তূপ, অন্ধকারে তাই বোধ হয়। অনেকখানি জমির ওপর মস্ত বাড়ী; রাস্তার ওপর তোরণ, তোরণ হ'তে খাস বাড়ী পর্যন্ত অনেকখানি রাস্তা চলে' গেছে ভেতরে। ফটকের ভেতর দিয়ে গাড়ী চলে; ভেতরের আলোতে ইউরঘিস দেখে বহু গম্বুজ দেওয়া বিরাট বাড়ী, অনেকটা মধ্যযুগীয় দুর্গের মত। ওর মনে হয়, ছোকরা নিশ্চয় ভুল করেছে, এটা দুর্গ না হয় তো নিশ্চয় একটা হোটেল বা পৌরসভা, এত বিরাট একটা ইমারৎ বাড়ী হ'তে পারে কখনো কারও! তবু কথা কইতে সাহস হয় না।

গাড়ী হ'তে নেমে পিছু পিছু চলে। সাথীর বাহুতে বাহু জড়িয়ে দীর্ঘ বহু সিঁড়ির স্তর পার হ'য়ে ওঠে একতলায়।

ফ্রেডি বলে, "দেখ খেলোয়াড়, এইখানে কোথায় একটা বোতাম আছে, ধর আমাকে, খুঁজে বের করি। শক্ত করে' ধর। হ্যাঁ, এই যে! বাঁচলাম!"

একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। নীল উর্দি পরা একটা লোক এসে দোর খুলে প্রস্তরমূর্তির মত দোর ধরে' দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরের আলোর তেজে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, পিট পিট করে' চায় ওরা পরস্পরের দিকে। ইউরঘিস অনুভব করে, সাথী টানছে, এগিয়ে চলে সাথীর সঙ্গে; নীল কল দোর বন্ধ করে' দেয়। ইউরঘিসের বুক ধড়ফড় করে। এতদূর এগোন ওর পক্ষে অতি-সাহসের কাজ। দুনিয়ার বার এ কোন্ জায়গায় ও পা বাড়াচ্ছে, কে জানে? গুহায় ঢুকে আলাদীন হয়তো এর চেয়ে বেশী বিস্মিত হয়নি!

ভেতরে আসে ওরা; মৃদু আলো জলছে এখানে; সেই আলোতেই দেখা যায় বিরাট হলঘর এটা, বড় বড় থাম ওপরে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে, হলের দূর প্রান্তে দেখা যায় অনেক ধাপ সিঁড়ি। মোজেইক পাথরের চৌকোকাটা মেঝে, আয়নার মত মসৃণ। দেওয়াল হ'তে অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি দেখা যায় অস্পষ্ট আলোর অপছায়ায়, সোনালী, লাল, লোহিতাভ—সমস্তটা মিলিয়ে বনের ভেতর সূর্যাস্তের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

উর্দিপরা লোকটি ছায়ার মত ওদের পিছু পিছু আসছিল। ফ্রেডি টুপি খুলে তার হাতে দিয়ে দেয়; তারপর ইউরঘিসের হাত ছেড়ে কোট হ'তে বেরোবার চেষ্টা করে। দু'-তিনবার চেষ্টা করে' লোকটার সাহায্যে কোট হ'তে বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে লম্বা-চওড়া গম্ভীর আর একটা লোক এগিয়ে এসেছে—একে দেখে জল্লাদ মনে হয়

ইউরঘিসের। সতেজ সোজা স্থির দৃষ্টিতে সে ইউরঘিসের দিকে চেয়ে থাকে, সে দৃষ্টির সামনে ইউরঘিস সংকুচিত হ'য়ে ওঠে। নিঃশব্দে সে ইউরঘিসের হাত ধরে' দোরের দিকে এগোতে থাকে। হঠাৎ ফ্রেডির স্বর শব্দিত হয়, "হ্যামিলটন, আমার বন্ধু আমার সঙ্গে থাকবেন।"

হ্যামিলটন ইউরঘিসকে পুরো ছাড়ে না; ফ্রেডি ডাকে, চলে' এস দোস্ত। সাহস পেয়ে এগিয়ে চলে ইউরঘিস ওর 'দোস্তের' দিকে।

ছোটবাবু! হেঁকে ওঠে হ্যামিলটন।

উত্তরে ছোটবাবু বলেন, "গাড়োয়ান ভাড়া পেলে কিনা দেখ তো।" বলে' ইউরঘিসের বাহুর সঙ্গে নিজের বাহু জড়িয়ে নেয়। 'টাকাটা আমার কাছে আছে' বলে' ফেলেছিল আর কি ইউরঘিস, খুব সময়ে নিজেকে সামলে নেয়। হ্যামিলটন নীলউর্দিকে ইশারা করে, সে চলে' যায় গাড়োয়ানের মামলার ফয়সলা করতে, আর হ্যামিলটন চলে ফ্রেডি ও ইউরঘিসের পিছু পিছু!

হলের শেস পর্যন্ত গিয়ে ওরা ফিরে দাঁড়ায়। সামনে বড় বড় দুটো দোর। ফ্রেডি ডাকে, "হ্যামিলটন!"

"আজ্ঞে?"

"খাবার ঘরের দোরটা কোথায় গেল?"

"কোথাও যায়নি তো, হুজুর।"

"খুলছ না কেন তা হ'লে?"

হ্যামিলটন দোরটা খুলে দাঁড়ায়। আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে উঁচু উঁচু স্তম্ভের বিরাট দীর্ঘ সারি, দূরে অন্ধকারে সারিটা মিলিয়ে গেছে। "বাতি!" ফ্রেডি হুকুম করে; চাকর বোতাম টেপে, অমনি ছাদ হ'তে প্রতিফলিত আলোকের বান বয় ঘরের মধ্যে; ইউরঘিসের চোখ ধাঁধিয়ে যায়; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও চোখ পিট পিট করে; ধীরে ধীরে আলো সয়ে' যায়, ও দেখে লম্বায় চওড়ায় বহুদূরবিস্তৃত একখানা ঘর,

ওপরে তেমনি বড় একটা গম্বুজ, গম্বুজ হ'তেই বয়ে' আসছে আলোর বন্যা। আর দেওয়ালগুলো? সবটা মিলিয়ে সুবৃহৎ একখানি চিত্র: সাগর-তরুণীদের সঙ্গে ফুলছড়ান বনে খেলা করছে বন-তরুণরা; ডায়ানা তার কুকুর ও ঘোড়ার দল নিয়ে ছুটে চলেছে গিরিতটিনীর ওপর দিয়ে; বনদীঘিতে একদল যুবতী স্নান করছে--সবগুলিই জীবনাকৃতি, দেখতে এত সজীব যে ইউরঘিস প্রথমটায় ভাবে যাদুপ্রভাবে কোন স্বপ্নপ্রাসাদে উপস্থিত হ'য়েছে বোধ হয় ও। এবার ওর দৃষ্টি পড়ে ঘরের কেন্দ্রস্থ লম্বা টেবিলখানার ওপর—স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত কালো মেহগিনী কাঠের টেবিলটি। টেবিলের মধ্যস্থলে খোদাইকরা একটা পুষ্পাধার—তার ওপর সজীব টাটকা দুষ্প্রাপ্য কত ফুল-পাতা; ফুল-পাতার মধ্যে কোথায় লুকোন আছে একটা আলো, তার রশ্মিতে ফুল-পাতার রঙ জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।

"এইটে আমাদের খাবার ঘর, পছন্দ হয় তো ইয়ার?" প্রশ্ন করলে উত্তর চাই-ই ফ্রেডির, আর ও প্রশ্ন করে' ইউরঘিসের মুখের কাছে মুখ এনে হাসে।

"এত জায়গা, এত চমৎকার ঘর, এখানে খেতে হবে একা বসে' বসে'; ঘর নয়তো নরক। কী বল হে?" হঠাৎ খেয়াল হয় ফ্রেডির; বলে, "এমন জায়গা—হিক্—আগে হয়তো কখনও দেখনি; তাই না দোস্ত?"

—"না।"

—"গ্রাম হ'তে এসেছ, অ্যাঁ?"

—"হ্যাঁ।"

—"হুঁ; আমি ঠিক ভেবেছিলাম। গেঁয়ো লোকরা এরকম ঘরই দেখেনি। কর্তা গেঁয়োদের ধরে'—হিক্—আনে; মুফৎ সার্কাস হয়। বুড়ো জোন্সের বাড়ী এটা, বুঝেছ? মাংসের কারখানাওয়ালা জোন্স!

বজ্জাতটা খালি শূয়োর হ'তে এ সব করেছে! এইভাবে যায় আমাদের পয়সা। তা যাক। চমৎকার বানিয়েছে এটা। জোন্সের নাম শুনেছ কখনো? কী হে ইয়ার, শুনেছ?"

কোনরকমে ইউরঘিসের মুখ দিয়ে বের হয়, "আমি ওরই কারখানায় কাজ করতাম।"

"কী!" আর্তনাদ করে' ওঠে ফ্রেডি, "কারখানায় কাজ করতে তুমি?" হা হা করে' হাসে খানিকটা, বলে, "তা ভাল, তা ভাল! গৌরব, তোমার গরবের কথা! হাতে হাত মেলাও ইয়ার, হাতে হাত মেলাও। কর্তার এখানে থাকা উচিত ছিল—তোমায় দেখলে খুশী হ'ত! মজুরদের সঙ্গে ভারী বন্ধুত্ব কর্তার, বলে পুঁজি আর মজুরের মিলিত সঙ্ঘ, অমনি—হিক্—আরও কত কী! কত মজার মজার ঘটনা ঘটে এ দুনিয়ায়, মানতেই হবে বাবা, ঘটে না? হ্যামিলটন, এস পরিচয় করিয়ে দিই—এ কুলের পুরোনো বন্ধু, কর্তার পুরোনো বন্ধু—কারখানায় কাজ করত। চলে' এস হ্যামিলটন, মিলে যাও আমাদের সঙ্গে, মৌজ করে' রাতটা কাটিয়ে দাও। আমার দোস্ত মিঃ—কিহে, নামটা কী তোমার, ইয়ার? নাম বল তোমার!"

"রুদকস—ইউরঘিস রুদকস।"

"হ্যামিলটন, হাত মেলাও আমার দোস্ত মিঃ রেড্‌নোজের সঙ্গে।"

বাড়ীর পুরাতন চাকর হ্যামিলটন ওখানে দাঁড়িয়েই কায়দাদুরস্ত ভাবে মাথাটি নুইয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, নিজের জায়গা হ'তে এক ইঞ্চিও নড়ে না। হঠাৎ ফ্রেডি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "হ্যামিলটন, তোমার কী হ'য়েছে আমি জানি, বাজি রাখ এক ডলার, ভাবছ—হিক্—আমি মাতাল হ'য়েছি, তাই না? হা হা হা!"

হ্যামিলটন পুনরায় কায়দামাফিক অভিবাদন জানিয়ে বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেডি ইউরঘিসের গলা জড়িয়ে ধরে' হেসে ফেটে

পড়ে। হঠাৎ থেমে গর্জন করে, "ওরে বজ্জাত হ্যামিলটন, ওরে বুড়ো বজ্জাত হ্যামিলটন, বরখাস্ত করব তোকে আমি, না করি তো কী বলেছি! হা! হা!! হা!!! আমি মাতাল হ'য়েছি! হা হা হা!"

নিজের হাসিতে নিজেই মত্ত থাকে ও। এরা দু'জনে অপেক্ষা করে; আবার কী খেয়াল পেয়ে বসবে ওকে কে জানে! "কী করতে চাও?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে' বসে, "দেখতে চাও বাড়ী? বেশ, আমি কর্তা হবো, চল ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। রাজকীয় বৈঠকখানা—এক-একখানা চেয়ারের দাম তিন হাজার ডলার। চা-ঘর—মেয়ারী আন্তনেত্‌—রাখাল নাচের ছবি—ক্লইসডায়েল—তেইশ হাজার। নাচঘর—ঝোলান বারান্দার থাম—বিশেষ জাহাজে বিদেশ হ'তে আমদানি—আটষট্টি হাজার। ভেতরের ছাদ রোমে আঁকা—হতভাগার নাম কি হ্যামিলটন—মাত্তোতোনি? মাকারোনে। তা'পর এ ঘর—রূপোর গামলা—বেনভেন্নুতো সেলিনি। অর্গানটা—আজ্ঞে, এটার দাম ত্রিশ হাজার ডলার! চাবি চালাও হ্যামিলটন, মিঃ রেড্‌নোজ শুনুক একবার। ওঃ না—উঁহু—একদম ভুলে গিয়েছিলাম, বলছে ওর ক্ষিধে পেয়েছে, খাবার নিয়ে এস হ্যামিলটন। এখানে হিক্ খেতে চেয়ো না দোস্ত, কিছু মনে করো না, আমার ঘরে চল, চমৎকার! কী আরাম! এদিকে—টিপে টিপে পা ফেল, পিছলে যেও না। ঠাণ্ডা খাবার খাব আমরা হ্যামিলটন, মাছ চাই, মাছটা ভুলো না, মাইরী। আর আঠারশো ত্রিশের ম্যাদেইরা মদ চাই। শুনলেন, আজ্ঞে!"

হ্যামিলটন বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনার বাবা যে হুকুম দিয়ে গেছেন—"

ফ্রেডি সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, "বাবা হুকুম দিয়ে গেছেন আমাকে, তোমাকে নয়।" বলেই সজোরে ইউরঘিসের গলা জড়িয়ে ধরে' ও

ঘর হ'তে চলে' যায়। চলতে চলতে আর একটা চিন্তা মাথায় আসে, "সাগরপারের কোন তার এসেছ আমার, হ্যামিলটন?"

"আজ্ঞে না।"

"কর্তা নিশ্চয় সফর করছে। যমজ ডুটো, হ্যামিলটন?"

"আজ্ঞে, ভাল আছে।"

"ভাল!" তারপর ফ্রেডি গদগদ স্বরে প্রার্থনা জানায়, "ভেঁড়ার বাচ্ছা ডুটোর ভাল করেন যেন ভগবান!"

একটি একটি করে' সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। সিঁড়ির শেষে ফোয়ারার পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের দিকে চোখ মারে জলবালার পুরুষক্ষ্যাপান মূর্তি—কী রং, ঠিক যেন জীবন্ত। সামনে বিপুল একটা সভাগৃহ, মাথার ওপর গম্বুজ, ঘরখানাকে কেন্দ্র করে' চতুর্দিকে অন্যান্য কক্ষ। হ্যামিলটন নীচে মাত্র কয়েক মুহূর্ত থেমে চাকরদের যথোপযুক্ত ফরমায়েশ দিয়ে আবার এসে সঙ্গ নেয় এদের; একটা বোতাম টেপে, সভাকক্ষ আলোয় জ্বলে' ওঠে। ওদের সামনে একটা দোর খুলে ধরে, ওরা ভেতরে যেতে একটা বোতাম টিপে সে ঘরখানাও আলোকিত করে' দেয়।

কক্ষটি পাঠগৃহরূপে সাজান; ঘরের মধ্যে মেহগিনী কাঠের টেবিলের ওপর বই আর ধূমপানের সরঞ্জাম—দেওয়ালগুলো কলেজী পুরস্কার ও পতাকা দিয়ে সাজান, তার একটু ওপরে প্রাচীরপত্র, ফোটো; একদিকে টেনিসের ব্যাট, ভোঙ্গার দাঁড়, পোলোছড়ি প্রভৃতি। একদিকের দেওয়ালে মস্ত একটা মুসের মাথা—ছ' ফিট লম্বা লম্বা শিং বের করে' রয়েছে, তার উল্টো দিকে একটা মহিষের মাথা। মসৃণ মেঝেয় বিছানো আছে বাঘ ভালুকের চামড়া। কত রকমের চেয়ার সোফা সেটি। একটা কোণ ইরাণীয় পদ্ধতিতে চাঁদোয়া ও মণি-ঝোলান বাতি দিয়ে সাজান। এ ঘরেরই একটা দোর দিয়ে

যাওয়া যায় শোবার ঘরে, তার পরের ঘরখানায় স্না[illegible] পুকুর—খাঁটি ও শ্রেষ্ঠ মার্বেল পাথর দিয়ে পুকুরটা তৈরী, এ[illegible] খরচ পড়েছিল চল্লিশ হাজার ডলার।

এক কি দু' মিনিট ফ্রেডি চুপচাপ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে; পাশের ঘর হ'তে রাক্ষুসে একটা বুলডগ্ বেরিয়ে আসে—এমন উৎকট বীভৎস জীব এর আগে আর ইউরঘিস দেখেনি। হাই তোলে কুকুরটা, কুমীরের মত হাঁ'টা; লেজ নাড়তে নাড়তে প্রভুর দিকে এগিয়ে আসে, প্রভু অভ্যর্থনা করে, "কী রে ডিউই! ঘুমুচ্ছিলি বুঝি, উঁ? হাঁ হাঁ হাঁ—কী হ'ল?" (কুকুর তখন ইউরঘিসের দিকে সশব্দে দন্তবিকাশ আরম্ভ করছে)। "আরে ডিইই, এই! এ যে আমার বন্ধু মিঃ রেড্নোজ, কর্তার পুরোনো বন্ধু! আর মিঃ রেড্নোজ, ইনি হ'লেন অ্যাডমিরাল (নৌসেনাধ্যক্ষ) ডিউই। নিউ ইয়র্ক প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছেন—একদফাতেই পাঁচাশী শো। কী রকম, বল দেখি!"

বড় একটা আরাম-কেদারায় বক্তা দেহ এলিয়ে দেয়, অ্যাডমিরাল ঢোকে কেদারার নীচে। ইউরঘিসের দিকে আর দাঁত না মেললেও, স্থির নজর রাখে ওর ওপর। অ্যাডমিরালের গাম্ভীর্য অটুট।

ভেতর হ'তে দোর বন্ধ করে' হ্যামিলটন দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ইউরঘিসের ওপর নজর রেখেছিল। বাহিরে পদধ্বনি হয়, ও দোর খুলে দেয়, উর্দিপরা একটা লোক ভাঁজা টেবিল হাতে প্রবেশ করে, তার পিছনে আসে আবৃত থালবাহী দুজন চাকর; শেষের দু'জন মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, প্রথম জন টেবিল বিছিয়ে তার ওপর খাবারের থালাগুলি সাজিয়ে দেয়—ঠাণ্ডা প্যাটি, মাংসের ছিল্‌কে, মাখনরুটির স্যাণ্ডউইচ (রুটির খোসা ছাড়ান), সৌখীন ছোট ছোট কেক—কেউ লাল, কেউ সবুজ, কেউ সাদা, কেউ হলদে, আর আধ ডজন হিমশীতল মদের বোতল।

খাবারগুলো দেখতে দেখতে সোল্লাসে বলে' ওঠে ফ্রেডি, "এ সব হ'ল তোমার মাল। চলে' এস ইয়ার, এগিয়ে এস!" বলেই তিন গেলাস মদ পর পর গলায় ঢেলে দেয়; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ইউরঘিস তখনও দাঁড়িয়ে। খেয়াল হয় ফ্রেডির; বলে, "আরে বস না!"

ফ্রেডির বিপরীত দিকে হ্যামিলটন একখানা চেয়ার ধরে' দাঁড়ায়; ইউরঘিস এঁচে নেয় ওকে বসতে না দেবার ফিকির এটা; কয়েক মুহূর্ত পরে অবশ্য বোঝে যে এমনি নিঃশব্দে চেয়ার ধরে' থাকা মানে অতিথিকে বসতে আহ্বান করা; তবু বসতে পারে না ও। ফ্রেডি বুঝে নেয়, চাকরদের উপস্থিতিতে ও বিব্রত বোধ করছে; চাকরদের বলে, "যেতে পার তোমরা।" তিন জন চ'লে যায়, হ্যামিলটন দাঁড়িয়ে থাকে।

"তুমিও যেতে পার হ্যামিলটন," ফ্রেডি নির্দেশ দেয়।

হ্যামিলটন বলে "ছোটবাবু—"

কথা শেষ হয় না, ফ্রেডি ক্রুদ্ধভাবে চীৎকার করে' ওঠে, "বেরিয়ে যাও, কথা শুনতে পাও না?"

ইউরঘিসের চোখ হ্যামিলটনের মতই তীক্ষ্ণ, লক্ষ্য করে বাইরে হ'তে হ্যামিলটন চাবিটা খুলে নিলে, যাতে চাবির ফুটো দিয়ে ঘরে লক্ষ্য রাখা যায়।

আবার টেবিলের দিকে চেয়ে ফ্রেডি বলে, "লেগে যাও এবার!"

সন্দেহাতুরভাবে ইউরঘিস ওর দিকে চায়।

"খাও!" ফ্রেডি বোঝায়, "টিপিয়ে নাও!"

"তুমি কিছু খাবে না?" জিজ্ঞাসা করে ইউরঘিস। উত্তর হয়, "ক্ষিধে পায়নি, খালি পিপাসা পেয়েছে; কিটী আর আমি কিছু খেয়েছি। খেয়ে নাও তুমি।"

কথায় আর সময় নষ্ট না করে' ইউরঘিস লেগে যায়। যায় যেন দু'খানা কোদাল দিয়ে—এক হাতে কাঁটা অন্য হাতে ছুরি ; পেটে দু'-এক টুকরো যেতেই মরা ক্ষিধে চনমনিয়ে ওঠে, কথা কওয়া তো দূরের কথা, সব থালা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্বাসই নেয় না বোধ হয় ও। একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ফ্রেডি, ওর খাওয়া শেষ হ'তে বলে' ওঠে, "বহুৎ খুব! একটু হেসে বলে, "টান দেখি এবার!" বলে' একটা বোতল এগিয়ে দেয়। গেলাসের বালাই না রেখে, বোতলটাই উল্টে দেয় ইউরঘিস ঠোঁটের ভেতর। অপার্থিব তরল-আনন্দে গর গর করে' নেমে যায় গলার ভেতর হ'তে পেটে এবং পেট হ'তে ছড়িয়ে পড়ে দেহের শিরা-উপশিরাগুলিতে, আনন্দে ওর মাথা বিগড়োবার উপক্রম! শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষে শুষে শব্দ করে ইউরঘিস—"আঃ!"

সহানুভূতির সঙ্গে ফ্রেডি জিজ্ঞাসা করে, "ভাল মাল, না?" বড় চেয়ারখানায় হেলান দিয়ে, মাথার পেছনে হাত দু'খানি রেখে ও এতক্ষণে ইউরঘিসের পানাহার দেখছিল। ইউরঘিস এবার পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চায়—নিখুঁত সান্ধ্য সজ্জায় সজ্জিত সুন্দর বালক, নধরকান্তি পুষ্ট দেহ, সোনালী চুল, মুখাকৃতি দেবোপম। নিকট-বন্ধুর মত ইউরঘিসের দিকে চেয়ে হাসে ফ্রেডি; তারপর আবার শুরু হয় ওর আপনভোলা বকবকানি। এবার একটানা দশ মিনিট বকে' চলে, এ বক্তৃতায় ও ইউরঘিসের কাছে বংশের ইতিবৃত্ত বিবৃত করে। "কামস্কাটকার খলিফ" নাটকের উজ্জ্বল তারকা'র ভূমিকায় অভিনয় করছে যে মেয়েটি, ফ্রেডির বড় ভাই স্থূল চার্লি তার প্রেমে পড়েছিল; কর্তা বললে ত্যজ্য-পুত্র করব; বলে' মাথা-খারাপ-হওয়া রকমের মোটা টাকা ফেলে দিলে কর্তা; নায়িকার প্রেম ফট হ'য়ে গেল। চার্লিও ওমনি টাকা পেলে, এখন সে গেছে তার মোটর নিয়ে মধুচন্দ্রিকা করতে, বিয়ের চেয়ে একি কোন অংশে কম? কর্তা তার আর এক সন্তানকেও ত্যজ্য করবার

হুমকি দেখিয়েছিল, সে হ'চ্ছে বোন গ্বেন্‌ডোলেন; বোনটা অনেক খেতাবওয়ালা ইতালীয় এক জমিদারকে বিয়ে করে' তার দুর্গে বাস করে, অন্ততঃ করত; প্রেমের জমিদার প্রেয়সীর দিকে খাবার থালাগুলো ছুঁড়তে থাকে। তখন বোন ত্রাহি ত্রাহি করে' কর্তার কাছে তার করে। মামলা কি তাই দেখতে গেছে কর্তা। কাজেই ফ্রেডি একা পড়ে' গেছে, পকেটে মাত্র দু'হাজার ডলার। ফ্রেডি কিন্তু ছাড়বার ছেলে নয়, নিজেরটুকু বোঝে ও বুঝিয়ে ছাড়বে ও কর্তাকে। আবার তার করবে ও, উত্তর না এলে ওর "বেড়ালবাচ্চী"কে দিয়ে তার করাবে, দু'জনের বিয়ে সুসমাগত! দেখবে তখন কী হয়!"

এইভাবে বকবক করে' চলে ছোকরা; কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হ'য়ে থামে, চোখ বোজে, আবার চোখ খুলে মধুরভাবে হাসে, আবার চোখ বোজে। ফের চোখ খুলে ইউরঘিসের দিকে চেয়ে হাসে, ফের চোখ বোজে। এবার আর চোখ খুলতে ভুলে যায়।

কয়েক মিনিট ইউরঘিস নিশ্চল হ'য়ে বসে' থাকে, দামী মদ ওর প্রতি শিরায় তখন তুলেছে আনন্দের তরঙ্গ। একবার একটু নড়ে, কুকুরটা গজ্‌রে ওঠে; তারপর হ'তে প্রায় দম বন্ধ করে' ও বসে' থাকে—একটু পরে প্রায় নিঃশব্দে দোর খুলে যায়, হ্যামিলটন ভেতরে আসে। ইউর-ঘিসের দিকে ভ্রূকুটি করে' নিঃশব্দে এগিয়ে আসে সে; ইউরঘিসও ভ্রূকুটিসহকারে চেয়ার ছেড়ে পিছোতে থাকে; কত আর পিছোন যায়! দেওয়ালে পশ্চাদ্‌গতি বন্ধ হয় ইউরঘিসের, হ্যামিলটন কাছে এসে দোর দেখিয়ে ফিস ফিস করে' বলে, "বেরিয়ে যা এখান হ'তে!"

ইউরঘিস ইতস্ততঃ করে, ফ্রেডির দিকে চায়; সে তখন মৃদু নাক ডাকাচ্ছে; হ্যামিলটন মন্তব্য করে, "ওঁকে জাগিয়েছ কি তোমার মাথা গুঁড়ো করেছি আমি।"

ইউরঘিস আরও একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে; লক্ষ্য করে মৃদু গর্জন-সহকারে অ্যাড্‌মিরালও হ্যামিলটনের পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে। এই বিপক্ষের সামনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই, দোরের দিকে পা বাড়িয়ে দেয় ও।

নিঃশব্দে ওরা বেরিয়ে যায়, সিঁড়ি পার হয়, হলঘরও পার হয় নিঃশব্দে। একেবারে সদর দোরে এসে ও থামে, হ্যামিলটন এগিয়ে আসে। কুকুরের মতই দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে হ্যামিলটন, "হাত উঠিয়ে দাঁড়া!" তড়াক্ করে' এক পা পিছিয়ে গিয়ে ইউরঘিস ওর ডান মুঠিটায় ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়ায়।

"কিসের জন্য", জানতে চায় ও; তখনই বুঝতে পারে দেহতল্লাসী করতে চায়, বলে, "তার আগে তোকে যমের বাড়ী পাঠাব।"

"জেলে যেতে চাস? পুলিসকে—"

"ডাক তোর পুলিসকে", ক্রুদ্ধ জন্তুর মত ফুঁসিয়ে ওঠে ইউরঘিস, "পুলিস না ডাকা পর্যন্ত ছোঁ দেখি আমার গা, দেখি তোর কত হিম্মত! তোদের পাপবাড়ীর কিছু ছুঁইনি আমি, আমার গাও তুই ছুঁবি না।"

হ্যামিলটনের আশঙ্কা হয়, ফ্রেডি জেগে উঠবে, তাই আর গোল না পাকিয়ে দোরটা খুলে দেয়, গর্জায়, "বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা!" ইউরঘিস দোরের বাইরে পা দিতেই, রাগ মিটিয়ে হ্যামিলটন মারে ওর পিছনে এক লাথি। লাথির জোরে তড়বড়িয়ে ছুটে পাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে একেবারে বরফে নেমে আসে ইউরঘিস।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সিঁড়ির শেষে বরফের ওপর উঠে দাঁড়ায় ইউরঘিস, রাগে পাগলা হ'য়ে গেছে যেন। কিন্তু দোর তখন বন্ধ হ'য়ে গেছে, কৃষ্ণমূর্তি দুর্ভেদ্য দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে? প্রতিশোধ নেবার উপায় নেই, শীতও লাগছে খুব। ও এক দৌড় লাগায় ওখান হ'তে।

দৌড়তে দৌড়তে সদর রাস্তায় এসে পৌঁছয়; বহু লোক চলাচল করছে দেখে থেমে যায়, নইলে লোকের নজর পড়বে ওর দিকে, ওই বস্তুটিই ও চায় সবচেয়ে কম। শেষ অপমানটা সত্ত্বেও, বিজয়গর্বে বুক ওর ফুলে ওঠে—ঠকিয়েছে ওদের! বহু মূল্যবান নোটটা ঠিকমত আছে কিনা দেখবার জন্য বারবার ও পকেটে হাত পোরে।

তবু ও বিপদে পড়ে—বিপদটা মজার হ'তে পারে, ভয়াবহও বটে, যত ভাবে তত ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে ব্যাপারটা। এর ভাঙানী! পকেটে একটা আধলা নেই, এটা না ভাঙালে রাত্রির জন্য বিছানা ভাড়া করবে কী দিয়ে—ভাঙানী নিতে হবে ওকে!

আধ ঘণ্টা কাটায় ও হেঁটে আর এই নিয়ে তর্ক করে'। ওর এমন কেউ নেই যে এর ফ্যায়সালা করে' দিতে পারে, যা কিছু করতে হয় ওকে নিজেকেই করতে হবে। কোন বাসাবাড়ীতে ভাঙান মানে জীবন খোয়ান—চুরি করে' বা কেড়ে তো নেবেই, ভোর হবার আগে ওকে খুন করে' ফেলাও বিচিত্র নয়। কোন হোটেল বা রেল ষ্টেশনে গিয়ে ভাঙানী চাইলে অবশ্য হয়, কিন্তু ওর মত ভিখিরীর হাতে একশো ডলারের নোট দেখে কী ভাববে তারা! কাল সকালেই ফ্রেডি জোন্সের নেশা কেটে গেলে ওর খোঁজ করতে লাগবে, তখন সবই যাবে। কাজেই একমাত্র

পন্থা দাঁড়ায় কোন ছোট মদের দোকানে চেষ্টা করা। সহজ উপায়ে না হ'লে, বাটা দিয়ে ভাঙিয়ে নেবে ও।

কয়েকটা দোকানে উঁকি মারে—উঁহুঁ, বড্ড ভিড়। নি[illegible] দোকান নইলে তো চলবে না। কপাল ভাল, একটা দে[illegible] দোকানের কর্মচারীটি ছাড়া আর কেউ নেই। মনে সাহস করে' ও ঢুকে পড়ে দোকানের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করে, "একখানা একশো ডলারের নোট ভাঙিয়ে দিতে পারেন ?"

কর্মচারীটির গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, দেখলে মনে হয় পেশাদার কুস্তীর পালোয়ান বা গুণ্ডা, তিন হপ্তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে। হাঁ করে' সে ইউরঘিসের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, "অ্যাঁ, কী বলছ ?"

"বলছি, একশো ডলারের একটা নোটের ভাঙানী দিতে পার ?"

"পেলে কোথায় ?" জিজ্ঞাসা করে কর্মচারী।

"তাতে তোমার দরকার নেই, নোটটা আমার, ব্যস্। ভাঙানী দিতে পার ? বাটা দেব।"

"দেখি নোটখানা", বলে' হাত বাড়ায় কর্মচারী।

"দেবে ভাঙিয়ে ?" বলে' ইউরঘিস শক্ত করে' চেপে ধরে নোটখানা পকেটের ভেতর।

কর্মচারী বলে, "কী আপদ, নোটখানা ভাল না জাল জানব কী করে' আমি ? কী ভেবেছ আমাকে ?"

ইউরঘিস ওর দিকে এগিয়ে যায়, নোটখানা বের করে' ধীরে ধীরে মুঠোর মধ্যেই নাড়ে; ওদিকে লোকটা হিংস্রভাবে স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে ঘেরার ওপার হ'তে। শেষ পর্যন্ত ইউরঘিস দিয়েই দেয় নোটটা।

কর্মচারী নোটটা পরীক্ষা করতে লাগে—আঙ্গুলের চাপে নোটখানা সমান করে' নেয়, আলোর দিকে তুলে ধরে, ওল্টায় পাল্টায়, পাশ বুক

পিঠ কিনারা সব দেখে তন্ন তন্ন করে'। নোটখানা একেবারে কড়কড়ে নতুন, তাতেই ওর সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। সমস্ত সময়টা ইউরঘিস বেড়ালের মত নজর রাখে ওর ওপর। লোকটা নোটখানা পকেটে পোরে।

"হুঁ!" বলে' কর্মচারীটি আগন্তুকের দিকে চায়—ছিন্ন মলিন পোষাক-পরিহিত একটা ভিখিরী, একটা হাত ভাঙ্গা, গলার সঙ্গে বাঁধা—আর তার হাতে একশো ডলারের নোট!

"কিনতে চাও কিছু?" জানতে চায় ও।

"হ্যাঁ", জবাব দেয় ইউরঘিস, "এক গেলাস বীয়ার নেব।"

"ঠিক আছে, ভাঙানী দেব", বলে' নোটখানা সে পকেটে রেখে ইউরঘিসকে এক গেলাস বীয়ার ঢেলে দেয় সামনের টেবিলের ওপর। তারপর হিসাবের খাতায় পাঁচ সেণ্ট্ জমা করে' টানাটা টেনে বের করে। রেজকী গুণে বের করে' দেয় দুটো ডাইম (দশ দশ কুড়ি সেণ্ট্), একটা সিকি (পঁচিশ সেণ্ট্) আর খুচরো পঞ্চাশটা সেণ্ট্।

আরও দেবে ভেবে ইউরঘিস একমুহূর্ত অপেক্ষা করে। সে রকম কোন লক্ষণ নেই ও-তরফের। ইউরঘিস বলে, "আর নিরানব্বই ডলার?"

"কোন্ নিরানব্বই ডলার?" জানতে চায় দোকান-কর্মচারী।

"আ-মা-র ভা-ঙা-নী!" চেঁচিয়ে ওঠে ইউরঘিস, "শ'য়ের বাকীটা!"

শান্তভাবে লোকটা বলে, "যাও, যাও চলে' যাও, মাতাল হ'য়েছ দেখছি।"

বন্য হিংস্রতায় ইউরঘিস ওর দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু অন্তরে তখন ওর আকৃতিহীন অবশকরা আতঙ্ক, আতঙ্ক যেন চেপে ধরে ওর বুকটা। তারপর আসে ক্রোধ, অন্ধ ক্রোধ আচ্ছন্ন করে' দেয় ওর

বুদ্ধি-বিবেচনা, পশুর মত অর্থহীন একটা চীৎকার করে' ওঠে ও একবার, তারপর গেলাসটা ছুঁড়ে দেয় লোকটার মাথা লক্ষ্য করে'; লোকটা মাথা নামিয়ে নেয়, আধ ইঞ্চির জন্য রক্ষা পেয়ে যায় মাথাটা; এবার উঠে লোকটা যুদ্ধং দেহি মূর্তিতে ইউরঘিসের সামনে দাঁড়ায়, ইউরঘিস ততক্ষণে হাতের ভরে পাক খেয়ে টেবিলটা পার হ'য়ে গেছে ওদিকে; লোকটা প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি লাগায় ওর মুখের ওপর, ঘুরে পড়ে ইউরঘিস; সে এক মুহূর্ত; উঠেই ধাওয়া করে লোকটার পিছু পিছু; লোকটা ছোটে আর চেঁচায় "বাঁচাও! বাঁচাও!" দৌড়তে দৌড়তে ইউরঘিস একটা বোতল তুলে নেয়; চেঁচাতে চেঁচাতে লোকটা ওদিকে ছুটে আসে ইউরঘিসেরই দিকে; ইউরঘিস গায়ের জোরে বোতলটা ছুঁড়ে মারে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে; মাথার পাশে লেগে বোতলটা ছিটকে দোরের বাজুতে লেগে টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। ইউরঘিস এবার ঘরের মধ্যখানে লোকটার দিকে ছুটে যায়; অন্ধ আক্রোশে এবার ও বোতল না নিয়েই এগিয়ে যায়, ঠিক এই-ই চাইছিল লোকটা; সুযোগ বুঝে ইউরঘিসের চোখ তুটোর মধ্যে বিরাশী সিক্কার একটা ঘুঁষি বসিয়ে দেয়, উল্টে পড়ে ইউরঘিস। [illegible]য় সঙ্গে সঙ্গে তুটো লোক দোকানে ঢোকে—ইউরঘিস এরই মধ্যে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, রাগে তখন ওর মুখে ফ্যানা ভাঙ্গছে, টেনে বের করবার চেষ্টা করছে ভাঙ্গা হাতখানা।

দোকান-কর্মচারী চেঁচায়, "তল্লাসী নাও, ছুরি আছে ওর কাছে।" চেঁচাবার সঙ্গে কর্মচারী লক্ষ্য করে নবাগত তুটিও মারামারিতে যোগ দিতে উৎসুক, সাহস বেড়ে যায়, বেগে এগিয়ে চলে ও ইউরঘিসের দিকে। এবার ঘুঁষি লাগায় ভাঙ্গা জায়গাটার ওপর, আবার পড়ে' যায় ইউরঘিস। মহাউৎসাহে তিন জনে একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে ওর ওপর। হাত ও পা সমভাবে চালায় ওরা।

এই সময় একজন পুলিস ঢোকে, ওরা শিকার ছেড়ে সাধুর মত উঠে দাঁড়ায় ; কর্মচারী সাজকে বলে, "তল্লাসী নাও, ছুরি আছে ওর কাছে!" ছেঁচ্ড়ে ইউরঘিস সবে উঠে বসেছে, পুলিসটা লাফিয়ে পড়ে ওর ওপর ; অবাক ইউরঘিস মুখ তোলে, নাক-সোজা ঘা পড়ে বেটনের। চোখে কিছু দেখছে না আর ইউরঘিস, থর থর করে' কাঁপছে দেহটা, তবু ও উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধ আবেগে শূন্যে হাত ছোঁড়ে। আবার বেটন নেমে আসে ওর মাথার ওপর পুলিসের দেহের সর্বশক্তি নিয়ে। নিস্তেজ নিস্পন্দ হ'য়ে ইউরঘিসের দেহটা আছড়ে পড়ে মেঝের ওপর।

বেটন বাগিয়ে বেড়ালের মত সাবধানে এগিয়ে আসে পুলিসটা ওর দিকে, আবার উঠবে আশায় বেটনটা উঁচিয়ে রাখে। ইতিমধ্যে দোকান কর্মচারী উঠে মাথায় হাত দিয়ে বলে, "উঃ, ভগবানের দয়ায় খুব বেঁচে গেছি। তখন মনে হচ্ছিল মেরে ফেলেছে বোধ হয় আমায়। দেখুন তো, মাথাটা কেটে গেছে কিনা।"

"না না, কিছু হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার আর কী! পাঁড় মাতাল হ'য়ে গেছে সেরেছিল আর কি আমাকে! জমাদার সাহেব, গাড়ী ডাকলে হ'ত না?"

পুলিস মন্তব্য করে, "আর মারামারি করবার ক্ষমতা নেই ওর। আর যাবে তো এই খানিকটা।" ইউরঘিসের জামার কলারে মুঠোটা পাকিয়ে নিয়ে হ্যাচ্কা টানে তোলে ও ইউরঘিসকে, কাজের সঙ্গে কথা চলে, "এরে এই, ওঠ্!"

কর্মচারীটি আলমারির কাছে গিয়ে একশো ডলারের নোটটি নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে, খানিকটা জল এনে ইউরঘিসের ওপর ঢেলে দেয়। দুর্বলভাবে ইউরঘিস গোঙায়, পুলিস ওকে হিঁচ্ড়ে তোলে,

ছ্যাচ্‌ড়াতে ছ্যাঁচ্‌ড়াতে দোকান হ'তে বের করে' নিয়ে যায়। মোড় ফিরলেই থানা, সুতরাং অন্ধকুঠুরীতে ঢুকতে বেশী দেরি হয় না ইউরঘিসের।

অর্ধেক রাত্রি কেটে যায় অচেতনভাবে, বাকীটা ব্যথায়, যন্ত্রণায়, অসহ্য মাথাধরায় ও নামভোলান পিপাসার সহযোগে। মাঝে মাঝে গলা ফাটিয়ে ও জল চায়, কিন্তু ওর আবেদন বা প্রয়োজন শোনবার কেউ নেই; ঐ থানাতে ফাটা মাথা ও জ্বর নিয়ে আরও অনেকে আছে; এ ধরণের শত শত আছে এ শহরে, লাখ লাখ আছে মহান এই দেশে, কিন্তু কে শোনে তাদের আবেদন!

সকালে এক পেয়ালা জল ও একটুকরো পাঁউরুটি দেওয়া হয় ইউরঘিসকে। তারপর ঠুসে দেওয়া হয় আরো অনেকের সঙ্গে থানার খাঁচাগাড়ীতে; আদালতে পৌঁছে ঢোকে আদালতের খাঁচায়; ওর পালা না আসা পর্যন্ত ঐ খাঁচাতেই বসে' বসে' ধোঁকে ও।

জানা গেল মদের দোকানের কর্মচারীটি এ অঞ্চলের ডাকসাইটে গুণ্ডা, বহু মারপিট দাঙ্গার বীর। আদালতে দাঁড়িয়ে শপথ করে' সে তার জবানবন্দী দেয়—রাতদুপুরে আসামী মদে চুর হয়ে টলতে টলতে ওর দোকানে আসে, এক গেলাস বীয়ার নিয়ে একটা ডলার দেয়। কর্মচারী তাকে ডলারের বাকী পঁচানব্বই সেণ্ট্‌ ফিরিয়ে দেয়, আসামী তখন আরও নিরানব্বই ডলার দাবী করে; কর্মচারী এ দাবীর উত্তর দেবার আগেই আসামী তার দিকে গেলাসটা ছুঁড়ে দেয়, তারপর মারে একটা বোতল, দোকানটাকে ভেঙ্গে একেবারে তছনছ করে' এসেছে।

আসামী ওঠে, তাকেও শপথ করতে হয়; সর্বজনপরিত্যক্ত জীব, কদর্য ময়লা রুগ্ন মূর্তি, ময়লা পটি বাঁধা একটা হাত, একটা গাল ও মাথা কাটা, রক্ত ও ময়লার মিশ্রণমাখান সারা মুখ, একটা চোখ কাল্‌চে মেরে

গেছে, আর একটা ফুলে স্থায়ীভাবে বন্ধ হ'য়ে আছে। বিচারক জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কী বলবার আছে?"

"হুজুর, আমি ওর দোকানে গিয়ে একশো ডলারের একটা নোটের ভাঙানি দিতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলেছিল, মদ কিনলে দেবে, তাই নোটটা আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু ও ভাঙানি দিতে চায় না।"

ম্যাজিস্ট্রেট এমনভাবে চেয়ে থাকে যেন তার বুদ্ধি গুবলেট হ'য়ে গেছে, বলে, "তুমি দিলে একশো ডলারের নোট!"

"হ্যাঁ হুজুর।"

"কোথায় পেয়েছিলে?"

"একটা লোক আমায় দিয়েছিল, হুজুর।"

"একটা লোক? কোন্ লোক, কিসের জন্য?"

"যুবক ভদ্রলোক, পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়, হুজুর। ভিক্ষে করছিলাম আমি।"

আদালতে হাসির ধুম পড়ে' যায়; হাসি চাপবার জন্য পুলিস ওর কলার হ'তে হাত উঠিয়ে নেয়, ম্যাজিস্ট্রেট খোলাখুলিই হাসতে থাকে। আবেগভরে ইউরঘিস বলে' ওঠে, "সত্যি, হুজুর।"

ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করে, "কাল রাত্রে ভিক্ষেও করেছিলে, মদও খাচ্ছিলে, কী বল?"

"না, হুজুর," প্রতিবাদ করে ইউরঘিস, "আমি—"

"একেবারেই মদ খাওনি কাল তা' হ'লে?"

"তা কেন, খেয়েছিলাম, হুজুর। আমি—"

"কী মদ খেয়েছিলে?"

"কী-একটা মদের একটা বোতল—নাম জানি না, ভেতরটা জ্বালা করে—"

আদালতে আবার হাসির ধুম পড়ে' যায়। হাসির মাঝপথে থেমে ভ্রূকুটি করে' ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করে, "এর আগে কখনো গ্রেফ্‌তার হয়েছিলে ?"

"আমি—আমি—"

"সত্যি বল আমার কাছে।"

"হ্যাঁ হুজুর, হ'য়েছিলাম।

"কতবার ?"

"মাত্র একবার, হুজুর।"

"কিসের জন্য ?"

"আমার অফিসারকে মারার জন্য, হুজুর। সে আমার—"

"থাক আর বলতে হবে না, ওতেই হবে। নিজেকে সংযত করতে না পারলে মদ একটু কম খেও। খরচাসহ দশ দিন। পরের মামলা ?" চোখ ফিরিয়ে নেয় ম্যাজিষ্ট্রেট।

হতাশায় আর্তনাদ করে' ওঠে ইউরঘিস, পুলিসের মেরামতিতে থেমে যেতে হয়; এক ঝাঁকানিতে ওকে ওখান হ'তে বের করে' নিয়ে গিয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীদের সঙ্গে একটা খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়; সেখানে অক্ষম ক্ষোভে ও শিশুর মত কাঁদতে থাকে। পুলিস বা ম্যাজিষ্ট্রেট ওর কথার কানাকড়ি মূল্য দেবে না আর, মদের দোকানদার বা তাদের কর্মচারী যা বলবে তাই হবে চরম সত্য, এটা ওর কাছে পৈশাচিক অত্যাচার বলে' মনে হয়। হায় বেচারী—কী ভাবে ও জানবে যে এই দোকানটার মালিক খালি সাধারণ আইন এড়াবার জন্যই পুলিসকে মাসে পাঁচ ডলার দেয়, উপরির জন্য উপরি তো আছেই; কী ভাবে জানবে যে এই মারপিট-বিশারদ দোকান কর্মচারীটি ও জেলার গণতন্ত্রী নেতার অতিবিশ্বস্ত গুণ্ডাদের অন্যতম; মাত্র কয়েক মাস আগে এই ম্যাজিষ্ট্রেটের ভোট পাবার কোন আশা

থাকে না, তখন এই কর্মচারীটিই তাকে রেকর্ডভঙ্গকারী ভোট পাইয়ে দেয়। এ সব জানবার কথা নয় ইউরঘিসের।

'ভুকভা জেলে' ওকে আবার নিয়ে যাওয়া হয়। আহত হাত আরের চোটে আরও আহত হ'য়েছে; কাজেই আর কাজ করতে হয় না ওকে, বরং চিকিৎসা হয়। পটি পড়ে হাতে গালে মাথায়। দেখতে হয় দিব্য। পরের দিন ব্যায়ামের সময় দেখা হ'ল জ্যাক ডুয়ানের সঙ্গে—জ্যাক হেসেই আকুল!

জ্যাক কিন্তু ওকে পেয়ে খুশী হয় মারাত্মক রকমের—ইউরঘিসের পক্ষেই মারাত্মক, কারণ জ্যাক দু' হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে' নাচতে আরম্ভ করে, "আরে! আমাদের গরু-গোকুল! কিন্তু একি, পেষাই কল পেরিয়ে এলে নাকি?"

"না, একটা হ'ল রেলের ধাক্কা, আর একটা মারপিট।" অন্যান্য বন্দীরা জুটে যায় কাহিনী শুনতে। ইউরঘিস ওর ইতিহাস বলে; এর অধিকাংশই অবিশ্বাস্য। কিন্তু ডুয়ানের ধারণা ইউরঘিসের মত লোক কখনো এমন কাহিনী বানাতে পারে না।

দু'জনে একা হ'তেই ডুয়ানে বলে, "তোমার কপাল বড় মন্দ, ধন! তা হ'ক, শিক্ষা তো হ'ল।"

"তোমায় ছেড়ে যাবার পর অনেক কিছু শিখেছি আমি।" বিষণ্ণভাবে ইউরঘিস বলে। বর্ণনা করে কী ভাবে গত গ্রীষ্মটা চরে' বেড়িয়েছে। নিজের কথা শেষ করে' বলে, "আর তুমি? তখন হ'তে এখানেই আছ বুঝি?"

"আরে না, গত পরশু এসেছি। পুলিস কিছু পেনামী চেয়েছিল, দিতে পারলাম না, দুঃসময় চলছে আজকাল আমার, বুটো মামলায়

ফাঁসিয়ে কয়েদে ঘুসিয়ে দিলে; ঝুটো মামলায় ফাঁসা হ'ল এই নিয়ে দু'বার। আমার সঙ্গে শিকাগো ছেড়ে চল না, ইউরঘিস?"

বিষণ্ণ ইউরঘিস বলে, "যাবার কোন জায়গা নেই যে আমার।"

হাল্কা হাসিতে কথাটা হাল্কা করে' ডুয়ানে বলে, "আমারও তো নেই। বের না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি এখন, তারপর দেখা যাবে।"

আগের বারের পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে সুকন্যা কয়েদে এবারও দেখা হয়; তবে, অধিকাংশই নতুন, অপরিচিত; সেবারের মত ছেলে বুড়ো জোয়ান সবই আছে; এরাও ঠিক তাদেরই মত, তফাৎ আছে বলে' মনে হয় না; এ যেন বেলাভূমিতে সাগরতরঙ্গ আছাড় খেয়ে পড়ছে, ভেঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে; তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে, সবগুলোই একরকম। ঘুরে ঘুরে ইউরঘিস এদের সঙ্গে আলাপ করে; এদের মধ্যে শক্তিশালীরা নিজ নিজ বীরত্বের কাহিনী বলে, দুর্বল বা অনভিজ্ঞরা তাদের ঘিরে এ সব কাহিনী শোনে সবিস্ময়ে। আগের বারে ইউরঘিস নিজের পরিবারবর্গের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না, এবার সে সব বালাই নেই, স্বচ্ছন্দে শোনে ও অন্যদের সুখ-দুঃখের কাহিনী, অনুভব করে ও আলাদা নয়, এদেরই একজন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ওর দৃষ্টিভঙ্গীর কোন তফাৎ নেই; যে উপায়ে এরা জগতে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে সেই উপায়ে ও ভবিষ্যতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

এবার পকেটের পয়সা ক'টি কেড়ে নিয়ে ওকে জেল থেকে বের করে' দেবার পর, ও সিধে চলে' যায় জ্যাক ডুয়ানের কাছে। যায় ও কৃতজ্ঞতা ও বিনয়ে ভরপুর হ'য়ে; ডুয়ানে ভদ্রলোক, লেখাপড়া জানে, একটা পেশা আছে তার। আর ইউরঘিস? মূর্খ, অজ্ঞ মজুর, ভবঘুরে, ভিখারী—ওর ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মেলাতে যে কেউ আসতে পারে, এটা অদ্ভুত বলে' মনে হয় ইউরঘিসের কাছে। ডুয়ানের কী

কাজে যে ও লাগতে পারে বোঝে না ইউরঘিস। বেচারী বোঝে না যে ওর সঙ্গে কেউ সদয় ব্যবহার করলে ও তার জন্য জান দিতে পারে, এ মহৎ গুণটা স্বাভাবিকভাবে ওর মধ্যে আছে—শুধু অপরাধীদের মধ্যে কেন, যে কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এ গুণ একান্তই বিরল।

ডুয়ানের ঠিকানাটা একটা ইহুদী পল্লীতে; একটা চিলেকোঠা, এখানে থাকে সুন্দরী একটি ফরাসী মেয়ে—ডুয়ানের রক্ষিতা, কিন্তু বেচারীকে উপার্জন করতে হয় সারাদিন সেলাই ও সারারাত্রি বেশ্যাবৃত্তি করে'। মেয়েটা ইউরঘিসকে জানায় ডুয়ানে অন্য কোথায় গেছে, পুলিসের ভয়ে আর ওখানে থাকতে সাহস পায় না। নতুন ঠিকানাটা একটা মদের গুদাম, এর মালিক জানায়, ডুয়ানের নামই কখনো শোনেনি সে। তারপর শুরু হয় প্রশ্নমালা; বহু প্রশ্নের পর লোকটা পিছনের একটা সিঁড়ি দেখিয়ে দেয়, এখান হ'তে একটা বন্ধকী দোকানের পিছনে একটা 'বেড়া' পর্যন্ত রাস্তা চলে' গেছে, এটা দিয়ে কিছুদূর গেলে একসারি ছোট ছোট ঘর, এগুলো ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততাভরা অফিস ঘর, এদেরই একটিতে জ্যাক ডুয়ানে লুকিয়ে আছে।

ইউরঘিসকে পেয়ে খুশী হ'ল ডুয়ানে; ওর কাছে একটা সেণ্ট ও নাকি নেই, ইউরঘিসেরই অপেক্ষা করছিল, দু'জনে মিলে একটা রোজগারের ব্যবস্থা করে' ফেলবে। দিনটা কেটে যায় ইউরঘিসকে শহরের চোর ছ্যাচোর গুণ্ডাপ্রকৃতির জগৎটা বোঝাতে এবং কীভাবে ইউরঘিস এ জগতে খেয়ে পরে' বেঁচে থাকতে পারবে, সেই বিদ্যে ও পরিকল্পনা শেখাতে। হাত ভাঙা বলে' এই শীতে ওর কষ্টটা নাকি খুবই বেশী হবে, তা ছাড়া অজ্ঞাত কারণে পুলিসী তৎপরতা ইদানীং বেড়ে গেছে; তা যাক, ওকে কেউ চেনে না, পুলিস যতদিন চিনে না ফেলছে ততদিন ওর কোন ভাবনা নেই। এটা "বাবা" হ্যানসনের আড্ডা;

বড় "ভাললোক" এই "বাবা" স্থানসন; সকলের প্রতি তাঁর "সমদৃষ্টি"; ওঁর পাওনাগণ্ডাটা যতদিন দেবে ততদিন নিশ্চিন্তে এখানে থাকতে পারা যায়; তা ছাড়া ডেরার ওপর পুলিসী হামলার খবর পাক্কা একটি ঘণ্টা আগে "বাবা" জানিয়ে দেন। এঁর পর আছেন রোজেনট্যাগ্, বন্ধকী কারবার করেন, যে কোন জিনিস এনে দিলে পুরো এক-তৃতীয়াংশ দামে তিনি সেটা কিনে নেন, একটি বৎসর লুকিয়ে রাখেন; তাঁর কথায় বিশ্বাস করা যায়, এক বৎসরের আগে বেরই করবেন না তিনি সে সব চোরাই মাল।

ঘরে একটা ষ্টোভ ছিল, খাবার তৈরী করে' খায় দু'জনে। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত দু'জনে অপেক্ষা করে' নেয়, তারপর ওরা বেরিয়ে পড়ে ওদের অভিযানে; ব্যবসায়ী অঞ্চল ছাড়িয়ে বাসিন্দা অঞ্চলে আসে, স্থানটা তখন প্রায় নিশুতি হ'য়ে গেছে। জ্যাক একটা বাতি-থাম্বায় উঠে বাতিটা নিভিয়ে দেয়; এই অন্ধকারে কাছাকাছি একসার সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে পড়ে দু'জনে।

অল্পক্ষণের মধ্যে পায়ের আওয়াজ আসে, উৎকীর্ণ হয় ওরা। লোকটা মজদুর, কিছু বলা হয় না তাকে, চলে' যায় সে। এর একটু পর পুলিসের ভারী বুটের আওয়াজ আসে, নিশ্বাস বন্ধ করে' বসে থাকে দু'জনে। পুলিস চলে' যায়। ঠাণ্ডাও ভীষণ, অসহ্য। তবু প্রায় পনের মিনিট ওরা ঐভাবে অপেক্ষা করে। দ্রুত পদধ্বনি শোনা যায়, প্রস্তুত হ'য়ে বসে ওরা। লোকটা ওদের পার হ'য়ে একটু যেতেই ছায়ার মত নিঃশব্দে জ্যাক উঠে যায়, একমুহূর্তের মধ্যেই ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হয়; দ্রুত এগিয়ে যায় ইউরঘিস। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী জ্যাক লোকটার হাত দু'খানার ওপর দাঁড়িয়ে যায়, ইউরঘিস টিপে ধরে লোকটার মুখখানা। লোকটা আচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে দেখে ইউরঘিস মুখ ধরে' থাকবার প্রয়োজন বোধ করে না, চেপে ধরে থাকে জামার

কলার; আর জ্যাক দ্রুত হাত চালায় লোকটার জামার অন্ধিসন্ধিতে। প্রথমে ওভারকোট, তারপর কোট, তারপর শার্ট, প্যাণ্ট—বাকী 'কিছুই' দেয় না, প্রতিটি প্যাকেট হ'তে প্রাপ্তগুলি স্থানান্তরিত করে নিজের পকেটে; সর্বশেষে লোকটার আঙ্গুলগুলো, নেকটাই প্রভৃতি সম্ভাব্য স্থানগুলো নিখুঁত পরীক্ষার পর দুযানে জানায়, "হ'য়ে গেছে।" দু'জনে লোকটাকে ছেঁচড়ে নিজেদের আস্তানা সিঁড়িটার ওখানে ফেলে দিয়ে দু'মুখো পা চালিয়ে দেয়।

ইউরঘিস ফিরে দেখে জ্যাক তার আগেই এসে "রোজগার"টা পরীক্ষায় লেগে গেছে। সোনার চেন ও লকেটসহ একটি সোনার ঘড়ি, রূপোর একটা পেন্সিল ও দেশলাইয়ের খোল, একমুঠো খুচরো আর একটা তাসের বাক্স—এইটে মহা উৎসাহে খোলে জ্যাক, তাসের বদলে আছে কতকগুলি চিঠি, থিয়েটারের টিকিট দু'খানা, সকলের শেষে কতকগুলো নোট; গুণে পাওয়া যায় একখানা কুড়ি ডলারের, পাঁচখানা দশ ডলারের, চারখানা পাঁচ ডলারের আর এক ডলারের মাত্র তিনখানা। জোর একটা নিশ্বাস টেনে জ্যাক বলে, "সব এই!"

জিনিসগুলো আর একবার পরীক্ষা করে' ওরা তাসের বাক্স, দেশলাই, লকেটের তরুণী-চিত্র প্রভৃতি সব বাজে বস্তু পুড়িয়ে ফেলে। ঘড়ি, চেন ও খোলটা নিয়ে জ্যাক নীচে যায়, ফিরে আসে যে লটা ডলার নিয়ে, মন্তব্য করে, "বজ্জাতটা বলছে সব খাদ মেশানো আছে। মিথ্যে কথা। আমার টাকার খুব দরকার জানে কিনা তাই!"

"রোজগার" ভাগাভাগি হ'য়ে যায়; ইউরঘিসের হিস্সায় পড়ে পঁয়ষট্টি ডলার আর কিছু ভাঙানি। আপত্তি জানায় ও, বড় বেশী হ'য়ে গেল; কিন্তু জ্যাকের নীতি অনুযায়ী ভাগটা হবে সমান সমান। মন্তব্য করে জ্যাক, "সাধারণ রোজগারের চেয়ে ভালই হ'য়েছে, বলতে হবে।"

সকালে উঠে ইউরঘিসকে খবরের কাগজ কিনতে পাঠান হয়; অভিযানের ফলাফল পরে কাগজে পড়া নাকি অভিযান করার প্রধান আনন্দ। জ্যাক গল্প করে, ওর এক দোস্তের নাকি এটা চিরকালের অভ্যাস ছিল, তারপর একদিন দেখে কি শিকারের জাঙ্গিয়ার পকেটে তিন হাজার ডলারের নোট না দেখে ফেলে এসেছে। নিজের এত বড় বোকামির পরিচয় পাবার পর হ'তে কাগজ পড়াই ছেড়ে দেয় সে। গল্পটা বলে' খুব খানিকটা হাসে জ্যাক।

রাহাজানিটার আধ স্তম্ভব্যাপী বিবরণ আছে: অবস্থা দেখিয়া মনে হয় উক্ত অঞ্চলে দুর্বৃত্তরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাইতেছে, কারণ, একই অঞ্চলে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার রাহাজানি সংঘটিত হইল। আক্রান্ত ব্যক্তিটি কোন বীমা প্রতিষ্ঠানের দালাল ছিলেন, পরের গচ্ছিত একশো দশ ডলার ছিল তাঁহার নিকট, সমস্তই খোয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার নাম শার্টে লেখা ছিল, তাহা না হইলে এখন পর্যন্ত ভদ্রলোকের পরিচয় পাওয়া যাইত না; দুর্বৃত্তরা তাঁহার মাথায় কঠিন আঘাত করার ফলে ভদ্রলোকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, হাতের কিছু অংশ জমিয়া গিয়াছে, আরোগ্যলাভ করিলেও ভদ্রলোকের তিনটি আঙ্গুল খোয়া যাইবে। উৎসাহী সংবাদদাতা সংবাদটা তাঁর পরিবারবর্গকেও দিয়ে এসেছেন, সংবাদটা শুনে তাঁদের কী অবস্থা হয়েছিল সেও বিবৃত করা হয়েছে। মন্তব্য করা হয়েছে: সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, পুলিস এ বিষয়ে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

ইউরঘিসের এটা প্রথম অভিজ্ঞতা, এ সব বিবরণ পড়ে' ও একটু বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ে। জ্যাক কিন্তু প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে— এ সব খেলের মজা নাকি এখানেই, এ ছাড়া উপায় বা কী আছে? যাক না দিনকত তখন ইউরঘিস নিজেই এ সব নিয়ে কারখানায় ষাঁড় মারার

চেয়ে বেশী ভাববে না। জ্যাক বলে, "হয় আমরা মরব, নয় ওরা; তা ওরাই মরুক না, আমারই মত তাই।"

"তবু ধর, আমাদের কোন ক্ষতি তো করেনি লোকটা।" ইউরঘিস আমতা আমতা করে।

"আমাদের ক্ষতি না করুক, সাধ্যমত কারও-না-কারও চরম ক্ষতি নিশ্চয় করেছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তুমি।"

ডুয়ানে বুঝিয়ে দেয়, এ ব্যবসায়ে একবার জানা-পরিচয় হ'য়ে গেলে, বরাবর পুলিসকে বখরা দিতে হয়; কাজেই সাথীর সাথে প্রকাশ্যে প্রকাশিত হওয়া ইউরঘিসের পক্ষে সমীচীন নয়, যতখানি সম্ভব লুকিয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু লুকিয়ে থাকতে থাকতে ইউরঘিসের ক্লান্তি ধরে। দু' সপ্তাহের মধ্যেই ও ফের শক্তি ফিরে পায়, তখন এইভাবে লুকিয়ে বসে' থাকা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। কিছু ব্যবসা করবার পর জ্যাক শক্তিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করে' ফেলেছে, ফলে অত লুকোলুকির আর দরকার নেই, ফরাসী মেয়েটিকে কাছে এনে সময় ও টাকা খরচ করছে অবশ্য ইউরঘিসের সঙ্গেই—সহকর্মীকে সমান অংশ ও সব কিছুরই দেয়। তবু ইউরঘিস অস্থির হ'য়ে ওঠে, যতই বোঝাও ভবি ভোলবার নয়; শেষ পর্যন্ত একদিন ইউরঘিসকে নিয়ে একটা মদের দোকানে যেতেই হয়। বেরুতেই যখন হ'ল, তখন আর একটা দোকান কেন, বিভিন্ন দোকানের ও "খেলাঘরে"র বড় পাণ্ডা, নামজাদা রাহাজান প্রভৃতির সঙ্গে ইউরঘিসের পরিচয় করিয়ে দেয়।

এইভাবে শিকাগোর উচ্চশ্রেণীর গুণ্ডাদের খানিকটা পরিচয় পায় ইউরঘিস। শহরটা নামে জনগণ কর্তৃক শাসিত, আসলে এটা শাসন করে কয়েকজন ধনী, শক্তি বিচ্ছুরণের জন্য একদল "কলম" দরকার। বৎসরে দু'বার, বসন্ত ও হেমন্তে, ভোটযুদ্ধ লাগে; লক্ষ লক্ষ ডলার তখন

এই সব "কলম"-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়; মিটিং হয়, ভাড়াটে বক্তারা চতুর বক্তৃতা দেয়, বাজনা বাজে, বাজী পোড়ে, হাজার হাজার মণ ইশ্‌তেহার বিলি হয়, মদের দীঘি খুলে দেওয়া হয়, সকলের ওপর নগদ টাকায় কয়েক লক্ষ ভোট কেনা হয়। ভোটযুদ্ধ মিটে গেলে এই "কলম"-দের ছেঁটে ফেললে চলে না, সারাটা বছরই এদের পুষতে হয়। কলম নেতা ও কলম সংগঠকরা সোজাসুজি টাকা পায়—অল্ডারমেন ও কাউন্সিলররা মোটামুটি ঘুষ দিয়ে দেয়, দলীর নেতারা থোক দেয় নির্বাচনী ফণ্ড হ'তে, আইন সভার সদস্যরা মাসিক মাসোহারা দেয়, ঠিকেদাররা কাজহীন চাকরি দেয়, ইউনিয়ন নেতারা মাঝেমধ্যে কিছু কিছু গুঁজে দেয় এদের হাতে, আর সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকরা মুফৎ বিজ্ঞাপন ছেপে কলম নেতা ও সংগঠকদের পীর বানায়। সাধারণ কলম সৈনিকদের পৌর প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় চাপিয়ে দেওয়া হয়, নয় তারা শহরে "চরে' খায়"। পৌর প্রতিষ্ঠানের জল বিভাগ, পুলিস বিভাগ, অগ্নি বিভাগ এমনি কত শত বিভাগ আছে, অনেক সৈনিকেরই এখানে ঠাঁই হ'য়ে যায়, এতেও যাদের হয় না, তারা লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতি পায়,. এদের চেয়ে মন্দভাগ্যরা সিঁধে লুঠতরাজ জোচ্চুরি রাহাজানি ক'রে "জীবিকা উপার্জন" করে। আইন অনুযায়ী রবিবারে মদ বিক্রি বা পান করা নিষিদ্ধ; এই আইনের দৌলতে মদের দোকানওয়ালারা পুলিসের খপ্পরে পড়ে' থাকে, ভাগাভাগি করতেই হয়, বখরাদারীটা অবশ্য ঝগড়ার নয়, মৈত্রীমূলক। আইন অনুযায়ী বেশ্যাবৃত্তিও নিষিদ্ধ, কাজেই "মহিলা"দেরও এই জুটের মধ্যে জুটে যেতে হয়। জুয়াঘর, লটারি প্রভৃতির মালিকদেরও এই বখরাদারীতে হাত মিলাতে হয়, কারণ দুর্নীতিপরায়ণ কাজ পুলিসস্পর্শ ব্যতীত পবিত্র হয় না—এই সব ব্যবসায়ের মধ্যে পড়ে কড়ে, রাহাজান, পকেটমার, ছিঁচ্‌কে চোর, চোরাই মাল ব্যবসায়ী, ভেজাল দুধ বিক্রেতা অর্থাৎ দুধবিক্রেতা, পচা

ও রোগযুক্ত মাংসবিক্রেতা, অস্বাস্থ্যকর বাসাবাড়ীর মালিক, "বিশেষ কাজের" ডাক্তার, মহাজন, ভিখিরী, "ঠেলাগাড়ী"ওয়ালা, পেশাদার "কুস্তীবীর, ঘুষিবীর" (গুণ্ডা), রেসের মাঠের টাউট, "জোগাড়ে", সাদামজুর-আড়কাঠি, তরুণী ফুসলানো বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি। দুর্নীতির এই সব প্রতিনিধি একই গণ্ডীবাসী, পুলিস ও রাজনীতিকদের এরা রক্ত-ভাই। অনেকস্থলে একই ব্যক্তি তিনটি পেশাই চালিয়ে যায়—পুলিস অফিসার "বেশ্যা বিতাড়নে" কোন বাড়ীর ওপর "হামলা" করছে, আসলে এটি তারই ব্যবসা। রাজনীতিক নিজের মদের দোকানেই তার প্রধান কর্মকেন্দ্র খুলে রাখে। এ সব ছাড়া কয়েকটি আড্ডা আছে, এদের রক্ষকরা নগরখ্যাতিসম্পন্ন; পৌরসভার "নেকড়ে", এরা ব্যবসাদারদের কাছে শহরের রাস্তা বিলি করে, এই সব রাস্তার জুয়ার আড্ডাগুলির পৃষ্ঠপোষক হ'চ্ছে "কুস্তীগীর" ও জুয়াড়ীরা—এদের ওপর আইনের কোন প্রভাব নেই। রাহাজান, দোর-জানালা ভাঙ্গনদাররা সমস্ত শহরের অধিকারী—তাদের ভয়ে শহর আতঙ্কিত হ'য়ে থাকে। নির্বাচনের দিনে এই সব খাল বিল নালা দীঘি ডোবা মিলে সাগরত্ব লাভ করে—দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের মহামিলনক্ষেত্র হয় শহরটা; ভোট নেবার আগেই ওরা বলতে পারে শহরের কোন্ জেলার ভোট কত হ'বে, ওদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই নির্ভুল, বড় বেশী বেঠিক হ'লে শতকরা একভাগ—তাও ভোটের পর এক ঘণ্টার মধ্যে ওরা বদলে দিতে পারে।

মাত্র একটা মাস আগে ইউরঘিস পথে পড়ে' না-খেয়ে মরছিল, আর আজ যেন কোন যাদুদণ্ডস্পর্শে অর্থ ও জীবনের উপভোগ্য সব কিছু মুফৎ এসে যাচ্ছে ওর পায়ের কাছে। জ্যাক ওকে "বাক" হ্যালোরান নামে একজন আইরিশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, লোকটা রাজনৈতিক "কর্মী", একেবারে অন্দরমহলের লোক। ইউরঘিসের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের পর বাক বলে, তার একটা ছোট পরিকল্পনা আছে,

মজদুরের মত চেহারার কোন লোক নইলে কিন্তু সে কাজ হবে না, করতে পারলে মোটা টাকা এসে যাবে; ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোপনীয়, এ নিয়ে মুখ খুললে চলবে না। রাজী হ'য়ে যায় ইউরঘিস। সেদিন শনিবার; সেদিন বিকেলে মজুরদের মাইনে দেবার একটা জায়গায় ওকে নিয়ে যায় বাক। মজুরীবাবু নোটভরা একগাদা খাম নিয়ে ছোট্ট একখানা গুমটিতে বসে' ছিল; দু'পাশে দু'জন সশস্ত্র সান্ত্রী; নির্দেশ অনুযায়ী নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের শেখান নাম বলে, "মাইকেল ও'ফ্লাহার্টি"; হাতে নিঃশব্দে একখানা খাম চলে আসে, নিঃশব্দে ও খামখানা একটা নির্দিষ্ট মদের দোকানে বাকের হাতে এনে দেয়; আবার যায়, এবার ওর নাম "জোহান্ স্মিডট্", তৃতীয়বারে ওর নাম "সার্জ রেমিণ্টস্কি"; বাকের মগজে কাল্পনিক শ্রমিকদের বিরাট একটা তালিকা, তাদের প্রত্যেকের 'প্রাপ্য' খাম এনে দেয় ইউরঘিস। কাজটার জন্য ইউরঘিস পাঁচ ডলার পায় আর প্রতিশ্রুতি পায়, হৈ-চৈ না করে' যতদিন এ কাজ করতে পারবে ততদিন এই হারে মজুরী পাবে। মুখ বুজে থাকার দিক হ'তে ইউরঘিস চমৎকার লোক, আনন্দ হয় বাকের; অন্যান্য মাননীয়দের কাছে সে ইউরঘিসকে পরিচিত করিয়ে দেয়।

আর একদিক হ'তেও এই পরিচয় হ'তে ইউরঘিস লাভবান হয়। কোন্ শক্তিবলে কোনর বা মদের দোকান-কর্মচারী ওকে জেলে পাঠিয়েছিল, সেটা এতদিনে বুঝতে পারে। একদিন "একচোখো লারি"র "সাহায্য-রজনী হ'ল। লোকটা খোঁড়া; উচ্চস্তরের মহোদয়দের বেশ্যামহলে বেহালা বাজায়; শহরের শক্তিমান মহলে খ্যাতিমান ব্যক্তি। বিরাট একটা হলঘর ভাড়া করা হয়, মদ ও মেয়েমানুষ খুশীমত; পাঁড় মাতাল হ'বার পর একটা বিশেষ মেয়েমানুষের দিকে ঝোঁক পড়ে' যায় ইউরঘিসের; হাত বা দেহ আর দুর্বল নেই, টানাটানির পর চলে

মারামারি; জয়ী হয় ও, কিন্তু পুলিস ওকে শেষ পর্যন্ত থানার অন্ধকুঠুরীতে পোরে। অন্ধকুঠুরীতে ওর আর আপত্তি নেই তত, তবে মদের মৌজটা এভাবে নষ্ট হ'তে দিতে ও গররাজী; খবর পাঠায় বাকের কাছে; বাক অবশ্য আসে না; সে ফোন করে জেলা নেতাকে, জেলা নেতা ফোন করে থানায়, ইউরঘিস "জামিনে" বেরিয়ে আসে। পরদিন আদালত বসবার আগেই জেলা নেতা পেস্কারকে বুঝিয়ে দিয়ে আসে, ইউরঘিস একান্তই ভদ্র ও শিষ্ট সজ্জন, আগের রাত্রে একটু অবিবেচনার কাজ করে' ফেলেছে। মামলা ওঠে; দশ ডলার জরিমানা হয় ইউরঘিসের; জরিমানাটা অবশ্য "স্থগিত" থাকে, অর্থাৎ পরে এ নিয়ে কেউ খোঁচাখুঁচি না করলে দিতেই হবে না কখনো।

প্যাকিংশহরের লোকেরা যে মানে অর্থের মূল্য যাচাই করে, ইউরঘিসের বর্তমান সঙ্গীরা তার ধারেকাছেও ঘেঁষে না, এদের মান সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তবু, বিস্ময়ের বিষয় এই যে মজদুরজীবনে ও যত মদ খেত, আজ তার চেয়ে অনেক কম খায়। আজ আর সে অবসাদ ও হতাশার উস্কানি নেই, মাথা খাটাবার লড়বার একটা-কিছু আজ ওর সামনে আছে। অল্পকালের মধ্যেই ও বুঝে নেয়, চোখ খোলা থাকলে অনেক সুবিধার সন্ধান আপনা হ'তেই পাওয়া যায়। নিজে ও কর্মঠ, মদ মেয়েমানুষ হ'তে দূরে থাকবার ওর স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, এই গুণে ও মদ-মেয়েমানুষ-প্রিয় জ্যাককেও খানিকটা সংযমী ক'রে তোলে।

এক বস্তু হ'তেই আর এক বস্তু আসে। একদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত ও আর ডুয়ানে একটা পরিচিত মদের দোকানে বসে' আছে; একজন "গ্রাম্য খরিদ্দার" (মাল কেনবার জন্য শহরের বাইরের ব্যবসাদার কর্তৃক প্রেরিত লোক) ঢোকে; লোকটার অবস্থা তখনও একেবারে তরল নয়, টলটলে। দোকানে তখন দোকান-কর্মচারী ছাড়া অন্য কেউ নেই।

মদ খেয়ে লোকটা বেরিয়ে যায়, ওরা দু'জনেও উঠে অনুসরণ করতে থাকে লোকটার। রাস্তাটা একজায়গায় রেলের বাঁধ ও ব[illegible]হীন নতুন বাড়ীর মধ্যে দিয়ে চলে' গেছে, এখনও এখানে বাতি পড়েনি। মোক্ষম জায়গা। লাফিয়ে পড়ে ইউরঘিস লোকটার ওপর; পড়ে যায় লোকটা, ইউরঘিস একটা পিস্তল বাগিয়ে ধরে তার ঠিক নাকের ডগায়, ওদিকে বিদ্যুৎগতি জ্যাক ডুয়ানে আঙুল ছোটায় ওর পকেটগুলোর মধ্যে; ঘড়ি ও একতাড়া নোট নিয়ে ওরা ফের সেই দোকানেই ফিরে আসবার আগে লোকটা হয়তো একটা চীৎকারও করতে পারেনি। [illegible]ার সময় ওরা দোকান-কর্মচারীকে চোখ টিপে গিয়েছিল, প্রস্তুত হ'য়ে বসেছিল সে। ওরা ফিরে আসতে পিছনের ঢাকা সিঁড়িটা খুলে দেয় সে, সেদিক দিয়ে ওরা পৌছয় পিছনের একটা বেশ্যাবাড়ীতে। এ বাড়ীর ছাদ হ'তে পাশের আরও তিনটে বাড়ীতে যাওয়া যায়। বখরায় গোলমাল হ'লে মাঝে মাঝে পুলিস হামলা করে; সে রকম ক্ষেত্রে এ চারটে বাড়ীর যে কোনটা হ'তে "খদ্দেরদের" অন্য বাড়ীতে চালান ক'রে দেওয়া যায়। তা ছাড়া জরুরী অবস্থায় অনেক মেয়েকেও এই সব পথে পাচার করে' দিতে হয়। মেয়ে পাকড়াবার ফিকিরটা বিচিত্র; কাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে, "ঝি চাই", "কারখানার জন্য কামিন চাই"; আবেদনকারীরা দেখা করতে আসে, চেহারা ও শরীর ভাল হ'লে তাদের একটা ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হয়। বিজ্ঞাপনের ফাঁদে ধরা মেয়েদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলঙ্গ করে' দিলেই পথে এসে যায়; কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কয়েক সপ্তাহ বন্দী করে' নেশা করতে বাধ্য করতে হয়; ইতিমধ্যে তাদের মা-বাপ আত্মীয়স্বজন হয়তো পুলিসে খবর দিয়ে পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজখবর করছে, কিছু করা হয়নি কেন জানতে চাইছে! আত্মীয়স্বজন খুব জেদ করলে তাদের এনে বিজ্ঞাপনদাতাদের অফিসখানা তল্লাসী করা হয় একবার।

আজকের অভিযানে বন্ধুদ্বয় "রোজগার" করে একশো ত্রিশ ডলার; ইঙ্গিতমত কাজ করার জন্য দোকান-কর্মচারী এর হ'তে কুড়ি ডলার ভাগ পায়। স্বভাবতঃই দু'পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব হ'য়ে যায়; ফলে কর্মচারীটি গোল্ডবার্গার নামে একজন "খেলাঘর" (জুয়ার আড্ডা)-ওয়ালার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেয়; আজ ওরা লুকোয় এরই আস্তানায়। মদের গেলাসের ওপর আলাপ জমে' ওঠে নবপরিচিতদের; মদের চাবিতে গোল্ডবার্গারের হৃদয়ের দ্বার খুলে যায়; গল্প করে সে, একটা মেয়েমানুষকে সে নাকি ভারী ভালবাসে, একে নিয়ে একজন তাসের জুয়াড়ীর সঙ্গে ওর মতবিরোধ হয়; সে গোল্ডবার্গারের চোয়ালে ভীষণ একটা ঘুঁষি মারে; তাসের জুয়াড়ীটা এ শহরে নবাগত; কাজেই তার মাথাটা কোনদিন গুঁড়ো অবস্থায় দেখতে পেলে ইউরঘিস বা জ্যাক যেন বিস্মিত না হয়, এ বলে' রাখছে ও। ইউরঘিস আজকাল সানন্দে শিকাগোর সকল জুয়াড়ীর মাথা গুঁড়োতে প্রস্তুত; গোল্ডবার্গার কী বা কত দিতে পারবে জানতে চায় ও। গোল্ডবার্গার ইহুদি, এ নকার উচ্চমহলের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম আছে; বলে, এ জেলার খাস উচ্চতম পুলিস অফিসারের কাছ হ'তে ও ঘোড়দৌড়ের কতকগুলো 'টিপ' পেয়েছে; অফিসারটার সঙ্গে ঘোড়াওয়ালাদের "সম্বন্ধ" আছে; তাছাড়া, গোল্ডবার্গার একদিন বড় বিপদে অফিসারটাকে রক্ষা করেছিল; কাজেই—। পলকে জ্যাক সবটা বুঝে নেয়, ইউরঘিসের মাথায় কিন্তু এ সবের কিছুই ঢোকে না। ওরা ওকে ঘোড়দৌড়ের 'ভেতরের' ব্যাপারটা ভাল করে' বুঝিয়ে দেবার পর, ও এসে-যাওয়া এই সুযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

বহু কোটি ডলার মূলধনের একটি ঘোড়দৌড় ট্রাষ্ট আছে। যে সব রাষ্ট্রে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন আটচল্লিশটি রাষ্ট্র আছে) এরা ব্যবসায় করে, তাদের আইনসভাগুলি এদের অধীন; বহু শক্তিশালী ও

বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্র এই ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত, ঐ যন্ত্রসাহায্যে এরা জনমত গঠন ও পরিচালনা করে; ফলে, এক লটারি ট্রাষ্ট ছাড়া দেশে এমন কোন শক্তি নেই যা নাকি এদের বিরোধিতা করতে পারে। দেশের উল্লেখযোগ্য সকল স্থানে এরা ঘোড়দৌড়ের পার্ক (মাঠ) তৈরী করিয়েছে; বিপুল অর্থের জোরে এরা জনগণকে ঘোড়দৌড়ে আকৃষ্ট করে, তারপর 'বোম্-দৌড়' সংগঠিত করে' এরা জনসাধারণের সম্পদ্ ও সর্ব্বস্ব লুঠ করে; লুণ্ঠনের বাৎসরিক পরিমাণ বহু কোটি ডলার ঘোড়দৌড় আগে ছিল প্রমোদ, এখন ব্যবসা; ঘোড়াকে নেশা করিয়ে দেওয়া যায়, তার ওপর ডাক্তারী' চলে, অল্প বা অতিশিক্ষা দেওয়া যায়; যে কোন মুহূর্তে হোঁচট খাওয়ান যায়, বা এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা অভিনয়ে দর্শকদের সামনেই চাব্‌কে ঘোড়ার মনের জোর ভেঙ্গে দেওয়া যায়। কয়েক কুড়ি এ রকম কৌশল আছে, কখনো ঘোড়ার মালিক কৌশল প্রয়োগ করে' ধনী হ'য়ে যায়, ঘোড়ার চালক বা শিক্ষকরা ঘুষ খেয়ে কৌশল প্রয়োগ করে, অনেক সময় বাইরের লোক ঘুষ দিয়ে কৌশল প্রয়োগ করায়; তবে এ সব উটকো, এক্‌চেটিয়াভাবে কৌশল প্রয়োগ করে ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ। কোন রাষ্ট্রের প্রধান শহরে ঘোড়দৌড় চললে, সে রাষ্ট্রের অন্যান্য সকল শহরেই ট্রাষ্টের দালালরা "দোহন" চালায়; দৌড় শুরু হবার ঠিক একটু আগে বহুদূর হ'তে টেলিফোনে সাংকেতিক সংবাদ আসে, এ সাংকেতিক সংবাদ যে পাবে সেই ধনী হ'য়ে যাবে। ইউরঘিস বিশ্বাস করছে না? বেশ তো, পরখ করলেই ঝামেলা মিটে যাবে, প্রস্তাব করে বেঁটে ইহুদি। কাল একটা নির্দিষ্ট বাড়ীতে আসুক ওরা তিনজনে, তখন পরীক্ষা হবে এ সবের। ইউরঘিস রাজী, জ্যাকও রাজী। দু'জনে একটা উচ্চশ্রেণীর লটারী বাড়ীতে যায় (এখানে সমাজীয় মহিলারাও আসেন; তবে দালাল ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রকাশ্যঘরে না বসে' তাদের সঙ্গে ফাটকা খেলেন

তাঁরা একটু আড়ালের ঘরে)। ওরা দশ ডলার করে' বাজী ধরে "ব্ল্যাক বেলডেম" ঘোড়ার ওপর, একে ছয়ের টিপ ; জিতে যায় ওরা। এধারার সংকেতের তরে ওরা বহু জুয়াড়ীর মাথা গুঁড়োতে রাজী ! কিন্তু পরের দিন গোল্ডবার্গার সহুঃখে জানায়, ওদের পরিকল্পনার 'গন্ধ' পেয়ে ওদের শিকার শহর ছেড়ে পালিয়েছে।

এ ব্যবসায়ে তেজ-মন্দা আছে ; তবে না খেয়ে মরতে হয় না, বাইরে খাবার না জুটলে, জেলের ভেতর মেলে। এপ্রিলের প্রথম দিকে নির্বাচন আসছে, অর্থাৎ আসন্ন 'কলম'দের অতুল ধনলাভ। জুয়ার আড্ডা, আস্তানা, মদের দোকান, বেশ্যাবাড়ী প্রভৃতি ঘোরাফেরার ফলে ইউরঘিস নির্বাচনী অন্দরমহল-সদরমহল সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখে ফেলে ; কতকগুলো কলম আবার উভয়ের—দু'দলেরই টাকা মারে, এদেরই কথাবার্তা ওর প্রধান শিক্ষক। হ্যালোরান "গণতন্ত্রী", ইউরঘিসও গণতন্ত্রী বনে' যায়, তবে আদাজল-খাওয়া গণতন্ত্রী বনে না ও, "প্রজাতন্ত্রীরা"ও বড় ভাল লোক, আগামী নির্বাচনের জন্য টাকার গাদা করছে। গত নির্বাচনে গণতন্ত্রীরা ভোটপিছু তিন ডলার দিয়েছিল, আর প্রজাতন্ত্রীরা দিয়েছিল চার। হ্যালোরান, আর একটি লোক এবং ইউরঘিস এক রাত্রে তাসে বসেছে ; গল্প জমে' ওঠে নির্বাচন বিষয়ে ; গত নির্বাচনের একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে অপর লোকটি ; সেদিন সাঁইত্রিশ জন ইতালীয়ের একটা থোক নামে ওখানে, আনকোরা নতুন। হ্যালোরানের ওপর এদের ভার দেয় গণতন্ত্রীরা, প্রজাতন্ত্রীরা পাঠায় আর একজনকে ; আপোসে ঝগড়া না করে' হ্যালোরান, বক্তা এবং প্রজাতন্ত্রীটি একথোক ইতালীয়কে দু'থোক করে' নিয়ে প্রত্যেককে এক এক গেলাস বীয়ারের বদলে দু'দলকেই ভোট দেওয়ায়, তিন ও চার ডলার হিসাবে প্রাপ্ত অর্থটা ভাগাভাগি হ'য়ে যায় তিন 'ষড়যন্ত্রীর' মধ্যে।

দুর্বৃত্ত-জীবনের ঝক্কিঝামেলা ঢের, ক্লান্তি এসে যায় ইউরঘিসের; পেশা বদলে ও রজনীতিক হয়। এই সময় পুলিস ও দুর্বৃত্তবাহিনীর মৈত্রী নিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ শুরু হ'য়ে যায়; কারণ, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দুর্বৃত্তবাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, পুলিস বিভাগের প্রান্তশাখা এটা। হ্যাঁ, খোলাখুলি জুয়া চলুক, লাম্পট্য চলুক আপত্তি নেই, বরং তাতে ব্যবসা ভালই চলে, কিন্তু সব দোর জানালা দোকান ভাঙবে, রাহাজানি করবে—এ সব কী! এক রাত্রে আমাদের জ্যাকই একটা কাপড়ের দোকানের সিন্দুক নিয়ে হাত পাকাচ্ছিল, দোকানের প্রহরী ওকে হাতেনাতে ধরে' পুলিসের হাতে দিয়ে দেয়—পুলিস বলতে প্রহরারত কনস্টেবল, এর সঙ্গে জ্যাকের পরিচয় বহুদিনের; কিছুদূর এসে জ্যাককে সে ছেড়ে দেয়। এই নিয়ে কাগজগুলো এমন হাঁউমাঁউ-খাঁউ জুড়ে দেয় যেন জ্যাককে জ্যান্ত খেতে চায় তারা। অবস্থা খারাপ বুঝে জ্যাক শহর ছেড়ে পালায়।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে হার্পার নামে একটা লোকের সঙ্গে ইউরঘিসের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়; লোকটা ব্রাউনের কারখানার নৈশ প্রহরী এবং এই-ই একদিন ইউরঘিসকে মার্কিন নাগরিক হ'তে সাহায্য করে। হার্পারের মতে এটা দৈব, তবে ইউরঘিসকে ওর মনে নেই, ওর সময়ে কত 'কাঁচামাল' যে ওর হাত পেরিয়েছে তার কি ইয়ত্তা আছে, কা'কে মনে রাখবে ও? একটা মদের দোকানে বসে' বসে' হ্যালোরান, হার্পার আর ইউরঘিস রাত্রি দুটো পর্যন্ত নিজ নিজ অভিজ্ঞতার গল্প করে। হার্পারের কাহিনী একটু দীর্ঘ—কীভাবে কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়, তারপর হ'তে এখন ও সাধারণ মজদুর, মজদুরই শুধু নয়, গোঁড়া ইউনিয়নভক্ত। কয়েক মাস পরে অবশ্য ইউরঘিস জানতে পারে যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে ঝগড়াটা সাজান ব্যাপার, ইউনিয়নের ভেতরের খবর এনে দেবার জন্য মালিকরা এখনও ওকে

হপ্তায় বিশ ডলার করে' দিয়ে চলেছে। ইউনিয়ন সদস্য হিসাবে হার্পার বলে কারখানায় এখন খুব উত্তেজনা ও আন্দোলন চলছে। মজতুরদের সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে, এখন যে কোন দিন হরতাল হ'য়ে যেতে পারে।

নিজের কাহিনী বলবার পর হার্পার ইউরঘিস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কয়েক দিন পরে সে মজাদার একটা প্রস্তাব নিয়ে ইউরঘিসের কাছে ফিরে আসে। ঠিক কথা ও দিতে পারছে না, তবে ওর ধারণা ওর কথামত কাজ করলে এবং চুপ থাকতে পারলে ইউরঘিস কারখানার মালিকদের কাছ হ'তে নিয়মিত মোটা মাইনে পাবে। হার্পার—'ঝোঁপ' হার্পার নামে সমধিক খ্যাত—কারখানা অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক গণতন্ত্রী মাইক স্কুলির দক্ষিণহস্তস্বরূপ;—এদিকে আগামী নির্বাচনে অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে—হার্পার বোঝায়। কারখানা অঞ্চলের সীমান্তে অত্যন্ত ধনী একটা ইহুদি থাকে, লোকটার মদের কারখানা আছে। তার কামনা পৌরপরিষদের সদস্য হবে, "মাননীয়" পদবী পাবে; তাকে মনোনীত করবার জন্য সে স্কুলির কাছে প্রস্তাব পাঠায়; যত টাকা লাগে সে দিতে রাজী আছে। স্কুলি রাজী হ'য়ে যায়; তাতে নিজের খানিকটা ক্ষমতা হাতছাড়া হবার আশঙ্কা আছে—এতে রাজী নয় স্কুলি। উভয়-সঙ্কটে পড়ে' অনেক ভেবেচিন্তে স্কুলি প্রজাতন্ত্রীদের কাছে নিজে গিয়ে প্রস্তাব করে, ওরা স্কুলির অত্যন্ত "শান্ত" ভালমানুষ এক বন্ধুকে মনোনয়ন দিক (তা হ'লে তার মারফত স্কুলি নিজের ক্ষমতা অক্ষত রাখতে পারবে); বন্ধুটি কোন মদের দোকানের কর্মচারী; ইহুদির টাকাতেই স্কুলি তাকে জিতিয়ে দেবে; প্রজাতন্ত্রীদের মনোনীত প্রার্থী জিতলে প্রজাতন্ত্রীদলেরই গৌরব বাড়বে, এত সস্তায় এত গৌরব পাবার দ্বিতীয় পন্থা নেই প্রজাতন্ত্রীদের; তারা রাজী হ'য়ে যায়। সর্ত এই যে এর পরবর্তী নির্বাচনে প্রজাতন্ত্রীরা খোদ স্কুলির

বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দাঁড় করাতে পারবে না; তাতেও রাজী প্রজাতন্ত্রীরা। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে কি—ঝোঁপ বোঝায়—প্রজাতন্ত্রী-গুলো সব গাধা (স্কুলির রাজ্য কারখানা অঞ্চলে প্রজাতন্ত্রী হওয়া মানেই গাধা হওয়া)—কী ভাবে কাজ গুছিয়ে নিতে হয় গাধারা তাও জানে না; এদিকে, জঙ্গীনারা-সঙ্ঘের মহান রক্তচর্ম সদস্যরা তো আর খোলাখুলি প্রজাতন্ত্রী প্রার্থীকে সমর্থক জানাতে পারে না। এতেও খুব বেশী মুস্কিল হ'ত না, মুস্কিল হ'য়েছে অন্যত্র—গত বছর দু'য়েকের মধ্যে কোথা হ'তে সমাজতন্ত্রী দল নামে একটা নতুন দল গজিয়েছে কারখানা অঞ্চলে। এটা নোংরামির একশেষ—হার্পার মন্তব্য করে; কারখানা অঞ্চলের রাজনীতি একটা জগাখিচুরী হ'য়ে গেছে। সমাজতন্ত্রী নাম শুনলেই ইউরঘিসের ট্যামস্‌সিউস কুস্‌ংস্লেইকাকে মনে পড়ে' যায়; সেও নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলত। কোন শনিবারের বিকেলে অন্য কোন কাজ না থাকলে একটা প্যাকিং বাক্স নিয়ে গিয়ে ওরই মত আরও জন দু' তিন মিলে হাজির হ'ত একটা মোড়ে, গলা না ভাঙ্গা পর্যন্ত তিনজনে বক্তৃতা করত; ইউরঘিসকেও বোঝা[illegible]র চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওতে অনেক কিছু ধরে' এবং কল্পনা কা[illegible] নিতে হয়, কল্পনার বালাই নেই ইউরঘিসের; কোনদিনই তাই সে ও বস্তুটা ভাল বুঝতে পারেনি। হার্পার কিন্তু সোজা কথায় বুঝিয়ে দেয় সমাজতন্ত্রী মানে মার্কিন শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম স্বাধীনতা সব কিছুর শত্রু—জলের মত বুঝে যায় ইউরঘিস। হার্পারের মতে একেবারে জঘন্য—এরা না নেবে টাকা, না করবে তলায় তলায় "মেলজুল।" স্কুলি ইহুদিটাকে মনোনয়ন দেওয়ায় অন্য গণতন্ত্রীরা চটে' গেছে; বলে, গণতন্ত্রী দলের পক্ষ থেকে শেষে মনোনয়ন দেওয়া হল কিনা একটা 'ধনকুবেরকে'! এতে কিন্তু মজা হ'য়ে গেছে সমাজতন্ত্রীদের। স্কুলির ভাবনা এইখানেই। অবশ্য, গণতন্ত্রীরা একটু একটু করে' নরম হ'চ্ছে,

কিন্তু শেষে যদি সিদ্ধান্ত করে' ফেলে যে প্রজাতন্ত্রী গুণ্ডার (স্কুলির বন্ধুর) চেয়ে আগুনখেকো সমাজতন্ত্রী ভাল! তখন? তখন? এখানেই হ'ল ইউরঘিসের সুযোগ—দুনিয়ায় নিজেকে পাঁচজনের একজন করে' নেবার সুযোগ এখানেই—ঝোঁপ বোঝায় ওকে। এককালে ও ইউনিয়নে ছিল, মজদুর তো চিরকাল; কারখ'নায় অন্ততঃ ওর কয়েক শত পরিচিত আছে, ফের কাজ করতে লাগলে এবং ইউনিয়নে হৈচৈ করলে পরিচিতের সংখ্যা আরও বাড়বে; এদিকে রাজনীতি নিয়ে ও কখনো আলাপ-আলোচনা ক[illegible] বলে' এখন স্বচ্ছন্দে প্রজাতন্ত্রী বলে' নিজেকে চালিয়ে দিতে পারবে। ঠিকমত কাজ করলে পিপে পিপে মদ, টাকা আসবে; আর মাইক স্কুলিকে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করতে পারে ইউরঘিস, অনুজন-পরিজনকে কখনো নাকি স্কুলি ভোলে না। তা তো হ'ল, কিন্তু কী করতে হবে ইউরঘিসকে?—বিব্রতভাবে সে জিজ্ঞাসা করে। বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে ঝোঁপ; গোড়ার কথা ধরা যাক, কারখানায় গিয়ে একটা কাজ নিতে হবে, কাজ করতে হয়তো ভাল লাগবে না, তবে ওটুকু কষ্ট করতে হবে, উদ্দেশ্যগত রোজগার ছাড়া শ্রমিক হিসেবে যা রোজগার করবে সেটাও অবশ্য ওর থাকবে। ইউনিয়ন নিয়ে আবার মেতে উঠতে হবে, হার্পারের মত ইউনিয়নের একটা পদ অধিকার করবারও চেষ্টা করতে হবে। তারপর ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রজাতন্ত্রী প্রার্থী ডইলের বিষয়ে ভাল ভাল কথা আর ইহুদিটার সম্বন্ধে মন্দ কথা বলবে; এ কাজটা কিছুদূর এগোলে স্কুলি টাকা ও স্থান জোগাড় করে' দেবে, সেখানে ও (ইউরঘিস) "তরুণ প্রজাতন্ত্রী পরিষদ" বা অমনি কোন নাম দিয়ে একটা পার্টি খুলে বসবে, তখন ইহুদির কারখানার পিপে পিপে মদ, আমফু টাকা, বাজী, বক্তৃতা প্রভৃতি জঙ্গীনারা-সঙ্ঘের মতই চলবে; খানিকটা মজা করা আর কি! এই মজা দেখতে ও করতে ভালবাসবে এমন

বন্ধুবান্ধব কি আর ইউরঘিসের নেই? নিশ্চয় আছে, অনেক আছে; তারা গিয়ে জুটতে পারবে, তা ছাড়া আসল প্রজাতন্ত্রী নেতা ও কর্মীরাও ওকে সাহায্য করবে, তা হ'লেই নির্বাচনের দিনে ওদের জয়-জয়কার।

শেষ পর্যন্ত সব শোনবার পর ইউরঘিস বলে, "কিন্তু প্যাকিংশহরের কারখানায় কাজ পাব কীভাবে? কালা-তালিকায় যে আমার নাম উঠে গেছে।"

হার্পার হাসে; বলে, "সে আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

"বেশ, রাজী আমি; যা বলবে তাতেই আছি।"

ইউরঘিস আবার মাংসের কারখানা অঞ্চলে যায়, এবং উক্ত জেলার মালিক শিকাগোর মেয়রের মনিব মাইক স্কুলির সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলিই ইটখোলা, ময়লাগাদা এবং বরফ-পুকুরের মালিক—ইউরঘিস অবশ্য এ সব জানে না; জানে না যে, যে-রাস্তায় ওর ছেলে ডুবে মরেছিল তার বে-মেরামতির জন্য দায়ী এই স্কুলিই; যে বিচারক ইউরঘিসকে প্রথমবার জেলে দিয়েছিল, সে চাকরি পেয়েছে স্কুলিরই অনুগ্রহে, এও ইউরঘিসের অজ্ঞাত; যে কোম্পানী ইউরঘিসকে পচাবাড়ী বিক্রি করে' তারপর সেটা ঠকিয়ে নিয়েছিল, তারও বড় অংশীদার এই স্কুলি—ইউরঘিস যেমন এ সবের কিছুই জানত না, তেমনি ও জানত না যে মাংস-কারখানার মালিকদের হাতের পুতুল এই স্কুলি। তার কাছে স্কুলি একটা বিরাট শক্তি, ওর চেনাজানা মানুষের মধ্যে স্কুলিই সবচেয়ে বড়।

বেঁটে শুষ্কদেহ আইরিশ এই স্কুলি, হাত দুটো হরদম কাঁপছে। আগন্তুক অর্থাৎ ইউরঘিসের সঙ্গে সংক্ষেপে আলাপ হয়, ইউরঘিস কথা কয় কিন্তু স্কুলি তার ইঁদুরে চোখ দিয়ে ইউরঘিসের অন্তর অবধি যাচাই করে এবং এর সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করে। মনস্থির করার পর

ইউরঘিসের হাতে সে একটা চিট লিখে দেয়, নিয়ে যেতে হবে ডারহামের মিঃ হারমন নামক জনৈক ম্যানেজারের কাছে। চিটে লেখে, "পত্রবাহক ইউরঘিস রুদকস, আমার বিশেষ বন্ধু; ইহাকে একটি ভাল চাকরি দিলে আমি আনন্দিত হইব—এরূপ বলিবার গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। একবার এ অবিবেচনার কাজ করে' ফেলেছে, আশা করি সে ঘটনা বাধা হবে না।"

চিটখানা পড়ে হারমন জিজ্ঞাসুভাবে ইউরঘিসের দিকে তাকায়, "অবিবেচনার কাজ মানে?"

"আজ্ঞে কালা-তালিকায় আমার নাম উঠেছিল।"

হারমন ভ্রূকুটি করে, "কালা-তালিকা? তার মানে?"

ইউরঘিস বিব্রত বোধ করে, ভুলে গিয়েছিল যে কালা-তালিকার কথাটা প্রকাশ্য নয়। আমতা আমতা করে' বলে, "মানে মানে—কাজ পেতে মুস্কিল হয়েছিল আমার?"

"কী হ'য়েছিল?"

"একজন প্রধানের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে গিয়েছিল, আমার প্রধান নয়, তাই মেরেছিলাম।"

"ও", বলে হারমন কিছুক্ষণ ভাবে, জিজ্ঞাসা করে, "তা কী কাজ করতে চাও তুমি?"

"আজ্ঞে, যা হ'ক একটা কাজ; তবে, গত শীতে একখানা হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে', এবার একটু সাবধান থাকতে হবে।

"রাত্রে পাহারা দেওয়ার কাজ হ'লে চলবে?"

"আজ্ঞে না। রাত্রে যে আমায় মজদুরদের কাছে থাকতে হবে।"

"বুঝেছি—রাষ্ট্রনীতি। শূয়োর ছাঁটাইয়ের কাজ?"

"হ্যাঁ, তা চলবে।"

হারমন একজন সময়রক্ষীকে ডেকে বলে, "একে প্যাট মর্ফির কাছে

নিয়ে যাও, বল যেমন করে' হ'ক একে যেন একটা কাজ দেওয়া হয়।"

এবার ইউরঘিস সদম্ভ পদক্ষেপে শূয়োর মারবার ঘরে যায়, আগে এখানে এসেছিল চাকরি ভিক্ষে করতে। সময়রক্ষী প্যাটকে জানায়, "মিঃ হারমন একে কাজে লাগাতে বললেন"; চোখ দুটো কটমট করে' চায় প্যাট, ইউরঘিস উদারভাবে হাসে। প্যাটের ডিপার্টে লোক বেড়ে যাবে, কম লোক নিয়ে বেশী কাজ দেখাবার কৃতিত্ব অর্জনের চেষ্টাটা মাটি হবে, তবু প্যাট "রা" কাড়ে না; বলে, "বেশ।"

আবার ইউরঘিস মজদুর হয়; প্রাক্তন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপটা ঝালিয়ে নেওয়ার কাজটা অবিলম্বে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে "স্কটি" ডইলের জন্য "শেকড়" গাড়ার কাজও শুরু হ'য়ে যায়। ডইল একবার ওর খুব উপকার করেছিল, হ্যাঁ, মরদ বটে ডইল, ডইল নিজেও একজন শ্রমিক, শ্রমিকের স্বার্থ দেখবে সেই—টাকার কুমীর ইহুদিকে ভোট দিয়ে কী লাভ হবে এদের, স্কুলির মনোনীত লোক সে, কখনো কোন ভাল কাজ করেছে স্কুলি শ্রমিকদের জন্য?—কেন ভোট দেবে শ্রমিকরা তার মনোনীত মানুষকে? ইতিমধ্যে স্কুলি আর একখানা চিট পাঠিয়ে দেয় ওর কাছে; এখানা নিয়ে যেতে হবে উক্ত অঞ্চলের প্রজাতন্ত্রী নেতার কাছে। যায় ও অবিলম্বে। নেতা ওর পরিচয় করিয়ে দেয় ওর ভাবী সহকর্মীদের সঙ্গে—একজন দু'জন নয়, একপাল। শুঁড়ির টাকায় হলঘর ভাড়া হ'তে দেরি হয় না, অঘোষিত সভা হয়, আর প্রতি রাত্রে ইউরঘিস ডজনখানেক করে' "ডইল প্রজাতন্ত্রী পরিষদে"র সভ্য জোগাড় করে' আনে। কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা বেশ সমারোহপূর্ণ উদ্বোধন রজনীর অনুষ্ঠান করে: হলের সামনের সড়কটায় ফৌজী বাজনদাররা কুচকাওয়াজ করে'

সামরিক গৎ বাজায়, হলের ওপর আকাশে বাজী পোড়ে, রাস্তায় বোম ফাটে, হলের প্রবেশদ্বারে লাল লাল বাতি জলে। লোকে হল গমগম করে, এই জনসমাবেশ দিয়ে দুটো "বিরাট জনসভা" হ'তে পারত—ফলে, প্রার্থী ডইল ঘাবড়ে ফ্যাকাসে মেরে যায়; স্কুলির মাইনে-করা একজন লেখক ওকে একটা বক্তৃতা লিখে দিয়েছিল, গত এক মাস ধরে' ও সেটা মুখস্থ করেছে; আজ এক দল আসে এক দল যায়, এজন্য সত্য সত্যই দু'বার সভা হয়, ডইল দু'বার ওর বক্তৃতা আবৃত্তি করে। কিন্তু সব খেল্ ছাড়িয়ে গেল সুবক্তা পারিষদ স্পোরশ্যাক্সের বক্তৃতা—পবিত্র মার্কিন নাগরিক অধিকার ও শ্রমিক-শ্রেণীর রক্ষা ও উন্নতিবিষয়ে আগুন ছুটিয়ে বক্তৃতা দিলেন তিনি হলের বাইরে মোটর গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে—তিনি এবার সভাপতি পদ মারবার তালে আছেন। পরদিনের কাগজগুলিতে বক্তৃতাটির আধ কলমব্যাপী বিবরণ বের হ'ল; সঙ্গে মন্তব্য রইল, মিঃ ডইলের সহসাউদ্ভূত এবং আশাতীত জনপ্রিয়তায় গণতন্ত্রী দলের সভাপতি মিঃ স্কুলি বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন।

খালি এতেই কি রক্ষা আছে! "ডইল প্রজাতন্ত্রী দলের" বিরাট মশাল-শোভাযাত্রা বের হয়, প্রত্যেক ভোটদাতা মুফৎ উৎকৃষ্ট বীয়ার পায়—এমন বীয়ার নাকি আর কোন নির্বাচনে ভোটদাতাদের খাওয়ানো হয়নি কখনো—এসব নিয়ে স্কুলি বড়ই ভাবনায় পড়েছে!—সংবাদপত্রে সংবাদ বের হয়। এই শোভাযাত্রা এবং অসংখ্য ছোটখাটো রাস্তার সভায় ইউরঘিস অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে; বক্তৃতা অবশ্য ও করে না—সেজন্য উকিল প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা আছেন—পরিশ্রমটা করে সভার শৃঙ্খলারক্ষায় ও বন্দোবস্তে: প্রচারপত্র বিলি করা, দেওয়ালে সাঁটা, সভায় লোক জড় করা প্রভৃতি অসংখ্য কাজ, তারপর সভা চলতে থাকলে ও বাজী ও বীয়ারের দিকে লক্ষ্য রাখে। নির্বাচন পরিচালনাকালে ও

ধনী ইহুদির শত শত ডলার নাড়াচাড়া করে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে; শেষদিকটায় ও বুঝতে পারে, অন্যান্য "ছেলেরা" ওর এই বোকা বিশ্বস্ততার জন্য ওকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে—ওর খবরদারির ঠেলায় তাদের বখরা তারা পাচ্ছে না। তখন তাদের খুশী করতে ও নিজের ক্ষতিপূরণে একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করে; কিছু পরে নির্বাচনী পিপেয় আরও ফুটো অবশ্য ও আবিষ্কার করে' নেয়।

স্কলিকেও খুশী করে ইউরঘিস। নির্বাচনদিনে "ভোট বের করবার" জন্য ও ভোর চারটেয় বের হ'য়ে পড়ে; কাজ চালাবার জন্য দু'ঘোড়ার একখানা গাড়ী পেয়েছিল, তাতেই চেপে ও বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘোরে, বাড়ী হ'তে তাদের বের করে' বিজয়গর্বে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যায়। তাড়াতাড়িতে নিজেই বার ছয় ভোট দিয়ে ফেলে ইউরঘিস, ওর বন্ধু-বান্ধবদের অনেককেই ওর আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। থোকে থোকে ও নবাগত লিথুয়ানীয়, পোল, বোহেমীয়, স্লোভাক নিয়ে আসে, নিজের কলের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ও তাদের অন্য ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য অন্য লোকের হাতে তুলে দেয়। সেদিন যাত্রা শুরুতে ওর ভোটকেন্দ্রের মুরুব্বি ওকে একশো ডলার দেয়, আরও তিনবার ওকে একশো ডলার করে' চাইতে হয়, কিন্তু কোনবারই পঁচিশ ডলারের বেশী ওর নিজস্ব পকেটে লাগে না, বাকীটা আসল ভোটের জন্য সত্যি সত্যি খরচ হ'য়ে যায়। আর গণতন্ত্রী দলের মহা দুর্যোগ—প্রায় হাজার বেশী ভোটে জনসাধারণ একজন সাধারণ দোকান-কর্মচারীকে নির্বাচিত করে। ভোট চলে বেলা তিনটে হ'তে রাত্রি পাঁচটা পর্যন্ত—অপবিত্র ও ভয়াবহ এই দহে অশেষ উত্তেজনায় সময়টা কেটে যায় ইউরঘিসের। উদ্ধত ধনীর বিরুদ্ধে ডইলের জয়—জনসাধারণেরই বিজয়, তাই প্যাকিংশহরের প্রতিটি লোক গণতন্ত্রের মহিমায় ইউরঘিসের মতই মত্ত ও উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

নির্বাচনের পর ইউরঘিস কারখানাতেই থেকে যায়, চাকরি বজায় রাখে। পুলিস কর্তৃক দুর্বৃত্তদের রক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তখনও জোর আন্দোলন চলেছে, কাজেই এ সময়টা "শুয়ে থাকা"-ই ভাল। ব্যাঙ্কে তখন ওর তিনশো ডলার জমা, ইচ্ছে করলেই ও অবকাশ উপভোগ করতে পারে, কিন্তু এ চাকরি করায় কষ্ট নেই, আর কাজ না করে' ও থাকতেও পারে না। তা ছাড়া স্কুলির সঙ্গেও এ বিষয়ে আলাপ হয়, স্কুলি ওকে থেকে যাবার উপদেশ দেয়, কারণ একটা-কিছু নাকি "ঘটে" যেতে পারে।

কয়েকজন চোস্ত্ দোস্তের সঙ্গে ইউরঘিস এবার আস্তানা নেয় একটা বোর্ডিং বাড়ীতে। ইতিমধ্যে একবার অ্যানিয়েলের কাছে খোঁজ নিয়ে এসেছে, সংবাদটা ছোট্ট : এলজবিয়েটারা নীচুশহরে চলে' গেছে। এ খবর পাবার পর ওদের সম্বন্ধে ভাবাই ছেড়ে দিয়েছে ও। নতুন একধরণের মানুষ এখন ওর সাথী, এরা অবিবাহিত, "খেলোয়াড়"। সার-পোশাক ছেড়ে দিয়েছে এখন ইউরঘিস, এখন শার্টের ওপর কড়কড়ে কলার, তেলচিটে একটা টাই থাকেই—রাজনীতি করতে গেলে এসব নাকি চাই। তা ছাড়া এখন হপ্তায় এগারো ডলার করে' রোজগার করে, তার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যক্তিগত ফূর্তির জন্যই ও খরচ করতে পারে, এটুকু বিলাসিতা করলে জমার ওপরও হাত পড়বে না।

সাথীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে নীচুশহরের সস্তা থিয়েটার, নাচঘর এবং এই শ্রেণীর ওদের অভ্যস্ত স্থানসমূহে যায় ও। প্যাকিংশহরের অধিকাংশ মদের দোকানেই জুয়োর ব্যবস্থা আছে, তাসের পাশার এবং অন্যান্য বহু

প্রকারের, এগুলো ছিঁচকে জুয়ো, তবু সন্ধ্যাগুলি বেশ কেটে যায়। বিশেষ খেলা জমে' ওঠে ওদের শনিবার রাত্রে ; সন্ধ্যায় বসে, [illegible]স্ত রাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতেই পারে না ওরা। [illegible]নের ঘটনা : শনিবারের সন্ধ্যা, খেলতে বসবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর অর্থ জিতে নেয় ইউরঘিস ; অন্য লোক হ'লে এর পর উঠে পালাত, কিন্তু ইউরঘিস মরদ, খেলতেই থাকে ও, খেলা গড়ায় রবিবারের বিকেল পর্যন্ত—তখন ইউরঘিসের লাভ পুঁজি দুই-ই শূন্য হ'য়ে গেছে। শনিবারের সন্ধ্যাতে প্যাকিংশহরে কতকগুলো নাচেরও ব্যবস্থা হয়, টিকিটের দাম আধ ডলার, কিন্তু বেশ কয়েক ডলার খরচ হ'য়ে যায় মদ ও আনুষঙ্গিকে ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ "মেয়েমানুষ" সঙ্গে আনে ; মারপিট না বেধে গেলে নাচ চলে সাধারণতঃ রাত্রি চারটে পর্যন্ত ; সমস্ত সময়টা মদে ও স্ফূর্তিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে ওরা নিজের নিজের মেয়েমানুষের সঙ্গে একটানা নেচে চলে।

কিছু একটা ঘটবে বলতে কী বোঝাতে চায় স্কুলি? ব্যাপারটা বুঝতে বেশী দেরি হয় না ইউরঘিসের। (আগে কারখানার মালিক ও ইউনিয়নগুলির মধ্যে একটা শিল্পে-শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়)। আগামী মে মাসে চুক্তিকালের অবসান হবে, তখন নতুন একটা চুক্তি করা দরকার। দু' পক্ষের কথাবার্তা চলছে, এদিকে কারখানাগুলিতে অবিরাম চলছে ধর্মঘটের কথা। পুরাতন হারে দক্ষ শ্রমিকরাই লাভবান হয়েছিল, কিন্তু মাংস মজদুর ইউনিয়নের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অদক্ষ শ্রমিক। শিকাগোতে অদক্ষ শ্রমিকরা সাধারণতঃ সাড়ে আঠারো সেণ্ট্ হিসেবে ঘণ্টা পায়, ইউনিয়নগুলি আগামী বৎসরের জন্য প্যাকিংশহরে এই হারই কায়েম রাখতে চাইছিল। শুনতে বেশী হ'লেও, আসলে মজুরী এতে খুব বাড়বে না। ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ হাজিরা বই-এ দশ

হাজার ডলার পর্যন্ত মজুরী পরীক্ষা করে—এই পরীক্ষা অনুযায়ী দেখা যায়, উচ্চতম মজুরী দেওয়া হ'য়েছে হপ্তায় চৌদ্দ ডলার আর নিম্নতম ছু' ডলার পাঁচ সেণ্ট্,—সবটার গড় দাঁড়ায় ছ' ডলার পঁয়ষট্টি সেণ্ট্। ছ' ডলার পঁয়ষট্টি সেণ্ট্ দিয়ে কোন মানুষ সংসার প্রতিপালন করতে পারে না। "প্রস্তুত মাংসের" দাম গত পাঁচ বৎসরে শতকরা পঞ্চাশ ডলার বেড়েছে, টেংরীর দাম অবশ্য ঐ হারেই কমেছে; সব দিক বিবেচনা করে' ইউনিয়ন মনে করে মালিকরা আঠারো সেণ্ট্ হিসাবে ঘণ্টা দিতে পারে। মালিকরা কিন্তু তাতে গররাজী, তারা ইউনিয়নের দাবি প্রত্যাখ্যান করে; এবং তারা কী করতে চায় দেখবার জন্য চুক্তি শেষ হ'বার দু' হপ্তা পরেই ওরা প্রায় এক হাজার শ্রমিকের মজুরী সাড়ে ষোল সেণ্টে নামিয়ে দেয়। শোনা যায় বুড়ো জোন্স প্রতিজ্ঞা করেছে, মজুরী পনেরো সেণ্টে নামিয়ে তবে সে ছাড়বে। দেশে তখন পনেরো লক্ষ লোক বেকার বুভুক্ষু, এদের অন্ততঃ এক লক্ষ তখন খাস শিকাগোতেই। আর ইউনিয়নওয়ালারা চায় কিনা মালিকরা করজোড়ে ওদের কাছে গিয়ে ওদের দাবি মেনে নিক অর্থাৎ এক বছর ধ'রে দিন কয়েক হাজার ডলার করে' গচ্ছা দিক। বেশী নয়!

এ সব চলে জুনে। বিষয়টার সামগ্রিক ভোট নেওয়া হয়, ধর্মঘটেরই সিদ্ধান্ত হয়। অন্যান্য মাংসের কারখানাওয়ালা শহরেও এই একই সিদ্ধান্ত নেয় শ্রমিকরা। মাংস দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় হঠাৎ জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি জেগে ওঠে। বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করবার জন্য বহু অজুহাত বহু কারণ বহু অনুরোধ আসে, মালিকরা কিন্তু জেদ্ ছাড়ে না। আগে হ'তে জাহাজ জাহাজ গরু শূয়োর আনায়, বহু মালগাড়ী ভর্তি তোষক খাটিয়া জমা করে। রাগে ফেটে পড়তে থাকে শ্রমিকরা—এক রাত্রে এখানকার ইউনিয়ন হ'তে মাংসের কারখানাওয়ালা প্রতিটি শহরে—যেমন, সেণ্ট পল, দক্ষিণ ওমাহা, সিউনগর, সেণ্ট্

জোসেফ, কানসাস নগর, পূর্ব সেণ্ট্ লুই, নিউ ইয়র্ক—তার যায় এবং পরদিন দুপুরে পঞ্চাশ হ'তে ষাট হাজার মাংস-মজদুর ধর্মঘট করে' কারখানা হ'তে বেরিয়ে আসে। এইভাবে শুরু হয় বিখ্যাত "গো-মাংস ধর্মঘট"।

খাওয়া সেরে ইউরঘিস যায় স্কুলির সঙ্গে দে[illegible] করতে। স্কুলি এখন সুন্দর একটি বাড়ীতে থাকে, ওর সুবিধার জন্য পৌরসভা বাড়ীর সামনের রাস্তাটা উত্তমভাবে বাঁধিয়ে দিয়েছে, আলোর ব্যবস্থা করেছে, এখানে কোন ছেলের ডোববার আশঙ্কা নেই। বর্তমানে স্কুলির আধা-অবকাশ চলছে, চিন্তায় ভাবনায় যেন বেশী রকমের বিব্রত। ইউরঘিসকে দেখে স্কুলি ভ্রূ কোঁচকায়, বলে, "কী চাও?"

"ধর্মঘটের সময় একটা কাজ পাইয়ে দিতে পারেন কিনা দেখতে এলাম।"

স্কুলির ভ্রূ আরও কুঁচকে যায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে ইউরঘিসের দিকে চেয়ে থাকে। সেদিনকার সকালের কাগজে ইউরঘিস স্কুলির একটা বিবৃতি পড়েছে, তাতে স্কুলি কারখানার মালিকদের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে' জানিয়েছে যে মালিকরা যদি দরিদ্র শ্রমিকদের দাবি মেনে না নেয়, তা'হ'লে পৌরসভা ওদের কারখানা উঠিয়ে দেবে শহর হ'তে। এখন স্কুলি বলে, "দেখ রুদকস, নিজের কাজেই তুমি লেগে থাক না?" চমকে ওঠে ইউরঘিস—সকাল আর দুপুর!

ইউরঘিস বলে' ওঠে, "মামড়ি' হ'য়ে কাজ করব?"

"কেন নয়?" জানতে চায় স্কুলি, "তোমার কী তাতে?"

"আমি—আমি—," আমতা আমতা করে ইউরঘিস, কারণ দেখাতে পারে না; ধরে' নিয়েছিল ও এ অবস্থায় ইউনিয়নের নির্দেশ অনুযায়ী চলা উচিত।

"মালিকরা ভাল লোক চায়, খুব দরকার এখন তাদের," স্কুলি বলে' চলে, "এখন যারা সাহায্য করবে, মালিকরাও তাদের ভুলবে না। কেন সুযোগ করে' নেবে না নিজের!"

"তা হ'লে পরে আমি রাজনীতিতে কী কাজে লাগব আপনার?" ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে।

কথার মাথায় বলে' দেয় স্কুলি, "এমনিতেও কোন কাজে লাগবে না তুমি।"

"কেন না?"

"হুঁ!" চীৎকার করে' ওঠে স্কুলি, "তুমি প্রজাতন্ত্রী, তা ভুলে গেছ বুঝি? ভাবছ চিরটাকাল আমি প্রজাতন্ত্রীদেরই নির্বাচিত করাব শুঁড়ি তো এরই মধ্যে আমাদের খেল্ ধরে' ফেলেছে, এখন তারই [illegible] সামলাতে প্রাণ বেরুচ্ছে।"

বোবা মেরে যায় ইউরঘিস। এদিকটা ও আগে ভাবেনি বলে, "গণতন্ত্রীও তো হ'তে পারি আমি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু রাতারাতি নয়। রাজনীতিতে রোজ দল বাদলান যায় না। আর তা ছাড়া, আমার আর দরকার নেই তোমাকে—আর কিছু কাজ নেই তোমার। আর ধর, নির্বাচন আসতেও এখন অনেকদিন। এই এতদিন কী করবে তুমি বসে' বসে'?"

ইউরঘিস বলে, "ভেবেছিলাম আপনার সাহায্য পাব।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় পাবে। কোন বন্ধুকে আমি কখনো ভুলি না। কিন্তু আমি তোমায় যে কাজটা জুটিয়ে দিলাম সেটা ছেড়ে ফের আমার কাছে আসা কি ভাল দেখায়? তোমার মত আরও শত শত লোক তো আমার পিছনে ঘুরছে, আমি কী করতে পারি, বল! রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার নাম করে' এই সপ্তাহে আমি সতেরো জনকে পৌরসভা হ'তে মাইনে পাবার ব্যবস্থা করে' দিয়েছি, এ কি আর চিরকাল চলে? তোমার

যা বললাম, এ সব কথা অবশ্য তাদের বলব না, তুমি ভেতরের লোক বলেই বললাম, ভেতরের লোক বলেই তোমার আরও বেশী বোঝা উচিত। ধর্মঘট দিয়ে কী লাভ হবে তোমার?"

"তা ভাবিনি।" উত্তর দেয় ইউরঘিস।

"ঠিক কথা, কিন্তু ভাবলে ভাল করবে। আমার কথা বিশ্বাস করতে পার, শীঘ্রই ধর্মঘট খতম হ'য়ে যাবে, ইউনিয়নওয়ালারা হারবেই। এ সময় তুমি যা কামিয়ে নিতে পারবে তোমারই থাকবে। বুঝেছ?"

ইউরঘিস বোঝে। কারখানায় কাজের ঘরে ফিরে যায় ও। কাটা শূকরগুলিকে "তৈরী"র বিভিন্ন স্তরে ফেলে রেখে শ্রমিকরা চলে' গেছে; প্রধান তার কেরানী, শ্রুতিলেখক, বেয়ারা প্রভৃতিকে নিয়ে শূকর-গুলোকে কোনরকমে ছাড়িয়ে ঠাণ্ডাঘরে পাঠাবার চেষ্টা করছে। ইউরঘিস্ সোজা তার কাছে গিয়ে ঘোষণা করে, "কাজ করতে ফিরে এলাম আমি, মিঃ মর্ফি।"

মর্ফির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বলে, "সত্যি সত্যি চমৎকার লোক তুমি। কাজে লেগে যাও।"

উৎসাহ সংযত করে' ইউরঘিস বলে, "একটা কথা। আমার মাইনে কিছু বাড়া উচিত।"

"সে তো নিশ্চয়! কত চাও তুমি?"

সমস্ত রাস্তাটা ইউরঘিস নিজের মনে তর্ক করতে করতে আসছে, বলবার সময় শরীর যেন অবশ হ'য়ে আসে। মন ও মুঠি শক্ত করে' বলে, "মনে হয় দিন তিন ডলার হ'লেই চলবে।"

"ঠিক আছে," সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় মর্ফি।

কিছুক্ষণ কাজ করবার পর ও জানতে পারে কেরানী বেয়ারা প্রভৃতিরা পাঁচ ডলার হিসাবে রোজ পাচ্ছে; তখন ওর নিজের মাথায় নিজে লাথি মারতে ইচ্ছে হয়।

এইভাবে ইউরঘিস নতুন "মার্কিণ বীর" বনে' যায়, লেকসিংটন ও ফর্জ উপত্যকার শহীদদের গুণাবলীর সঙ্গে আজ ওর গুণাবলীও তুলনীয়। তুলনাটা অবশ্য পূর্ণ নয়, কারণ ইউরঘিস এখানে পাচ্ছে ভাল মাইনে, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, স্প্রিংএর খাট, গদি, দিনে তিনবার পুষ্টিকর খাদ্য, আছে ও নিশ্চিন্তে, প্রাণ বা দেহের কোন বিপদ নেই—খালি একটা অসুবিধা, মদের টানে কারখানার বাইরে যাবার প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ এর জন্যও সুবিধা দিতে প্রস্তুত, অরক্ষিত অবস্থায় ওকে যেতে হয় না। শিকাগোর অপর্যাপ্ত পুলিস বাহিনী হঠাৎ দুর্বৃত্ত ধরার কাজ ছেড়ে ইউরঘিসদের রক্ষার্থে নিয়োজিত হ'য়েছে।

পুলিস এবং ধর্মঘটীরা কোনপ্রকার হিংসাত্মক কাজ না করতে এবং হ'তে না দিতে স্থিরসংকল্প—আর একটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য প্রকার—এরা হ'ল সংবাদপত্র। ধর্মঘটভঙ্গকারী হিসাবে আজ ইউরঘিস সকাল সকাল কাজ ছেড়ে বেরুবার সুযোগ পেলে; মন তখন বাহাদুরিতে ভরপূর, তিনজন পরিচিতকে চ্যালেঞ্জ করে, "মদ খাবার জন্য যেতে পার বাইরে?" পারে তারা। হ্যালস্টেড্ সড়কের ওপর বড় ফটকটা দিয়ে ওরা বের হয়; কয়েকজন পুলিস এবং কয়েকজন ধর্মঘটী এখানে যাতায়াতকারীদের ওপর নজর রেখেছে। বেপরোয়াভাবে ওরা এগিয়ে চলে, কয়েকজন ধর্মঘটী এগিয়ে এসে যুক্তিতর্ক দিয়ে ওদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে। কোন যুক্তি কোন তর্ক শুনতে রাজী নয় ওরা। ফলে, চার বীরের মধ্যে একজনের টুপীটা উড়ে যায় পথের পাশের দিকে; লোকটা টুপী কুড়োতে দৌড়য়, অমনি পিছন হ'তে হল্লা ওঠে, "মামড়ি মামড়ি!" বিভিন্ন মদের দোকান হ'তে জন বারো ধর্মঘটী বেরিয়ে আসে। টুপীহীন দৌড় দেয় কারখানার দিকে, আর একজন বীরেরও ভয় ধরে, সেও দৌড় দেয় প্রথমের পিছু পিছু। দাঁড়িয়ে থাকে ইউরঘিস ও চতুর্থ; উদ্দেশ্য, মনের আনন্দে খানিকটা

মারপিট করা যাবে। ওদিকে ধর্মঘটীদের সংখ্যা বাড়ে। ইউরঘিসও দৌড় মারে একটা হোটেলের পিছন দিকে, সেখান হ'তে কারখানার সঙ্গীও একই সঙ্গে পৌঁছে হাঁপ ছাড়ে। ইতিমধ্যে অবশ্য "ঘটনা"স্থলে পুলিস যায়, জনতার সংখ্যাও বাড়ে, ফলে পুলিস ঘোষণা করে' দেয় অঞ্চলটায় দাঙ্গা বেধে গেছে, পুলিসের প্রধান আড্ডায় খবর যায়, গাড়ী গাড়ী পুলিস আসতে থাকে। ইউরঘিস এ সবের কিছুই জানে না। কেন্দ্রীয় সময়-রক্ষা অফিসের সামনে দেখে ওরই একজন সাথী মহাউত্তেজিতভাবে ক্রমবর্ধমান ভিড়ের সামনে বর্ণনা করছে কীভাবে চারজনকে মারমুখো বিরাট একটা বিশৃঙ্খল জনতা ঘিরে ফেলে এবং পিটতে থাকে, উক্ত চারজনকে পিটতে পিটতে জনতা টুকরো করে' ফেলে ইত্যাদি; মনুষ্যজাতির প্রতি অশ্রদ্ধার হাসি হাসে ইউরঘিস, হঠাৎ খেয়াল পড়ে কয়েকজন সুবেশ যুবক দ্রুতহাতে "ঘটনা"টা লিখে নিচ্ছে। এর দু'ঘণ্টা পরেই ইউরঘিসের হাতে সংবাদপত্রের জরুরী সংখ্যা এসে যায়, তাতে দু'ইঞ্চি লম্বা লম্বা লাল হরফে ছাপান হ'য়েছে :—

কারখানা অঞ্চলে হিংসাত্মক কার্যকলাপ!

ধর্মঘটভঙ্গকারীরা উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত!

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরদিনের সব কাগজগুলি কিনতে পারলে ইউরঘিস দেখত, ওর মত্ত অভিযান অনুসরণ করেছে প্রায় দু' কোটি মানুষ, এবং গুরুগম্ভীর পবিত্র ব্যবসায়ী পরিচালিত পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয়ের বিষয়বস্তু জুগিয়েছে।

যত সময় যায়, এ সম্বন্ধে ইউরঘিস তত বেশী দেখে। বর্তমানে কাজ শেষ হওয়ায় রেলে চড়ে' সোজা কারখানা হ'তে বেরিয়ে শহর ঘুরে আবার কারখানাতেই ফিরে আসতে পারে, কিংবা [illegible] দেওয়া দিব্য বিছানায় আরামে ঘুম লাগাতে পারে।

ঘুমনোটাই ওর পছন্দসই হয়; কিন্তু শুয়ে থাকাই হয়, ঘুমনো আর হয় না। সারা রাত্রি বহু ট্রেন-বোঝাই ধর্মঘটভঙ্গকারী আসতে থাকে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মজদুরদের মধ্যে হ'তে ধর্মঘটভঙ্গকারী সংগ্রহ করা কঠিন, তাই এই সব "মার্কিণ বীর" সংগ্রহ করা হ'য়েছে জঘন্য গুণ্ডা চোর ঠগ লম্পট, দক্ষিণের নিগ্রো এবং নিম্নতম শ্রেণীর বিদেশী শ্রমিক—যেমন গ্রীক, রুমানীয়, সিসিলিয়, স্লোভাকদের মধ্যে হ'তে। এদের অধিকাংশ আকৃষ্ট হ'য়েছে গণ্ডগোলের আশায়, মাইনের মোহ তত নেই; তারা আসার পর হ'তেই নাচগান হৈ-হল্লা করে' রাত্রিটাকে কদর্য করে' তোলে, কাজে যাবার সময় ঘুমোবার প্রস্তুতি করে।

সকালে প্রাতরাশের পর মর্ফি ইউরঘিসকে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে পাঠায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওকে হত্যাকক্ষের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বুক দুরু দুরু করে' ওঠে ইউরঘিসের—এই তার জীবনের সুযোগ, এবার ওকে অফিসার করা হবে।

কিছু কিছু 'প্রধান' বা অফিসার ছিল ইউনিয়নের লোক, অনেকে আবার ইউনিয়ন সদস্য না হ'য়েও ধর্মঘটীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। হত্যা ডিপার্টটায় অফিসার নইলে একমুহূর্ত চলে না, আর ঠিক এখানেই মালিকরা ঠেকায় পড়েছে। "ধোঁয়া মাংস", "লোণা মাংস", "টিনমাংস" কি উপজাতগুলি এখন পড়ে' থাকতে পারে কিন্তু টাট্‌কা মাংস না হ'লেই নয়, তা হ'লে হোটেল রেস্তরেণ্ট প্রভৃতিতে অভাব দেখা দেবে, তখন "জনমত" ঘুরে যাবে।

এ রকম সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না। হ্যাঁ, এ কাজ ও জানে, এর সব কিছু জানে, অন্যদের শেখাবার ক্ষমতাও রাখে। কিন্তু একটা সর্ত—এ কাজ নিয়ে কর্তৃপক্ষকে ও যদি সন্তুষ্ট করতে পারে, তাহ'লে ধর্মঘটের পরেও ওকে ঐ পদেই রাখতে হবে, নামিয়ে দিলে বা তাড়ালে

চলবে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানায়, এ বিষয়ে ও ডারহামদের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে। কর্তারা চায় কি? চায় ইউনিয়নকে আর ইউনিয়নের সঙ্গে যে সব অফিসার বেরিয়ে গেছে তাদের ভাল করে' শিক্ষা দিতে। ধর্মঘটকালে ইউরঘিস রোজ পাবে পাঁচ ডলার আর গণ্ডগোল চুকেবুকে গেলে পঁচিশ ডলার হিসেবে হপ্তা পাবে।

উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয় ওকে, তাই পরে' নিয়ে মহাউৎসাহে ও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানটা যেন ভূতের আড্ডায় পরিণত হ'য়েছে—একপাল নির্বোধ নিগ্রো আর বিদেশী, না বোঝে তারা কোন কথা, না বোঝে এ কাজ; আর কয়েক ডজন ফ্যাকাসেমূর্তি বুকবসা কেরানী, গরমে তাজা রক্তের গন্ধেই তাদের মাথা ঘোরে। সেই একই কক্ষ, যেখানে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে অবিরত গতি বাড়িয়েও বিস্ময়কর দক্ষ হাতে শ্রমিকেরা ঘণ্টায় চারশো হিসাবে পশু মেরেছে—চামড়া ছাড়িয়েছে, ছেঁটেছে, আজ সেখানেই সকলে মিলে ডজন দুই জানোয়ার মারতে ও তাদের চামড়া ছাড়াতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। নিগ্রো এবং "স্থানীয় মাননীয়রা" কাজ করতেই চায় না, কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর জিরিয়ে না নিলে ওদের চলে না। দু'দিনের মধ্যেই ডারহাম এণ্ড কোম্পানী এদের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা লাগিয়ে দেয়, বসে' বিশ্রাম করবার জন্য কৌচের পর্যন্ত ব্যবস্থা হ'য়ে যায়, প্রয়োজনমত তারা বাইরে যেতে থাকে, দরকার হ'লে একটু চোখ বুজেও নিতে পারে; কাজ বা স্থান কারও জন্যই নির্দিষ্ট নেই, কাজেই পলাতকদের পলায়ন জানতে অফিসারদের ঘণ্টা কাবার হ'য়ে যায়। অফিস কর্মচারীরা আতঙ্কে পড়ে' কাজ করে, এ কাজ করতে গররাজী হওয়ায় একযোগে ত্রিশজন কেরানীকে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম সকালেই নবাগতদের খানাপিনা পরিবেশনে গররাজী হওয়ায় কয়েকজন মহিলা কেরানীকেও দূর করে' দেওয়া হয়।

এমন একটি বাহিনী সংগঠিত করবার ভার পড়ে ইউরঘিসের ওপর। যথাসাধ্য করে ও, ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে' লোকগুলোকে সারবন্দী করে' দাঁড় করিয়ে কাজের কায়দা শিখিয়ে দেয়। জীবনে কখনো ও হুকুম করেনি, তবে আজীবন বহু প্রকারের বহু হুকুম শুনেছে, ফলে বস্তুটা আর অজ্ঞাত নেই, তা ছাড়া গলাদেরও গুণ আছে; সব মিলিয়ে যে কোন পুরনো অফিসারের মতই সেও ধমক দেয়, তর্জনে-গর্জনে হুকুম চালায়। দুঃখের মধ্যে ছাত্রগুলির শেখবার ইচ্ছা নেই। বিরাট কোন কৃষ্ণমূর্তি ধমক খাবার পর অভিমত প্রকাশ করে, "দেখ মালিক, যে ভাবে কাজ করছি তা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে অন্য কাউকে এ কাজ দিতে পার।" সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও কাজ ছেড়ে বক্তার চারিপাশে জুটে যায়, গজর গজর করে তারাও। দুপুরের খাবার পর ছুরিগুলি উবে যায়, নিগ্রোদের জুতোগুলো খুঁজলে অবশ্য ভালভাবে শাণিত অবস্থায় তাদের প্রত্যেকখানি বেরিয়ে আসবে।

বিশৃঙ্খল এই জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা অসম্ভব ব্যাপার; স্থান-কালের মাহাত্ম্যে ইউরঘিসও এদের মতাবলম্বী হ'য়ে পড়ে—কিসের জন্য ও অত ছুটোছুটি চেঁচামেচি করে' নিজেকে ক্লান্ত করবে? করবার কোন কারণ নেই। চামড়াগুলো কেটে কেটে ফর্দাফাঁই হ'য়ে গেলেও কাউকে ধরা যাবে না, সকলেই সব করছে; বা কেউ যদি কাজে না লেগে কোথাও ঘুমোয়, তাকে খুঁজতে গিয়ে কোন লাভ হবে না, কারণ সেই অবসরে অন্যরা ঘুমোবার আস্তানা খুঁজতে বেরিয়ে যাবে। ধর্মঘটের সময়ে যা খুশী তাই করলেও মালিকরা মাইনে দেবে। ইউরঘিস আবিষ্কার করে বিশ্রাম নেবার অবকাশ থাকায়, সজাগ চিত্তগুলি একাধিক জায়গা হ'তে পাঁচ ডলার করে' রোজগারের ব্যবস্থা করে' নিয়েছে, অন্ততঃ সম্ভাবনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাউকে ধরে ফেললে ও তখনই তাকে বরখাস্ত করে' দেয়, তবে নির্জনে ধরলে এবং অপরাধী

চোখ টিপে দশ ডলারের একখানা নোট বাড়িয়ে দিলে ইউরঘিসও হাত বাড়িয়ে দেয়। অল্পকালের মধ্যে বিদ্যাটা বেশ বিস্তৃতিলাভ করে, ইউরঘিসও বেশ দু'পয়সা কামাতে থাকে।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও আহত গরুগুলিকে এবং ব্যাধিগ্রস্ত শূয়োর-গুলিকে বধ করাতে পারলেই মালিকরা এখন নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। সাধারণতঃ এ গরমের দিনে গাড়ীতে ঠাসাঠাসি করে' দু' তিন দিন ধরে' আসায় ও জল না পাওয়ার জন্য কোনো শূয়োরের হয়তো কলেরা হয় গাড়ীর মধ্যে, সে শেষবারের মত ঠ্যাঙগুলো ছুঁড়ে নেবার আগেই গাড়ীর অন্য শূয়োরগুলি তাকে গুঁতোতে শুরু করে। ফলে, যাত্রাবসানে গাড়ী খুলে অনেক সময় কতকগুলো শূয়োরেরর কঙ্কাল দেখা যায়। হাড্ডিসারগুলোকে নামাবার সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে না পারলে, তাদের দিয়ে "শূয়োরচর্বি" ছাড়া আর কিছু হবে না। গো-মহিষাদির বেলায়ও ঐ একই কথা। ঠ্যাঙ কি হাড়গোর ভেঙ্গে যেগুলি এখন-তখন হ'য়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে না পারলে, সেগুলোর মাংস দিয়ে চর্বি করা ছাড়া উপায় থাকে না; ব্যবস্থা করবার জন্য দরকার হ'লে দালাল, গ্রাহক, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকলেই হাত লাগিয়ে কাজ তুলে দেয়। ওদিকে সুদূর দক্ষিণে কারখানাওয়ালাদের দালালরা নিগ্রো সংগ্রহ করে' চলেছে, চুক্তি—দিন পাঁচ ডলার আর থাকা খাওয়া, ধর্মঘটের কথাটা অবশ্য সযত্নে চেপে যায় দালালরা। রেলের সঙ্গেও কারখানাওয়ালাদের চুক্তি হ'য়ে গেছে; অন্যান্য যাত্রীগাড়ী বন্ধ রেখে বিশেষ কারণবশতঃ কম হারে নিগ্রো কুলি বহনে বহু গাড়ী নিযুক্ত করেছে। বহু শহর এই সুযোগে তাদের জেল ও ভিক্ষুকাশ্রম খালি করে' ফেলেছে—ডিস্ট্রিক্টের ম্যাজিস্ট্রেটরা সব আসামীর ওপর হুকুম দিচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহর ত্যাগ করতে হবে—কারখানাওয়ালাদের

দালালরা আদালতের বাইরে যে কোন লোকের শহর ত্যাগের সুবিধা করে' দেবার জন্য দাঁড়িয়েই আছে—জাহাজ ভর্তি ভর্তি লোক শহর ত্যাগ করছে। "মার্কিণ বীরদের" প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন সব জিনিস, বিভিন্ন প্রকারের মদ্যসহ কারখানার মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে মাল-গাড়ীগুলি। সিনসিনাটিতে ত্রিশজন স্ত্রী-শ্রমিক সংগ্রহ করা হ'ল "টিনে ফল ভরবার জন্য," এখানে এলে তাদের লাগিয়ে দেওয়া হ'ল মাংস প্যাক করার কাজে, এদের শুতে দেওয়া হ'ল ঘেরা একটা বারান্দায়—পুরুষ-শ্রমিকদের যাতায়াতের রাস্তা এটা। দিনরাত্র দলের পর দল "মার্কিণ বীর" আমদানি হয়, কারখানার গ্যারেজ গোয়াল গুদাম প্রভৃতি স্থানে ওদের থাকতে দেওয়া হয়, খাটিয়ায় খাটিয়ায় লাগালাগি হ'য়ে আর একটা মেঝে হ'য়ে যায়। একই ঘরে খাওয়া শোওয়া, ইঁদুরের ভয়ে শ্রমিকরা রাত্রে খাটিয়া চাপায় খাবার টেবিলের ওপর।

এত চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু মালিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। শতকরা নব্বইজন শ্রমিকই বেরিয়ে গেছে—ফলে সামনে আব নতুন করে' একটি শ্রমিক বাহিনী তৈরী করার সমস্যা—অপরদিকে মাংসের দাম শতকরা ত্রিশভাগ বেড়ে যাওয়ায় জনগণ ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলবার দাবি করছে। মালিকরা দাবি করল বিষয়টা একটি মধ্যস্থের হাতে দেওয়া হ'ক; ইউনিয়ন এ প্রস্তাব মেনে নিলে দশ দিন পরে, ধর্মঘট উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। উভয়পক্ষ স্বীকৃত হ'ল যে সকল কর্মীকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং "ইউনিয়ন সদস্যদের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ" করা চলবে না।

ইউরঘিসের পক্ষে এটা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার সময়। "বৈষম্যমূলক আচরণ" না ক'রেই কর্মচারীদের কাজে ফিরিয়ে নিলে, ওর বর্তমান চাকরিটি খোওয়া যায়। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে ও দেখা করে; তিনি

বলেন, "দেখ না কী দাঁড়ায়। ডারহামের ধর্মঘটভঙ্গকারীদের কাউকেই নাকি যেতে হবে না।"

"রফাটা" মালিকদের সময় লাভের কৌশল, না তারা আশা করেছিল যে এই পন্থায় তারা ইউনিয়নগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে, বলা শক্ত। কিন্তু সেই রাত্রেই এই ডারহামের কারখানা হ'তে দেশের প্রতিটি মাংসের কারখানায় টেলিগ্রাম চলে' গেল, "কোন ইউনিয়ন নেতাকে পুনর্নিয়োগ করো না।" পরদিন সকালে বিশ হাজার লোক খাবারের কৌটো হাতে ভিড় করে' দাঁড়াল কাজে লাগবার জন্য; কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়তে হয় আঙিনায়। শূয়োর ছাঁটাই ঘরের দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইউরঘিস দেখে প্রত্যাবৃত্তদের কাজে লাগবার আগ্রহ, আর দেখে তাদের শান্ত রাখবার জন্য জন চল্লিশ পুলিসের পাহারা; দেখলে, একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনতার সামনে গিয়ে এক এক করে' যাকে খুশী বেছে নিতে লাগল; বাদ পড়ল সামনের সারির লোক—এরা ইউনিয়নের কর্মকর্তা, সংগঠক, প্রতিনিধি—এদের বক্তৃতা দিতে শুনেছে ইউরঘিস অনেকবার। শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ গুঞ্জন বেড়ে চলে, দৃষ্টি হ'য়ে ওঠে ক্রুদ্ধ। কসাইরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানকার ভিড়টা একটু বেশী বেড়ে ওঠে, হৈ-চৈ হয়, দ্রুত পা চালায় ইউরঘিস সেই দিকে। বিরাটদেহ একজন কসাই, এ ছিল প্যাকিং ট্রেড কাউন্সিলের সভাপতি, এর সামনে দিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাঁচবার পার হ'য়ে যায়, ওকে কিন্তু দেখেই না; রাগে ফুলতে থাকে শ্রমিক জনতা। দ্রুত তারা তিনজনের একটা প্রতিনিধিদল নির্বাচিত করে' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে পাঠাবার চেষ্টা করে একবার দু'বার তিনবার, তিনবারই পিটিয়ে পুলিস ওদের পিছিয়ে দেয়। তখন শুরু হয় গোলমাল, চীৎকার। শেষে খোদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেরিয়ে আসে দোরের কাছে, শ্রমিক জনতা একস্বরে জানায়, "হয় সকলে কাজে লাগব, নয় কেউ

লাগব না!” ঘুঁষি পাকিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানায়, “গরুর পালের মতই বেরিয়ে গিয়েছিলি তোরা, আবার ভেঁড়ার পালের মত ফিরে আসবি!”

বড় কসাইটি সহসা একটা পাথরকুচির ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে সজোরে ঘোষণা করলে, “বন্ধুগণ, সমঝোতার শেষ হ’ল, আমরা সকলে আবার বেরিয়ে যাব!” এই আবার কসাইদের ধর্মঘট শুরু হ’ল; অন্যান্য কারখানাতেও একই চাতুরী খেলেছিল মালিকরা, সে সব জায়গা হ’তেও কসাইরা বেরিয়ে আসে, মালিক অ্যাভেন্যিউ ধরে’ চলে এদের শোভাযাত্রা; শ্রমিকদের জমাট ভিড় এদের সানন্দ অভিনন্দন জানায়। ইতিমধ্যে হত্যামঞ্চে যারা কাজে লেগেছিল, তারাও হাতিয়ার ফেলে বেরিয়ে আসে, যোগ দেয় শোভাযাত্রীদের সঙ্গে, এদের কেউ কেউ আবার ঘোড়ায় চড়ে’ খবরটা ছড়িয়ে বেড়ায়। ফলে, অল্পক্ষণের মধ্যে সমগ্র প্যাকিংশহরে ক্রুদ্ধ শ্রমিকদের ধর্মঘট আবার আরম্ভ হ’য়ে যায়।

এর পর প্যাকিংশহরের স্বর বদলে যায়—রাগে টগবগ করে’ ফুটতে থাকে যেন শহরটা; “মামড়ি”দের কুদিন পড়ে; একটা-না-একটা ঘটনা না ঘটে, এমন দিন যায় না। খবরের কাগজগুলো বিনিয়ে বিনিয়ে বিবরণ দেয় এ সব ঘটনার, সকল ব্যাপারেই ইউনিয়নগুলিকে দোষী করে। আজ হ’তে দশ বছর আগে এই প্যাকিংশহরেই ধর্মঘট হ’য়ে গেছে—তখন কিন্তু ইউনিয়ন ছিল না শ্রমিকদের; সেবার “জাতীয়” সেনাবাহিনী ডাকতে হ’য়েছিল; রাত্রে “জাতীয়” সেনাবাহিনী ও শ্রমিকবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বাধত, যুদ্ধক্ষেত্র আলোকিত করে’ রাখত জলন্ত রেলগাড়ীগুলি। প্যাকিংশহরকে দাঙ্গাহাঙ্গামার কেন্দ্র বলা যায়, চিরকালই এমনি। “হুইস্কি পাড়া”য় শতাধিক মদের দোকান আছে, প্রতিরাত্রেই এখানে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, গ্রীষ্মের রাত্রিগুলিতে বেশী হয়। যে কেউ এবারকার

গ্রীষ্মের পুলিস রিপোর্ট ওল্টালে দেখতে পেত, বিশ হাজার শ্রমিক নিষ্কর্মা হ'য়ে বসে' থাকলেও এবং তাদের ক্রোধের প্রচুর কারণ থাকলেও, অন্য-বারের তুলনায় বহু কম দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'য়েছে এ বছর—সংবাদপত্রগুলি কিন্তু নিদারুণ দাঙ্গাহাঙ্গামার খবরে ভরপূর। এদিকে, ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এক লক্ষ শ্রমিককে সংযত রেখেছে, লুণ্ঠতরাজ করতে দেয়নি, অন্ততঃ-পক্ষে ছ'টি ভাষাভাষী এই জনতাকে ক্ষুধা ও হতাশার মধ্যেও গত ছ' সপ্তায় আশা ও উৎসাহ দিয়ে রেখেছে—এ জিনিস দেখবার বা লেখবার সাংবাদিক নেই।

মালিকরা, অপরপক্ষে, সম্পূর্ণ নতুন একটা শ্রমিকবাহিনী গঠনের কাজে দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছে। এক কি দু'হাজার করে' ধর্মঘটকারী নিয়ে আসে ওরা প্রতিরাত্রে, এদের কেউ কেউ মালিকদের অন্য জায়গাকার গুদাম-দোকানের অভিজ্ঞ কর্মচারী; এদের মধ্যে কসাই হ'তে ম্যানেজার পর্যন্ত সবই আছে, আর কিছু অন্য শহরের ধর্মঘটত্যাগী দালাল, বাদবাকী সবই সুদূর দক্ষিণের তূলোক্ষেতের গোলাম-চাষী "কাঁচা" নিগ্রো; অভিজ্ঞদের বিভিন্ন ডিপার্টে বিতরণ করা হয়, আর এই কাঁচাদের ভেঁড়ার পালের মত ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে কোন একটা ডিপার্টে। এদেশে (আমেরিকায়) একটা আইন আছে যে, লাইসেন্স না দেওয়া পর্যন্ত এবং সে ঘরে উপযুক্ত জানালা, দোর, সিঁড়ি, অগ্নিকাণ্ড হ'লে পালাবার পথ না থাকলে, বাসগৃহরূপে তা ব্যবহার করা চলবে না; কারখানায় কিন্তু প্রাক্তন "রঙঘরে" অর্থাৎ জানালাহীন একটিমাত্র দোরওয়ালা একখানা হলঘরে মেঝের ওপর শোবার ব্যবস্থা করে' দেওয়া হ'য়েছে একশো শ্রমিকের, ঘরটায় ওঠবার সিঁড়ি নেই, আছে গড়ানে তক্তার মত একটা ব্যবস্থা। জোন্স-কারখানার "শূকর-গৃহের" তিনতলায় একটা গুদামঘর আছে, এখানে জানালার বালাই নেই, জোন্স এখানে শোবার ব্যবস্থা করে' দিয়েছে সাতশো লোকের; গদীও

জোটেনি এদের জন্য, খাটিয়ার খোলা স্প্রীঙের ওপর পড়ে' থাকতে হয়, তাও দু' দফায় শোয় দু'দল—একদল দিনে একদল রাত্রে। এসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হ'য়ে ওঠে, জনমতের চাপে মেয়র পর্যন্ত হুকুম জারী করে আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে মালিকদের। মালিকরা একটা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে ইনজাংশন জারী করিয়ে দেয়, বর্তমানে মেয়রের হুকুমটা প্রয়োগ করা চলবে না।

মেয়র বড়াই করতে লেগেছে সে নাকি শহর হ'তে জুয়ো ও গুণ্ডাবাজী ভাগিয়ে দিয়েছে। শহরে জিনিসগুলো আজকাল সত্যি সত্যিই কম; তারা যায় কারখানায় নিগ্রোদের "ছাল" ছাড়াতে। রাত্রে কারখানাগুলির আঙিনায় নিগ্রোদের মদ মেয়েমানুষ জুয়া ও মারপিটের মেলা বসে' যায়। মারপিট করে ওরা নিজেদের মধ্যে, জুয়ো পরিচালনা করে শহরের জুয়াড়ী ও গুণ্ডারা, মদ ও শ্বেতাঙ্গ মেয়েমানুষ সরবরাহ করে কারখানার মালিকরা—মেয়েগুলিকে জোগাড় করে' আনা হ'য়েছে গ্রামাঞ্চল হ'তে। সাদা মেয়েমানুষ ও সাচ্চা মদ ভোগ করবার সুযোগ পেয়েছে ওরা জীবনে এই প্রথম। ওদের পূর্বপুরুষরা ছিল আফ্রিকার বর্বর, এখানে এনেও ক্রীতদাস করে' রাখা হয়েছিল, তারপর ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেলে ও-প্রথার ঐতিহ্যটা থেকে যায়, আইনে না হ'লেও আসলে ওরা গোলামই আছে। ধর্মঘট ভাঙবার উদ্দেশ্যে এখানকার মালিকরা আজ ওদের স্বাধীনতা দিয়েছে সাদা মেয়েমানুষ ও লাল মদ ভোগ করবার। ধর্মঘট ভেঙ্গে গেলে ওদের আবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে দক্ষিণের ক্ষেতে-খামারে।

আঙিনায় জমা হয় তিন চার হাজার নিগ্রো—খালি গা, পরনে প্যাণ্ট, পায়ে বুট, বুটের ভেতর ছুরি। জুয়ো খেলতে খেলতে ঘুষোঘুষি লেগে যায় নিজেদের মধ্যে, দাঙ্গাকারীদের জন্য আসর করে' দেয় ঐ জনতা, চারিপাশের বাড়ী হ'তেও নিগ্রো মাথা ঝোঁকে এ দৃশ্য দেখবার

জন্য; আর বড় বড় কালো মর্দা নিগ্রোর বগলদাবা হ'য়ে দাঁড়ায় সাদা মেয়েমানুষ। নরকের রাজ্য চলে রাত্রের কারখানায়। চিরগোলাম নিগ্রোরা আজ স্বাধীনতা পেয়েছে—হীন প্রবৃত্তিগুলো চরিতার্থ করবার, নিজেদের ধ্বংস করবার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেছে ওরা। ছোরাছুরি চলে, গুলিও চলে। মজদুর মরে, কারখানার মালিকদের সাদা পারমিট্ আছে, তারই জোরে মালের নামে মরা মজদুর পাঠিয়ে দেয় ওরা সমুদ্রে—কর্তৃপক্ষকে খুনজখম নিয়ে মাথা ঘামাবার কষ্ট করতে হয় না। "স্ত্রী শ্রমিক" ও পুরুষ শ্রমিকদের শোবার ব্যবস্থা করে' দিয়েছে মালিকরা পাশাপাশি ঘরে, বা একই হলঘরে; সন্ধ্যা হ'বার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কাম চরিতার্থতার তাণ্ডবলীলা—পাইকারীভাবে বীভৎস ব্যভিচার আমেরিকায় এই প্রথম। মেয়েগুলি শিকাগোর তলানী [illegible], গ্রামে পাঠানো দালালদের সংগ্রহ করা নারীবাহিনী, আর পুরুষেরা গ্রামের অজ্ঞ মজুর। পাপের ব্যাধি বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে অনতিবিলম্বেই—আর সে সব কুৎসিত ব্যাধি জন্ম, পক্কতা ও বিস্তৃতিলাভ করে কোথায়, না যেখানে খানা বনছে সভ্যজগতের সর্বস্থানের জন্য!

মাংসের এই কারখানাগুলি নয়নানন্দকর বা তৃপ্তিদায়ক স্থান কস্মিনকালেও ছিল না, আজ সে স্থান হ'য়েছে পনেরো বিশ হাজার নরপশুর আস্তানা। সূর্যের তীব্র রৌদ্র বর্ষণ হ'ত সমস্ত দিন ধরে' এক বর্গ মাইল এই নোংরামির ওপর, হাজার হাজার জন্তুজানোয়ার গাদা করা থাকত দুর্গন্ধময় রোগবীজাণুবহুল খাটালগুলোর ওপর, খোলা জঞ্জাল ও পোড়া কয়লাভরা রেলপথের ওপর, জানালাহীন ঘিঞ্জি কারখানার ইমারৎগুলোর ওপর—এদের ভেতর তাজা হাওয়া কখনো প্রবেশ করতে পায় না; তা ছাড়া ছিল তাজা রক্তের নদী, রসিয়ে-যাওয়া গাদা গাদা মাংস, মাংসসিদ্ধের কড়াই, সাবানতৈরীর কড়াই, শিরিষ কারখানা, নারকীয় দুর্গন্ধযুক্ত সার-পুকুর; এরপর আসল

জঞ্জাল বলে' যে সব বস্তু খোলা জায়গায় ঢিপোন হ'ত সে সব এখনও বর্তমান, এর সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে নবাগত মজদুরদের ময়লা তেলচিটে দুর্গন্ধময় মেলে-দেওয়া জামাকাপড়, খাবারের টুকরো ও মাছি-ভর্তি খানাঘর, আর স্নানাগারের নামে যেখানে সেখানে ময়লা জলের জমাট নালি—সবকিছু মিলে কারখানাগুলোকে করে' তুলেছে নোংরামিতে অতুলনীয়।

এই নবাগত দলকে রাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয় রাস্তায় "খেলবার" জন্য। খেলা বটে! পথের ওপর মারামারি, জুয়োর আড্ডা, মদের আড্ডা ও মাতলামো, খিস্তি, কান্না, হুল্লোড়, হাসি; আবার ব্যাঞ্জো বাজিয়ে যে কোন জায়গায় নাচ ও গানের আসর। রবিবারের রাত্রি-সহ সাত দিন ধরে' চলে এই ব্যাপার। এতেই শেষ নয়। এক কোণে জলে একটা অগ্নিকুণ্ড, তার পাশে কঙ্কালসার ডাইনীর মত এক নিগ্রো বুড়ী পাকা চুল উড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বিকট আওয়াজে ওদের নিগ্রো মন্ত্র আওড়ে নরকাগ্নি জাগ্রত করে আর ধর্মভীরু নিগ্রো মেয়ে-পুরুষ সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়ে' পাপের অনুতাপ ক'রে ডুকরে ডুকরে কাঁদে!

ধর্মঘটের সময় কারখানাগুলির ভেতরের রূপ এই, বাইরে পেটুক ছেলের মত জনগণ মাংসের জন্য মরাকান্না তোলে, ধর্মঘটী ক্ষুব্ধ হতাশায় লক্ষ্য করে এসব, আর কারখানার মালিকরা কঠোরভাবে নিজেদের কাজ বা উদ্দেশ্যসিদ্ধি করে' চলে। প্রতিদিন দলে দলে নতুন নতুন লোক ভর্তি করা হ'চ্ছে—কিন্তু পুরনোরা ঠিকমত কাজ করতে না চাইলে বা না পারলে বরখাস্ত করে' তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। নতুন অপরিচিত জায়গায় এর চেয়ে বড় বিপদ আর নেই; তারা কাজে মন দিচ্ছে যেন, কাজের গতিও বাড়ছে—মালিকদের এসব চাতুরী-প্রয়োগে আরও অনেকের মত ইউরঘিস তাদের মুখপাত্র, দালাল। অনুভব করে ও বিরাট একটা যন্ত্রের মত কারখানার নতুন শ্রমিকবাহিনী

ধীরে ধীরে গড়ে' উঠছে। এখন মনিবিয়ানা এসে গেছে ওর; এই অসহনীয় গরম ও ধর্মঘটভঙ্গকারী ঘৃণ্য দালাল হ'য়েছে বলে' নিজের ওপর তীব্র ঘৃণায় সব সময়ই মদ খায়, মেজাজ হ'য়ে উঠেছে খুনের মত; লোকগুলোকে খেঁকিয়ে ধমকে, গালাগাল দিয়ে, মারবার হুমকি দিয়ে তারা ক্লান্তিতে অজ্ঞান হ'য়ে পড়বার মত না হওয়া পর্যন্ত ও খাটিয়ে চলে।

আগষ্ট মাসের শেষাশেষি একদিন। একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দৌড়তে দৌড়তে এসে তার সঙ্গে ওদের যেতে বলে; হাতিয়ার ফেলে দৌড়য় ওরা তারি পিছু পিছু। বাইরে এসে দেখে জনতা-সমুদ্র, তার মধ্যে কতকগুলো ছ'ঘোড়ার মালটানা গাড়ী আর তিনখানা পুলিস-বোঝাই পুলিস গাড়ী। সদলবলে ইউরঘিস একখানা ঘোড়ার গাড়ীর ওপর উঠে পড়ে, বাত ও চাবুক চালায় সজোরে, ওরাও চেঁচায়, জনতার মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটে চলে মহাবেগে ও মহাশব্দে। ব্যাপার কী? সাজ্ঘাতিক! একটা ষাঁড় খাটাল ভেঙ্গে পালিয়েছে ধর্মঘটীরা সেটাকে ধরে' খেয়ে ফেলতে এবং নিজেদের প্রাণ ও লড়বার শক্তি রক্ষা করতে পারে!

অ্যাশল্যাণ্ড অ্যাভেনিউএর দিকের ফটক হ'য়ে ওরা বেরিয়ে যায়, ওদের গাড়ীতেও জন আট পুলিস, ভয়ের কিছু নেই। রাস্তায় গাড়ী পড়তেই বিভিন্ন মদের দোকান হ'তেই বের হয় নারী ও পুরুষ শ্রমিক; কিন্তু কোন মারপিট বা গণ্ডগোল হয় না। কিছুদূর এসে কিন্তু গাড়ী রুখে যায়, চাবুক বা গলায় কাজ হয় না আর—গাড়ীর সামনে জমাট জনতা। থামলে চলবে না—খবরদারী দিতে দিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় ওরা জনতা লক্ষ্য করে', জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে—দেখা যায়, রাস্তার মধ্যে পড়ে' আছে রক্তাক্ত একটা গোদেহ।

বহু দক্ষ কসাই তখন বাইরে, করবার তাদের কিছু নেই, ঘরে ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়ে। পাকা হাতে তারা দু'মিনিটে একটা ষাঁড়ের মাথা ভেঙে চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতে পারে; করেছেও তাই। দেহটা দু'ভে খুবলে তোলা বহু মাংস লোপাট হ'য়ে গেছে। এর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন—শাস্তি দিতে লেগে যায় পুলিস, সামনে যে মাথা পায় তাই ভাঙে, রাগে ক্ষোভে যন্ত্রণায় ভয়ে জনতা চ্যাচায়, কিন্তু তারা নিরস্ত্র, তাই যে যার পালায়, কেউ চোঁচা দৌড় দেয় সিধে সড়ক ধরে', কেউ কেউ ঢোকে আশপাশের দোকান বা বাড়ীতে। ইউরখিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা খেলায় মেতে ওঠে—এক-একজন একটা শিকার বেছে নিয়ে মাথা ভাঙে, কোন শিকার হয়তো পালায় আশ্রয়ের চেষ্টায়, শিকারী ছোটে পিছু পিছু, শিকার ধাক্কা খায় বন্ধ দোরে, সঙ্গে সঙ্গে ঘা পড়ে মাথায়, যে সব শিকার খোলা দোর দিয়ে কোন দোকান বা বাড়ীর পালঙ্ক বা ছেঁড়া কাপড়ের গাদার নীচে লুকিয়েছে শিকারীরা তাদের হাতের সুখে পিটে ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে নিয়ে যায় গাড়ীর কাছে—তখনও হয়তো বেয়াদব শিকার আর্তনাদ করে।

একটা শিকারের সন্ধানে ইউরখিস ও দু'জন পুলিস ঢোকে একটা মদের দোকানে। শিকার আশ্রয় নেয় একেবারে আলমারির কাছে; দু'জনে তাকে পিটতে সুরু করে, সে মাথাটা বাঁচিয়ে একাৎ ওকাৎ মারে, বেটন ও লাঠি পড়ে পিঠে বা কাঁধে; বেশীক্ষণ লাঠি চালাতে হয় না, শিকার মাথার মায়া ছেড়ে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। ইউরখিস বাস্তব মানুষ, বাজে সময় নষ্ট না করে' লেগে যায় বোতলের পর বোতল মদ টানতে। দ্বিতীয় পুলিসটা মোটা, জনতার মধ্যে আটকা পড়েছিল দোরে, এদিককার ব্যাপার দেখে ছটফট করে' গালাগাল দেয়, শেষ পর্যন্ত এগোয়ও। অন্য পুলিসটাও শিকার ছেড়ে গলায় মদ ঢালতে লেগে যায়, পেটটা জ্বালা হ'লে পকেটে বোতল পুরতে লাগে, যতগুলো

ধরে। একজন পোল স্ত্রীলোক এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, এদের কাণ্ড-কারখানা দেখে এবার ছুটোছুটি ও চ্যাঁচানি বা কান্না সুরু করে' দেয়; দ্বিতীয় পুলিসটা তার তলপেটের নীচে চালিয়ে দেয় বেটনটা, দুটো ডিগবাজী খেয়ে গড়িয়ে যায় দোকানের মালিকা, না উঠে পড়েই থাকে। পকেটে বোতল পোরা হ'লে প্রথম পুলিস মদ বেচবার টেবিলের ওপর রক্ষিত গেলাস বোতল প্রভৃতি ঝেঁটিয়ে দেয় এক বেটনের ঘায়ে। মালিকা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পুলিস তার পিঠে হাঁটু লাগিয়ে চোখ দুটো টিপে ধরে। প্রথম পুলিস টাকার বাক্স ভাঙ্গে, মদের বোতল ফেলে পকেট বোঝাই করে প্রাপ্ত অর্থে। এবার ইউরঘিস ও সে ছুটে বেরিয়ে পড়ে দোকান হ'তে; দ্বিতীয় পুলিসটা এক-ঝটকায় মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওদের পিছু নেয়। গোদেহ উদ্ধার হ'য়ে গেছে, সেটাকে গাড়ীতে তুলে ওরা গাড়ী হাঁকিয়ে দেয়। পিছনের কান্না ও আর্তনাদের সঙ্গে উড়ে আসে অদৃশ্য হস্তনিক্ষেপিত ঢিল। দু' ঘণ্টার মধ্যেই ছ' ইঞ্চি লম্বা লাল হরফে ছাপা কয়েক হাজার সংবাদপত্র বের হয়—জনতা কর্তৃক পুলিস দলের উপর ইষ্টকবর্ষণ। মাথা হ'তে ক্যাশবাক্স ভাঙ্গা পর্যন্ত ঘটনাগুলো অবশ্য প্যাকিংশহরের মজদুরদের আর্তিভরা বুক ছাড়া কোথাও আর লেখা হ'ল না।

ওরা ফিরল তখন বিকেল হ'য়ে গেছে, আনা গোদেহ আর মারা দুটো ষাঁড় ছাড়িয়ে-ছেঁটে সেদিনকার মত কাজ শেষ করলে ওরা। তিনজন বন্ধুর সঙ্গে ইউরঘিস বের হয় নীচুশহরে খানাপিনা করতে; এ তিনজনও অন্য ট্রাকে দ্বিপ্রাহরিক অভিযানে বেরিয়েছিল। পথে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার গল্প হয় ওদের। নীচুশহরে পৌঁছে ওরা ঢোকে জুয়োর আড্ডায়। জুয়োতে ইউরঘিসের ভাগ্যটা নাকি ভাল নয় বিশেষ, এ দানে সে হারে পনের ডলার। এই লোকসানের পর

সান্ত্বনার দরকার, ইউরঘিস মদ খায় প্রচুর। প্যাকিংশহরে ফিরল তখন রাত্রি দুটো, শরীর ও মন দুই-ই খুব খারাপ। এর ওপর ঘনিয়ে আসে ওর দুর্ভাগ্য।

ঘুমোবার ঘরে ঢোকবার সময় পা টলছে ওর; মুখ রাঙিয়ে, তেলচিট্‌চিটে কিমোনো পরে' একটা মেয়েমানুষ যাবার পথে দাঁড়িয়েছিল, কোমর জড়িয়ে ধরে' সে সোজা দাঁড়াতে সাহায্য করে ইউরঘিসকে। একটা অন্ধকার ঘরে ঢোকে ওরা; ভেতরে পা বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি, এমন সময় সামনের দোর সশব্দে খুলে যায়, লণ্ঠন হাতে একটা লোক সামনে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, "কে ওখানে?" কী একটা বলতে যাচ্ছিল ইউরঘিস, কিন্তু আগন্তুক তার আগেই লণ্ঠন তুলে আলো ফেলে ওর মুখের ওপর। লোকটাকে দেখে ইউরঘিস বোবা মেরে যায়, বুকটা ধ্বক করে' ওঠে—আগন্তুক কোনর!

কোনর, মালবাহক কুলিদের অফিসার! এই কোনর ফুঁসলেছিল ওর বৌকে, তাকে জেলে পাঠিয়েছিল, তার বাড়ী লোপাট হবার, সংসার ধ্বংস হবার কারণ, তার সমস্ত জীবনটাকে উৎসন্ন করবার মূল সেই কোনর। ইউরঘিসের মুখের উপর পড়েছে লণ্ঠনের আলো, আর ও নিষ্পলক স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে কোনরের দিকে।

প্যাকিংশহরে আসবার পর মাঝে মাঝে কোনরের কথা মনে পড়েছে ইউরঘিসের, কিন্তু মনে হয়েছে কোনর বা সে ঘটনা সুদূরের একটা কিছু, ওর সঙ্গে যেন তার আর কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু কোনরকে সামনে জীবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইউরঘিসের সম্বন্ধ থাকা না-থাকার কোন কথাই মনে আসে না—ক্রোধের একটা বন্যা আসে যেন, উন্মত্ততা আসে আগের সেদিনের মতই—কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে লাফিয়ে পড়ে ও লোকটার ওপর, কোনর পড়ে' যায়, পড়তে ওকে দেবে না ইউরঘিস, মাঝপথে দু'চোখের

মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি চালায়, লটকে পড়ে কোনর ; ইউরঘিস তখন কোনরের মাথাটা পাথরের সিঁড়ির ওপর সজোরে ঠুকতে থাকে।

মেয়েমানুষটা তারস্বরে চেঁচায়, অন্য বহু লোক ছুটে আসে। বাতি উল্টে নিবে গেছে, ঐ অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখা যায় না, খালি ইউরঘিসের জোর নিশ্বাস নেবার ও শিকারের শব্দ শোনা যায়, মেয়েটা চুপ মেরে গেছে। শব্দ লক্ষ্য করে' এগিয়ে গিয়ে ইউরঘিসকে তোলবার চেষ্টা করে ওরা ; আগের মতই এবারও ইউরঘিস ওঠে কোনরের গলার খানিকটা মাংস মুখে নিয়ে, আগের মত এবারও আগন্তুকদের সঙ্গে বেপরোয়া মারামারি করে। পুলিস এসে যায়। সকলের সহযোগে পিটতে পিটতে পুলিস ওকে বেহুঁস করে' দেয়।

বাকী রাতটা কাটে ওর কারখানাস্থ থানার কুঠুরীঘরে। এবার ওর পকেটে টাকা আছে ; অসুবিধে হয় না খুব। জান ফিরলে টাকা ছাড়ে, পানীয় আসে, খবরও পাঠান যায় "ঝোপ" হার্পারের কাছে, হার্পার আসে না। অত্যন্ত দুর্বল ও অসুস্থ বোধ করে ইউরঘিস। সকালে ওকে আদালতে হাজির করান হয়—কোনরের ক্ষতের ফলাফল যতদিন না জানা যায়, ততদিনকার জন্য ওকে পাঁচ হাজার ডলারের জামিন দেওয়া হয়। আনন্দে পাগল হ'য়ে যায় যেন ইউরঘিস! সে ম্যাজিস্ট্রেটটা ওর বহুভাগ্যবলে আর, অন্ততঃ আজ, নেই—সুযোগ বুঝে বলে, আগে কখনও গ্রেপ্তার হয়নি, মারতে যায়নি ও, আহত ব্যক্তিই আগে আক্রমণ করে ওকে, আত্মরক্ষার্থে যা একটু……, ও গরীব, ওর হ'য়ে দুটো ভাল কথা বলবার কেউ নেই, নইলে ওর বিশ্বাস এখনই ও ছাড়া পেয়ে যেত। "ঝোপ" থানায় না যাক, আদালতে ছিল।

ঝোপ ঘোরায়, ফূর্ত্তি করতে ও নীচুশহরে গিয়েছিল বলে' খবরটা ঠিক সময়ে ও পায়নি; "কিন্তু হ'ল কী তোমার?"

"এক ব্যাটার কম্ম সারছিলাম। সে যাক, এখন যে পাঁচ হাজার ডলারের জামিনের ব্যবস্থা করতে হয়।"

"ও কিছু না, করে' দিচ্ছি", বেপরোয়াভাবে ঝোপ জানায়, "অবশ্য তোমার নিজস্ব দু'চার ডলার এতে খরচা হ'তে পারে। কিন্তু হ'য়েছিল কী?"

ইউরঘিস বলে, "লোকটা একবার আমার সঙ্গে অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করে।"

"কে সে? চিনি নাকি আমি?"

"ব্রাউনের কারখানায় একটা 'প্রধান'—এখনও আছে কিনা জানি না। লোকটার নাম কোনর।"

চমকে ওঠে ঝোপ, "কোনর! ফিল্ কোনর নয় তো?"

"হ্যাঁ, সেই ব্যাটাই তো। কেন?"

"ওরে খোদা! তা হ'লে তুমি গেছ। এ মিঞা তোমায় কোন সাহায্য করতে পারবে না!"

"সাহায্য করতে পারবে না আমায়? কেন, কেন?"

"ও যে স্কুলির চাঁই পাণ্ডাদের একজন—জঙ্গীনারা সঙ্ঘের সদস্য—স্কুলি ওকে আইন সভার সদস্য করবার ব্যবস্থা করছিল। ফিল্ কোনর! ভগবান!"

এবার ইউরঘিস বিপন্ন বোধ করে, কোন কথা কইতে পারে না।

ঝোপ বলে, "ইচ্ছে হ'লে স্কুলি তোমায় ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে!"

ইউরঘিস ভাবে; অবশেষে বলে, "আমি কেন মেরেছি, কাকে মেরেছি স্কুলি জানবার আগেই, ওকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করে' নেওয়া যায় না?"

"কিন্তু তুলি যে শহরেই নেই, ধর্মঘট এড়াবার জন্য কোথা ভেগেছে। কোথায় গেছে তাও জানি না।"

আচ্ছা কাণ্ড যা হ'ক। এত বিপদেও পড়ে মানুষে! বিমূঢ় হ'য়ে বসে থাকে ইউরখিস। ওর ঠ্যাঙা ঠেকে গেছে আরও [illegible] ঠ্যাঙাতে, হার তো বটেই, মরা ছাড়া যে উপায় নেই ওর! ভাবে, জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু আমি কী করব, তা বল।"

"তার আমি কি জানি! তোমার জন্য জামিনও আমি নিতে পারব না। তোমার জামিন নিতে গিয়ে শেষে নিজেকে মাটি করব!"

আবার দু'জনে চুপচাপ।

দুর্বলভাবে ইউরখিস বলে, "আচ্ছা, এমন হয় না, কাকে মেরেছি তা যেন তুমি জানতে না, তাই জামিন দাঁড়িয়েছিলে, এমনি একটা ভান করে' কাজ উদ্ধার করতে পারবে না?"

"কিন্তু তাতে লাভ হবে কি তোমার, বিচার তো হবে", বলে' হার্পারও ভাবতে লাগে।—"হুঁ, একটা পথ আছে। তোমার জামিন আমি কম করে' দিতে পারি, তারপর টাকা থাকে তো টাকাটা ফেলে দিয়ে, ভাগো।"

ব্যাপারটা ভাল বোঝে না ইউরখিস, ঝোপ বোঝায়। বোঝবার পর ইউরখিস জানতে চায়, "কত লাগবে?"

"তা তো জানি না। কত আছে তোমার?"

"তিনশো ডলার", ইউরখিস উত্তর দেয়।

"বেশ। ঠিক বলতে পারছি না, তবে চেষ্টা করব ওতেই তোমায় বের করতে। বন্ধুত্ব বলে' তো একটা জিনিষ আছে—বন্ধুর জন্য এ ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে আমাকে। এক কি দু' বছরের জন্যে তুমি রাজ-অতিথি হবে, এটা কি আমার ভাল লাগবে হে!"

ব্যাঙ্কের খাতাখানা প্যান্টের সঙ্গেই সেলাই করা থাকে, সেখানা এখন

বের করে' দেয় ইউরঘিস ঝোপ হার্পারের হাতে। সমস্ত জমা দেবার আদেশ লিখে দেয় ঝোপ, ইউরঘিস দস্তখৎ মেরে দেয়। ঝোপ এবার ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোঝায়, ইউরঘিস লোকটা অত্যন্ত ভদ্র, নইলে কি স্থুলির বন্ধু হ'তে পারে? একজন ধর্মঘটভঙ্গকারী ওকে আক্রমণ করে বলেই ও—। জামিন কমে' আসে তিনশো ডলারে, নিজেই জামিন দাঁড়ায় ঝোপ, নগদ ডলার জমা দেয় না। ইউরঘিসকে অবশ্য এ কথা জানায় না, এ কথাও বলে না যে বিচারের সময় টাকাটা বাজেয়াপ্ত হ'তে না দিয়ে নিজের পকেটে পোরবার ব্যবস্থা করে' নেওয়া ওর পক্ষে মুস্কিল হবে না—স্থুলিকে অসন্তুষ্ট করবার ঝুঁকি নিচ্ছে, আর এটুকু পুরস্কারও পাবে না ও? ইউরঘিসকে জানায়, সে এখন মুক্ত, যত শীঘ্র পালাতে পারে ততই মঙ্গল। কৃতজ্ঞতায় ইউরঘিস থস্‌থসে হ'য়ে যায়। ব্যাঙ্কজমা বাবদ ও পায় এক ডলার চৌদ্দ সেণ্ট, বিগত নৈশ উৎসবান্তে পকেটে ছিল দু' ডলার পনের সেণ্ট, এই সম্বল নিয়ে ইউরঘিস বাস্ ধরে; নামে গিয়ে শিকাগোর অপর প্রান্তে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

আবার ইউরঘিস পতিত ভবঘুরে। এবার ও থাবাকাটা জানোয়ার বা খোল হ'তে বের করা কচ্ছপের মত পঙ্গু। কি রহস্যজনক শক্তি ছিল এতদিন ওকে আবেষ্টন করে', তারই জোরে রুজিরোজগার করেছে অনায়াসে, যা খুশী তাই করেছে, ফল কিন্তু ভোগ করতে হয় নি। আজ এক অস্ত্রের আঘাতে রহস্যময় সে শক্তি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। বললেই আজ আর চাকরী পাওয়া যায় না; নির্ভাবনায়

এখন আর চুরি করা যাবে না—সাধারণ চোরের পালের সঙ্গে শাস্তি-ভোগ করতে হবে। অথচ সাধারণ চোরের পালের সঙ্গে মিশতে পারবে না, ধ্বংসের জন্য সে চিহ্নিত। পুরোনো সঙ্গী-স্যাঙাৎদের সঙ্গেও মিশতে পারবে না, ওকে ধরিয়ে দিয়ে তারা নিজেদের সুবিধা করে' নেবে। যে অপরাধ ও করেছে খালি তার জন্যই যে আজ ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হবে তাই নয়, যে সব অপরাধের অপরাধী ধরা পড়েনি, তাদের জন্যও শাস্তিভোগ করতে হবে ওকেই—যেমন ও আর ডুয়ানে মারল "গ্রাম্য খরিদ্দারকে", তার জন্য শাস্তি পেয়েছে কোন হতভাগ্য। কাজেই আজ একা একা লুকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই ওর।

এসব সত্ত্বেও তত বিপদ হ'ত না, কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে অন্যদিক হ'তে। আগে কোন খালি গাড়ীর তলা বা ভেতরে কিম্বা কারও সদর দরজার সিঁড়িতে শুতে পেলেই ও খুশী হ'ত, আর পনেরটা সেণ্ট্ পেলে খাওয়া চলে' যেত; তখন আর ওর দুঃখ থাকত না। ইদানীং হাত হ'য়েছে খরুচে, নজর উঁচু, তার সঙ্গে জুটেছে কতকগুলো বদ-অভ্যাস। আগে শরীর গরম রাখবার জন্য মদ খেত, এখন মদের জন্যই মদ চাই, আরও কত কি বিলাসিতা দরকারী হ'য়ে পড়েছে এখন। সেগুলো না পেলে কষ্ট হয়, দুঃখ পায়। মদের জন্য মন ছটফট করে, ঐ ছটফটানিতে অন্য চিন্তা তলিয়ে যায়। শেষ সেণ্ট্টা দিয়ে মদ গিলে বসে' থাকে, তার ফলে সমস্ত দিন আর কোন খাবারই জোটে না।

আবার ও কারখানাগুলোর ফটকে ফটকে নিয়মিত হানা দেয়। আজ শিকাগোতে কাজ পাওয়া বিশেষ করে' ওর পক্ষে যত মুস্কিল, আগে কখনও তত ছিল না। এর আংশিক কারণ, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট; প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক গত বসন্তে বেকার

হ'য়েছে, আজ পর্যন্ত তাদের সুরাহা হয়নি। গত দু' মাস ধ'রে বিশ হাজার লোক ধর্মঘট ক'রে খাস শিকাগোতেই বসে' আছে, তাদের অনেকেই কাজ খুঁজতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন পরে ধর্মঘট গলে' যায়, তাতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না, ধর্মঘটী কাজে ঢুকলে মামড়িরা প্রাণভয়ে কাজ ছেড়ে পালায়, বেকার হ'য়ে তারাও কাজ খোঁজে। দশ পনের হাজার "কাঁচা নিগ্রো", বিদেশী, জেল হ'তে বের করা চোর ডাকাতদের এখন 'চায়' বলে' খেতে দেওয়া হয়। যেখানেই যায় ইউরঘিস, সেখানেই এরা থাকে; সর্বদা ওর আতংক এর মধ্যে কেউ যদি জেনে থাকে যে কর্তৃপক্ষ ওকে 'চায়'! এত ভাবনা নিয়ে মানুষ শিকাগোয় টিকতে পারে না; ঠিক করে শিকাগো ছেড়ে ও পালাবে, কিন্তু পকেট যে শূন্য! বাইরে যাবেই বা কী দিয়ে, আর গিয়ে খাবেই বা কী? সামনে শীত। কাজ জুটবে না কোথাও। সে সবের চেয়ে ঢের ভাল জেল যাওয়া, আস্তানা ও আহার দুই-ই মিলবে।

এভাবে দশ দিন যায়, পকেটে পড়ে' থাকে আর মাত্র কয়েকটি সেণ্ট্। এ ক'দিন একটা উঠকো কাজ কি একটা মোট বইবার সুবিধা পর্যন্ত ও পায়নি। হাসপাতাল হ'তে বেরবার সময় খালি একটা হাত বাঁধা ছিল, আজ দুটো হাত দুটো পা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা জগন্নাথ—সামনে অনাহারে মৃত্যুর বীভৎস মূর্তি। না খেয়ে মরতে হবে, না খেয়ে মরতে হবে, এই বিকট আতংক অবিরাম ওকে উদ্‌ভ্রান্ত করে' নিয়ে বেড়ায়, একমুহূর্তের অব্যাহতি পায় না বেচারী। খাবারের অভাবের চেয়ে এই দুশ্চিন্তাতেই ও আরও মুষ্‌ড়ে পড়ে। না খেয়ে মরতে চলেছে ও। রাক্ষসের মত অনাহার মৃত্যু হাত বাড়ায় ওর দিকে, তার শ্বাসপ্রশ্বাস লাগে ওর গায়ে—ঘুম ভেঙ্গে যায়, কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়ে ও; সমস্ত শরীর ঘামে প্যাচ্‌পেচে হ'য়ে যায়; দাঁড়াতে সাহস পায় না,

যেদিকে পারে দৌড় লাগায়। কাজ ভিক্ষা করে' হেঁটে চলে ও, ক্লান্ত হ'লে বসে' পড়ে, কিন্তু চুপ করে' বসে' থাকতেও পারে না—কদর্য কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি নিয়ে এগিয়ে চলে থপাস থপাস করে'—ফ্যাল্‌ফেলে চোখে চারিদিকে চাইতে চাইতে। শহরের যে দিকেই যায় সেদিকেই ওর মত শত শত—যেদিকে যায় সেদিকেই প্রাচুর্যের প্রসাদ ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর হাত বসিয়ে রাখছে ওদের অনাহারের আঙিনায়। একরকমের কারাগার আছে, যার মধ্যে থাকে বন্দী আর বন্দীর কামনার সকল বস্তু থাকে বাইরে, আর একরকমের কারাগার আছে, যার ভেতরে থাকে প্রয়োজনীয় সকল বস্তু, আর মানুষ থাকে বাইরে।

*

পকেটে আর মোট পঁচিশটা সেণ্ট্। রুটির দোকানগুলো বন্ধ হ'বার আগে অবিক্রীত ও পচা রুটি আধা দামে বিক্রী করা হয়, এ সন্ধান জানে ইউরগিস। এখন পচা বাসি দুখানা রুটি কিনে গুঁড়িয়ে পকেট বোঝাই করে' নেয়, একসঙ্গে পেট-পূরে খায় না, মাঝে মাঝে এক এক টুকরো মুখে ফেলে, চিবোয় অনেকক্ষণ ধরে'। রুটি ছাড়া আর কিছুতেও পয়সা খরচ করে না, দু'তিন দিন পরে সেদিক হ'তেও হাত গুটোয় ও, এবার ড্যাষ্টবিন আর ছাইগাদা হাঁটকায়, এক আধ টুকরো যে-কোন রকমের খাবার পেয়ে গেলে পরম সমাদরে ছাই ঝেড়ে পকেটে রাখে, ভাবে, মরণকে অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্য রোখা গেল।

এইভাবে কয়েকদিন ঘুরে বেড়ায়, সর্বগ্রাসী ক্ষিদের চোখ দুটো জল-জল করে, দিনের পর দিন ক্রমে দুর্বল হ'য়ে পড়ে। একদিন সকালে কুৎসিত একটা অভিজ্ঞতা হ'ল; হেঁটে চলেছে দোকানের সামনে দিয়ে—একজন মালিক ডেকে ওকে চাকরী দেয়; কাজ আরম্ভ করে ও,

মালিক কিন্তু তখনই ওকে দূর করে' দেয়, কারণ গায়ে জোর নেই ওর। দাঁড়িয়ে দেখে, অন্য একটা লোক কাজটা পেলে, কাজটা করতে লাগল। বুক ভেঙ্গে যায় ওর, কোটটা নিয়ে পালিয়ে যায় ও ওখান হ'তে, কান্না পায় ছোট ছেলের মত, কোনরকমে সামলে রাখে নিজেকে। শেষ ওর ঘনিয়ে এসেছে—কোন আশাই নেই ওর! হঠাৎ হতাশা কান্না ঘুচে গিয়ে দেখা দেয় দুরন্ত রাগ। নিজের মনে খিস্তি করে খানিকক্ষণ। আচ্ছা, অন্ধকার হ'ক, তারপর ফের ঐখানে ফিরে গিয়ে বজ্জাতটাকে ও দেখিয়ে দেবে এখনও ওর মধ্যে কোন পদার্থ আছে কি নেই!

বার বার ও আপন মনে প্রতিশোধের শপথ নিয়ে চলেছে; একটা মোড় ঘোরে, সামনে শাকসব্জীর একটা দোকান, দোকানের সামনের সারটায় সাজান রয়েছে বাঁধাকপি। এক নজর দেখে নিয়েই ছোঁ মেরে একটা বড় কপি নিয়ে এক ভোঁ দৌড় লাগায় ও। হৈচৈ পড়ে' যায়, পনের বিশ জন লোক পিছু নেয় ওর। এ-গলি সে-গলি করে' বহু দূর পালিয়ে আসে কপিটাকে কোটের মধ্যে লুকিয়ে; শান্তভাবে চলে। আরও কিছুদূর গিয়ে একটু নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে বসে' যায় ও কাঁচা কপি ভক্ষণে; আধখানা খেয়ে পেট ভরে' যায়, বাকীটা ছাড়িয়ে পকেটে পুরে রাখে; পরের দিন খাওয়া হবে।

একখানা সংবাদপত্র আছে, এর চালকরা জনসাধারণকে নিয়ে মাথা ঘামায়; এরা একটা লঙ্গরখানা খুলেছে, বিনামূল্যে সুরুয়া বিলোয় অনাহারক্লিষ্টদের। কেউ বলে এতে ওদের খুব বিজ্ঞাপন হ'য়ে যায়, সেই জন্যে দেয়, কেউ বলে, না দিলে ওদের সব পাঠকই যে মরে' যাবে। উদ্দেশ্য যাই হ'ক, এক এক বাটি ভাল পুরু পুরু সুরুয়া বিলি করে ওরা সারা রাত্রি ধরে'। আর একটা বুভুক্ষুর কাছে সংবাদটা পায় ইউরঘিস। সঙ্গে সঙ্গে ও মনে মনে শপথ করে' নেয়,

রাত কাবার হবার আগে ও অন্ততঃ বার' বাটি আদায় করবেই। কার্যক্ষেত্রে পায় মাত্র এক বাটিই, কারণ লাইন অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ। রাত ফুরোয়, বিলি বন্ধ হয়, লাইনের আকার তখনও একই থাকে।

লঙ্গরখানাটা বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত, মদের দোকান, বড় বেশ্যাবাড়ী, গুণ্ডার আস্তানা এই পাড়াতেই, চেনা পড়বার সমূহ আশংকা, তবু যায় ও; এদিক হ'তে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে, সুকস্কা জেলটাকে এখন কাম্য আশ্রয় মনে হয়। এতদিন তবু আবহাওয়াটা ভাল ছিল, যেখানে পেয়েছে ঘুমিয়েছে, এখন শীতের পূর্বগামী শীতের ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির ছায়াপাত হয়েছে। একদিন স্রেফ আস্তানার জন্যই ওকে দু'বার মদ কিনতে হয়, বাকী রাত্রিটুকু কাটিয়ে দেবার জন্য "পচা বীয়ার থানায়"ও দু' সেণ্ট্ খরচ করতে হয়। দোকানটা খুলেছে একটা নিগ্রো; মদের দোকানের বাইরে খালি হ'য়ে যাওয়া যে সব পিপে পড়ে' থাকে তারই তলানি কুড়িয়ে এনে ও রাসায়নিক পদার্থ যোগে সেটাকে "পানযোগ্য" করে, দু' সেণ্টে এক গেলাস দরে বিক্রী করে আর এক পাত্র কিনলে খালি মেঝেতে শুয়ে থাকতে দেয় রাত্রি। এখানে আস্তানা গাড়ে যত 'পতিত' সমাজচ্যুত নারী পুরুষ।

যে সব সুযোগ কিছুকাল ভোগ করে' এসেছে ইউরগিস এখন সেগুলো মনে পড়ে' যাওয়ায় ও আরও কষ্ট পায়। যেমন আর পাঁচ ছ' সপ্তাহের মধ্যেই এ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে, পথে প্রাচীরে পোষ্টার পড়ে' গেছে, ইউরগিসের আজকের সাথী-স্যাঙাৎরা পর্যন্ত এ নিয়ে আলোচনা করে—দেখে শুনে দুঃখে হতাশায় বুক ফেটে যায় ইউরগিসের।

একদিন সমস্ত দিন ও খালি প্রাণটুকু ধরে' রাখবার জন্যই ভিক্ষে করে সকল ফিকির প্রয়োগে, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না; সন্ধ্যায় একটি বৃদ্ধা মহিলাকে বাস হ'তে তাঁর ছাতা ও ব্যাগ নিয়ে

নামতে ও সাহায্য করে, তিনি নামবার পর ও নিজের "ভাগ্যহীন কাহিনী" শোনায়; ভদ্রমহিলার বহু সন্দিগ্ধ প্রশ্নের জবাব দেবার পর মহিলা ওকে একটা রেস্তঁরায় নিয়ে গিয়ে পঁচিশ সেণ্টের খাবার রুটি, সব্জীর ঝোল, গরম মাংস, আলু, সীম ও কফি খাইয়ে দেন, দোকান হ'তে ও বের হয় বাতাস-পোরা বলের মত টাইটম্বুর পেট নিয়ে। বেরিয়ে রাস্তার দূর প্রান্তে বৃষ্টির মধ্যেই ও দেখতে পায় লাল বাতি জ্বলছে, বৃষ্টির মধ্যে চাপা ড্রাম বাজান'র আওয়াজ আসছে। জিজ্ঞেস না ক'রেই ও বোঝে এটা রাজনৈতিক সভা। বুক ফুলে ওঠে। সভাস্থল লক্ষ্য করে' এক দৌড় লাগায় ইউরগিস!

নির্বাচনী লড়াই এবার কিন্তু কিছুতেই জোর ধরতে চায় না, জনসাধারণ উত্তেজিত হ'তে যেন একান্তই গররাজী। সভা করলে লোক হয় না, হ'লে হৈ হল্লা করতে চায় না। শিকাগোয় এবারকার নির্বাচনী সভাগুলো চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আজকের সভার বক্তা হেঁজো-পেঁজো কেউ নয়—জাতির সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী; রাজনৈতিক ম্যানেজাররা দুর্ভাবনায় পড়ে' গেছে। কিন্তু ভাগ্য তাদের ভাল, পরম কারুণিক ঈশ্বর আজ ঝড়বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন!—আর ঘাবড়াবার কিছু নেই, কয়েকটা বাজী পুড়িয়ে ঢাকে গোটাকয়েক ঘা দিতে পারলেই হ'ল, গৃহহারা, কর্মহীন, বুভুক্ষুর দল দলে দলে এসে হাজির হবে, সভাগৃহ ঠাসাঠাসি হ'য়ে ভরে' যাবে। এতে খালি অনেক সুবিধাই যে পাওয়া যাবে তা' নয়, পরদিনের কাগজগুলো লেখবার সুযোগ পাবে—সহ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে কী অভ্যর্থনাই জানায় শহরবাসী! শ্রোতাদের স্থান সংকুলান হয়নি, আর এসব ধনী শ্রোতা নয়, মজুরীজীবী জনসাধারণ। এরা দেশ ও জগৎবাসীকে বোঝাতে চায় হয়তো যে, পদপ্রার্থীর উচ্চ বাণিজ্যনীতিতে এই সব ভাগ্যহীন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল।

বিরাট সুসজ্জিত সভাগৃহে স্থান পেয়ে যায় ইউরঘিস। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর, আজকের বক্তা বক্তৃতা দিতে ওঠেন, সে কী অবস্থা ইউরঘিসের—বক্তা ওর পূর্বপরিচিত সু-বক্তা পরিষদ স্পীয়ার স্ক্যাংক্স; ওদের "ভইল প্রজাতন্ত্রী সঙ্ঘের" সভায় এই লোকটাই বক্তৃতা করেছিল, এবং প্রধানতঃ এর বক্তৃতার জোরেই মাইক স্কুলির দোকান কর্মচারী বন্ধু নির্বাচিত হ'য়েছিল।

বক্তাকে দেখে ইউরঘিসের চোখ প্রায় সিক্ত হ'য়ে ওঠে। মনে পড়ে সেই সুসময়ের ঘণ্টাগুলি, কত কাছাকাছি তখন ও এই গৌরব-বৃক্ষের। তখন ও নির্বাচিতদেরই, দেশশাসকদেরই একজন—নির্বাচনী যুদ্ধে তখন ওর নিজেরই তাক ছিল। আজ আর একটা নির্বাচন যুদ্ধ—এবার নদীর স্রোতের মত টাকা ঢালছে প্রজাতন্ত্রীরা, অবশ্য দুর্ঘটনাটা না ঘটলে আজ ঐ টাকায় ওরও অংশ ছিল, তাহ'লে এই ভাবে কি আর ও দাঁড়িয়ে থাকত এদের মধ্যে!

সুবক্তা স্পীয়ার স্ক্যাংক্স "রক্ষণ" ব্যবস্থার মহিমা ব্যাখ্যা করছিলেন—সুকৌশলে এমন ব্যবস্থা আর হয় না; এই পদ্ধতির সাহায্যে মজুররা মালিকদের পণ্যের জন্য উচিত অপেক্ষা বেশী দাম আদায় করতে সাহায্য করে, মালিকরা লাভের সবটা নিজেদের ব্যাংকে না পাঠিয়ে কৃতজ্ঞতাবশতঃ তার একটা অংশ মজুরদের মধ্যে নাকি বেঁটে দেয়। ডান-হাতি বাঁ-হাতি এমন পদ্ধতি আর নাকি হয় না। বক্তা মনে করেন প্রাকৃতিক বিশ্ব নিয়মগুলির মত এ নিয়মও অতীব মঙ্গলদায়ক। এই জন্যই কলম্বিয়া আজ সাগর-রত্ন—তার ভবিষ্যৎ গৌরব, শক্তি ও সম্মান নির্ভর করছে নাগরিকসাধারণ কতখানি আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে এই "রক্ষণ" ব্যবস্থার রক্ষকদের সমর্থন করবেন তার ওপর। মহৈশ্বর্যপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানের নাম—"মহান আদি দল।"

এবার ব্যাণ্ড বাজতে লাগে। চমকে উঠে বসে ইউরঘিস। অদ্ভুত

মনে হ'তে পারে কিন্তু ইউরিবিস এতক্ষণ ভদ্রলোকের বক্তৃতার সারমর্ম বোঝবার চেষ্টা করছিল। বোঝবার চেষ্টা করছিল—মার্কিণ ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ, মার্কিণ বাণিজ্যের বিপুল বিস্তৃতি, প্রশান্ত মহাসাগরে, দক্ষিণ-আমেরিকায়, বা অন্য যে-কোন দেশে পদদলিত বঞ্চিতরা কাঁদছে, সেখানেই প্রোথিত হ'চ্ছে মার্কিণ সভ্যতার ভিত্তি-প্রস্তর। বোঝবার চেষ্টা করে তার একটা কারণ অবশ্য এই যে ও জেগে থাকতে চায়; জানে একটু তন্দ্রা লাগবার চেষ্টা করলেই জোর নাক ডাকবে, নাক ডাকলে বের করে' দেবে এই বৃষ্টিবাদলে ঠাণ্ডায়—তার চেয়ে কষ্টে সৃষ্টে জেগে থাকাই ভাল, এবং জেগে থাকবার প্রধান উপায় হ'চ্ছে বক্তৃতা বোঝবার চেষ্টা করা। কিন্তু পেটপুরে খাবার খেয়েছে, দেহ ক্লান্ত, সভাকক্ষ গরম, আসনটী আরামপ্রদ; বক্তার চেহারা ক্রমশঃ অস্পষ্ট ও বড় হ'তে হ'তে নাচতে থাকে, শেষে আমদানী-রফতানীর সঙ্গে মিশে যায় বক্তার চেহারা। একবার ওর পার্শ্ববর্তী লোক পাঁজরায় এক খোঁচা মারে, চমকে উঠে বসে ও, পিট পিট করে' একান্ত নির্দোষের মত চেয়ে থাকে। কিন্তু আবার কখন ঢলে পড়ে, নাক ডাকে। শ্রোতারা বিরক্ত হয়, কটমটিয়ে চায় ওর দিকে, ও ঘুমোয়, সহশ্রোতারা পুলিস ডাকে। পুলিস ওর গলা ধরে' এক ঝাঁকানিতে দাঁড় করিয়ে দেয়, হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে থাকে ও। বক্তৃতায় বাধা পড়ে; শ্রোতাদের মধ্যে কেউ বক্তাকে উৎসাহ দেয়, "আরে বলে' যাও দোস্ত, লোকটাকে বের করে' দিচ্ছি আমরা।" হাসিতে ফেটে পড়ে সভা, বক্তাও সজ্জনশোভন হাসি হাসেন, আবার বক্তৃতা আরম্ভ হয়; ইউরিবিস একটা লাথি ও গালাগালের মালা সহ বৃষ্টিতে দাঁড়ায়।

একটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ও অবস্থাটার পর্য্যালোচনা করে, জখম হয়নি, গ্রেফতার হয়নি—ওঃ, এতখানি আশা করা যায় না। নিজেকে একটু খিস্তি করে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়। তারপর মন দেয় বাস্তব

অবস্থার ওপর—আশ্রয় নেই, বৃষ্টি পড়ছে, পকেটে কপর্দক নেই। ভিক্ষেয় লেগে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

হিমশীতল জলে ভিজতে ভিজতে কাঁধ কুঁচকে এগোয় ইউরঘিস। ছাতা মাথায় সুসজ্জিতা এক মহিলা ওদিকে এগিয়ে আসেন। যথারীতি মহিলার পাশে গিয়ে ইউরঘিস বলতে লাগে, "দেখুন, দয়া করে আমার রাত্রির জন্য বাসাভাড়াটুকু দেবেন! আমি গরীব মজুর—"

মহিলা ফিরে তাকাতেই ওর কথা বন্ধ হ'য়ে যায়, এ যে ওর পরিচিত। ওরই বিয়ের দিন এই মেয়েটী সুন্দরীর ভূমিকা নিয়েছিল, সত্যিই সুন্দরী মেয়েটী; র‍্যাকৃৎসিয়সের সঙ্গে কী নাচটাই নেচেছিল। বিয়ের পর ইউরঘিস ওকে আর দু' একবার মাত্র দেখেছিল কিন্তু ভোলেনি, শুনেছিল র‍্যাকৃৎসিয়স আর একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে অ্যালেনাকে ছেড়ে গেছে, তার পর প্যাকিংশহর ছেড়ে অ্যালেনা কোথায় যে পালায় কেউ জানত না। আর তার সঙ্গে দেখা আজ এখানে!

অ্যালেনাও চিনতে পেরেছিল, সবিস্ময়ে বলে, "কে, ইউরঘিস রুদকস! এ কি দশা তোমার?"

ইউরঘিসের কথা বেধে যায়, বলে, "আমি—আমার বড় দুর্দিন পড়েছে অ্যালেনা। কিন্তু তুমি—তুমি—কি বিয়ে করেছ?"

"না, বিয়ে করিনি। আছি এক জায়গায়।"

কিছুক্ষণ নির্বাক হ'য়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে ওরা। শেষে অ্যালেনা বলে, "পারলে তোমায় আমি সাহায্য করতাম, ইউরঘিস, সত্যি বলছি সাহায্য করতাম, টাকা নিয়ে বের হইনি, সঙ্গে একটা সেণ্ট্‌ও নেই। তার চেয়ে আর একটা উপকার করতে পারি তোমার—কী ভাবে সাহায্য পাবে বলে দিতে পারি। মেয়ারিজা কোথায় আছে বলতে পারি।"

ইউরঘিস চমকে ওঠে, কথা বেধে যায়, বলে, "মেয়ারিজা!"

"হ্যাঁ। সে তোমায় সাহায্য করবে। সেও আছে এক জায়গায়, ভালই ব্যবসা চলছে তার, তোমায় দেখে খুশী হবে।"

মাত্র এক বৎসর আগে ইউরঘিস প্যাকিংশহর হ'তে পালিয়েছিল, পালাবার সময় মনে হ'য়েছিল জেল হ'তে পালাচ্ছে যেন; অব্যাহতি পাবার জন্য পালিয়েছিল এই মেয়ারিজা ও এলজ্‌বিয়েটার কাছ হ'তেই। আজ কিন্তু এদের নাম শুনেই ওর সমস্ত সত্ত্বা আনন্দে নেচে ওঠে। তাদের দেখতে চায় ও, বাড়ী যেতে চায় ইউরঘিস। তারা ওকে সাহায্য করবে, ওর ব্যথা বুঝবে তারাই। এক পলকে অবস্থাটা ও একবার তলিয়ে নেয়। পালাবার ভাল অজুহাতই ছিল ওর—পুত্রের মৃত্যুতে শোকাকুল হ'য়ে পালাবে না মানুষ? না ফেরবারও ভাল কারণ আছে —ওরা প্যাকিংশহর ছেড়ে পালিয়েছিল, কোথায় খুঁজে পাবে ও ওদের। বলে, "ঠিক আছে, যাব আমি।"

অ্যালেনা ওকে ক্লার্ক স্ট্রীটের একটা ঠিকানা দেয়; বলে, "আমার ঠিকানা দেবার আর দরকার নেই, মেয়ারিজা জানে।" আর কথা না বাড়িয়ে ইউরঘিস পা বাড়ায়।

উক্ত ঠিকানায় মেলে বিরাট পাথরের একটা বাড়ী, বাড়ীর সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ। সদর দরজায় ঘণ্টার বোতাম টেপে ইউরঘিস।

দরজাটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে' উঁকি মারে রঙীন (অর্থাৎ নিগ্রো) একটা মেয়ে, ওর রূপ দেখে মেয়েটার সন্দেহ হয়, জিজ্ঞাসা করে, "কী চাও?"

"মেয়ারিজা বার্কৎ সাইনস্কাস কি এখানে থাকে?"

"কে জানে! কী দরকার তোমার তার সঙ্গে?"

"তার সঙ্গে দেখা করতে চাই—সে আমার আত্মীয়া।"

মেয়েটা একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে। তারপর দরজা খুলে দেয়।

ইউরখিস হলঘরখানায় দাঁড়ায়। মেয়েটা বলে, "দেখছি গিয়ে। কী নাম তোমার ?"

"বল গিয়ে ইউরখিস এসেছে।"

মেয়েটা চলে যায়। মিনিট দুই পর ফিরে এসে বলে, "ও নামের কেউ এখানে থাকে না।"

বড্ড দমে যায় ইউরখিস। বলে, "আমায় যে বললে সে এখানে থাকে।"

বিষাদে ভেঙে পড়ে ও, নিরুপায়ভাবে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করে। আবার দরজায় ঘণ্টা বাজে, মেয়েটা দরজা খোলে; ভারী পায়ের শব্দ শোনে ইউরখিস। হঠাৎ মেয়েটা চীৎকার করে' পিছিয়ে আসে। ইউরখিসের দিকে তাকিয়ে দৌড়তে সুরু করে ওপরের দিকে, দৌড়য় আর বুক ফাটিয়ে চেঁচায়,—"পুলিস! পুলিস জাতিকল!"

বিমূঢ়ের মত একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে ইউরখিস, হঠাৎ নজর পড়ে নীলউর্দিরা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। কালবিলম্ব না করে' দৌড় লাগায় ও নিগ্রো মেয়েটার পিছু পিছু। নিগ্রো মেয়েটার চীৎকারেই ওপরে ভয়, ছুটোছুটি, কান্না ও বিভ্রান্ত চীৎকারের সোরগোল লেগে গেছে তখন। আছে পুরুষ নারী দুই-ই—নারীরা যা পেয়েছে তাই জড়িয়ে ছুটোছুটি করছে, পুরুষরা পোষাক পরিধান পদ্ধতির সর্ব অবস্থার নিদর্শন হ'য়ে লাফালাফি করছে। ইউরখিস গিয়ে দাঁড়ায় এদের মধ্যে, ওখান হ'তে নজর পড়ে একখানা বড় ঘরে—ঘরের ভেতর রেশমী কাপড় ঢাকা চেয়ার, সোফা, থালা গেলাস ছড়ান টেবিল। মেঝের সর্বত্র তাস ছড়ান, একটা টেবিল উল্টে গেছে, তার ওপরের বোতল গেলাস ছড়িয়ে গেছে মেঝের 'পর, বোতল হ'তে গড়িয়ে পড়া মদে কার্পেট ভিজে গেছে, মেঝের একপাশে একটা মেয়ে মূর্চ্ছা

গেছে, দুটো লোক তার চেতনা ফেরাবার চেষ্টা করছে, আর ডজন খানেক লোক পালাবার চেষ্টায় দরজার কাছে ভীড় করছে।

দোতলার সিঁড়ির মুখের দোরে ধাক্কা পড়ে, ধাক্কার শব্দে গম গম করে' ওঠে হলঘরটা, মিশ্রিত নারী-পুরুষের এই জনতা আবার লাফালাফি সুরু করে' দেয়। তেতলা হ'তে গাঁট্টাগোঁট্টা একটা মেয়ে নেমে আসে—ঠোঁট গাল চোখ রাঙান, কানে হীরের দুল। এ সব দিকে তার নিজের লক্ষ্য নেই। হুকুম করে, "পিছনের দিকে। তাড়াতাড়ি!" বলে' নিজেই পথ দেখিয়ে দৌড়য় পিছনের দিকে; তার পিছু পিছু অন্যান্যের সঙ্গে ইউরঘিসও ছোটে। রান্নাঘরে পৌঁছে একটা আলমারীর চাবি টেপে মেয়েটা, একটা গোপন দোর খুলে যায়; হুকুম করে মেয়েটা, "চলে' যাও ভেতরে"। তখন এদের সংখ্যা বিশ-ত্রিশ জন। অন্যের সঙ্গে ইউরঘিসও সেই সংকীর্ণ দোরপথে ঢুকে পড়ে, কিন্তু আগে যারা ঢুকেছিল, ও মাথা হ'তে তারা খবর দেয়, "এদিকেও পুলিস—ফাঁদে পড়েছি আমরা!"

দমে না মেয়েটা, হুকুম ছাড়ে, "ওপর তলায়।" আবার সুরু হয় পুরুষ-নারীর ঠেলাঠেলি, সকলেই সকলের আগে পালাতে চায়। একতলা, দোতলা, তেতলা, তারপরই ছাদে ওঠবার একটা মই। মই-এর নীচে সন্ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত একটা জনতা, মই-এর মাথায় ছাদের ওপর একটা লোক গোপন দোরটা টেনে তোলবার জন্য টানাটানি লাগিয়েছে। দোর কিন্তু নড়ে না। মেয়েরা নীচে হ'তে উপদেশ ছোড়ে, "আঁকশিটা টেনে তোল আগে।" উত্তর আসে, "নীচে কে ধরে' আছে যেন।"

তবে উপায়? নীচের তলা হ'তে উপায় বাৎলে দেয়, "খুশী হ'লে পালাতে পার তোমরা, পুরুষরা। সত্যিকারের কাজ করতে এই আমরা এবার।"

উত্তেজনা কমে' যায়, যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিস দল ফৌজীকায়দায় সার বেঁধে উঠে আসে। পুরুষগুলো ভয়ে জুল জুল করে' চায়। মেয়েগুলো বে-পরোয়া ধিঙ্গিপনা শুরু করে, ভাবখানা—কিছুই হয়নি বা ফূর্তিরই একটা কিছু হচ্ছে। একটা মেয়ে সিঁড়িলাগান বারান্দায় বসে' চটি-পরা পা দুটি নাড়ে ঠুক ঠুক করে', পুলিস দল উঠে আসে আর চটি লাগে হেলমেটের মাথায়। একটা পুলিস ওর গোড়ালি ধরে' হেঁচকা টানে নামিয়ে দেয়, মেয়েটা হাসে—খুব মজা হ'ল যেন একটা। আসলে ওরা ক্যাকাসে মেরেছে কিনা বোঝবার উপায় নেই, বুঝতে হ'লে ক' পোঁচ রঙ তুলতে হবে কে জানে! তাচ্ছিল্যভরে পুলিস চায় পুরুষগুলোর দিকে। হল্ ঘরে চারটে মেয়ে বাক্সের ওপর বসে' আমোদ করে, কথায় কথায় হেসে ফেটে পড়ে যেন ওরা, পুলিসদলের বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়ে রসিকতা করে; এদের মধ্যে লাল কিমোনো পরা একটা মেয়ের আওয়াজ—কি কথা, কি রসিকতা কি হাসি—সব কিছুতেই ছাড়িয়ে যায় অন্য সকল শব্দ। সকলের মত ইউরঘিসেরও চোখ পড়ে তার দিকে, মেয়ারিজা! বলে ওঠে ও, "মেয়ারিজা!"

এত পরিচিত কণ্ঠস্বর! মেয়ারিজাও ফিরে চায় ওর দিকে। দেখে সংকোচে এতটুকু হ'য়ে যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে তড়াক্ করে' লাফিয়ে উঠে বলে, "ইউরঘিস!"

"তোমায় দেখতে এসেছিলাম, মেয়ারিজা।"

"কখন?"

"এইমাত্র।"

"কী করে' জানলে তুমি—কে বলল তোমায় আমি এখানে আছি?"

"অ্যালেনা। পথে তার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

বলবার কথা পায় না ওরা, নিঃশব্দে চেয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। অন্যান্য সকলেও ওদের দিকে চেয়ে আছে দেখে মেয়ারিজা ওর কাছে উঠে আসে। ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে, "আর তুমি? এখানেই থাক বুঝি তুমি?"

"হ্যাঁ এখানেই থাকি।"

নীচে হ'তে হাঁক আসে, "মেয়েরা, পোষাক পরে' নাও। এখনই। দেরী করলে সময় পাবে না, কষ্ট হবে তোমাদেরই। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।"

কে যেন কাঁপে, দাঁত ঠক্ ঠক্ করে। মেয়েরা হলের পাশের ঘরগুলোয় ঢুকে যায়।

"এস", বলে' মেয়ারিজা ইউরঘিসকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। ছোট ঘর, লম্বায় আট ফুট, চওড়ায় ছয় বা ঐ রকম। একখানা লোহার খাটিয়া, একখানা চেয়ার, একটা সজ্জাটেবিল আর দোরের পিছনে ঝোলান কিছু পোষাক। মেঝেয় বিশৃঙ্খলভাবে জামাকাপড় টুপি ডিস খাবার গেলাস রুজ রঙ সেণ্ট প্রভৃতি ছড়ান, চেয়ারের ওপর একপাটি চটি একটা ঘড়ি আর হুইস্কির বোতল গেলাস। নয়-ছয় হ'য়ে আছে ঘরখানা।

কিমোনোটা আর মোজা ছাড়া মেয়ারিজার পরনে আর কিছুই নেই; ইউরঘিসের সামনেই ও পোষাক পরতে লাগে, দোরটাও বন্ধ করে না। এতক্ষণে ইউরঘিস বুঝে নিয়েছে কোথায় এসেছে, ঘর ছাড়বার পর এ দুনিয়ায় দেখেছে ও অনেক কিছু, শীঘ্র আর কিছুতে বিস্মিত হবার অবস্থা ওর নেই, তবু—তবু মেয়ারিজাকে এইভাবে পোষাক পরতে দেখে একটু চমকে যায় ও। ঘরে ওরা চিরকাল শিষ্ট সভ্য ছিল; এখন ভাবছিল, আগের কথা মনে ক'রেও মেয়ারিজা এটা না করলেই পারত। ভাবতে ভাবতে নিজেকেই ও নিজে উপহাস

করে মনে মনে—গর্দভ আজ বটে তো ও! সভ্য শিষ্ট! নিজে কি ও আজ, শিষ্টতার ভাণ! ভব্যতার ভাঁড়ামো!

"কতদিন আছ এখানে?" জিজ্ঞাসা করে ইউরঘিস।

"প্রায় এক বৎসর।"

"কীভাবে এলে?"

"বাঁচতে হবে তো," জবাব দেয় মেয়ারিজা। "তাছাড়া ছেলেদের চোখের সামনে ঠায় উপোস করা দেখতে পারছিলাম না।"

নির্বাক হ'য়ে ইউরঘিস ওর পোষাক পরা দেখে। শেষে বলে, "কাজ ছুটে গিয়েছিল বুঝি তোমার?"

"রোগে পড়েছিলাম; তারপর টাকা ছিল না হাতে। তারপর স্ত্যানিসলোবাস মারা গেল—"

"স্ত্যানিসলোবাস মারা গেল!?"

"হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম তোমায়!" শান্তভাবে বলে মেয়ারিজা, "তুমি তো এসব জান না।"

"কী ভাবে মরল সে?"

"ইঁদুরে খেয়ে ফেললে।"

হতভম্ব হ'য়ে যায় ইউরঘিস, "ইঁদুরে!"

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে মেয়ারিজা বলে, "হ্যাঁ। একটা তেলের কারখানায় কাজ করত—ওরা ওকে দিয়ে বয়াতো মদ। ভাঁড়ের দুদিকে টিন ঝুলিয়ে নিয়ে যেত ও। যাবার আগে প্রত্যেক টিন হ'তেই এক চুমুক করে' খেয়ে নিত। একদিন একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিল, নেশার ঘোরে গুদাম ঘরের এক কোণে গুটালি পাকিয়ে পড়ে থাকে। কারখানা বন্ধ হ'য়ে যায়। সকালে দোর খুলে দেখা যায়, ইঁদুরে ওর প্রায় সবটাই খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলেছে।"

আতংকে জমে যাবার অবস্থা হয় ইউরঘিসের। মেয়ারিজা ফিতেই

বাঁধে জুতোর। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। হঠাৎ একটা পুলিস ঘোরের কাছে এসে হাঁক ছাড়ে, "এই, তাড়াতাড়ি কর।"

"হ্যাঁ, যত শীগ্‌গির পারি," বলে' মেয়ারিজা দ্রুত হাতে বেঁধে চলে ওর স্তনবন্ধনী।

"বাকী সব বেঁচে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আছে কোথায় তারা"। জানতে চায় ইউরঘিস।

"এখান হ'তে বেশী দূর নয় জায়গা। ভাল আছে সব।"

ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে, "কাজ করছে সকলে?"

"পেলে এল্‌জ্‌বিয়েটা করে, আমিই বেশীর ভাগ তাদের দেখাশোনা করি—আজকাল রোজগার করি আমি ভালই।"

ইউরঘিসের হাড় সিরসির করে' ওঠে; চুপ মেরে যায় ক্ষণিকের জন্য। আবার জিজ্ঞাসা করে, "তুমি এখানে আছ তা জানে ওরা? কী ভাবে থাক, জানে?"

"এল্‌জ্‌বিয়েটা জানে। তার কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারি নি। ছেলেরাও এতদিনে বুঝে গেছে নিশ্চয়। তবে লজ্জা পাবার তো কিছু নেই—এ ছাড়া উপায় কি আমাদের?"

তবু ইউরঘিস জানতে চায় "ট্যামস্তসিয়স? সে জানে?"

"কি জানি।" কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মেয়ারিজা বলে দেয়, "কী ভাবে জানব। গত এক বছর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ওর আঙুলের ক্ষত বিষিয়ে আঙুল কাটা যায়, তখন হ'তে আর ও বেহালা বাজাতে পারত না। তার পর কোথায় চলে' গেছে।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোষাকের সামনেটার বোতাম আঁটছিল মেয়ারিজা; ইউরঘিস চেয়ে ছিল ওর দিকে। বিশ্বাস করতে পারছিল না ও যে এক বৎসর আগে দেখা সেই মেয়ারিজা আর এই মেয়ে একই

মানুষ। আজ ও এত কম কথা কয়—কঠোরতার একটা আবরণ ছেয়ে আছে একে। এর দিকে চেয়ে থাকতেও যেন ভয় করে ইউরঘিসের।

এক নজর ইউরঘিসের দিকে তাকিয়ে মেয়ারিজা বলে, "তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার দুঃসময় যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, বড় দুঃসময় যাচ্ছে। পকেটে একটা সেণ্ট্ পর্যন্ত নেই, কাজও নেই।"

"কোথায় ছিলে এতদিন?"

"সর্বত্র। দিনকতক ভবঘুরে হ'য়ে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর কারখানার কাজে লাগলাম—ঠিক ধর্মঘটের আগে," ইতস্ততঃ কথা ও থেমে যায়। কথা ঘুরিয়ে বলে, "তোমার কথা জিজ্ঞেস করলাম। দেখলাম তোমরা চলে' গেছ, কোথা গেছ কেউ জানে না। ভেবেছিলে নিশ্চয়, তোমাদের সঙ্গে ফাঁকিবাজি করে' চলে গিয়েছিলাম, তাই না মেয়ারিজা?"

"না। আমি তোমায় দোষ দিই না। আমাদের কেউ তোমায় দোষী করেনি। যথেষ্ট করেছিলে তুমি। আমাদের পক্ষে সে কাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন।" এক মিনিট থেমে আবার বলে, "তখন বড় বোকা; বড় অজ্ঞ ছিলাম আমরা, মুশ্‌কিলটা হয়েছিল ওখানেই। কোন কিছুরই সুযোগ নিতে পারিনি। আজ যা জানি তখন এটুকু জানলে, আমরা জিততাম।"

"এখানে আসতে তুমি?"

"হ্যাঁ," উত্তর দেয় মেয়ারিজা, "কিন্তু আমি বলছি তোমার কথা।—তা হ'লে তুমি ওনার ব্যাপারটা নিয়ে সম্পূর্ণ অন্যভাবে চলতে।"

ইউরঘিস চুপ করে' থাকে। ওনার ব্যাপারটা নিয়ে এভাবে কখনও চিন্তা করেনি।

মেয়ারিজা বলে' চলে, "পেট অচল হ'লে মানুষের যা কিছু বেচবার মত থাকে তাই বেচে ফেলা উচিত—আমি তো তাই বলি। আজ বড় বেশী বিলম্ব হ'য়ে গেছে, তবু আশা করি তুমি এখন এটা বোঝ। প্রথম প্রথম ওনা আমাদের সকলের ভরণপোষণ চালাতে পারত," মেয়ারিজার কণ্ঠস্বরে ভাবপ্রবণতা বা বাহাদুরী প্রকাশের নির্লজ্জতা নেই, অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলে' চলে ও।

"আমি—হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়", ইতস্ততঃ করে' ইউরঘিস জানায়, চেপে যায় যে দ্বিতীয় বার ফিল কোনরকে ঠ্যাঙাবার আনন্দের বিনিময়ে ও তিনশো ডলার ও প্রধানের চাকরী ছেড়েছে।

ঠিক এই সময় পুলিস আসে দোরের কাছে, "এস, এবার।...খুব জমেছে!"

"ঠিক আছে।" পালখগোঁজা টুপিটা হাতে নিয়ে মেয়ারিজা হল-ঘরের দিকে পা বাড়ায়, ইউরঘিস ওর পিছু পিছু চলে; পুলিস খাটের তলা, দোরের পিছন প্রভৃতি দেখে নেয়। যেতে যে 5 ইউরঘিস জিজ্ঞাসা করে, "কী হবে এবার?"

"এই হামলার কথা বলছ? ও কিছুই না—এ আমাদের প্রায়ই হয়। বাড়ীউলীদের সঙ্গে পুলিসের সময়ের একটা রফা আছে; এর সব কিছু আমি জানি না। সকাল হবার আগে আজও রফা হয়ে যাবে। সে যা হবে হ'ক, তোমার কোন ভয় নেই। পুরুষদের এরা কখন কিছু বলে না।"

"হ'তে পারে," সায় দেয় ইউরঘিস, "কিন্তু আমায় ওরা ছাড়বে না।"

"মানে?"

"আমার নামে হুলিয়া আছে। ধরতে পারলে বছর দুয়েক মেয়াদ দিয়ে দেবে।" লিথুয়ানীয়তে বললেও খুব চাপা গলায় জানায় ইউরঘিস।

বন্দীরা নীচের হল্‌ঘরে দাঁড়িয়েছিল, বিরাটকায়া হীরের ফুল-ওয়ালী দাঁড়িয়েছিল সকলের মধ্যে; মেয়ারিজা তারই কানে কানে কী বলে। ফুল-ওয়ালী হামলার ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্টকে বলে, "ওহে ভাই, এই লোকটা তার বোনকে দেখতে এসেছিল, তোমরা আসবার এক মিনিট আগে এসেছিল। ভিখিরী ধরছ নাকি তোমরা?"

অমায়িকভাবে হেসে সার্জেণ্ট বলে, "কিন্তু চাকরবাকর ছাড়া আর সকলকেই নিয়ে যাবার হুকুম।"

অন্য বন্দীদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ইউরঘিস, বাঘের সামনে মেড়ার মত ঘাড় ঝুঁকিয়ে ধুঁকছে সব। বুড়ো, বাচ্ছা, কলেজের ছেলে আর তাদের ঠাকুর্দা হ'তে পারে এমন পলিতকেশ বৃদ্ধ—সবই আছে। কেউ কেউ সান্ধ্যপোষাকপরিহিত, পোষাক যার যাই হ'ক, এক ইউরঘিস বাদে কারও দেহে দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই।

সকলে এসে গেলে দোর খোলা হয়। সামনে পুলিস গাড়ী। আসে-পাশের বাড়ী হ'তে কৌতূহলী উৎসুক অধিবাসীরা হুজুগের গন্ধ পেয়ে সম্ভবমত ঘাড় বাড়িয়ে দেখছে, মন্তব্য ছুঁড়ছে। বন্দিনীরা জোর হাসি হেসে জবাব দিচ্ছে, পুরুষরা বুকের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে মুখের ওপর টুপি টেনে দাঁড়িয়ে আছে। বাসে ওঠার মত করে' ওরা ঠাসাঠাসি করে' গাড়ীতে ঢোকে। থানায় ইউরঘিস একটা অন্য নাম দেয়। আরও জন ছয়ের সঙ্গে ওকে একটা অন্ধ কুঠরীতে পোরা হয়। অন্যরা ফিস্‌ফাস করে' গল্পসল্প করে; আর ইউরঘিস এক কোণে একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজের চিন্তাসাগরে ডুব দেয়।

কয়লার খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত এই সমাজের বহু শাখা-প্রশাখাসমন্বিত পাপ অপরাধ ও দুর্নীতির সুড়ঙ্গগুলো দেখেছে ইউরঘিস। মানুষকে সে কদর্য বীভৎস জঘন্য ধরে' নিয়েছে, কিন্তু কী ভাবে যেন মনুষ্যজাতির জঘন্যতা হ'তে নিজের প্রিয় পরিবারটিকে

বাদ দিয়ে রেখেছিল ও। আজকের এই আবিষ্কার—মেয়ারিজা একটা বেশ্যা, তার দেহবিক্রয়ের পয়সায় এলজ বিয়েটা ও তার সন্তানরা জীবনধারণ করছে, এই আবিষ্কারের বিভীষিকাকে ও সহজ করে' নিতে পারে না। নিজের সঙ্গে তর্ক করে, যুক্তিবিচার করে, প্রবোধ পেতে চায় ও। নিজে বেশ্যাবৃত্তির চেয়ে অনেক বেশী হীনতায় নেমেছে, তবু এই আঘাতটা ও ভুলতে পারে না, দুঃখের হাত হ'তে অব্যাহতি পায় না, মনটা বার বার এতটুকু হ'য়ে যায়। ওর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ নাড়া খেয়েছে, বহুদিনের স্মৃতি, যেগুলি মরে' শেষ হ'য়ে গেছে ভেবেছিল, তারা আজ আবার জেগে ওঠে, ভূমিকম্পের মত কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর সামাজিক সত্তা! পুরাতন জীবনের স্মৃতি—পুরাতন আশা, পুরাতন আকাঙ্ক্ষা, শিষ্ট সমাজ-জীবন ও মুক্তির ওর পুরাতন স্বপ্ন!—মরেনি তো এরা, ঘুমিয়ে পড়েছিল। আবার ওনাকে দেখতে পায়, শান্তস্বরে ওনা মিনতি করছে। দেখতে পায় শিশু অ্যান্টেনাসকে—তাকে ও মানুষ করে' তুলতে চেয়েছিল! ওর কম্পিতদেহ বুড়ো বাপকে দেখতে পায়—তার অতুল ভালবাসা নিয়ে সংসারের সকলকে বুড়ো আশীর্বাদ করছে। ওনার কলংকের দিনটা আবার সজীব হ'য়ে ফিরে আসে, উঃ কি যন্ত্রণাই না ভোগ করেছিল ইউরঘিস! আচ্ছা পাগল ছিল ও সেদিন! ব্যাপারটাকে কত ভয়াবহ মনে হ'য়েছিল সেদিন; আর আজ মেয়ারিজা বললে, ও শুনল, আধাআধি মেনেও নিলে—সেদিন ও বোকামি করেছিল! হাঁ—তাই-তো বলল মেয়ারিজা—স্ত্রীর ইজ্জৎ বেচে জীবিকা চালাতে! ঘুরিয়ে বলেনি, সোজাসুজিই বলেছে। এরই ফাঁকে ষ্ট্যানিসলোবাসের ভয়াবহ ভাগ্যটা মনে পড়ে—অথচ কত শান্ত, বে-পরোয়া ভাবে মেয়ারিজা বলে' গেল ব্যাপারটা। বরফে ছেলেটার তিনটে আঙুল জমে গিয়েছিল, সেই হ'তে কী ভয়ই করত সে বরফকে—এই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে

ইউরঘিস যেন তার কান্না শুনতে পায়—এত স্পষ্ট এত সত্য হ'য়ে ওঠে ও কান্না—ঘামতে থাকে ইউরঘিস। চোখের সামনে যেন দেখতে পায় হাজার হাজার ইঁদুর ছেলেটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে আর ছেলেটা প্রাণভয়ে লড়ছে সেই পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘরে—আতঙ্কে থর থর করে' কেঁপে ওঠে ইউরঘিস।

এসব কোমল চিন্তা আজ ওর কাছে অপরিচিত নবাগত; এসব নিয়ে মাথা ঘামান ছেড়ে দিয়েছিল ও বহুদিন আগে, ভেবেছিল অব্যাহতি পেয়ে গেছে ও সব দুর্বলতার কবল হ'তে। আজ তারা আবার ফিরে আসে। কিন্তু এসব চিন্তা দিয়ে কী লাভ? চতুর্দিক হ'তে বন্দী অসহায় ইউরঘিসের—এসব চিন্তা দিয়ে কার উপকার করতে পারে ও? কেন ছেড়ে দিলে নিজেকে এ যন্ত্রণার মধ্যে। এই তো সেদিনও ভাবপ্রবণতার সঙ্গে লড়েছে ও, কাছাকাছি আসতে দেয় নি। আর আজ? ঠিক আছে, আর কখন মনে এ দুর্বলতা আসতে দেবে না, অবশ্য অসতর্ক মুহূর্তে এরা যদি ওকে ধরে অভিভূত করে' ফেলে তা হ'লে কী আর করবে ও। ওর অন্তরের পুরাতন আলাপ আবার শোনে ও, পুরাতন অস্তিত্ব হাতছানি দিয়ে ডাকে ওকে, বাহু বাড়ায় আলিঙ্গনের জন্য। তবু আজ কত দূরে, সে অস্তিত্ব আজ ছায়াময়—এক হবার আর উপায় নেই, মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে অতল অন্ধ গহ্বর। আজ এত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, আবার কালই তো তারা মিলিয়ে যাবে কুয়াসার অপছায়াতে। অন্তরের বাণী মরে যাবে, আজই শুনল, আর কখন তো শুনতে পাবে না—এই ভাবেই ওর মনুষ্যত্বের শেষ শিখা চরমভাবে নিবে যাবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

সকালে জলখাবারের পর ওদের আদালতে নিয়ে যায়। আদালত লোকে লোকারণ্য—বন্দী, কৌতুহলী আর আশাবাদী—অর্থাৎ ম্যাহাজানের যদি সাক্ষাৎ পেয়ে যায় এখানে! বেশ্যালয়ের পুরুষগুলোর মামলা ওঠে আগে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের খালাস দিয়ে দেয়, কিন্তু সভয়ে লক্ষ্য করে ইউরঘিস, ওদের সঙ্গে ওর মামলা ওঠে না, ওর চেহারাটাই নাকি সন্দেহজনক, ওর মামলাটা তো সন্দেহজনক বটেই। এই আদালতেই ওর শাস্তি "স্থগিত" রা[illegible] হয়েছিল। সেই ম্যাজিষ্ট্রেট্, সেই পেস্কার। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পেস্কারটা ওর দিকে চেয়ে থাকে—তার যেন চেনা-চেনা মনে হয়, ম্যাজি[illegible]ট্রেটের ও সব কিছু মনে হয় না, সে তখন টেলিফোন বার্তার কথা [illegible]বছে—টেলিফোনটা আসবে কোন পুলিস কর্তার বন্ধুর কাছ হ'তে—বক্তব্য "পোলী" সিম্পসনের বিচারটা কীভাবে করতে হ'বে। উক্ত ভাবনার মধ্যেই শুনে নেয়, ইউরঘিস ওখানে গিয়েছিল তার বোনকে খুঁজতে; শুষ্কভাবে উপদেশ দেয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ "এর চেয়ে ভাল জায়গায় রেখ বোনকে", বলে' ইউরঘিসকে খালাস দিয়ে দেয়। মেয়েগুলোকে পাইকারীভাবে পাঁচ ডলার করে' জরিমানা ক'রে, বাড়ীউলী হিসেব মাফিক ডলারের নোট বের করে' দেয় মোজার ভেতর হ'তে।

ইউরঘিস বাইরে অপেক্ষা করে; মেয়ারিজা বের হ'লে দু'জনে মেয়ারিজাদের আড্ডার দিকে হেঁটে চলে। ঐ দুপুরেই কয়েকজন খরিদ্দার এসে গেছেন; সন্ধ্যায় বাড়ীটার ব্যবসা আবার পুরোদমে জমে' উঠবে, যেন কিছুই হয়নি। তা হ'ক, মেয়ারিজা ইউরঘিসকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প করতে বসে। দিনের আলোয় লক্ষ্য করে

ইউরষিস, মেয়ারিজার গালে আগেকার স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক রঙ আর নেই, গায়ের রঙ শুকনো-চামড়ার মত হলদে মেরে গেছে, আর চোখের কোলে দাগ।

জিজ্ঞেস করে ইউরষিস, "অসুখ করেছিল নাকি?"

"অসুখ?..." বলে' বিশ্রী একটা শব্দ উচ্চারণ করে মেয়ারিজা। গাট্টাগোট্টা বহু খিস্তি আজকাল ও চমৎকার রপ্ত ক'রে ফেলেছে। "এই জীবন! অসুখ ছাড়া কি ভাল থাকা যায়!" বলে' বিষণ্ণভাবে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। একটুক্ষণ পরে বলে, "মরফিনের ফল। এখন রোজই মনে হয়, আরও বেশী চাই, আরও বেশী।"

"কিসে লাগে ও জিনিস?"

"এ কাজের এই রীত, কেন আমি জানি না। মরফিন না হ'লে মদ। নেশা না করলে মেয়েরা এ সব এক পল সহ্য করতে পারে না। প্রথম এলে বাড়ীউলীরা একটা-না-একটা নেশা দেবেই, মেয়েরাও নেশার ভক্ত হ'য়ে ওঠে; নেশা না করলে মাথা ধরে, বা অমনি কে যন্ত্রণা ভুগতে হয়; অভ্যেস হ'তে কতদিন লাগে? আমারও অভ্যেস হ'য়ে গেছে; ছাড়বার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এখানে থাকলে কস্মিনকালেও ছাড়তে পারব না।"

"কতদিন থাকবে এখানে ভাবছ?" জিজ্ঞাসা করে ইউরষিস।

"কি জানি, হয়তো চিরকাল। এ ছাড়া কী করব আর?"

"টাকাকড়ি কিছু জমাও না?"

হেসে ওঠে মেয়ারিজা, "জমাব! কোথায়! এক পয়সা জমে না। মনে হয়, প্রচুর পাই আমি, কিন্তু সবই চলে' যায়। আমি পাই রোজগারের অর্ধেক—খদ্দেরপিছু আড়াই ডলার, এক এক রাত্রে পঁচিশ হ'তে ত্রিশ ডলার পর্যন্ত রোজগার হয়—ভাবছ অনেক জমাতে পারি! কিন্তু থাকবার খরচ, খাবার খরচা সবই দিতে হয় আমাকে, আর এ সব

খরচার হার কি! তারপর কালতু খরচা, মদের দাম, এমনি আরও কত কি, আমি জানিও না, বুঝিও না; ওরা দাবী করে' কেটে নেয়। সপ্তাহে আমার ধোবী খরচ কত জান—কুড়ি ডলার। তবু করবার কিছু নেই। হয় এ সব অত্যাচার সইতে হবে, নয় এ জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে। অন্য যেখানে যাব সেখানেই এই। বাঁচাবার মধ্যে বাঁচাই সপ্তাহে পনের ডলার, এইটে এল্‌জ্‌বিয়েটাকে দিই; এইটুকু দিতে পারি বলে' ছেলেরা স্কুলে যেতে পারছে।" বলতে বলতে থেমে যায় মেয়ারিজা, বিষণ্ণভাবে কী যেন ভাবে; তখনই আবার খেয়াল হয়, ইউরখিস মন দিয়ে ওর কথা শুনছে, তাই ফের ও বলতে লাগে, "এই-ভাবে এরা মেয়েদের রাখে; মেয়েরা চাইলেই ধার দেয়, ধার জমে গেলে আর পালাতে পারে না তারা। বিদেশ হ'তে হয়তো কোন তরুণী এল, ইংরেজীর একটা শব্দও জানে না, দালাল তাকে এনে তুললে এমনি কোন জায়গায়; ব্যবসায়ে নামতে বাধ্য করা হ'ল তাকে; তবু কিছুদিন পরে হয়তো সে চলে' যেতে চায়—বাড়ীউলী তখন হিসেবের খাতা দেখিয়ে দেয়, মেয়েটার এদের কাছে দুশো ডলার জমে' আছে, সেটা শুধে তবে অন্য কথা! বলে' তাকে উলঙ্গ করে' তার পোষাক-আশাক ছিনিয়ে নেয়, ভয় দেখায়—কথামত না চললে ধারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়ে দেবে। কাজেই মেয়েটাকে থেকে যেতে হয়, যতদিন থাকে ততই ধার বাড়ে। আবার অন্য কাজের লোভ দেখিয়ে অনেক মেয়েকে এখানে এনে পোরা হয়। আদালতে আমার পাশে যে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল, দেখেছ? সেই যে, সোনালী চুল!"

"হ্যাঁ। কী হ'ল তার?"

"মেয়েটা ফরাসী। এক বছর আগে আমেরিকায় আসে। দেশে দোকানের কেরাণী ছিল, এখানে কারখানায় বেশী মাইনে পাবে লোভ দেখিয়ে একটা লোক ওকে নিয়ে আসে; ও একা নয় অবশ্য; ওর সঙ্গে

ওর মত আরও পাঁচজন ছিল ; এ বাড়ীরই কাছাকাছি একটা বাড়ীতে এনে ওদের তোলে ও মেয়েটাকে, একা একটা ঘরে বন্দী করে', খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ওকে অজ্ঞান করে' দেওয়া হয়, জ্ঞান হ'লে দেখে ওকে বহুজনে বিধ্বস্ত করেছে। কান্নাকাটি করে' চুল ছিঁড়ে ও এক কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। এরা ওকে উলঙ্গ করে', বিষ দিয়ে অর্ধ অচেতন করে' কয়েকদিন রেখে দেয়, শেষ পর্যন্ত সৎ জীবনে ফেরবার সমস্ত চেষ্টা ও ছেড়ে দেয়। দশ মাস সে বাড়ীটা হ'তে ও বেরোতে পায়নি, তারপর অযোগ্য বলে' ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখান হ'তেও ওকে বোধ হয় তাড়িয়ে দেবে, কেমন যেন পাগলামির ছিট দেখা দিচ্ছে, তার ওপর হর্দম নেশা করে। ওদের ছ'জনের মধ্যে একজন "পালিয়েছে" ; তেতলার জানালা হ'তে সে লাফিয়ে পড়েছিল। শহরে একটা হৈচৈ পড়েছিল। শোননি ব্যাপারটা ?"

"শুনেছি।" 'গ্রাম্য খরিদ্দার' অভিযানের পর ইউরঘিস আর ডুয়ানে যে বাড়ীতে আশ্রয় নেয়, সেখানেই এটা ঘটেছিল। পুলিসের সৌভাগ্য-বশতঃ আত্মহত্যা করবার কয়েকদিন আগে মেয়েটা নাকি পাগল হ'য়ে গিয়েছিল।

মেয়ারিজা বলে' চলে, "এ ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা। একটা মেয়ে এনে দিতে পারলে দালালরা চল্লিশ ডলার পায়। সকল দেশ হ'তেই এরা মেয়ে ধরে' আনে—ধরে' আনে মানে নানা ফিকিরে জোগাড় করে। এ বাড়ীটায় ন'টা দেশের সতের জন মেয়ে আছে। অন্য বাড়ীতে আরও বেশী দেশের আরও বেশী মেয়ে দেখতে পাবে। এখানে আধ ডজন ফরাসী মেয়ে আছে,—এই বাড়ীওয়ালী ও-ভাষাটা বলতে পারে বলেই বোধ হয় এক বাড়ীতে এত জুটেছে। ফরাসী মেয়েরা বড় বিশ্রী, জাপানী মেয়ে ছাড়া অন্য সকলের চেয়ে খারাপ। পাশের বাড়ীটা জাপানী মেয়েমানুষে ভর্তি, বাবা কী

জঘন্য। ওদের একটা থাকলেও সে বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না।" দু'এক মুহূর্ত থেমে মেয়ারিজা বলে, "এখানকার অধিকাংশ মেয়েই শিষ্ট সভ্য; শুনে বিস্মিত হচ্ছ, না? আগে ভাবতাম, এ সব ভাল লাগে যাদের তারাই আসে এপথে; তা কি হয়? আচ্ছা ভাব ত'.—ইচ্ছে করে' কি ভাল লাগে বলে' কি কোন মেয়ে যে কোন পুরুষের কাছে—তা সে জোয়ান বুড়ো ধলা কালা যাই হ'ক, নিজেকে বেচতে পারে!"

"এদের কেউ কেউ বলে ভাল লাগে তাদের।" প্রশ্ন তোলে ইউরঘিস।

"জানি", উত্তর দেয় মেয়ারিজা, "যে কোন কথা বলতে পারে এরা। ধরা পড়েছে, জানে বেরোতে পাবে না, ভাল লাগতেই হয়। কিন্তু আরম্ভ করবার সময় ভাল লাগেনি, দারিদ্র্যের চাপে পড়ে' আসে, বুঝতেই তো পার। এখানে একটা ইহুদী মেয়ে আছে, সে আগে এক পোষাকের দোকানে কাজ করত; অসুখে পড়ে' চাকরী যায়; চার দিন কাজের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, একদানা খাবার জোটেনি, তখন ক্ষিধেয় পাগল হ'য়ে সে এমনি একটা বাড়ীতে গিয়ে কিছু খেতে চায়; তারা হুকুম করে, আগে পোষাক ফেলে দাও। একদম উলঙ্গ হ'লে তবে খাবার পায় সে!"

গম্ভীরভাবে মেয়ারিজা কী যেন ভাবে। হঠাৎ বলে, "তোমার কথা বল ইউরঘিস। কোথায় ছিলে?"

ইউরঘিস তার দীর্ঘকাহিনী বলে, বাড়ী হ'তে পলায়ন, ভবঘুরে জীবন, সুড়ঙ্গের ভেতর কাজ, দুর্ঘটনা, জ্যাক ডুয়ানে, কারখানা অঞ্চলে রাজনীতিক জীবন এবং পতন। সহানুভূতিসহকারে ওর কথা শোনে মেয়ারিজা, শেষের দিকে ওর অনাহারের কাহিনীও অবিশ্বাস্য মনে হয় না, ওর মুখের ওপরই অনাহারের সুস্পষ্ট ছাপ। মেয়ারিজা বলে,

"খুব সময়ে পেয়ে গেছ আমাকে। তোমার ভার আমি নেব। যতদিন কাজ না পাও, সাহায্য করব।"

"চাই না যে তুমি—" বলতে চায় ইউরঘিস।

"কেন চাও না? এখানে আছি বলে'?"

ইউরঘিস তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, "না না, তা নয়। চলে' গিয়েছিলাম, তোমাদের দেখিনি"—

"কী যা-তা বক! ওসব ভুলে যাও। ওজন্যে আমি কোনদিন তোমায় দোষ দিই নি।"

ইউরঘিস কথা কইতে পারে না। মেয়ারিজা বলে, "ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়। খাবার সময় পর্যন্ত থাক, ঘরেই আমি খাবার আনিয়ে নেব।" বলে' ও একটা বোতাম টেপে, জবাবে একটা রঙীন মেয়ে এসে দোরে দাঁড়ায়, বরাৎ দিয়ে দেয় মেয়ারিজা। মেয়েটা চলে' গেলে হাসতে হাসতে বলে, "হুকুম নেবার কেউ থাকলে বেশ লাগে, না?"

হাজতের জলখাবারটা নিয়ম ও আইন রক্ষা; পেট ভরেনি ইউরঘিসের। এখন দু'জনে ছোটখাট একটা ভোজের ব্যবস্থা করে' ফেলে। এল্‌জ্‌বিয়েটা, ছেলেদের, ও আগেকার দিনের কথা কইতে কইতে স্বস্তির সঙ্গে খায় ওরা। খাওয়া শেষ হ'বার আগেই আর একটি রঙীন মেয়ে এসে খবর দেয়, "মহাশয়া (বাড়ীওয়ালী) ডাকছেন লিথুয়ানীয় মেয়ারী (অর্থাৎ মেয়ারিজা)-কে।"

মেয়ারিজা বলে, "তার মানে তোমাকে যেতে হবে।"

পৃথকীকৃত বস্তী এলাকার বর্তমান বাসাটার ঠিকানা দিয়ে দেয় মেয়ারিজা; ইউরঘিস উঠে পড়ে। মেয়ারিজা বলে, "যাও তুমি, তোমায় দেখলে ওরা খুশী হবে।"

ইতস্ততঃ করে ইউরঘিস। "যেতে চাই না আমি, পারছি না। বিশ্বাস কর মেয়ারিজা। কিছু পয়সা দাও, আমি একটা কাজ খোঁজ করে' নিই।"

"টাকাপয়সা কী করবে? দরকার তো তোমার খাবার আর আস্তানার।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক; কিন্তু তাদের একদিন ছেড়ে পালিয়ে, আজ বেকার হ'য়ে তাদের কাছে যাব কোন্ মুখে, আর তুমি এদিকে—"

"যাও, যাও," ঠেলে দেয় মেয়ারিজা, "কী যা-তা বকছ! টাকাপয়সা তোমায় আমি দেব না।" দোরের দিকে এগোয় ইউরখিস, তার পিছু পিছু আসতে আসতে মেয়ারিজা বলে, "পয়সা দেব না, কেন জান? পয়সা পেলে তুমি মদ খেয়ে নিজেরই ক্ষতি করবে। এই পঁচিশ সেণ্ট নাও, নিয়ে বাড়ী যাও। তোমায় দেখলে তারা খুব খুশী হবে, লজ্জা পাবার সময়ই পাবে না। আচ্ছা, এস।"

বেরিয়ে পথ চলতে চলতে ইউরখিস অবস্থাটা ভাবে। ঠিক করে আগে একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে; সমস্ত দিনটা কারখানা, গুদাম, দোকানে কাজ খোঁজে, কোথাও কিছু হয় না। সন্ধ্যা হয় হয়, ও ঠিক করে বাড়ী যাবে, বাড়ীর দিকে পা চালায়; পথে একটা রেষ্টরেণ্ট পড়ে, খাবার জন্য ঢুকে পড়ে সেখানে। যখন বেরুল, তখন ওর মন বদলে গেছে—চমৎকার রাত্রি, বাইরেই কোথাও ঘুমোবে; কাল আর একবার চাকরীর চেষ্টা করে' দেখবে। চলতে চলতে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নেয়, দেখে কালকের রাজনৈতিক-সভা-বাড়ীটার সামনে দিয়েই ও চলেছে। আজ আর বাতি বা বাজী নেই, খালি একটা কী লেখা ঝুলছে—বহু লোক ভেতরে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে ইউরখিস ঠিক করে' ফেলে, আজও ভেতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে' নেবে, বিশ্রাম করতে করতে কী করবে না-করবে স্থির করে' নেবে। প্রবেশপথে কাউকে টিকিট নিতে দেখা গেল না, এটাও তা হ'লে মুফৎ তামাশা!

ঢুকে পড়ে ও। হল্‌ঘরে আজ কোন সজ্জা নেই, তবে মঞ্চে ও হল্‌ঘরে বক্তা শ্রোতা গিজ্‌গিজ্‌ করছে, বসবার সব আসনই প্রায় ভর্তি হ'য়ে গেছে। শেষের দিকের একটা চেয়ারে বসে' পড়ে ও; অল্পক্ষণের মধ্যে সভার কথা ও ভুলে যায়। ও জোঁকের মত আবার ওদের চুষে খেতে এসেছে, তাই ভাববে নাকি এল্‌জ্‌বিয়েটা? না, বোঝালে বিশ্বাস করবে যে সত্যিই ও কাজ খুঁজছে এবং কাজ পেলে নিজের সাধ্যমত আবার ও সংসারের জন্য করবে। ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে তো? না, দেখলেই তিরস্কার করতে লাগবে? যদি একটা কাজ পেত ফেরবার আগে! শেষ মালিকটা যদি আর একবার পরখ করত ওকে!

জনতার গর্জনে হল্‌ কেঁপে ওঠে। ইউরঘিস চোখ তুলে চায়। ইতিমধ্যে হলের সম্ভাব্য সকল স্থান পূর্ণ হ'য়ে গেছে। নারী-পুরুষ সকল শ্রোতা দাঁড়িয়ে উচ্চধ্বনি করে' রুমাল নাড়ছে। হয়তো বক্তা এসে গেছে। ইউরঘিস ভাবে, নিজেদের এমন বোকা বানায় কেন এরা! এর থেকে কী পাবার আশা করছে এরা? নির্বাচন, সরকার, দেশশাসন—এ সবের সঙ্গে কী সম্বন্ধ এদের? রাজনীতির সাজঘর থেকে এসেছে ইউরঘিস!

আবার নিজের চিন্তায় ও ফিরে আসে—এখানকার খালি একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়—দোর পর্যন্ত সব ঠাসাঠাসি ভর্তি হ'য়ে গেছে, বেরোবার সময় বেরোবে কোন্ দিক দিয়ে। সভা ভাঙতে এখনও অনেক দেরী, তখন বেরোলে আর বাড়ী যাবার সময় থাকবে না; বাইরে কাটাতে হ'লে তারও তো একটা জায়গা চাই। সকালে বাড়ী যাওয়াই ভাল হবে বোধ হয়; ছেলেরা তখন স্কুলে থাকবে, নির্জনে এল্‌জ্‌বিয়েটার সঙ্গে বোঝাবুঝিটা ভাল হবে। এল্‌জ্‌বিয়েটা কখন অবুঝ হয়নি, তা ছাড়া ইউরঘিস তো আর ধোয়া

দিতে চায় না। বোঝাবার সকল চেষ্টাই করবে ইউরথিস, তা ছাড়া মেয়ারিজ্জা রাজী আছে, খরচা যোগাচ্ছে তো সেই। এল্‌জ্‌বিয়েটা তেমন তেমন বেচাল ধরলে, ইউরথিসও এই নিয়ে বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে দেবে।

ভেবেই চলে ইউরথিস। এক কি দু'ঘণ্টা থাকবার পর, আবার কালকের বিপদ দেখা দেয়। সমস্ত সময়টা ধরেই বক্তৃতা চলেছে, আর শ্রোতারা আনন্দে উত্তেজনায় কখন হাততালি দিচ্ছে, কখন চ্যাঁচাচ্ছে। ক্রমে বক্তৃতা ও অন্যান্য ধ্বনি ইউরথিসের কাণে এক হ'য়ে আসতে থাকে, বিভিন্ন চিন্তাস্রোত মিলে তালগোল পাকিয়ে যায়, মাথাটাও ওঠা-নামা করে। কয়েকবার ও নিজেকে ধরে' ফেলে, কঠোর শপথ করে, না ঘুমুবে না, কিছুতেই না। কিন্তু হল্‌ঘরটী বদ্ধ ও গরম, হেঁটেছে এবং খেয়েছেও প্রচুর—শেষ পর্যন্ত মাথাটা সামনে ঝুঁকে আসে, নাসাধ্বনি সুরু হ'য়ে যায়। এবারও পাশে হ'তে খোঁচা আসে, আতংকে চমকে ও উঠে বসে। নিশ্চয় নাক ডাকছিল, হুঁ! হ্যাঁ, তারপর কী বলছে। মনপ্রাণ দিয়ে ও মঞ্চের দিকে চাইবার চেষ্টা করে—ভাবখানা এ বক্তৃতার চেয়ে আকর্ষণীয় অন্য কিছু এ জীবনে ও কখনও পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবার আশা নেই। এদিকে কল্পনা করে, চতুর্দিকের বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি, ক্রুদ্ধ গুঞ্জন, তারপর ওর কলার লক্ষ্য করে' পুলিসের অগ্রগতি। দেখবে নাকি সুযোগ নিয়ে। সব শ্রোতা তো সমান নয়, এরা হয়তো কিছু না বলতেও পারে। ঘুমও পায়, ভয়ও ধরে।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনে ও, বামাকণ্ঠে শান্ত মধুর ধ্বনি, "শোনবার চেষ্টা করলে হয়তো শুনতে আপনার ভাল লাগবে, কমরেড।"

এতে আরও চমকে ওঠে ইউরথিস, পুলিস ধরলে এতো ঘাবড়াত

না। তখনও ও স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকে, নড়ে না পর্যন্ত। মনটা তবু দুলে ওঠে, কমরেড্! ওকে "কমরেড্" বলে কে! বহুক্ষণ ও স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকে; যখন মনে হ'ল পার্শ্ববর্তিনী আর হয়তো ওর ওপর নজর রাখছে না, তখন আড়চোখে তাকে একবার দেখে নেয়। সুন্দরী তরুণী, সুন্দর দামী পোষাক পরনে, মানে, এককথায় "মহিলা"। আর এ কিনা ওকে "কমরেড্" বলে' ডাকে!

আর একটু ভাল করে' দেখবার জন্যে অতি সাবধানে ও আর একটু ফেরে বা চোখটা ফেরায়। দেখা হয় না। এবার ও অনেকখানি ফিরে অভিভূতের মত মহিলাকে দেখে। মেয়েটি ওর কথা ভুলেই গেছে হয়তো, অন্ততঃ ওর ওপর নজর রাখেনি, সামনের দিকে চেয়ে আছে। কে যেন সেখানে কী বলছে, অস্পষ্টভাবে তার কথা কাণেও আসে ইউরিপিসের। ওর চিন্তা তখন মেয়েটির মুখ নিয়ে [illegible]। মেয়েটীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ভয় [illegible] ওর। সির্‌সির্ করে' ওঠে শরীর। ব্যাপার কী? কী বলছে [illegible]লোকটা? এমনভাবে টানবার কী থাকতে পারে বক্তৃতায়? প্রস্তরমূর্তির মত মেয়েটি বসে' আছে, হাত দুটি খুব শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে কোলের ওপর পড়ে' আছে। মুখের ওপর উত্তেজনার, তীব্র চেষ্টার ছাপ, যেন বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, বা কাউকে মরণপণে লড়তে দেখছে। মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্র দুটী কেঁপে উঠছে, মাঝে মাঝে ব্যস্তভাবে ঠোঁট দুটী ভিজিয়ে নিচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মেয়েটীর বুক ওঠে পড়ে, তার উত্তেজনা ক্রমশই যেন উচ্চ হ'তে উচ্চতর গ্রামে ওঠে, তারপর আবার পড়ে' যায়; সাগরদোলায় দোদুল্যমান নৌকার মত মেয়েটীর মনের অবস্থা। ব্যাপার কী? কেন? লোকটার বক্তৃতার ফল? কে লোকটা? কিসের বক্তৃতা চলছে? এতক্ষণে ও বক্তার দিকে চায়।

এ যেন প্রকৃতির কোন উৎক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল দৃশ্য দেখা—যেন একটা পার্বত্য অরণ্য ঝড়ে ওলট-পালট হ'য়ে গেছে, বা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গে তোলাপাড়া চলছে অসহায় একখানা জাহাজ নিয়ে। বিশৃঙ্খল তোলপাড় চলেছে যেন—অস্বস্তি বোধ করে ইউরঘিস; মূর্ত্ত অনিয়ম, অর্থহীন একটা গর্জন। বক্তা তার এই শ্রোতাটির মতই রুক্ষমূর্তি; ঢাঙা পাতলা, মুখের অর্ধেকটায় পাতলা একটু দাড়ি, চোখের স্থানে আছে কালো কালো দুটো গর্ত। মহা উত্তেজনায় দ্রুত বলে' চলেছে লোকটা, কথার সঙ্গে চলেছে বহুপ্রকারের অঙ্গসঞ্চালন, একস্থানে না দাঁড়িয়ে মঞ্চের ওপর খেয়ালহীনভাবে এদিক হ'তে ওদিক ঘুরছে, লম্বা হাত দুখানা শ্রোতাদের দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন তাদের প্রত্যেককে ধরে' নেবে এখনি; অর্গানের মত কণ্ঠস্বর গম্ভীর। ইউরঘিস কিন্তু ভাবে ওর চোখের কথা, কণ্ঠস্বরের দিকে খেয়াল হয়নি; হঠাৎ মনে হ'ল ইউরঘিসের, বক্তা তার মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে ওকে লক্ষ্য করেই নিক্ষেপ করছে। কী কণ্ঠস্বর! আবেগে, ব্যথায়, আকাঙ্খায় কেঁপে কেঁপে উঠছে, এতে অব্যক্ত কী-একটা কথার রেশ রয়ে' গেছে—বুঝতে পারে না ইউরঘিস। এ-জিনিষ একবার শো[illegible] মানে এ বক্তৃতার মধ্যে বন্দী হওয়া, বন্দী হওয়া কেন একস্থানে বাঁধা পড়া। লোকটা বলছে—"এ সব শুনে আপনারা বলবেন, হ্যাঁ, সব সত্যি কথা, কিন্তু চিরকালই তো এমনি হ'য়ে আসছে। বা বলতে পারেন, আসবে হয়তো কিন্তু আমার জীবনকালে আসবে না; আমার কী লাভ? তাই আবার ফিরে যান প্রতিদিনকার ঘানির পথে ঘুরতে, ফিরে যান জগৎজোড়া অর্থনৈতিক যাঁতাকলে পিষ্ট হ'তে, অন্যের সুবিধার জন্য দীর্ঘসময় মেহনৎ করতে, ঘৃণা অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করতে, বিপজ্জনক অস্বাস্থ্যকর স্থানে কাজ করতে, ক্ষুধা দুর্দশা দুর্গতি রাক্ষসীদের সঙ্গে লড়তে, ফিরে যান আপনারা দুর্ঘটনা, ব্যাধি ও মৃত্যুর

ঝুঁকি নিতে। প্রতিদিন সে কাজ হিংস্রতর হ'য়ে ওঠে, বেড়ে চলে কাজের গতি কত নিষ্ঠুরভাবে, প্রতিদিনই পরিশ্রম বাড়ে একটু একটু করে', আর খাটুনি বাড়ার সাথে সাথে দুরবস্থার বজ্রমুষ্টি চেপে ধরে আপনাদের বেশী করে'। মাস কাটে, বছরও হয়তো কেটে যায়—তখন ফিরে আসেন, আমিও আবার ফিরে আসি আপনাদের অনুরোধ জানাতে, জানতে আসি দারিদ্র্য দুর্দশা আপনাদের চেতনা এনেছে কিনা, দেখতে আসি অন্যায়ে অত্যাচারে এখনও আপনাদের চোখ খুলল কিনা! আমি অপেক্ষা করব, এখনও অপেক্ষা করব—এ ছাড়া আর কিছু তো আমি করতে পারি না। এমন কোন জঙ্গল নেই যেখানে এ সব জিনিসের বিভীষিকা হ'তে লুকোতে পারি, এমন কোন আশ্রয় নেই যেখানে আশ্রয় নিয়ে এদের করাল কবল হ'তে বাঁচতে পারি; পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, সর্বত্রই দেখেছি এই অভিশপ্ত প্রথা। দেখি, মানুষের সুন্দর মহান মনোবৃত্তিসকল, কবিদের স্বপ্ন, শহীদের বেদনা সবই বাঁধা পড়েছে, নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত লাভের, লুঠের লোভের শেকলে এরা আবদ্ধ! এই জন্যই আমি বিশ্রাম করতে পারি না, চুপ করে' থাকতে পারি না; এই জন্যই আমি ছুঁড়ে ফেলেছি আরাম, আয়েস, সুখ, স্বাস্থ্য, যশ, আর এই জন্য সর্বত্র আমি কেঁদে বলি, প্রকাশ করি আমার অন্তরের যন্ত্রণা। এই কারণেই দারিদ্র্য বা রোগ, ঘৃণা বা উপহাস, ভীতিপ্রদর্শন বা ঠাট্টা আমায় চুপ করাতে পারবে না, চুপ করব না আমি জেল বা শাস্তির ভয়ে—আঃ! তারা আছে, আরও আসুক, এ জগতে বা এ দুনিয়ার বাইরে যে শক্তি আছে বা ছিল বা ভবিষ্যতে আসবে, বা সৃষ্টি করা হবে তারা কেউ—কেউ আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। আজ ব্যর্থ হ'লে কাল আবার চেষ্টা করব, কারণ আমি জানি ত্রুটি আমার—জানি, এ ধরিত্রীতে আমার আত্মার স্বপ্ন যদি একবার

প্রকাশ পায়, এর পরাজয়ের দাহ যদি মানুষের ভাষায় প্রকাশ পায় একবার, তা হ'লে তার আঘাতে অজ্ঞতার অবিশ্বাসের কুসংস্কারের অতি শক্ত বাধাও চুরমার হ'য়ে যাবে, অতি অলস অতি হতাশ মানুষও কাজের প্রেরণায় চঞ্চল হ'য়ে উঠবে, মানুষের ওপর আস্থা যে একেবারে হারিয়েছে সে লজ্জিত হবে, তাতে আতঙ্কিত হ'য়ে উঠবে অতি স্বার্থপরও, উপহাসের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, জোচ্চুরি মিথ্যা গর্তের অন্ধকারে আত্মগোপন করবে, আর সমগ্র শক্তি নিয়ে পূর্ণমূর্তিতে দাঁড়াবে সত্য। একা সত্য! কারণ, কারণ ভাষাহারা কোটি কোটি মানুষের ব্যথাকে ভাষা দিই আমি, অত্যাচারিত সান্ত্বনা-হীন ভাষা পায় আমার ভাষায়, যারা জীবনের সব কিছু হারিয়েছে, জীবনে যাদের বিশ্রাম নেই, মুক্তি নেই, যাদের কাছে এ দুনিয়াটা একটা কয়েদখানা, নির্যাতনের অন্ধগহ্বর, জীবন যাদের কাছে কবর—আমি প্রকাশ করি তাদের ব্যথা! এখনি, এ মুহূর্তে যে শিশু দক্ষিণের তুলোক্ষেতে মেহনৎ করছে, ক্লান্তিতে টলছে, যন্ত্রণায় অবশ হ'য়ে এসেছে যার চেতনা, মৃত্যু ছাড়া যার অন্য কোন আশা নেই—কথা কইছি আমি তার ভাষায়! যে মা বস্তীর চিলেকোঠায় মোমবাতির অস্পষ্ট আলোতে বসে' সেলাই করছে আর ক্লান্তিতে কাঁদছে, শিশুদের শেষক্ষুধার ব্যথায় ভেঙে পড়ছে—তার অন্তর্দাহকে রূপ দিই আমি! ছেঁড়া ন্যাকড়ায় শুয়ে, শিশুদের অনাহারে মৃত্যুর মুখে ফেলে এখনি যে শ্রমিক মরছে—তার ভাষায় বলছি আমি! এই মুহূর্তেই এই বিভীষিকাময় শহরে পরাজিতা ক্ষুধার্তা তরুণী পথ চলছে আর ভাবছে হ্রদের জলে ডুবে মরবে, না বেশ্যালয়ে ঢুকবে—তার অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে আমার ভাষায়! লোভের লাভের রথচক্রে বাঁধা পড়েছে যারা, তারা যেখানেই থাক, পরিচয় তাদের যাই হ'ক—তাদের কথাই বলি আমি! মানুষ মুক্তির জন্য আর্তনাদ

করছে, মানুষের সেই আর্তনাদের ভাষায় কথা কই আমি। এই ধূলির ধরণী হ'তে ওঠবার জন্য, জাগবার জন্য, এই কারাগার ভাঙবার জন্য গর্জন করছে। অত্যাচারের অজ্ঞতার পিশাচবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে' ফেলতে চায় মানুষের অমর আত্মা, আলোর অভিমুখে পথ খুঁজে চলেছে সে আত্মা—আমি কথা কই সে আত্মার ভাষায়!"

ক্ষণকালের জন্য বক্তা থামে। মুহূর্তের একটা স্তব্ধতা, শ্রোতারা যেন নিশ্বাস নেবার অবসর চাইছে, সহসা সহস্র কণ্ঠের ধ্বনি ওঠে। এ সবের মধ্যে ইউরঘিস স্থির অনড় নির্বাক হ'য়ে বসে' আছে—বক্তার ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, বিস্ময়ের প্রবল আঘাতে দেহ তার কাঁপছে।

বক্তা হাত তোলে, জনতা নিঃশব্দ হ'য়ে যায়, সে আবার বলতে লাগে—

"যেই হন আপনি, সত্যের জন্য যদি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে আপনার, তা হ'লে আপনার কাছেই আমি বোঝবার আবেদন জানাই। কিন্তু আমার আবেদন বিশেষ করে' মেহনতকারী জনতার কাছে. অমানুষিক মেহনৎ দারিদ্র্য ক্ষুধা দুর্দশা মৃত্যু আর অধঃপতনের যে চিত্র আমি আঁকছি এ সব তার কাছে ভাবপ্রবণতার বস্তু নয়, বক্তৃতাবাজী করে' ভুলে যাবার জিনিস নয়—তাদের কাছে এ সব প্রতিদিনের কঠোর ক্ষমাহীন বাস্তব, এরাই শ্রমিকের হাত-পায়ের বেড়ী, পিঠের চাবুক, এরাই তার বুকে চেপে থাকে জগদ্দল পাথরের মত। মজদুর, আমার আবেদন আপনার কাছে! আপনি আপনার মেহনৎ দিয়ে বানিয়েছেন এ দেশ, অথচ এর শাসনব্যবস্থায় কোন কথা খাটবে না আপনার; চাষ করবেন আপনি, ভোগ করবে অন্যে; মেহনৎ করবেন হুকুম তামিল করবেন, তার বদলে বোঝাবাহী পশুর চেয়ে বেশী কিছু দাবী করতে পারবেন না;—আপনি পাবেন খাদ্য

কোনরকমে ধড়ে প্রাণ থাকবার মত খাবার, আর মাথা গোঁজবার একটু আস্তানা। আপনারই কাছে আমার আবেদন, আপনার কাছেই আসি আমি মুক্তির বাণী নিয়ে! আপনার কাছে কতখানি চাইতে পারব, জানি—জানি তার কারণ আমিও আপনার জায়গায় ছিলাম, আপনার জীবন যাপন করেছি আমি—এখানে এমন কেউ নেই, যে এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে। পথকুক্কুরের মত রাস্তাবাসী হওয়া কী জিনিষ আমি জানি; জুতো পালিস করে' বেড়ান, রুটির টুকরো কুড়িয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা, দোকানের পিছনে সিঁড়ির মধ্যে ঘুমোন, খালি গাড়ীর তলে রাত কাটান আমারই জীবনে ঘটেছে। জানি, সাহস করা, আশা করা, বড় বড় সুখের স্বপ্ন দেখা—তারপর মেহনৎ করবার শক্তি ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে নিরুপায়ভাবে ধ্বংস হ'তে দেখা কী জিনিস আমি জানি; আমারই জীবনের সুকোমল সুন্দর ফলফুলগুলি লুব্ধপশুর পায়ের তলে পিষ্ট হ'য়ে গেছে। একটু জ্ঞানের জন্য মজদুরকে কী দাম যে দিতে হয় তা আমি জানি। এর জন্য আমি দিয়েছি আমার খাদ্য, সহ্য করেছি দেহমনে অসহনীয় যন্ত্রণা, জ্ঞানের দাম বলে' দিয়েছি আমার স্বাস্থ্য, উৎসর্গ করে' দিয়েছি আমার জীবন। তাই, আপনাদের কাছে আশা ও মুক্তির কাহিনী, নতুন জগৎ সৃষ্টির আদর্শ, নতুন এক শ্রমিকশক্তির উত্থানের কল্পনা এনে যখন দেখি আপনারা অবিশ্বাস আলস্য আর কুসংস্কারের পাঁকে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, আমি বিস্মিত হই না। তবু আমি হতাশ হই না, কারণ আমি জানি, কোন্ শক্তি আপনাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কারণ আমি জানি, দারিদ্র্যের কশাঘাত কী বস্তু, জানি প্রভুত্বের কী ঔদ্ধত্য, মালিকের কী নির্মম ঘৃণা পলে পলে হীন করে' ফেলে আপনাদের। আজ রাত্রে এখানে যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছেন তাঁদের কত জন অমনোযোগী, কত জন এ বক্তৃতা গ্রাহ্য করছেন না, কত জন এসেছেন

অলস কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবার জন্য, বা কত জন এসেছেন আমাদের উপহাস করবার জন্য—আমি জানি না; কিন্তু জানি, এর মধ্যে অন্ততঃ একজনও আছেন যিনি দারিদ্র্যে দুর্দশায় অন্যায়ে নি[illegible]নে তাড়িত হ'য়ে এ অন্যায় ব্যবস্থার সত্যকার রূপ দেখবার জন্য এ[illegible]ন— আঘাতে আঘাতে তিনি মনোযোগী হ'য়ে উঠেছেন; যিনি [illegible]কারে পথ হাতড়ে চলেছেন, আমার কথা তাঁকে স্থায়ী আলো [illegible] দিক বিদ্যুৎ চমকের মত সামনের পথ দেখিয়ে দেবে, দেখিয়ে দেবে [illegible] বাধা, কোথায় বিপদ, সমাধান করবে তাঁর সমস্যার, আসান [illegible] তাঁর মুশ্‌কিল। ঘুচে যাবে তাঁর চোখের আবরণ, খসে' পড়বে [illegible] কড়াবেড়ী—আমাকে ধন্যবাদ দেবেন তিনিই, তখন তিনিই চল[illegible] মুক্ত মানুষের স্বাধীনতার দীর্ঘপদক্ষেপে, উন্নত মস্তকে; স্বসৃষ্ট গোলা[illegible] হ'তে মুক্তি পাবেন তিনি; আর কখন এ ফাঁদে তিনি পড়বেন [illegible] কোন দমনে তিনি দমিত হবেন না, কোন ভয় তাঁকে ভীত কর[illegible] পারবে না—এই রাত্রি হ'তেই তিনি চলবেন সম্মুখে আর পি[illegible] নয়, আজ রাত্রি হ'তেই তিনি পড়বেন, বুঝবেন, শান দিয়ে নেবেন নিজের তলোয়ারে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন তাঁর জঙ্গী ভাই জঙ্গী সাথীদের সঙ্গে। আমারই মত তিনিও অমূল্য মুক্তি ও আলোকের বার্তা নিয়ে যাবেন অপরের কাছে—এ মুক্তি ও আলোক তাঁর নিজস্ব নয়, আমার নিজস্ব নয়, এরা মানুষের চিরন্তন উত্তরাধিকার। শ্রমিক, মজদুর—কমরেড্! চোখ খুলুন, চেয়ে দেখুন আপনার চারিদিকে। দীর্ঘকাল অসহ্য উত্তাপে মেহনৎ করে' করে' আপনার বোধশক্তি অসাড় হ'য়ে গেছে—কিন্তু একবার—একবার খুন আপনার বাসভূমি এই দুনিয়াকে—ছিঁড়ে ফেলুন এর প্রথা এর [illegible]ধা এর আইনের পোষাক, একবার দেখুন এর কদর্য নগ্ন কুৎসিত [illegible]তি! বুঝুন একে, বুঝুন! ভেবে দেখুন একবার, এই রাত্রেই

মাঞ্চুরিয়ার প্রাঙ্গণে বিদ্বেষবোঝাই দুটী সেনা পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে—বুঝুন, আমরা যখন এখানে বসে' তখনই দশ লক্ষ মানুষকে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরবার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—পাগলের মত পশুর মত তারা পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে' ফেলবার জন্য হিংস্র মত্ততায় নেচে উঠেছে—হিংসায় নেচে উঠেছে শান্তি-দূতের জন্মের উনিশশো বছর পর! ভগবদ্বাণীর মত তাঁর শান্তির বাণী উনিশশো বছর ধরে' প্রচার করবার পর মানুষের সেনা জঙ্গলের জানোয়ারের মত করাল নখদন্ত বের করছে মানুষকেই ক্ষতবিক্ষত করবার জন্য! দার্শনিকরা যুক্তি দিয়ে বুঁঝিয়েছেন, ধর্মপ্রচারকরা হিংসার উচ্ছেদ করতে বলেছেন, কবিরাও সাশ্রু মিনতি জানিয়েছেন—তবু আজও হিংসার কুৎসিত দানব অবাধে বিচরণ করছে এই দুনিয়ায়। আমাদের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমাদের সংবাদপত্র আছে, কেতাব আছে, শান্তির জন্য আমরা ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি উপরের স্বর্গ আর নীচের এই ধরিত্রী, অ[illegible]মা ওজন করে' যুক্তিতর্ক দিয়েছি, পন্থার অনুসন্ধান নয়, গবেষণা করেছি—তারপর মানুষকে সাজিয়ে দিয়েছি মানুষ মারবার হাতিয়ারে। এর নাম নরহত্যা না রেখে, রেখেছি যুদ্ধ—ব্যস, নিশ্চিন্ত। বড় কথার আবরণে মর্যাদার মহত্ত্ব দেখিয়ে আমায় ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না। আসুন আমার সঙ্গে, আসুন—চোখ খুলুন, বুঝুন, উপলব্ধি করুন! চেয়ে দেখুন বুলেটবিদ্ধ নরদেহ, চেয়ে দেখুন নরদেহের ঐ খণ্ডগুলো, বোমার আঘাতে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেছে! মানুষের মাংসে কিরীচ বসার শব্দ পাচ্ছেন! যন্ত্রণার ব্যথার বেদনার ঐ আর্তনাদ শুনুন! চেয়ে দেখুন মানুষেরই মুখ যন্ত্রণায় কী বীভৎস, মানুষেরই মুখ হিংসায় ঘৃণায় কেমন শয়তানের প্রতিচ্ছবি হয়েছে! ঐ মাংসখণ্ডের ওপর হাত দিন, দিন—এখনও গরম, এখনও কাঁপছে—এই একমুহূর্তে

আগে ওটা ছিল মনুষ্য-হৃদয়েরই অংশ। এখনও বাষ্প হ'য়ে উঠছে ওর গরম রক্ত—মানুষেরই শ্বাসপ্রশ্বাসে চলত এ হৃদযন্ত্র! ভগবান সর্বশক্তিমান!—তবু চলেছে পরিকল্পিত, সংগঠিত, নিয়মিত এই হত্যাকাণ্ড! এ সব আমাদের অজ্ঞাত নয়, কাগজে এ সব আমরা পড়ি, তারপর অসাড় মন উচ্চারণ করে, 'এমনিই হ'য়ে থাকে চিরকাল' এই পৈশাচিক হত্যালীলা ফলাও করে প্রকাশ করে আমাদের সংবাদ-পত্র, কিন্তু সংবাদপত্র বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় না, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোও জানে, কিন্তু তবু তারা নির্মূল করে' দেয় না নিজেদের—জনতাও দেখে এ হত্যালীলা, তবু তারা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে না, বিদ্রোহ করে না।

"আপনাদের পক্ষে মাঞ্চুরিয়া হয়তো বহুদূর, আসুন আমার সঙ্গে, বাড়ীর কাছে আসুন; এই শিকাগো সহরের কথা ধরুন। এখানেই আজ, এই রাত্রে, দশ হাজার স্ত্রীলোক ক্ষুধার তাড়নায় দেহবিক্রী করছে নোংরামির বন্দীবাসে। আমরা কি এটা জানি না? জানি। এ নিয়ে হাসিতামাসা করি আমরা! কিন্তু এই সব মেয়ে আপনারই মায়ের প্রতিমূর্তি, হয়তো আপনাদের বোন, হয়তো মেয়ে। আজ যে শিশুকে বাড়ীতে রেখে এখানে এসেছেন, কাল সকালে যার হাসিতে আত্মহারা হবেন—দেহবিক্রয় করাই হয়তো তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি। আজ, এই রাত্রে, এই শিকাগোতে দশ হাজার সক্ষমদেহ জোয়ান কাজ কাজ করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজ করতে তারা ইচ্ছুক—কিন্তু পাচ্ছে কী? পাচ্ছে ক্ষুধা, দুর্দশা, অপমান; গৃহহীন হতভাগ্যের দল শীতকালের এই ভয়াবহ ঠাণ্ডায় অপেক্ষা করছে বিভীষিকাময় মৃত্যুর। এই রাত্রেই শুধু এই শিকাগোতে এক লক্ষ শিশু একটুকরো রুটির জন্য ক্ষইয়ে ফেলছে নিজেদের শক্তি, ফুঁকে দিচ্ছে তাদের জীবন; আজই লক্ষাধিক মা দারিদ্র্যে দুর্দশায় বিপন্নভাবে কাঁদছে কোন

অন্ধকার বস্তীতে। কেন? শেষ সাধ্যমত মেহনৎ করেও সন্তানদের মুখে একটু খাবার দিতে পারছে না বলে'। লক্ষের অনেক বেশী বাতিল বৃদ্ধ এই শীতের ঠাণ্ডা রাজপথে অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে—এই ভয়ানক মৃত্যু তাদের কাছে আশীর্বাদ, মৃত্যুই তাদের মুক্তি দেবে সকল যন্ত্রণার কবল হ'তে। দশ লক্ষ স্ত্রী শিশু পুরুষ এখানে গোলামের মেহনৎ করে' চলেছে, খালি কোনরকমে বেঁচে থাকবার জন্য তারা যতক্ষণ দাঁড়াতে পারে, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে ততক্ষণ খেটে চলে একটানা; মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এরা টেনে চলবে একঘেয়ে ক্লান্তিকর এই কাজ, বয়ে' চলবে ক্ষুধা আর দুর্দশা। এদের ললাটলিপি—অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা, ব্যাধি, গরম, ঠাণ্ডা, অবসাদ আর মত্ততা বয়ে' চলা। এবার দৃষ্টি ফেরান আপনারা আমার সঙ্গে এই চিত্রেরই অন্যদিকে। হাজার জন—হয়তো দশ হাজার—এরা এই সব গোলামের মালিক, তারা ভোগ করছে এদের মেহনৎ। যা ভোগ করছে, সেটুকু রোজগার করবার জন্য বিন্দুমাত্র পরিশ্রম তারা করে না। ভোগ্যবস্তু পাবার জন্য মুখ ফুটে বলতে পর্যন্ত তাদের হয় না—আপনা হ'তে বিপুল অর্থ আসে তাদের কাছে, অভাব তাদের ভাবনা নয়, ভাবনা কী ভাবে ঐ অর্থ খরচ করবে। তারা বাস করে প্রাসাদে,—বিলাসিতার উচ্ছৃঙ্খলতার মচ্ছব করে,—সে বিলাসিতা উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ণনা করবার ভাষা নেই, কল্পনা টলে' যায়, তার সামনে মানবাত্মা অস্বস্তি বোধ করে। তারা শত শত ডলার খরচ করে এক জোড়া জুতো, কি একখানা রুমাল কিম্বা এক জোড়া গার্টারের জন্য; ঘোড়া, মোটর, বজ্‌রা, বাড়ী, একটা ভোজ, বা দেহ সাজাবার ছোট চক্‌চকে একটুকরো পাথরের জন্য তারা খরচ করে লক্ষ লক্ষ ডলার। ঔদ্ধত্য আর অপচয়ের প্রতিযোগিতা করে তারা নিজেদের মধ্যে, প্রতিযোগিতা করে কাজের জিনিস প্রয়োজনীয় জিনিসকে কত

নষ্ট করতে পারে; প্রতিযোগিতা করে শ্রমিকের জীবন প্রতিভার শক্তি ধ্বংস করার; মানুষকে কষ্ট দেওয়ার, যাতনা দেওয়ার, মানুষের ঘামে আর রক্তে মিশিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা তাদের। সব কিছু তাদের—সব কিছুই আপনা হ'তে আসে তাদের কাছে—ঠিক যেমন ঝর্ণার জল পড়ে গিয়ে ছোট ছোট নদীতে, ছোট ছোট নদীর জল পড়ে বড় নদীতে আর বড় বড় নদীর সমস্ত জল মিশে যায় সাগরে, তেমনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে, অবশ্যম্ভাবীভাবে সমাজের সকল সম্পদ্ গিয়ে পড়ে এই মুষ্টিমেয়ের হাতে। চাষী জমি চাষ করছে, খনি-শ্রমিক ধরিত্রীর গর্ভ খুঁড়ছে, তাঁতি মাকু চালাচ্ছে, রাজমিস্ত্রী ইট পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরী করছে, বুদ্ধিমান আবিষ্কার করছে, চতুর পরিচালনা করছে, বিজ্ঞ অধ্যয়ন করছে, অনুপ্রেরণা-প্রাপ্ত গাইছে—আর এ সব কিছুর ফল, মস্তিষ্ক ও পেশীর শ্রমের উৎপাদন সমবেত করা হয় বিপুল এক স্রোতে, সে স্রোত গিয়ে পড়ে কয়েকজন ধনীর কোলে। সমগ্র সমাজটা তাদের মুঠির মধ্যে, পৃথিবীর শ্রমিক তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল—আর তারা হিংস্র নেকড়ের মত সমাজকে শ্রমকে ছিন্নভিন্ন করছে, বিধ্বস্ত করছে —বুভুক্ষিত শকুনি-গৃধিনীর মত তারা ছিঁড়ছে আর গিলছে! সমগ্র মানবজাতির শক্তি তাদের সম্পত্তি। শুধু কি আজ?—স্মরণাতীত কাল হ'তে তারা এই চালিয়ে আসছে। মানুষ যা কিছুই করুক, যে চেষ্টাই করুক—করছে এই কয়েকজনের জন্য! সমাজের সমগ্র শ্রমশক্তিটাই শুধু তাদের পদানত নয়, শাসনযন্ত্রগুলোও তারা কিনে রেখেছে; তারা অন্যায় সুবিধা অটুট রাখবার জন্য সর্বত্র তাদের লাম্পট্যের চৌর্যের ঐশ্বর্য প্রয়োগ করছে—তাদের কোলে প্রবাহিত মুনাফার স্রোতস্বিনী তারা আরও গভীর, আরও বিস্তৃত করে' খনন করছে। আর আপনি, মেহনৎকারী মজদুর! আপনাকে জুতে দেওয়া হ'য়েছে এই যাঁতাকলে, ভারবাহী পশুর মত বয়ে' চলেছেন মুনাফার পাহাড়, তাতে আপনার

অধিকার নেই, আপনি তা ভোগ করতে পারেন না, আপনি খালি ভাবতে পারেন দৈনন্দিন দৈন্য ও দুর্দশার কথা—কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মধ্যে এমন একজনও কি আছেন যিনি বিশ্বাস করেন যে, এই ব্যবস্থা চিরকাল চলতে পারে?—এত নিষ্ঠুর এত অধঃপতিত কেউ কি আছেন আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে, যিনি উঠে বলবার সাহস রাখেন যে, এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হবে? বলতে পারেন, সমাজের শ্রমশক্তির উৎপাদন, মনুষ্যজাতির জীবিকার উপায় চিরকাল ধরে' সম্পত্তি হ'য়ে থাকবে কয়েকটা অলসের আর পরগাছার, খরচ হ'য়ে চলবে তাদের ব্যভিচার আর অহঙ্কারের পরিপূর্তির জন্য, খরচ হবে তাদের যে কোন উদ্দেশ্যসাধনে, খরচ হ'তে থাকবে যে কোন অলস পরগাছার খেয়াল-খুশীমত? বলতে পারেন, কোন উপায়ে কোনদিন মানুষের শ্রমের ফল মানুষজাতির সম্পত্তি হবে না, মনুষ্য-সমাজের প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে না? বলতে পারেন, কোনদিন মানুষ-সমাজ তার শ্রমের ফল নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পাবে না? আর যদি বলেন, মনুষ্য-সমাজ একদিন এ অধিকার পাবেই পাবে, জিজ্ঞাসা করব আমি, কীভাবে, দুনিয়ার কোন্ শক্তি সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে? আপনাদের আজকের মালিকরা করবে ভেবেছেন? তারাই কি লিখে দেবে আপনাদের স্বাধীনতার সনদ্? তারা কি বানিয়ে দেবে আপনাদের মুক্তি-অর্জনের অসি? তারা কি গড়ে' দেবে আপনাদের সৈন্যবাহিনী, তারাই কি পরিচালনা করবে আপনাদের মুক্তিফৌজ? মনে করেন কি এই উদ্দেশ্যে তারা তাদের দৌলত খরচ করবে? আপনাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত উন্নতির জন্য তারা প্রতিষ্ঠান বানিয়ে দেবে? আপনাদের উন্নতির বার্তা ঘোষণা করবার জন্য তারা কি সংবাদপত্র প্রচার করবে? আশা করেন কি তারা আপনাদের পথ দেখাবার জন্য, আপনাদের লড়াই চালাবার জন্য রাজনৈতিক দল গড়ে' দেবে? দেখতে পাচ্ছেন

না, এ সব কাজ আপনার নিজের কাজ? স্বপ্ন দেখতে হবে আপনাকেই, পরিকল্পনা করতে হয়, মনস্থ করতে হয় আপনাকেই করতে হবে, আপনি ছাড়া আর কেউ আপনার স্বপ্ন আপনার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করবে না। দেখতে পাচ্ছেন না, মালিক ও সম্পদের পক্ষে উদ্ভাবনীয় উত্থাপনীয় সম্ভাব্য সকল প্রকার বাধার বিরুদ্ধে নিদারুণ লড়াই করে' তবেই শ্রমশক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে? তারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, উপহাস করবে, ঘৃণা করবে, শাস্তি দেবে, আঘাত হানবে, জেলে দেবে, উপহার দেবে মৃত্যু—এ কি জানেন না আপনারা? গোলাগুলির, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আপনাদের অনাবৃত বুক পেতে দিয়ে লড়তে হবে, এ কথা কি অজ্ঞাত আপনাদের? আজকের অন্ধ নিষ্ঠুর দারিদ্র্য হ'তে কঠোর ক্ষমাহীন সংগ্রামের শপথ নিতে হবে। আমাদের এই অশিক্ষিত মনকেই শত অসুবিধার মধ্যে পথ খুঁজে নিতে হবে, আমাদের অশিক্ষিত অসংস্কৃত দুর্বল কণ্ঠের আওয়াজ দিয়েই আঘাত হানতে হবে। আজকের এই পরম দুঃখের একা-একা ভোগ করা ক্ষুধা দিয়ে, খুঁজে, চেষ্টা করে', আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে', হৃদয়ব্যথা হতাশা নিয়ে, ঘামের মত রক্ত বিলিয়ে লড়তে হবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। ক্ষুধার স্বল্প অন্ন হ'তে বাঁচাতে হবে এ লড়াইএর রসদ, নিদ্রাকে বঞ্চিত করে' রোজগার করতে হবে আমাদের শিক্ষা, ফাঁসি-রজ্জুর ছায়াতল হ'তে দিয়ে যেতে হবে চিন্তার সম্পদ্। এ আন্দোলনের শেকড় রয়েছে সুদূর অতীতে, অপরিচিত অসম্মানিত সে আন্দোলনকে অবজ্ঞা করা উপহাস করা সহজ, ঘৃণা ও প্রতিশোধের বেশে সজ্জিত সে আন্দোলন সুরূপ নয়,—কিন্তু সে কার কাছে?—আপনার কাছে নয়। আপনি মজদুর, মজুরী-গোলাম, আপনার কাছে এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম! আজাদীর এ লড়াইয়ের অবসাদহীন বজ্র-আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন কি?—এ আহ্বানকে

আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না, এ দুনিয়ার যেখানেই থাকুন আপনি, এর আহ্বানে সাড়া আপনাকে দিতেই হবে। এ আওয়াজে ভাষা মিশিয়েছে আপনার ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার, আপনার আকাঙ্ক্ষা, আপনার কর্তব্য, আপনার আশা—এ সংসারে আপনার যা কিছু আছে তারই ভাষা মিশেছে সংগ্রামের আহ্বানে। দারিদ্র্য উচ্ছেদের জন্য দরিদ্রের দাবী মিশেছে এতে। নির্যাতিত ঘোষণা করছে নির্যাতনের ধ্বংস—সে ঘোষণা মিশেছে এ, আওয়াজে। এতে মিশে গেছে দুখের চাপের গড়া শক্তির ধ্বনি, নিষ্পেষিত দুর্বলতা হ'তে উদ্ভূত দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বাণী, যন্ত্রণা ও হতাশার অতলগহ্বরে সৃষ্ট আনন্দ ও সাহসের অনিবার্য কণ্ঠধ্বনি। শ্রমিক শক্তি। অপমানিত পদদলিত হ'য়ে পড়ে' আছে তার বিপুল বিরাট দানবীয় পর্বতপ্রমাণ দেহ নিয়ে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ, তাই পেরেছে শত্রুরা একে অন্ধ করতে, বেঁধে রাখতে। তবু সেই পতিত অন্ধ আবদ্ধ দেহের মধ্যেই হানা দিচ্ছে প্রতিরোধের স্বপ্ন, আশা লড়ছে তার আচ্ছন্নকারী ভীতির বিরুদ্ধে। একদিন এ দেহ নড়বে, তার নড়ার সঙ্গে শেকলের একটা আঁকড়ি কেটে যাবে, অমনি আশার প্রবাহ বইবে তার বিরাট দেহের প্রান্তস্থিত শিরাউপশিরায়ও,—তখন? তখন নিমেষমধ্যে তার স্বপ্ন হবে সম্পাদিত ঘটনা। একবার চমকে উঠবে বইকি! তারপর সে দাঁড়াবে উঠে উন্নত মস্তকে,—ছিঁড়ে যাবে বাঁধনের শেকল,—তার বুকের ওপর চাপান পাথর গড়িয়ে পড়বে। সে দাঁড়াবে—আকাশচুম্বী তার উন্নত শীর্ষ, পৃথিবীব্যাপী তার দেহ, তার সন্তুষ্ট আনন্দের ধ্বনিতে—"

আবেগে বক্তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভেঙে যায়; বাহুদ্বয় উচ্চে উৎক্ষিপ্ত; তার আশা তার স্বপ্ন যেন তাকে মেঝে হ'তে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নিচ্ছে! একস্বরে গর্জন করে' ওঠে শ্রোতৃবর্গ, উত্তেজনায় তারা হাত নেড়ে

হো হো করে' হেসে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যায়। ইউরগিসও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে, আবেগ প্রকাশের অন্য পথ পাচ্ছে না ও, এ আবেগ চাপবার ক্ষমতা নেই ওর, তাই গলা ফেড়ে চেঁচিয়ে চলেছে। বক্তার কথায় কী হ'য়েছে বলা যায় না, তার কথার তোড়ে, বক্তার কণ্ঠস্বরে, উচ্চারণভঙ্গীতে ওর এই অবস্থা—অদ্ভুত কণ্ঠস্বর, আত্মার অন্তরতম প্রদেশে ঘণ্টার ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত সে কণ্ঠস্বর যেন বহুক্ষণ বাজতে থাকে; কী যাদু আছে এ কণ্ঠস্বরে! মহাশক্তিশালী হাতের মত এ কণ্ঠস্বর শ্রোতাকে মুষ্টিবদ্ধ করে' ঝাঁকানি দিতে থাকে, তার অন্তর পূর্ণ করে' দেয় রহস্য-জনক অপার্থিব ভয়ে আতঙ্কে! তার সামনে খুলে যায় দীর্ঘ দৃশ্যপথ, পায়ের নীচের মাটি গুঁড়িয়ে যায়, ফুলে ফেঁপে কেঁপে ওঠে ধরণী—শ্রোতার সহসা মনে হয়, সে আর একটিমাত্র মানুষ নেই—অনুভব করে অন্তরের স্বপ্নাতীত শক্তি, তার মধ্যে আরম্ভ হয় দানবীয় শক্তির লড়াই, ভূমিষ্ঠ হবার জন্য অস্থির হ'চ্ছে বহুপ্রাচীন বিস্ময়েরা; শ্রোতার শ্বাসপ্রশ্বাস হ'য়ে যায় দ্রুত, জ্বালা ধরে আঙুলের প্রান্তে, যুগপৎ হর্ষবিষাদে অস্থির হয় তার চিত্ত। ইউরগিসের মনে হচ্ছিল, লোকটার বাক্য তার অন্তরে বজ্রের মত গুঁড়িয়ে দিয়েছে যেন যতকিছু, ফেঁপে ফুলে উঠেছে আবেগের বন্যা ওর মধ্যে—তাতে মিশে গেছে যত ওর পুরাণো আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার শোক, তার রাগ, তার হতাশা। আজ পর্যন্ত জীবনে যা কিছু অনুভব করেছে সবই ফিরে আসে প্রায় অবর্ণনীয় একটী আবেগের সঙ্গে। ওর এত দুঃখ, এত কষ্ট, এ যন্ত্রণা ভোগা অন্যায় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও যে নিজেকে পিষ্ট হ'তে দিয়েছে, পরাজয় মেনে নিয়েছে অত্যাচার-অবিচার-নিপীড়নের সামনে, বশ্যতা স্বীকার করেছে, ভুলে গেছে নিজের মনুষ্য-পরিচয়, দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে স্বাভাবিক বলে',—এ অধঃপতনের, এ

অপমানের, এ পাগলামি বর্ণনা করবার ভাষা নেই ওর—সহ্য করল ও কেমন করে' এতদিন! আঃ সত্যি কথা, বড় সত্যি কথা—এত পতন মানুষের! এ তো দেহ খুন করা নয়, আত্ম-হত্যা, মানুষের আত্মাকে হত্যা করছে জোতদার দল; ভগবানের প্রেরিত-পুরুষ বলেছেন, "আত্মা-ঘাতকদের সঙ্গে কি দেহ-ঘাতকদের তুলনা হয়!" আর ইউরগিস? মানুষ ইউরগিস?—তার আত্মাকে খুন করেছে ওরা। ও নিজে?—নিজে আপোস করেছে অধঃপতন আর হতাশার সঙ্গে, ভুলে গেছে আশা করতে লড়তে! আর আজ? এখন? একটা ধাক্কায় খুলে গেল ওর অবস্থার রুক্ষ কদর্য রূপটা! মনে হচ্ছিল আত্মার অবলম্বনগুলি ধ্বসে' পড়ে' গেছে ওর, ছুঁচির হ'য়ে ছিঁড়ে গেছে ওর মাথার ওপরের আকাশ—এখন ও দাঁড়িয়ে আছে,—ঊর্ধ্বোত্থিত মুষ্টিবদ্ধ বাহু, চোখ রক্তবর্ণ, শিরাগুলি ফুলে উঠেছে আর বন্যজন্তুর মত আত্মহারা হ'য়ে অসংলগ্নভাবে মহা উত্তেজনায় চীৎকার করে' চলেছে ও। চীৎকার যখন আর করতে পারছে না, তখন ও ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছে, হাঁপাচ্ছে আর আপন মনে বলছে: "ভগবান! ভগবান! ভগবান!"

উনত্রিংশ অধ্যায়

বক্তা মঞ্চের ওপরেই একটি আসনে বসে' পড়েছে; ইউরঘিস বোঝে তার বক্তৃতা শেষ হ'য়ে গেছে। কয়েক মিনিট ধরে' অভিনন্দন ও আনন্দধ্বনি চলে। হঠাৎ কে-একজন একটা গান ধরে, অমনি উল্লাসধ্বনি থামিয়ে জনতাও সমবেত কণ্ঠে সে গান ধরে—হলঘরখানা কাঁপতে থাকে সে-গানে। ইউরঘিস কখনও এ গান শোনেনি, গানের কথাগুলি ও ধরতে পারে না—তবু গানটা অদ্ভুতভাবে ওকে অভিভূত করে' ফেলে—গানটা মার্সেইলেস্! বজ্রগম্ভীর নাদে গীত হ'য়ে চলে এর পদের পর পদ, আর ইউরঘিস তার চেয়ারে বসে' বসে' কাঁপে প্রতিটি স্নায়ুতে, হাতদুটি দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে অনড়ভাবে পড়ে' থাকে কোলের উপর। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত এত নাড়া জীবনে ও কখনও খায়নি—আজ ওর মধ্যে যেন অলৌকিক একটা-কিছু ঘটে যায়। বুদ্ধি বিমূঢ় হ'য়ে গেছে, ভাববার আর ক্ষমতা নেই, শুধু এইটুকু বোঝে, অন্তর-কম্পনের প্রচণ্ড উৎক্ষেপণের মধ্যে ওর মধ্যে জন্মলাভ করেছে নতুন-একটি মানুষ। ধ্বংসের করাল গ্রাস হ'তে ছিনিয়ে আনা হ'য়েছে ওকে, মুক্ত করা হ'য়েছে হতাশার দাসত্ব হ'তে; ওর দুনিয়া বদলে গেছে ওর সামনে—ও আজ মুক্ত, মুক্ত! এখন যদি আগেরই মত দুঃখ-দুর্দশা ভুগতে হয় ওকে, যদি ভিক্ষে করতে হয়, উপোস করতে হয়, তবু আগের ইউরঘিস আর থাকবে না; আজকের দুঃখ-দুর্দশা ভিক্ষে উপোস আর আগেকার ভিক্ষে দুর্দশা উপোস দুঃখ এক নয়—আজ ও প্রতিটী জিনিষ তলিয়ে বুঝবে, সহ্য করবে। অবস্থা বা পরিবেশ আর তাকে খেলার বস্তু বানাতে পারবে না। এখন হ'তে তার একটা ইচ্ছা থাকবে, উদ্দেশ্য থাকবে, সে মরদ হ'বে; এমন একটা বস্তু পেয়েছে আজ যার

জন্ম লড়তে পারবে, প্রয়োজন হ'লে মরতেও পারবে তার জন্ম। এখানকার এই লোকগুলিই ওকে পথ দেখাবে, সাহায্য করবে,—ও বন্ধু পাবে, সাথী পাবে, পাবে সহকর্মী,—বাস করবে আজ হ'তে জ্ঞানের নজরের মধ্যে, চলবে শক্তির হাতে হাত মিলিয়ে।

জনতা গান থামায়, ইউরখিস চেয়ারে হেলান দেয়। সভার সভাপতি এগিয়ে এসে বক্তৃতা আরম্ভ করে ; প্রথম বক্তার পর এর ভাষা স্বর ভাব সবই জ'লো অর্থহীন মনে হয় ইউরখিসের, মনে হয় পাপ করছে লোকটা ! ঐ অলৌকিক লোকটা বলবার পর অন্য কেউ আর বলবে কেন ?—কেন সকলে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না ? সভাপতি বলছিল, সভার খরচ ও পার্টির অভিযান চালাবার জন্য এখন চাঁদা তোলা হবে। শোনে ইউরখিস, কিন্তু একটা আধলাও নেই পকেটে, দেবে কী। অন্য চিন্তায় মন লাগায় ও।

বক্তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' রাখে ; বক্তা তখন একখানা আরাম-কেদারায় মাথার নীচে হাত দু'খানি ভেঁজে রেখেছে—অবসন্নতার মূর্তি। হঠাৎ কিন্তু সে দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে আসে ; সভাপতি বলে, বক্তা এবার শ্রোতৃবর্গের কারও কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেবে। কে একজন—একটা স্ত্রীলোক—টলস্টয় সম্বন্ধে বক্তা কর্তৃক প্রকাশিত কী একটা মত সম্বন্ধে কী-একটা প্রশ্ন করে। টলস্টয় ফলস্টয় নাম শোনেনি কখন ইউরখিস। এমন বক্তৃতার পর এমন প্রশ্ন করা কেন আবার ? আর বুলি আওড়ান নয়, এখন কাজ করতে হবে, অন্যদের ধরে' পাকড়ে জাগাতে হবে, তারপর তাদের সংগঠিত করে' লড়তে হবে !

তবু আলোচনা চলে, যেন গল্পসল্প করছে সব ; উত্তেজনা কেটে যায় ইউরখিসের, ফিরে আসে ও দৈনন্দিনের দুনিয়ায়। কয়েক মুহূর্ত আগে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল পাশের সুন্দরী মেয়েটার হাতের ওপর একটা চুমু

খেয়ে ফেলে, মনে হচ্ছিল অন্ত পাশের লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে। এতক্ষণে আবার ওর মনে পড়ে' যায়, ও একটা ভবঘুরে, ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধভরা ওর পোষাক,—সকলের ওপর মনে পড়ে' যায়—আজ রাত্রে ঘুমোবার আস্তানা জোগাড় করা হয়নি এখনও!

সভা শেষ হয়, জনতা ধীরে ধীরে সভা ত্যাগ করে, ইউরগিস অস্থির হয় অনিশ্চয়তার যন্ত্রণায়। সভাশেষে উঠে যেতে হবে, এটা কেমন যেন ওর মগজে আসেনি, স্পষ্টভাবে না হ'লেও ভেবেছিল এ স্বপ্ন চিরস্থায়ী হবে, চিরকালের জন্য পেয়ে গেছে সাথী ও ভাই। কিন্তু এখন ও বেরিয়ে যাবে আর সব উবে যাবে, এ সব কোথাও কখন খুঁজে পাবে না ও আর। চেয়ারে বসে' ভয়ে ভয়ে ভাবে ও; কিন্তু ওর সারির অন্যান্যরা যেতে চায়, কাজেই উঠতেও হয়, চলতেও হয়; স্রোতের ঠেলায় বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলবার সময় দৃঢ় আশায় চায় অন্যদের মুখের দিকে; উত্তেজিতভাবে তারা সকলে বক্তৃতাটা সম্বন্ধে আলোচনা করছে—কিন্তু ওর সঙ্গে আলোচনা করতে আসবে এমন তো কেউ নেই! দোরের কাছে যেতে রাত্রির ঠাণ্ডা লাগে গায়ে, অমনি মরিয়া হ'য়ে ওঠে ও। যে বক্তৃতা শুনল সে সম্বন্ধে ও কিছুই জানে না, বক্তার নামও জানে না, আর কিছু না জেনে শুনে এমনি এমনি বেরিয়ে যাবে ও! উহুঁ, সে হবে না। কারও সঙ্গে কথা কইতেই হবে। কিন্তু—; ঠিক আছে, সেই লোকটাকেই খুঁজে বের করবে ও, তার সঙ্গেই কথা কইবে। ও লোচ্চা ভিখিরী বলে' সে লোকটা ওকে ঘেন্না করবে না।

ঘুরে ফাঁকা একসার চেয়ারের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও, সেখান হ'তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে; ভিড় কমে' এলে ও মঞ্চের দিকে এগোয়। বক্তা আর মঞ্চের ওপর নেই, তবে মঞ্চে যাবার একটা দোর আছে, দোরটা খোলা আছে, লোক যাওয়া-আসা করছে, কেউ বাধা দিচ্ছে না।

সাহস সঞ্চয় করে' ইউরখিস ভেতরে ঢুকে পড়ে, দোরের পর একটা হল্‌ঘর—ফাঁকা ; সেটার অপর প্রান্তে আর একটা ঘরের একটা দোর ; এ-ঘরটায় বহু লোকের ভিড়। ওর দিকে কেউ তাকায়ও না, নির্বিবাদে ঘরে ঢুকে ও লোকগুলোর মুখের দিকে চাইতে থাকে, ওর বাঞ্ছিত জন অর্থাৎ বক্তাকে দেখতে পায় একটা কোণে ; বাগ্মী কাঁধদুটো কুঁচকে অর্ধমুদ্রিত নেত্রে একখানা আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট, মুখখানা ভয়াবহ রকমের ফ্যাকাসে, প্রায় সবুজে মেরে গেছে, অবশের মত একখানা হাত পাশে পড়ে' আছে ; পাশে দীর্ঘাকৃতি, চশমাপরা একটি লোক দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলছে আর বলছে, "দয়া করে' একটু সরে' দাঁড়ান ; দেখছেন না কমরেড্ কত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন!"

কাজেই ইউরখিসও চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে ; এইভাবে পাঁচ বা দশ মিনিট কেটে যায়। মাঝে মাঝে চোখ খুলে বক্তা পাশের লোকদের দু'একটা কথা বলে ; এই ধরণের এক অবসরে ইউরখিসের ওপর তার চোখ পড়ে, সে দৃষ্টিতে যেন একটা জিজ্ঞাসা, ফলে ইউরখিসের আকাঙ্ক্ষাটা উগ্র হ'য়ে ওঠে—ও এগিয়ে দাঁড়ায়।

প্রায় রুদ্ধশ্বাস দ্রুততায় বলে, "আপনাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছিলাম, হুজুর। আপনার বক্তৃতা শুনে কত যে—কত ভীষণ খুশী যে হ'য়েছি না বলে' যেতে পারলাম না। আমি—আমি এ সব বিষয়ে কিছুই জানি না—"

বৃহদ্‌কায় ব্যক্তিটি কিছুক্ষণের জন্য কোথায় গিয়েছিল, এই সময় ফিরে এসে বলে, "কমরেড্ অত্যন্ত ক্লান্ত, কারও সঙ্গে কথা কওয়া—;" বক্তা কিন্তু হাত তুলে ওকে থামতে অনুরোধ করে, বলে, "আমাকে কিছু বলবার আছে এর", তারপর ইউরখিসের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, "সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আরও জানতে চান আপনি?"

চমকে ওঠে ইউরখিস। "আমি—আমি—আমি...", ভেবে বলে,

"এটা সমাজতন্ত্রবাদ? জানতাম না আমি। যে বিষয়ে আপনি বললেন তাই আমি জানতে চাই, কাজে লাগাতে চাই আমি আপনার...যা বললেন, আমার জীবনে সে সব হ'য়েছে।"

"কোথায় থাকেন আপনি?"

"বাড়ী নেই আমার। আমি বেকার।"

"বিদেশী তো আপনি, তাই না?"

"আমি লিথুয়ানীয়, হুজুর।"

বক্তা কিছুক্ষণ ভাবে, তারপর পাশের বন্ধুটির দিকে ফিরে বলে, "কে আছে এখানে, ওয়ালটার্স্? ওস্ট্রিন্ কি আছে—কিন্তু সে তো পোল—"

বন্ধু জানায়, "লিথুয়ানীয় ও বলতে পারে।"

"ভালই হ'ল। সে চলে' গেছে কিনা একবার দেখবে ভাই?"

পার্শ্বস্থ বন্ধু চলে' যায়। বক্তা ইউরঘিসের দিকে চায়—গভীর কৃষ্ণ চোখ, প্রশান্তি ও ব্যথামাথা মুখ; বলে, "আমায় ক্ষমা করবেন, কমরেড। গত এক মাস ধরে' এমনি বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আর একজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তিনি আপনাকে আমারই মত সাহায্য করতে পারবেন—"

দূত দোর পর্যন্ত গিয়েই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পায়, তাকে নিয়ে ফিরে এসে ইউরঘিসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়—"কমরেড্ ওস্ট্রিন্স্কি"। খুঁড়িয়ে দাঁড়ালে ওস্ট্রিন্স্কি ইউরঘিসের কাঁধ পর্যন্ত হয়তো উঁচু হবে, একটা ঠ্যাঙ একটু খোঁড়া, মুখখানা কোঁচকান বলীরেখাঙ্কিত, পরণে লম্বা কাল পুরোণো একটা কোট, প্রাচীনত্বের উত্তাপে কোটের সেলাইয়ের জোড় ও বোতামের ঘরগুলো সব ফেটে যেয়ে গেছে, চোখে সবুজ চশমা—ফলে ওস্ট্রিন্স্কির মূর্তিটা হ'য়েছে অদ্ভুত। ও ইউরঘিসের হাত ধরে' অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে লিথুয়ানীয় ভাষায় কথা কয়; মুহূর্তমধ্যে সপ্রতিভ হ'য়ে ওঠে ইউরঘিস।

ওষ্ট্রিন্‌স্কি বলে, "সমাজতন্ত্রবাদ জানতে চান? নিশ্চয়। চলুন পথে বেরোই, হাঁটতে হাঁটতে নিরালায় বেশ কথা হবে।"

উস্তাদ যাদুকরের কাছে বিদায় নিয়ে ইউরঘিস এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ওষ্ট্রিন্‌স্কি প্রস্তাব করে, ইউরঘিসের বাড়ীর দিকেই চলা যাক, ইউরঘিসকে এগিয়ে দেওয়াও হবে। ইউরঘিসকে আবার ব্যাখ্যা করতে হয়, ওর বাড়ী নেই। তখন ওষ্ট্রিন্‌স্কির অনুরোধে নিজের জীবনকাহিনী বলে ও: কীভাবে আমেরিকায় এল, মাংসের কারখানায় জীবন, কীভাবে পরিবারটা ভেঙে গেল, কীভাবে ভবঘুরে হ'ল—এই পর্যন্ত বলতেই ওষ্ট্রিন্‌স্কি ওর হাত চেপে ধরে' বলে' ওঠে, "কমরেড্‌, তুমি যে যাঁতার ভেতর হ'তে বেরিয়ে এসেছ! তোমাকে আমরা জঙ্গী লড়াকু করব!"

ওষ্ট্রিন্‌স্কি তখন নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করে: ইউরঘিসকে ও ওর বাড়ীতেই নিয়ে যেত, কিন্তু মুশ্‌কিল হ'য়েছে কি দু'খানা বৈ ওর ঘর নেই, শুতে দেবার বিছানাও নেই; নিজের বিছানাটাই দিত কিন্তু ওর স্ত্রীর অসুখ। শেষ পর্যন্ত ওষ্ট্রিন্‌স্কি উপলব্ধি করে কোন খোয়ে পড়ে' ইউরঘিসকে রাত কাটাতে হবে, তখন ওর রান্নাঘরের মেঝেতে শুতে অনুরোধ করে; সানন্দে রাজী হ'য়ে যায় ইউরঘিস। ওষ্ট্রিন্‌স্কি বলে, "কাল হয়তো এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। কোন কমরেড্‌কে সাধ্যমত আমরা উপোস করতে দিই না।"

ঘেটো অঞ্চলের একটা বস্তীতে দু'খানা ঘর নিয়ে ওষ্ট্রিন্‌স্কির 'বাড়ী'। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ওরা শিশুর কান্না শোনে। ওষ্ট্রিন্‌স্কি জানায়, ওর তিনটি সন্তান, নবাগত চতুর্থটী কাঁদছে। শোবার ঘরের দোর বন্ধ করে' দু'জনে রান্নাঘরে ঢোকে। একদিকে দর্জির কাজ করবার একটা বেঞ্চি, অন্যান্য জিনিষপত্র বিশৃংখলভাবে ছড়ান। কিন্তমিন্ত হ'য়ে যায় ওষ্ট্রিন্‌স্কি, বলে, "অনেক রাত্রি হ'য়ে গেছে কিনা, গেরস্থালীর অবস্থা

এসময় এমনি থাকে" ; বলে' হাসে। দু'খানা চেয়ার টেনে নিয়ে দু'জনে চুল্লির কাছে বসে। ওস্ট্রিন্‌স্কি জানায়, সে "প্যান্ট সমাপ্তি-কারের" কাজ করে, পোষাকের বড় পোঁটলা নিয়ে এসে 'শেষ স্পর্শ' হিসেবে কাটছাট করা, এখানে-ওখানে দু'একটা সেলাই দেওয়া ওর কাজ, খালি ওর নয়, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ঐ কাজ করে। ওস্ট্রিন্‌স্কি বলে, "চোখের জোর কমে' আসছে, একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেলে কি করব জানি না ; জমা তো কিছু নেই, দিন বার চৌদ্দ ঘণ্টা কাজ করে' কোনরকমে বেঁচে থাকা আর কি! প্যান্টসমাপ্তির কাজে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন নেই, তাই যে কেউ এ কাজ করতে পারে, ফলে এতে প্রতিযোগিতা বেড়ে বেড়ে মজুরীর হার নেমে আসছে। মজুরীতে প্রতিযোগিতা প্রথার দস্তুরই এই। হ্যাঁ, এই মজুরীতে প্রতিযোগিতা প্রথা হ'তেই ইউরগিস সমাজতন্ত্রবাদ শিখতে লাগলে সবচেয়ে ভাল করবে। দিনকার-দিন জীবন টেনে চলবার জন্য মজদুরকে কোন একটা কাজের ওপর নির্ভর করতে হয়, এইভাবে তারা নিজেদের মধ্যে রেশারেশি করে, রেশারেশির ফলে সবচেয়ে নীচু শ্রমিক যে-মজুরীতে কাজ করতে রাজী হয়, সকলকেই তাই নিতে হয়। এইভাবে জনসাধারণের বিরাট একটা অংশ দারিদ্র্যের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রাম করে' চলতে বাধ্য হয়। মজদুর অর্থাৎ মজুরীর বিনিময়ে যে নিজের শ্রম বিক্রী করে তার দিক হ'তে এ প্রথার নাম "প্রতিযোগিতা" ; আর মাথার দিকে যারা থাকে অর্থাৎ শোষকরা, তাদের কাছে জিনিষটা অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য রূপ নেয়—তারা সংখ্যায় কম, ফলে তারা জোট পাকিয়ে প্রভুত্ব করতে পারে, তখন তাদের শক্তি আর ভাঙা যায় না। এই কারণে জগৎ জুড়ে দুটো শ্রেণী তৈরী হচ্ছে, দুটী শ্রেণীর মধ্যে থেকে যাচ্ছে সেতুহীন একটা গহ্বর—ধনিক শ্রেণী, অপরিমেয় তাদের ঐশ্বর্য, আর অদৃশ্য শেকলে বাঁধা অন্‌হোতা (বা সর্বহারা) শ্রেণী। প্রতি একজন

খনিকে অন্ততঃ এক হাজার অনুহোতা আছে, কিন্তু তারা অজ্ঞ অসহায়, যতদিন এরা সংঘবদ্ধ হ'তে না পারে, 'শ্রেণী-সচেতন' না হয় ততদিন এদের শোষকের কৃপার ওপর নির্ভর করে' থাকতে হবে। সংঘবদ্ধ করা, শ্রেণী-সচেতন করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ক্লান্তিকর, তবু এ প্রচেষ্টা চলতে থাকবে; এ আন্দোলন তুষার-তটিনীর গতির মত, যাআ একবার সুরু হ'লে সে আর থামতে পারে না। প্রতিটি সমাজতন্ত্রী স্ব স্ব অংশমত কাজ করে' চলে, "সুসময়ের আগমনের" স্বপ্নরূপ দেখে; সুসময় মানে, শ্রমিকরা যখন ভোটকেন্দ্র মারফৎ শাসনযন্ত্র অধিকার করে' উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাতে পারবে।* এই ভবিষ্যৎ জানা থাকলে, মানুষ যত দরিদ্রই হ'ক, জীবনে যত কষ্টই পাক, সত্যি সত্যি অসুখী কখন সে হ'তে পারে না। নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা সে নিজে দেখে যেতে না পা'ক, তার সন্তানরা পাবে, সমাজতন্ত্রীর কাছে তার শ্রেণীর জয় মানে তার জয়; আন্দোলন অবিরাম এগিয়ে চলেছে, এই হ'তেই সে উৎসাহ পায়; যেমন এই শিকাগো শহরে অতি দ্রুতবেগে আন্দোলন বিস্তৃতিলাভ করছে। শিকাগো দেশের শিল্পকেন্দ্র, এখানকার মত এত শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন আর কোথাও নেই; কিন্তু এ সব প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের বিশেষ মঙ্গল করতে পারে না, কারণ মালিকরাও সংঘবদ্ধ, এজন্য হরতাল সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়, তখন ইউনিয়নগুলো ভেঙ্গে যায়, আর ইউনিয়ন ভাঙলেই শ্রমিকরা সমাজতন্ত্রীদের কাছে চলে' আসে।

যে যন্ত্র অর্থাৎ পার্টি মারফৎ অনুহোতা নিজেকে শিক্ষিত করে'

---

* ইউরগিস পরে বুঝতে পারে, যে-শাসকশ্রেণী নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে, ভোটকেন্দ্র মারফৎ তাকে পরাজিত করার আশা আকাশ-কুসুম।

—অনুবাদক

তোলে তার সাংগঠনিক রূপটা এবার ওস্ট্রিন্‌স্কি ব্যাখ্যা করে। ছোট-বড় সকল শহরে "স্থানীয়" (সংগঠন) আছে, এদের হ'তে ছোট ছোট জায়গায়ও "স্থানীয়" গড়ে' তোলা হচ্ছে; এক-একটা স্থানীয়তে এক হাজার হতে ছ' হাজার পর্যন্ত সভ্য আছে, বর্তমানে এদের আছে সর্বসমেত চৌদ্দ শো, মোট সভ্যসংখ্যা পঁচিশ হাজার, পার্টি পরিচালনার জন্ত এরা প্রত্যেকে নিয়মিত চাঁদা দেয়। শিকাগোর সংগঠনটীর নাম "স্থানীয় পাচক জেলা", এখানে এর আশীটি শাখা সংগঠন আছে; শহরের সর্বসমন্বিত এই প্রতিষ্ঠান শুধু নির্বাচনী অভিযান চালাবার জন্তই বৎসরে বেশ কয়েক হাজার ডলার ব্যয় করে। পার্টির মুখপত্র-রূপে একখানা ইংরেজী, একখানা বোহেমিয় এবং একখানা জার্মাণ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, একখানা মাসিকপত্রিকাও বের করা হয়; এ ছাড়া পার্টির "সমবায় পুস্তক প্রকাশ প্রতিষ্ঠান" হ'তে কয়েক লক্ষ সমাজতন্ত্রী পুস্তক ও প্যাম্প্‌লেট ছাপান ও প্রচার করা হয়। গত কয়েক বৎসরের পার্টি এখানে এত উন্নতি করেছে—ওস্ট্রিন্‌স্কি যখন এখানে আসে, তখন এখানে প্রায় কিছুই ছিল না।

ওস্ট্রিন্‌স্কি জাতিতে পোল, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। সাইলেসিয়া (জার্মাণী)-তে কয়েক বৎসর কাটিয়েছে, সেখানে পোল বলেই অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করেছে; সে গত "সত্তর সালসমূহের" কথা, তখন বিস্‌মার্ক ফ্রান্স জয় করার পর "আন্তর্জাতিকের" ওপর তার "রক্ত ও লৌহ" নীতি প্রয়োগ করছে, তবু তখন হ'তেই ওস্ট্রিন্সকি অনুহোতা-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। সে নিজে দু'বার জেল খেটেছে তবে তখন বয়স ছিল অল্প, ও সব তত পরোয়া করেনি। নিজের দিক হ'তে বলতে গেলে, পার্টির জন্ত ওর কৃত্য অপেক্ষা অনেক বেশী করেছে ও, কারণ জার্মাণ সাম্রাজ্যে সমাজতন্ত্রবাদ যখন একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হ'ল, সে সময় ওখানে থাকলে সংগ্রাম করার

তত কষ্ট আর থাকত না, কিন্তু সে সময় আমেরিকায় চলে' আসে ও, এখানে এসে নতুন করে' তাকে আন্দোলন সুরু করতে হয়। আমেরিকায় তখন সমাজতন্ত্রবাদের নাম শুনলেই সকলে হাসত—আমেরিকায় সকলেই 'স্বাধীন' তো! "যেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেই মজুরীগোলামীর প্রকৃতি বদলে যায়!"—মন্তব্য করে ওস্ট্রিল্‌কি।

রান্নাঘরের সিধে শক্ত চেয়ারখানায় হেলান দিয়ে, বাঁকা চুল্লির দিকে পা ছড়িয়ে বসে' ওস্ট্রিল্‌কি চাপাস্বরে কথা করে' চলে, বেশী শব্দ করলে পাশের ঘরের ঘুমন্তরা জেগে যেতে পারে। ইউরঘিসের চোখে এ লোকটিও সভার বক্তা অপেক্ষা কম বিস্ময়কর মনে হয় না; এ গরীব, সবার নীচে, ক্ষুধাপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত—অথচ কত জিনিস জানে, জীবনে কত সাহস করে' এগিয়ে গেছে, কত কাজ করেছে, সত্যিকারের বীর তো এই! ওর মত আরও আছে—হাজার হাজার আছে ওর মত, বিস্ময়ের ব্যাপার যে তারা সকলেই মজুর! এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান, এই সংগঠন ইউরঘিসের সহকর্মীরা গড়ে' তুলেছে—আশ্চর্য! বিশ্বাস করতে পারে না ইউরঘিস, এত মহান এত বিরাট একটা জিনিষ গড়ে' তুলল কুলিমজুর!—এও কি সত্যি হ'তে পারে?

ওস্ট্রিল্‌কি বোঝায়, এই রকমই হয়; সমাজতন্ত্রে নবদীক্ষিত যেন পাগল হ'য়ে যায়—অন্যেরা এই সহজ সত্যটা কেন বুঝছে না, সে বুঝতে পারে না; আশা করে এক সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র জগৎটাকে সে সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষিত করে' ফেলবে! কিছুদিন পরে বুঝতে পারে, কী ভীষণ কঠিন এ কাজ; নতুন নতুন লোক আসতে আরম্ভ করলে পুরাতন কর্মী গতানুগতিকতার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে যায়—এইটেই সবচেয়ে বড় বিপদ, সে অবস্থায় তাকে বাঁচাতে পারা সৌভাগ্যের কথা। বর্তমানে তার উত্তেজনা প্রকাশ করে' ফেলবার বহু সুযোগ পাবে ইউরঘিস, কারণ সামনে রাষ্ট্রপতীয় (নির্বাচনী) অভিযান আসছে

তাই সকলেই এখন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছে। শাখাস্থানীয়র পরবর্তী সভায় ওষ্ট্রিল্‌কি ওকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেবে, তখন ও পার্টির সদস্য হ'য়ে যেতে পারবে। সাপ্তাহিক চাঁদা মাত্র পাঁচ সেণ্ট, তবে কেউ দিতে অক্ষম হ'লে চাঁদা মকুব করে' দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রী দলটা সত্যিকারের গণতন্ত্রী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—পার্টি পরিচালিত হয় সম্পূর্ণরূপে এর সদস্যদের দ্বারাই, এখানে বাইরের কোন টাকাওয়ালা চালানেওয়ালে বা পরিচালক নেই। এ সবের সঙ্গে ওষ্ট্রিল্‌কি পার্টির নীতিগত আদর্শও বোঝায়। ইউরঘিস হয়তো বলতে পারে যে সমাজতন্ত্রীদলের একটাই নীতি—কী? না, "আপোষহীন সংগ্রাম," জগদ্ব্যাপী অনুহোতা-আন্দোলনের এই হ'ল সার কথা। কোন সমাজতন্ত্রী হয়তো বিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হ'ল; তখন, কোন আইন দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মঙ্গল হবে বুঝতে পারলে সে ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গেই সে প্রস্তাবিত আইনের পক্ষে ভোট দিতে পারে; কিন্তু এ সব সুবিধার সীমা আছে—কোন সমাজতন্ত্রীরই ভুললে চলে না যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য বিপ্লবের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করা। আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক সমাজতন্ত্রী দু' বৎসরে আর একজনকে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত করে, সকলের পক্ষে এটা অবশ্য সম্ভব হয় না; তবু ভোটের ওপর এই হারে পার্টি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকলে ১৯১২ সালের মধ্যে মার্কিণ শাসনব্যবস্থা সমাজতন্ত্রীদের করতলগত হবে—সব সমাজতন্ত্রী অবশ্য এতখানি আশা করে না।

সকল সভ্য জাতির মধ্যেই সংগঠিত সমাজতন্ত্রী আছে; এটা, ওষ্ট্রিল্‌কি বোঝায়, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পার্টি, পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন দলের চেয়ে বড়; এর সদস্যসংখ্যা তিন কোটি, এর আট লক্ষ সদস্য ভোট দেয়। পার্টির প্রথম সংবাদপত্র বের হয় জাপানে; আইন সভার প্রথম সদস্য নির্বাচিত হয় আর্জেন্টিনায়; ফ্রান্সে পার্টি মন্ত্রী

মনোনয়নে যোগ দিতে পারে; ইটালি এবং অষ্ট্রিয়াতে ক্ষমতার তুলাদণ্ড পার্টির করধৃত, প্রয়োজনমত যে কোন মন্ত্রীসভার পতন ঘটাতে পারে। জার্মাণীতে সাম্রাজ্যের পূর্ণ ভোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ পার্টির দখলে, তাই অন্যান্য দল পার্টির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য একজোট হ'য়েছে। একটা জাতির অনুষ্ঠোতাদের বিজয়ে কিন্তু কাজ হবে না, ব্যাখ্যা করে' বোঝায় ওষ্ট্রিল্‌কি, কারণ তা' হলে অন্যান্য ধনিক রাষ্ট্র তাদের সামরিক শক্তি দিয়ে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রটীকে পিষে দেবে; এই জন্যই সমাজতন্ত্রী আন্দোলন বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য সমগ্র মানবজাতির আন্দোলন। সমাজতন্ত্র মানবজাতির নবধর্ম—বা, ইউরঘিস ধরে' নিতে পারে যে—'প্রাচীন ধর্মের (খৃষ্টধর্মের) সারমর্মের পূর্ণ প্রয়োগ'।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত ইউরঘিস নব-পরিচিতের সঙ্গে আলোচনায় কাটিয়ে দেয়। তার কাছে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, প্রায় অতি-প্রাকৃত অভিজ্ঞতা—দৈহিক সীমার বাইরে চলে' গেছে এমনি কোন জগতাতীত সত্ত্বার সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হ'য়ে গেছে। গত চার বৎসর ধরে' ইউরঘিস পথ হাতড়ে হাতড়ে আর অবিরাম ভুল করে' চলেছে এই জঙ্গলের ভেতর—আজ হঠাৎ একখানা হাত এসে উঠিয়ে নিয়ে যায় ওকে ভুল আর দুর্দশার গোলকধাঁধা হ'তে, ওকে বসিয়ে দেয় পর্বত-চূড়ায়, সেখান হ'তে ও দেখতে পায় বার বার ওর চলা আর ভুল-করা পথগুলো, দেখতে পায় কর্দমাক্ত জলা—কতবার আটকে গেছে ঐ সব বিপজ্জনক কাদায়, দেখতে পায় ওর এতদিনকার আক্রমণকারী হিংস্র জানোয়ারদের আত্মগোপন করার গুহাগুলি। এই প্যাকিংশহরের কথাই ধরা যাক, এর বহু অভিজ্ঞতা তো ইউরঘিসের আছে, কিন্তু এর কী না জানে ওষ্ট্রিল্‌কি, এর সবকিছু ও ব্যাখ্যা করতে পারে!

ইউরঘিসের দৃষ্টিতে মাংস-কারখানার মালিকরা ছিল দৈবের মত অনিবার্য শক্তি, ওট্রিল্‌কি তাদের দাঁড় করায় গোমাংস ব্যবসায়ের যৌথ ব্যবসায়ীরূপে, বিপুল পুঁজির সংযোগ হ'য়েছে, সংযুক্তপুঁজির পাহাড় সকল প্রকার বিরোধিতা দলিত মথিত করে', আইন উল্টে দিয়ে জাতির মানুষগুলোকে শিকার করে' চলেছে। প্যাকিংশহরে প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে ইউরঘিসের—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূয়োর মারা দেখছিল, মনে হয়েছিল—কি নিষ্ঠুর, কি বর্বর ব্যবস্থা—শূয়োর হ'য়ে জন্মায়নি বলে' সেদিন ধন্যবাদ দিয়েছিল নিজের ভাগ্যকে। আজ ওর নব-পরিচিত ওকে বুঝিয়ে দেয় শূয়োরের সঙ্গে কোন পার্থক্যই ওর ছিল না—মাংস-কারখানার শূয়োর না হ'য়ে ও ছিল কারখানার মালিকের শূয়োর। শূয়োরের কাছে ওরা চায় কী?—লাভ; যতখানি লাভ নিষ্কাশন করতে পারে শূয়োর হ'তে, এই তো? মজদুর থেকেও ঠিক তাই-ই চায় ওরা; অবশ্য, জনসাধারণের কাছেও ওরা তাই-ই চায়—লাভ। শূয়োর কী ভাবে বা কী কষ্ট ভোগ করে, সেটা মালিকদের বিবেচ্য নয়, ঠিক তেমনি মজদুর কী ভাবে বা কী কষ্ট [illegible], সেটাও তাদের বিবেচ্য নয়, মাংসক্রেতাদের সম্বন্ধেও মালিকদের মনোবৃত্তি তাই। এটা প্যাকিংশহরের বৈশিষ্ট্য নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই জিনিষই ঘটে' চলেছে, তবে প্যাকিংশহরে এটা একটু বেশী জোরদার, এই যা। তার কারণ আছে—হত্যা নিয়ে কারবার এখানে, ফলে বেপরোয়া হিংসা ও হিংস্রতা এখানকার বৈশিষ্ট্য—এখানকার মালিকদের হিসাবের প্রথা অনুযায়ী এক পয়সার মুনাফা একশোটা নরজীবনের চেয়ে ঢের ঢের বেশী মূল্যবান। ইউরঘিস যখন সমাজতন্ত্রী প্রচার-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবে—হ্যাঁ হ্যাঁ, অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে ও সব পড়তে পারবে—পরিচিত হ'লে মাংস-ব্যবসায়ের এই যৌথ প্রতিষ্ঠানটীর বহুরূপ বহুদিক হ'তে ও

নিজেই দেখতে পাবে; দেখবে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা বা প্রথা—এটাকে অন্ধ যুক্তিবুদ্ধিহীন লোভের অবতার বলা যায়। একটা দানবের মত লোভ তার হাজার মুখে গিলে চলেছে, হাজার ক্ষুরে দলিত মথিত করে' চলেছে; মুনাফার লোভই হ'ল মহাকসাই ধনতন্ত্রের আত্মা। বাণিজ্য-সাগরের ওপর এ দস্যু-জাহাজের মত ভেসে চলেছে, তার মাস্তুলে কালাঝাণ্ডা, লড়াই ঘোষণা করেছে এ মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধে। ঘুষ আর দুর্নীতি এর প্রাত্যহিকতার প্রথা, কাজের পদ্ধতি; শিকাগোর সরকার এই কারখানা সঙ্ঘের শাখা অফিসমাত্র; শহরের বহু লক্ষ কোটি মণ জল কারখানার মালিকরা চুরি করছে, 'বিশৃঙ্খল' ধর্মঘটের জন্য ধর্মঘটকারীদের কী শাস্তি দিতে হবে তার হুকুম ছাড়ছে আদালত-গুলোর ওপর, মেয়রকে হুকুম দিয়েছে ইমারত আইন তাদের ওপর প্রয়োগ করতে পাবে না। জাতীয় রাজধানীতেও এদের ক্ষমতা অপ্রতিহত; তার জোরে এরা পণ্যের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করিয়েছে, তার জোরে এরা জাল সরকারী রিপোর্ট চালিয়ে দেয়, আয়কর আইন অমান্য করে, তারপর হৈ হল্লা হ'লে হিসেবের খাতাপত্র জ্বালিয়ে দিয়ে "অপরাধী" কর্মচারীদের বিদেশে পাচার করে' দেয়। বাণিজ্য-জগতে এই যৌথপ্রতিষ্ঠানটী জগন্নাথ রথ, এর তলে চাপা পড়ে' প্রতিবছর মুছে যাচ্ছে হাজার হাজার ব্যবসায়, এদেরই কল্যাণে কত লোক পাগল হ'চ্ছে, আত্মহত্যা করছে। গৃহপালিত পশুপালনের ব্যবসা অবলম্বন করে' এক-একটা (মার্কিণ) রাষ্ট্র বেঁচে আছে, আর এরা গরুর দাম এত নামিয়েছে যে পশুপালন ব্যবসা নষ্ট হবার উপক্রম হ'য়েছে; চাপ দিয়ে এরা হাজার হাজার কসাইকে ধ্বংস করেছে। সমগ্র দেশটাকে এরা কয়েকটা জেলায় বিভক্ত করে' প্রতি জেলার জন্য নিজেরা দাম নির্ধারিত করে' দিয়েছে। যত রিফ্রিজারেটর রেলগাড়ী আছে সে সবই এদের, তার জোরে এরা হাঁস মুরগী শাকসব্জী ডিম প্রভৃতির ওপর বিপুল কর

ফলিয়েছে। এদের সাপ্তাহিক মুনাফা কয়েক কোটি ডলার, এ অর্থের শক্তিতে এরা রেল, ট্রাম, বাস, গ্যাস ও বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও নিজেদের সম্পত্তি করবার চেষ্টায় আছে—ইতিমধ্যেই এরা খাদ্যশস্য ও চামড়ার ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছে। এদের সর্বগ্রাসী প্রচেষ্টা দেখে জনসাধারণ একবার ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু প্রতিকারের পন্থা খুঁজে পায়নি তারা। এখানেই হ'ল সমাজতন্ত্রীদের কাজ, পথহারা এই জনতাকে পথ দেখিয়ে সংগঠিত করে' যোগ্য করে' তুলতে হবে এই বিরাট যৌথ মাংসব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটীকে দখল করবার জন্য, এই যন্ত্রকে ব্যবহার করতে হবে মানুষের খাদ্য উৎপাদনের কাজে, তখন আর এই সব কারখানা কয়েকটা দানবীয় দস্যুর জন্য মুনাফার পাহাড় বানাবে না। রাত্রি দুপুরও গড়িয়ে যায়, তখন ইউরঘিস ওষ্ট্রিন্‌স্কির রান্নাঘরের মেঝেয় শোবার ব্যবস্থা করে; তবু প্রায় একটী ঘণ্টা ধরে' ঘুম আর আসে না—জেগে জেগে মহাগৌরবের স্বপ্ন দেখে—প্যাকিং-শহরের জনগণ শোভাযাত্রা করে' এগিয়ে গিয়ে অধিকার করছে মাংস-ব্যবসায়ের যৌথপ্রতিষ্ঠান!

ওষ্ট্রিন্‌স্কি ও তার পরিবারবর্গের সঙ্গে নাস্তাটা খাওয়া হ'য়ে যায় ইউরঘিসের। মন চাঙ্গা। সিধে এলজবিয়েটার কাছে হাজির হয়—তার নিজের বাড়ীতে। কালকের লজ্জা আর নেই,—ভেতরে গিয়ে কালকের ভেবেচিন্তে-রাখা কথাগুলো না উগ্‌লে, এলজবিয়েটাকে ও বলতে লাগে বিপ্লব সম্বন্ধে। এলজবিয়েটার মনটা হায় হায় করে—আহা গো, এমন জামাই এমন হদ্দ পাগল হ'য়ে গেল! কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তার মধ্যে কেটে যায়, তবু এলজবিয়েটা ঠিক করতে পারে না জামায়ের মাথাটা বিগড়েছে, না ঠিক আছে! অনেকক্ষণ পর সে ঠিক করে' ফেলে, রাজনীতি বাদে আর অন্য সব দিকেই জামাইয়ের মগজটা

বিলকুল ঠিক আছে, দুশ্চিন্তা কেটে যায় বেচারীর। ইউরঘিসের বক্তৃতার প্রথম শিকার এলজবিয়েটা কিন্তু সমাজতন্ত্রের দিক হ'তে দুর্ভেদ্য এলজবিয়েটার বর্ম ভেদ করে' কোন যুক্তিই ঢুকতে পারে না। দুর্দশার আঁচে পুড়ে পুড়ে এলজবিয়েটার অন্তর ঝামা ইট মেরে গেছে, তাকে টিপেটুপে অন্য কিছু গড়বার চেষ্টা বৃথা; তার কাছে জীবন মানে ঘুম হ'তে ওঠা থেকে না ঘুমোন পর্যন্ত খাবার জোগাড় করার সমাধান-হীন চিন্তা—কাজেই ওর কাছে ধনতন্ত্রবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের ঝামেলা নেই, আছে রুটিবাদ। নতুন কি-একটা বাদ অমন জামাইকে পেয়ে বসেছে, তা পা'ক, এতে যদি ওর মতির স্থিরতা আসে, পরিশ্রমী করে' তোলে ওকে তা হ'লেই যথেষ্ট, তা হ'লেই এ বাদও এলজবিয়েটার কাছে ভাল। তারপর যখন বুঝতে পারে যে, ইউরঘিস কাজ খুঁজতে চায়, অংশমত সংসারে সাহায্যও করতে চায়, তখন এলজবিয়েটা ওকে যা' খুশী বোঝাবার ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেয়, এবার এলজবিয়েটা সব কিছু বুঝতে রাজী আছে! এই ছোটখাট স্ত্রীলোকটি সাংসারিক জ্ঞানের দিকে অদ্ভুত চৌকস। পিছনে-শিকারী-লাগা খরগোশ দৌড়তে দৌড়তে উপায় চিন্তা করে, এলজবিয়েটাও যেন তেমনি—মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে ও স্থির করে' ফেলে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি ওর মনোভাব কী হবে। ইউরঘিসের সঙ্গে সে সর্ববিষয়ে একমত হ'য়ে যায়, খালি একটি বিষয়ে ওর অমত—চাঁদা দেওয়া কেন আবার! ঐটুকু বাদে, আর সব কিছু ভাল। মাঝে মাঝে ইউরঘিসের সঙ্গে সভায় যেতেও রাজী সে—সে ডামাডোলের মধ্যেই পরদিনের রুটির চিন্তা ও ঠিক করে' নেবে!

দীক্ষিত হবার পর পূরো একটা সপ্তাহ ধরে' ইউরঘিস শহরের এ প্রান্ত হ'তে ও প্রান্ত পর্যন্ত কাজের তল্লাস করে' বেড়ায়; একদিন অদ্ভুতভাবে ভাগ্য খুলে যায়। শিকাগোর অসংখ্য ছোট ছোট হোটেলগুলোর একটার সামনে দিয়ে চলেছে ইউরঘিস, হঠাৎ খেয়াল

হয় একটাতে ঢুকে পড়লে মন্দ হয় না; একটু ইতস্ততঃ করে' ও ঢুকে পড়ে। ভেতরের বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়েছিল, হাবভাব চেহারা দেখে ইউরঘিস ঠিক করে, এই-ই মালিক, তার কাছে গিয়ে কাজের আবেদন জানায়।

"কী কাজ করতে পার?" জিজ্ঞাসা করে লোকটা।

"যা বলবেন, আজ্ঞে।" এতে সবটা ঠিকমত বলা হ'ল না দেখে ইউরঘিস তাড়াতাড়ি জুড়ে দেয়, "অনেকদিন ধরে' কাজকর্ম নেই, হুজুর। আমি সৎ লোক, গায়ে জোর আছে, খাটতে চাই—"

কর্তা তীক্ষ্ণভাবে চায় ওর দিকে, "মদ খাও তুমি?"

"আজ্ঞে, না।"

"ভাল। আমার একটা দারোয়ান আছে, সব কাজই করে, কিন্তু মদ খায়। এই নিয়ে তাকে সাতবার বরখাস্ত করা হ'ল, ঠিক করে' ফেলেছি তাকে আর লাগাবও না ছাড়াবও না, যথেষ্ট হ'য়েছে। দারোয়ান হবে, মানে কুলি, অর্থাৎ সব কিছু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খুব শক্ত কাজ কিন্তু। মেঝে ঝাড়ু দিতে হবে, পিকদানাগুলো ধুতে হবে, বাতি সাফ করা, তেল পোরা জ্বালান, খদ্দেরদের বাক্স তোলা নামান "

"রাজী, হুজুর।"

"ঠিক আছে। মাসে ত্রিশ দিতে পারি বাপু, আর খেতে পাবে। খুশী হ'লে এখনই লেগে যেতে পার। সে ব্যাটার উর্দিটা পরে' নিতে পার।"

সুতরাং ইউরঘিসের কাজ হ'য়ে যায়। মহাবিক্রমে কাজে লেগে যায় ও, খেটে চলে রাত্রি পর্যন্ত। তারপর গিয়ে এলজবিয়েটাকে বলে, তখন অনেক রাত্রি তবু ওষ্ট্রিন্স্কিকে এত বড় সুখবরটা তখনই না

জানিয়ে ও পারে না। খবর দিতে গিয়ে আরও বিস্ময়কর খবর পায়। হোটেলটা কোথায় আছে বলে' চলেছিল ও, ওকে থামিয়ে ওস্ট্রিলকি জিজ্ঞাসা করে, "হিণ্ড্‌স্ নয় তো!"

"হুঁ, ঐ নামই তো।"

ওস্ট্রিন্‌স্কি বলে, "তা হ'লে যে দেখছি শিকাগোর সবচেয়ে ভাল মালিকের কাছে তুমি চাকরী পেয়ে গেছ, অ্যাঁ! সে (এই) রাষ্ট্রের একজন পার্টি সংগঠক, তাছাড়া আমাদের ভাল বক্তাদের একজনও!"

সকালে গিয়েই ইউরঘিস মালিককে বলে; মালিক অমনি ওর হাত ধরে' বলে' ওঠে, "আরে ভাই বল! এ জন্যই তোমাকে ভাল লেগেছিল। একজন ভাল সমাজতন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছি বলে কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারিনি। বাঁচালে এতক্ষণে!"

তখন হ'তে "মালিকের" কাছে ইউরঘিস হ'ল "কমরেড ইউরঘিস," মালিক আশা করে ইউরঘিসও ওকে "কমরেড্‌ হিণ্ড্‌স্" বলে' ডাকবে। নিকট-বন্ধুদের কাছে হিণ্ড্‌সের নাম "টমি" হিণ্ড্‌স্। হিণ্ড্‌স্ লম্বায় খাটো, প্রস্থে প্রশস্ত, রক্তটুসটুসে গাল, পাশে কাঁচাপাকা গোঁফ, অত্যন্ত দয়ালু; এমন প্রাণখোলা লোক কমই পাওয়া যায়, ফুর্তির আর উৎসাহের যেন অন্ত নেই, দিনরাত সমাজতন্ত্র বকছে। একটা বিরাট সভাকে হাসাতে সে ওস্তাদ, কিন্তু একবার জেগে উঠলে তার কথার তোড় ছোটে জলপ্রপাতের মত।

টমি হিণ্ড্‌স্ প্রথম জীবনে কামারের তলপিঠে ছিল; সেখান হ'তে পালিয়ে ইউনিয়ন সেনাদলে যোগ দেয়; এখানে জবরজঙ্গ কম্বল ও অকেজো বন্দুক মারফৎ ওর "কলমের" (সরকারী দুর্নীতির) সঙ্গে পরিচয় হয়। বিপৎকালে বন্দুক ভাঙলে ও বলত, 'ওর একমাত্র ভাই মারা গেল,' অকেজো কম্বল নিয়ে ভুগতে হ'লে দোষ চাপাত নিজের

"বুড়ো" বয়সের ওপর। বৃষ্টি হ'লে ওর গিঁঠে গিঁঠে বাত ঢুকতো, তখন মুখ কুঁচকে ও বলতো, "পুঁজিবাদ রে বাবা, পুঁজিবাদ! কলঙ্কিত সমাজ!" দুনিয়ার সকল রোগ-শোক দুঃখ-দুর্দশার জন্য একটিমাত্র ওষুধ, সকলের কাছেই সেটি প্রচার ও করে; সে কারও ব্যবসায়ে ব্যর্থতা, ডিস্‌পেপসিয়া বা ঝগড়াটে শাশুড়ী যাই হ'ক, চোখের নিমেষে ওষুধ বাৎলে দেয়, "বুঝতেই পারছ কী করতে হবে—সমাজতন্ত্রী প্রার্থীকে ভোট দিও!"

যুদ্ধান্তে হিণ্ড্‌স্ অক্টোপাসের (অর্থাৎ অতিশক্তি ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ের) পদচিহ্ন ধরে' চলবার চেষ্টায় লেগে যায়; যুদ্ধের সময় ও করছিল যুদ্ধ আর একদল লোক করছিল ব্যবসার নামে চুরি, এখন ওর প্রতিযোগিতা শুরু হয় সেই সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের বা চোরদের সঙ্গে। শহর সরকার তাদের কব্জার মধ্যে, রেলপথ-মালিকদের সঙ্গে তাদের যোগ-সাজস, ফলে অন্যান্য সৎ ব্যবসায়ীর সঙ্গে হিণ্ড্‌স্‌ও হ'ল কোণঠাসা। ব্যবসায় চেষ্টা বৃথা বুঝে হিণ্ড্‌স তার পুঁজিপাটা "শিকাগো প্রকৃত সম্পত্তি ব্যাঙ্কে" জমা রেখে একাই লেগে যায় "কলম" নদীতে বাঁধ বাঁধতে; পৌরসভার সংস্কারক সভ্য হয়, কিছুই সংস্কৃত হয় না, তখন ও মজদুর ইউনিয়নসহ চারটী দলে পর পর যোগ দেয়; তিরিশ বছর এই ভাবে লড়বার পর ও বুঝতে পারে কেন্দ্রীভূত দৌলতকে পরাজিত করা যায় না, তাকে একেবারে ধ্বংস না করলে চলে না। অতএব—একখানা পুস্তিকা লিখে ছাপিয়ে বিলি করে' নিজেরই একটা পার্টি গড়তে লেগে যায় ও; এই সময় উড়ো একখানা সমাজতন্ত্রী প্রচারপত্র এসে যায় ওর হাতে, পড়ে' বোঝে এতদিনে ও যে-পথের সন্ধান পেয়েছে, সে-পথ ধরে' অনেকে অনেক আগে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অতএব, হিণ্ড্‌স্ সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য। তখন হ'তে এই আট বৎসর ধরে' যে কোন জায়গায় অর্থাৎ সর্বত্র ও পার্টির মতবাদ প্রচার করে' চলেছে, কোথাও

কোন ভোজ, চায়ের আসর, ধর্ম্ম-সম্মেলন বা মজদুর সঙ্ঘের সভা যাই হ'ক, সেখানে হিগুস্ নিজেকে কোনরকমে নিমন্ত্রিত করে' নেয়—বাইর্ —সমাজের চড়িভাতি, মার্কিণ-আফ্রিকা ব্যবসায়ী। সঙ্ঘের ভোজ বা হোটেলমালিক পরিষদের সভা কোন কিছুতেই আপত্তি নেই হিগুসের—সেখানে গিয়ে সভার উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্বন্ধটা ব্যাখ্যা করে' দিয়ে আসে। এর পর সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য ওর ব্যক্তিগত সফর আছে; সফর শেষ হ'লে নতুন নতুন 'স্থানীয়' গঠনের কাজ আছে, এ সবও শেষ হ'লে বিশ্রামার্থে বাড়ী ফেরে, অর্থাৎ শিকাগোয় সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। হিগুসের হোটেলটা প্রচারের উর্বরভূমি; এখানকার কর্মচারীরা সকলেই সমাজতন্ত্রী, এই হংসদল মধ্যে কেউ বক থাকলে কিছুদিনের মধ্যে হংস সে হবেই, অন্ততঃ চাকরী ছাড়বার সময় দেখবে সে সমাজতন্ত্রী হ'য়ে গেছে। মালিক স্বয়ং হয়তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আলোচনা শুরু করলেন, আলোচনা প্রাণবন্ত হ'তেই তার সাড়া জাগে হোটেলময়, আলোচনাকারীদের ঘিরে ভিড় জমতে থাকে, অল্পক্ষণের মধ্যে ওখানকার সকলেই যোগদান করে, তারপর সকলের মিলিত বিতর্ক আরম্ভ হ'তে আর কতক্ষণ! এটা প্রতিরাত্রির প্রোগ্রাম। টমি হিগুস্ না থাকলে তার এই কাজটি চালায় তার সহকারী, হোটেল পরিচালনার কাগজপত্র নিয়ে তখন কাজ করেন শ্রীমতী হিগুস। সহকারী মালিকের পুরাতন বন্ধু—দেখতে কদাকার, দেহ বিশাল, মাথাটা ছোট, আ-গাল বিস্তৃত মুখ, মুখমণ্ডলের রঙ রঙ-চটা, ঠোঁটের দু'পাশ হ'তে ঝুলছে মংগোলীয় ধাঁচের লিকলিকে দুটো গোঁফ—রূপে ও প্রকৃতিতে অবিকল প্রেইরীর চাষী; আসলে বটেও তাই, জীবনের প্রধান ভাগ কেটেছে ঐ কর্ম্মে, প্রেইরীর চাষীদের সঙ্গে উত্তরে রেলপথ বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াই করে পঞ্চাশটি বছর, তারপর রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়, দল বদলাতে থাকে। শেষে দেখ্

হিগুন্সের সঙ্গে। হিগুন্স্ ওকে বোঝায় মাংস-কারখানার যৌথ প্রতিষ্ঠানটা ধ্বংস না করে' অধিকার করে' নিতে হবে। বিস্ময়কর বুদ্ধি অতএব ও অবিলম্বে দেশে নিজের খেতখামার বেচে শিকাগোয় চলে' আসে। অ্যাম্স্ ট্বারের পরিচয় এই।

এরপর সহকারী-কেরানী হ্যারি অ্যাডাম্স্। দেখতে পণ্ডিত-পণ্ডিত, পাতলা রোগা চেহারা, প্রাচীন (ইংল্যাণ্ড হ'তে আগমনকারী) তীর্থযাত্রীদলের বংশধর, বাড়ী ম্যাসাচুসেট্সে। সেখানে সে কাপড়-কলে দক্ষ শ্রমিকের কাজ করত; দীর্ঘকালস্থায়ী মন্দাবাজারের জন্য হ্যারি এবং তার পরিবারের যায়-যায় অবস্থা হয়; তাই দক্ষিণ ক্যারোলিনা চলে' যায় ও বসবাস করবার জন্য। ম্যাসাচুসেট্সে শ্বেত নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা একভাগের দশমাষ্টমাংশ (·৮), আর দক্ষিণ-ক্যারোলিনায় শতকরা তের ও ষষ্ঠদশমাংশ (১৩·৬), তাছাড়া সেখানে ভোটার হ'তে হ'লে সম্পত্তি থাকা দরকার, নাবালক শ্রমিক নিয়োগেও সেখানে বাধা নেই; ফলে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য কোন ভাবনা নেই। সেখানে ব্যবসায়ে উন্নতিও খুব। হ্যারি এসব জানত না, খালি জানত দক্ষিণ-ক্যারোলিনায় তুলোর ব্যবসায় খুব বাড়বাড়ন্ত, কলগুলো চালু আছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে বেঁচে থাকতে গেলেও একা কাজ কর্লে চলবে না, পরিবারের সকলকেই কাজ করতে হবে—ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুরুষ সকলে, তাও সন্ধ্যা ছটা হ'তে ভোর ছটা পর্যন্ত। প্রতিকার চাই! ও লেগে যায় কল-মজুরদের সংগঠিত করতে; ও কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত। অন্য একটা কাজ খুঁজে নেয়; এ কাজটা বেশ মন দিয়ে করছিল কিন্তু কাজের সময় কম করবার দাবীতে সেখানেও ধর্মঘট লেগে যায়, এবার ও চেষ্টা করে রাস্তার জটলায় বক্তৃতা দেবার, সেখানেই ওর অন্ত। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোয় কয়েদী খাটাবার ঠিকে পায় ঠিকেদাররা, কলকারখানার ক্ষেতে-খামারে

তারা কয়েদী-শ্রমিক সরবরাহ করে; প্রয়োজনমত পর্যাপ্ত কয়েদী না থাকলে শ্রমিকশ্রেণীর লোক ধরে' ধরে' যে-কোন অজুহাতে কয়েদী বানিয়ে নেওয়া হয়, কেননা যেমন ক'রেই হ'ক দেশের শিল্প ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। বক্তৃতা দেবার অপরাধে হ্যারি গ্রেপ্তার হ'ল; ওদের কারখানার মালিকের জ্ঞাতিভাই আবার ম্যাজিষ্ট্রেট, তার হাতে পড়ল হ্যারির 'বিচারের' ভার। ফলাফল বলা বাহুল্য। কয়েদী হিসেবে খাটতে খাটতে হ্যারি মর-মর হ'য়ে পড়ে; কিন্তু সে অবস্থা সহ্য করে ও। কোন কয়েদী-শ্রমিক কাজে অনিচ্ছা দেখালে কি জাইজ্ ই করলে আদালতে ফের তার 'বিচার' হয়, আর একটা মেয়াদ হ'য়ে যায়। প্রাণপণ করে' খেটে চলে হ্যারি, মেয়াদ ফুরোয়, মুক্তি পায় ও। তৎক্ষণাৎ সপরিবারে এবং সপোঁটলাপুঁটলি দক্ষিণ-ক্যারোলিনা ত্যাগ করে, রাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে এসে মন্তব্য করে—'নরক'! ট্রেণের ভাড়া নেই। না থাক। ফসল কাটার সময়, একদিন ক্ষেতে কাজ করে, একদিন হাঁটে—পেট ও পথ দুইএরই হিল্লে হয়। এইভাবে শিকাগো পৌঁছে হ্যারি সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেয়। ও বই পড়তে ভালবাসে, কথাবার্তা বিশেষ কয় না, বক্তৃতা দেওয়া ওর আসে না; ওর অফিস ভেস্কে সব সময়েই একগাদা বই আছেই—লেখে ও। আজকাল ওর লেখনীনিঃসৃত প্রবন্ধ পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এ সব হ'তে ধারণা হ'তে পারে, হোটেলের ব্যবসা ভাল চলে না; কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এই সব র্যাডিক্যাল মতবাদ হোটেল-ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি করে না; যত র্যাডিক্যালের আড্ডা এই হোটেলটী, ব্যবসায়ী-আগন্তুকরাও এতে মজা পায়। ইদানীং অন্যান্য স্থান হ'তে আগত পশু-বিক্রেতাদের এটী প্রিয় হোটেল হ'য়ে উঠেছে। কারখানাওয়ালারা পশু-ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করবার জন্য হঠাৎ পশুর দাম চড়ায়, বেশ কিছু পশু এসে গেলে হঠাৎ আবার দাম নামিয়ে দেয়; বিদেশী এই সব ব্যাপারী

তখন মুস্কিলে পড়ে, পশু ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মত ট্রেণভাড়া পকেটে থাকে না, দু'-এক দিন শিকাগোতে থেকে যেতে হয় কোন সস্তা হোটেল অবলম্বন করে'; হিণ্ড্সের হোটেল সস্তা, এখানেই ওরা জোটে, বারান্দায় কে নরম না গরম বক্তৃতা দিচ্ছে তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। হিণ্ড্সের ধারণা এই সব পশ্চিমা ব্যাপারী ওর মনের মত "মক্কেল", তাদের জন বারকে একজায়গায় জুটিয়ে "প্রথা" (অর্থাৎ কীভাবে কারখানার মালিকরা পশুর দাম নিজের ইচ্ছেমত বেঁধে দিতে পারে) বোঝাতে লেগে যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই হিণ্ড্স্ ইউরঘিসের কাহিনী জেনে যায়—তারপর দুনিয়ার বাদশাহীর বিনিময়েও আর ও নতুন দ্বারোয়ানকে ছাড়তে রাজী নয়। কোন বিতর্কের মধ্যে হঠাৎ থেমে হিণ্ড্স্ বলে, "এই দেখ, আমার ঐ লোকটীকে দেখছ ত', ওসবের (মালিকদের জুয়াচুরির) খুঁটিনাটি সব দেখেছে এ!" হাতে তখন যে কাজই থাক, হাতের কাজ ফেলে ইউরঘিস জুটে যায় এদের বিতর্ক সভায়। বলে হিণ্ড্স্, "কমরেড ইউরঘিস, হত্যামঞ্চে কী দেখেছ, বল তো এদের।" প্রথম প্রথম ইউরঘিস মহামুস্কিলে পড়ে যেত, একদল লোকের সামনে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা আর কাঁচা দাঁত তোলান প্রায় সমান ব্যাপার বলে' মনে হ'ত ইউরঘিসের। ক্রমে ক্রমে এ দুর্বলতা কেটে যায় ওর, ঠিক কোন্ ব্যাপারটা বলতে হবে বুঝে যায়, তারপর হ'তে অনুরোধ এলেই হ'ল! সোৎসাহে বুক ফুলিয়ে ও লেগে যায় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে। মালিক পাশে বসে' আকারে ইংগিতে সাবাস দিয়ে, বিস্মিত হ'য়ে উৎসাহ দেয় ইউরঘিসকে। ইউরঘিস বর্ণনা করে, আনবার সময় মরা শূয়োরগুলোকে কীভাবে একটা লম্বা-চওড়া চোঙের মধ্যে ফেলা হয় "নষ্ট করে' ফেলবার জন্য," ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চোঙের নীচে দিয়ে সেগুলো বের করে' অন্য রাষ্ট্রের কারখানায় পাঠানো হয় 'চর্বি' বানাবার জন্য; অমনি উত্তেজিতভাবে

হিগুস্ মন্তব্য করে ওঠে, "বলুন, আপনারাই বলুন, এমন কাণ্ড-কারখানা কি কেউ বানিয়ে বলতে পারে ?"

তারপর হোটেলওয়ালা বোঝাতে আরম্ভ করে, এ সব অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্রীরা, মাংসের কারখানাগুলির যৌথ ব্যবসায়টীকে সত্যিকার কাজে লাগাতে পারে সমাজতন্ত্রীরা। উত্তরে অধম-শ্রোতা জানায়, সমস্ত দেশটাই তো এ সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছে, কাগজগুলো এ সব মালিকের নিন্দায় ভরা, সরকার এ সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে ;—প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করবার মত জবাব প্রস্তুত থাকে হিগুসের ; বলে, "বুঝলাম, যা বলছেন সব সত্যি, কিন্তু, এ সব হৈচৈএর আসল কারণ কী বলতে পারেন ? গোমাংসব্যবসায়ী এই যৌথ প্রতিষ্ঠানটীর মত বে-আইনী লুঠবাজ আরও যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে ; শীতে গরীবদের জমিয়ে মারবার জন্য আছে কয়লার এমনি একচেটিয়া কোম্পানী, লোহার পেরেকটার দাম পর্যন্ত দুনো আদায় করবার জন্য আছে লৌহ-ইস্পাত একচেটিয়া কোম্পানী, এমনি আছে তৈল একচেটিয়া কোম্পানী—তার অনুগ্রহে গরীবের রাত্রে পড়াশোনা বন্ধ। এ-ও থাকতে খালি মাংসের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ওপর সরকার ও সংবাদপত্র-জগতের এত চোটপাট কেন বলতে পারেন ?" প্রতিপক্ষ হয়তো বলে, তেলের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধেও তো জনসাধারণ গলা ফাড়ছে। হিগুস্ তাকে থামিয়ে ফের বলতে আরম্ভ করে, "দশটী বছর আগে হেনরী ডি লইড্ তাঁর "দৌলত বনাম আমদৌলত" গ্রন্থে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর হাঁড়ির খবর বের করে' দিয়েছিলেন ; বড়কর্তাদের সমবেত চাপে বইখানি মারা পড়ে, আপনি হয়তো তার নাম পর্যন্ত শোনেননি। আজ আবার দু'খানা পত্রিকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে নিয়ে পড়েছে—ফল হয়েছে কী ?—অন্য সব কাগজ

একজোটে এবং তারস্বরে লেখক ও পত্রিকা দু'খানিকে ঠাট্টা করতে লেগেছে, দেশের কেন্দ্রীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান অপরাধী কোম্পানীর মালিকদের স্বপক্ষে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করছে—আর সরকার বাহাদুর ? কিছুই করছে না। বলুন এবার, মাংসের একচেটিয়া কারবার আর তেলের একচেটিয়া কারবারের মধ্যে এত পার্থক্য করা হচ্ছে কেন ?"

এখানে অপরপক্ষ সাধারণতঃ স্বীকার করে, অতশত সে বোঝে না। অমনি দারুণ উৎসাহে টমি বোঝাতে লেগে যায়—তখন তার চোখ দুটো দেখবার জিনিস হ'য়ে ওঠে। "সমাজতন্ত্রী হ'লে বুঝতেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আসলে শাসন করে রেলের একচেটিয়া ব্যবসায়ী কোম্পানীটী ; এই রেল যৌথ কোম্পানীই আপনার শাসনযন্ত্র চালাচ্ছে, তা' যে রাষ্ট্রেই আপনি বাস করুন আপনাদের শাসনযন্ত্র ওদেরই হাতে ; যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদ ওদেরই সম্পত্তি। মাংসের একচেটিয়া কারবারটী ছাড়া অন্য যে সব একচেটিয়া কারবারের নাম করলাম না আমি, সবই রেলব্যবসায়ের শাখা। মাংসব্যবসায় রেল-মালিকানার মধ্যে নিজেদের মিলিয়ে দেয় না, নিজেদের ট্রাক লরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে' রেল কোম্পানীর 'প্রাপ্য' বহু মালভাড়া ফাঁকি দিচ্ছে, রেলের ভাণ্ডারে 'লুঠ' করছে। কাজেই জনসাধারণকে তাতিয়ে তোলা হচ্ছে, কাগজগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য হল্লা লাগিয়েছে, সরকারও মাংসের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! আর আপনার মত সাধারণ জন এ সব দেখে শুনে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যান, ভাবেন আপনারই জন্য এ সব করা হচ্ছে ; একবারও ভাবেন না যে এটা হ'ল শতাব্দীকালব্যাপী ব্যবসায় প্রতিযোগিতার চরম অধ্যায়—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর মালিকানা পাবার জন্য 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল' ও মাংসের ব্যবসায়ের শেষ লড়াই এটা !"

এই প্রতিষ্ঠানে কাজ ও বাস করে ইউরগিস, এখানে তার শিক্ষা

পূর্ণতা লাভ করে। মনে হ'তে পারে ইউরষিস এখানে কাযকর্ম বিশেষ করে না, আসলে ব্যাপারটা তার উল্টো। টমি হিগুসের জন্য ও তার একখানা হাতই কেটে ফেলতে পারে, হিগুসের হোটেলটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর রাখা ওর জীবনের আনন্দ। কাজ করে হাতে আর ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় গোটাবিশেক সমাজতন্ত্রী বিতর্ক—এতে কাজের ক্ষতি হয় না। মনে মনে কোন অবুঝকে বোঝায়, মাজাঘষার কাজে চিন্তার সঙ্গে হাতও চলে জোরে। মদ খাওয়া বা অন্যান্য বদ স্বভাব ও ছেড়ে দিয়েছিল বলতে পারলে সুখের বিষয়ই হ'ত, কিন্তু কথাটা সত্যি হ'ত না। এই বিপ্লবীরা দেবতা নয়, মানুষ—সমাজের ঘৃণ্য গর্তের নোংরামাখা মানুষ। তাদের কেউ কেউ মদ খায়, কেউ খিস্তি করে, আচার-ব্যবহারে কেউ কেউ আদবকায়দার তোয়াক্কা রাখে না। অন্য সাধারণ জনসাধারণের সঙ্গে পার্থক্য এদের একটী—এদের একটা আশা আছে, একটা আদর্শের জন্য এরা কষ্টস্বীকার করে, লড়ে। এক-একসময় ইউরষিসের মনে হয়, স্বপ্নটা রূপ নেবার দিন এখনও বহুদূরে, অস্পষ্ট—তখন এক গেলাস মদ অনেক স্পষ্ট অনেক বেশী আনন্দদায়ক মনে হয়; এক গেলাস হ'তে দু' গেলাস, কি আরও বেশী গেলাস হ'য়ে গেলে, তখন নিজের ওপর রাগ ধরে ইউরষিসের, প্রতিজ্ঞা করে কাল হ'তে আর মদ খাবে না, কিছুতেই না। শ্রমিক শ্রেণী একটু আলোর অভাবে অন্ধকারে ঘুরে মরছে, এক গেলাস বীয়ারের পয়সায় পঞ্চাশখানা প্রচারপত্র কিনে বিলি করে' দেওয়া যায়, তাতে কত অভাগা জ্ঞানের আলো পাবে, সেই আনন্দেই তো মত্ত হ'য়ে থাকা যায়, তা' না সেই পয়সা দিয়ে মদ খাওয়া! এইভাবেই আন্দোলন বিস্তৃত হ'য়েছে, এমনি ত্যাগের দ্বারাই উন্নত হবে। সমাজতন্ত্রবাদ খালি আনলেই হয় না, এর জন্য লড়তেও হয়, এ বস্তু একার নয়, সকলের। যে কারণে ইউরষিসের ত্যাগের এই প্রবৃত্তি, সেই কারণেরই আর একটা দিক ওকে

ক্রুদ্ধ করে' তোলে ; সমাজতন্ত্র সাক্ষাৎ দেববাণী—শোনবার সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে যে এ মতবাদ মেনে না নেয়, সেই বদমায়েশের জন্যই তো ইউরঘিসের মদ খাবার আনন্দ নষ্ট হ'য়ে যায় ; কেউ শোনবামাত্র বুঝে গেলে বা মেনে নিলে ইউরঘিসকে আর মদের পয়সা বাঁচিয়ে প্রচারপত্র কিনতে ও বিলি করতে হয় না, আবার এই জন্যই পরিচিত মহলে ইউরঘিস অস্বস্তিকর। বস্তীতে আশেপাশের ঘরে এলজবিয়েটার কিছু পরিচিত-পরিচিতা আছে, ইউরঘিস তাদের পাইকারীভাবে সমাজতন্ত্রী করবার চেষ্টা করে, সহজে তারা বোঝে না, ইউরঘিস কয়েকবার তাদের মারতে বাকী রাখে।

জিনিষটা এত সহজ সত্য ইউরঘিসের কাছে! ইউরঘিস বুঝতে পারে না, অন্যান্য সব লোক অমনি সহজে সমাজতন্ত্রবাদটা বুঝতে পারে না কেন! এই দেশ, এর ক্ষেত, এর ইমারৎ, রেলপথ, কলকারখানা, এর ভাণ্ডার ধনিক নামক কয়েকটী ব্যক্তির সম্পত্তি, এদেরই জন্য মজুরীজীবীরা খাটতে বাধ্য হচ্ছে, লোকে যা কিছু উৎপাদন করছে তার লাভ গাদা হ'চ্ছে, আরও গাদা আরও গাদা করা হচ্ছে এই ক'জন ধনিকের দৌলত বাড়াবার জন্য ; ধনিকরা শ্রমিকের শ্রম শুষেই অকল্পনীয় বিলাসিতায় দিন কাটায়। এ ত স্পষ্ট! মালিকের মালিকানা ঘুচিয়ে যাঁদের শ্রমে পণ্য উৎপন্ন হয় সেই শ্রমিকদের দিতে হবে লাভটা! দুই আর দুইএ চার হওয়ার মত সহজ সরল ব্যাপার। সমাজতন্ত্রবাদের মোদ্দা কথাই তো এই, অথচ এমন লোকও আছে যারা দুনিয়ার সর্ব বিষয়ে বড় বড় বাত্‌ ওড়াতে পারে কিন্তু বুঝতে পারে না খালি সহজ সরল এই ব্যাপারটা! এ সব পণ্ডিত বলে কি, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি যে ভাবে বড় বড় ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে, গভর্ণমেণ্ট তা পারে না—বলে কি—একবার, হাজারবার বলবে ঐ এক কথা ; হয়তো ভাবে খুব বুদ্ধিমানের মত কথা কইছে। এই সব পণ্ডিত বুঝতে পারে না যে,

হয়ে না, বলে' চলে, "এই যে স্তালারেথের যিশু! এই শ্রেণীসচেতন শ্রমিক! এই শ্রমিক সঙ্ঘের সূত্রধর! এই আন্দোলনকারী, আইনভঙ্গকারী, এই অগ্নিবর্ষী অরাজকপন্থী! আজকের জগৎ তাঁর নাম ভাঙিয়ে মানুষের আত্মা ও দেহের চূর্ণে বানাচ্ছে ডলারের পর্বত, আজ যদি সেই জগৎপ্রভু একবার ফিরে এসে তাঁর নামে অনুষ্ঠিত এই অনাচার একবার প্রত্যক্ষ করতেন, তাহ'লে তাঁরও আত্মা আজ বিভীষিকার ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত! প্রেম ও দয়ার অবতার এ দৃশ্যে পাগল হ'য়ে যেতেন না? সেই ভয়াবহ রাত্রি—যেদিন তিনি গেথসেমেনের উদ্যানে অন্তরবেদনায় আর্ত, রক্তস্বেদ নিঃসৃত হচ্ছে, ভাবুন তো একবার আজকের মাকুরিয়ার অবস্থা দেখলে তাঁর কী অবস্থাটা হ'ত—তাঁরই স্বর্ণমূর্তি সম্মুখে রেখে অসংখ্য মানুষ ছুটেছে ব্যাপকভাবে নরহত্যা করবার জন্যে, নরহত্যা করছে এরা কামুক নিষ্ঠুর দানবদের ঘৃণ্য মুনাফাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য—ভাবুন একবার, এ দৃশ্য দেখলে কী অবস্থা হ'ত তাঁর! বুঝতে পারছেন না, আজ তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গে থাকলে, যে চাবুক মেরে তিনি মন্দির হ'তে সুদখোরদের তাড়িয়েছিলেন, সেই চাবুক দিয়েই—"

নিশ্বাস নেবার জন্য বক্তা মুহূর্তের জন্য থামে। শ্রীমান বলে, "না বন্ধু, ভদ্রলোকের যথেষ্ট বাস্তব বুদ্ধি ছিল। আজকের দিনে তিনি কল কমলালেবু পকেটে করে' নিয়ে গিয়ে সমস্ত মন্দিরটাই উড়িয়ে দিতেন।"

সকলের হাসি থামলে লুকাস পুনরায় বলতে আরম্ভ করে: "কমরেড, বাস্তব রাজনীতির দিক হ'তে বিষয়টা বিচার করুন। ইতিহাসের একটী মানুষ, অনেকে তাঁকে ভগবান বলে ভক্তি করে; আমাদেরই একজন ছিলেন তিনি, আমাদের জীবন যাপন করতেন, আমাদের মতবাদ প্রচার করতেন। আর আজ তাঁকে ছেড়ে দেব তাঁর শত্রুদের

হাতে? বিকৃত করতে দেব তাদের তাঁর আদর্শ? তাঁর বাণী আমরা পেয়েছি—এ বস্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; এই বাণী উদ্ধৃত করে' জনগণের কাছে প্রমাণ করব আমরা যে তিনি কী ছিলেন, কী শিখিয়েছিলেন, কী করেছিলেন? নিশ্চয় করব, হাজার [illegible] করব। দুর্বৃত্ত অলস শয়তানদের তাঁর পুরোহিতের গদি হ'[illegible] টেনে নামিয়ে, আবার আমরা জনগণকে তাঁর আদর্শে কর্মচঞ্চল কর্[illegible]।"

আবার থামে লুকাস। শ্রীমান টেবিলের ওপর হ'তে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে বলে, "এই যে কমরেড, এখান হ'তে সুরু করুন আপনি। ধর্মের গুরু জনৈক বিশপ—তাঁর স্ত্রীর মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার দামের জহরৎ চুরি গেছে! বিশপদের মধ্যে ইনি বিশেষ মসৃণ তৈলচিক্কন! অত্যন্ত পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ বিশপ! দেশপ্রেমিক, মজদুরদরদী বিশপ—মজুরীজীবীদের চৈতন্য আচ্ছন্ন করবার জন্য পৌর আড়কাঠি যুক্তসজ্য!"

উল্লিখিত বাক্‌যুদ্ধে অন্যান্য সমবেতগণ নীরব ছিল। এবার মিঃ মেনার্ড বলে, একটু খোঁচা মারবার উদ্দেশ্যেই মন্তব্য করে যে, সমাজ-তন্ত্রীরা সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত কাঠখোট্টা ছাঁটকাট কার্যতালিকা বানিয়ে রেখেছে বলেই তো সে জানে; অথচ আজ এখানে দু জন সক্রিয় পার্টি-সভ্যের বক্তৃতা শুনে ওর মনে হয়, অন্ততঃ ও যতদূর বুঝেছে যে, কোন বিষয়েই এরা একমত নয়। তার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এরা একটু জানাবে কি, যে কোন বিষয়ে এরা একমত এবং কীজন্য এরা একই পার্টির সভ্য? ফলে, সযত্নচয়িত শব্দসমন্বয়ে দুটী তত্ত্ব তৈরী হয়: প্রথম, জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনব্যবস্থার সাধারণ মালিকানা ও গণতন্ত্রী পরিচালনায় সকল সমাজতন্ত্রী বিশ্বাসী; দ্বিতীয়, সমাজতন্ত্রী বিশ্বাস করে যে, মজুরীজীবীদের শ্রেণীসচেতন সংগঠন সাহায্যেই উক্ত অবস্থা আসতে পারে; ব্যস, এই পর্যন্তই সকল সমাজতন্ত্রী একমত।

ধর্ম-গোঁড়া লুকাসের কাছে সমাজতন্ত্রী সমাজ মানে নব জেরুসালেম —"তোমার" অন্তরে অবস্থিত "রাজ্যের" প্রতিষ্ঠা। শ্রীমানের কাছে সমাজতন্ত্র দূর লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে প্রয়োজনীয় একটা ধাপ ছাড়া আর কিছু নয়, অধৈর্য হ'য়েই এ ধাপ সহ্য করতে হবে; সে নিজেকে "দার্শনিক অরাষ্ট্রতন্ত্রী" বলে। বলে অরাষ্ট্রতন্ত্রী বলব তাকে যে বিশ্বাস করে যে, মনুষ্য সমাজের শেষ অবস্থায় প্রতিটী মানুষের ব্যক্তিত্ব পুষ্ট হবার মত মুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হবে, দৈহিক নিয়মের বন্ধন ছাড়া অন্য কোন নিয়ম বা আইনকানুন দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না। একই প্রকার দেশলাইএ সকলের আগুনই জ্বলতে পারে, একই প্রকার রুটি দিয়ে সকলেরই পেট ভরতে পারে, এইজন্য সংখ্যাতত্ত্বের জোটদ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা চালনা করা সম্ভব হবে। ধরিত্রী একটীই, উপযোগী পদার্থের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে জ্ঞান ও নৈতিক বস্তুর কোন সীমা নাই, যে কেউ এদের যতখানি খুশী আহরণ করতে পারে তাতে অন্যের অংশ কম পড়বার আশঙ্কা থাকে না; এইজন্য "বস্তুর ব্যাপারে সাম্যবাদ আর জ্ঞানের ব্যাপারে অরাষ্ট্রবাদ" এই সূত্রটী বর্তমান অন্‌হোতা চিন্তারাজ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। প্রসববেদনা চুকে গেলে এবং ক্ষত সারলেই সমাজে সরল স্বাভাবিক অবস্থা প্রবর্তিত হবে; প্রতিটী মানুষ জমা রাখবে তার শ্রম, ধরিত্রী মারফৎ উঠাবে তার প্রয়োজনীয় বস্তু, তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদন, বিনিময় ও ব্যবহার পদ্ধতি চালু হবে, এ ব্যবস্থা তখন এত স্বাভাবিক বোধ হবে যে আজ আমরা যেমন হৃদ্‌স্পন্দন সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, তেমনি ঐ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তখন সচেতন থাকব না। তারপর, শ্রীমান ব্যাখ্যা করে, সমাজ ভেঙে একধরণের কতকগুলি সমিতি বা সম্প্রদায়ে পরিণত হবে, যেমন বর্তমানের ক্লাব বা রাজনৈতিক দল, ধর্মসঙ্ঘ; বিপ্লবের পর শিল্প সাহিত্য ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের ভার নেবে এই সব "মুক্ত সমিতি"।

রোম্যান্টিক নভেল পড়তে যারা ভালবাসে তারা রোম্যান্টিক ঔপন্যাসিক-দের ভরণপোষণ চালাবে, এই ভাবে ইম্প্রেসিওনিস্ট চিত্রকার, প্রচারক, সঙ্গীতজ্ঞ, নট, সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির ভরণপোষণ চলবে। এদের কেউ যদি দেখে তার খরচ চালাবার কেউ নেই, সে তখন তার সময়ের এক অংশ দিয়ে অন্য কাজ করে' ভরণপোষণ চালিয়ে নিতে পারবে। এ ব্যবস্থা এখনও আছে; তফাৎটা শুধু এই যে এখন জীবিকা উপার্জনের জন্যই সমস্ত সময় কেটে যায়, আর তখন পরস্বত্বভোগী শোষক-শ্রেণীর উচ্ছেদ হবে বলে যে-কেউ দিন মাত্র একঘণ্টা কাজ করেই নিজের জীবিকা উপার্জন করে' নিতে পারবে। আজকের চিত্রশিল্পীর শ্রোতা ও গুণগ্রাহী অত্যন্ত কম, এই কমসংখ্যক শ্রোতাও ব্যবসা জগতে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য যে প্রতিযোগিতা করেছে তার ফলে নীচ ঘৃণ্য হ'য়ে গেছে সমগ্র চিত্রশিল্প। প্রতিযোগিতার অবসান হ'য়ে সমস্ত মানুষ যখন মুক্ত হবে তখন চিন্তা ও চারুশিল্পের দিকে দিকে যে উন্নতি ও বিস্তার হবে আজ আমরা তার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না।

তখন সম্পাদক জানতে চায়, কোন তথ্যের ওপর নির্ভর করে মিঃ শ্রীমান এমন দৃঢ়নিশ্চয় হ'লেন যে, এমন সমাজ সম্ভব হবে যার সদস্যরা মাত্র একঘণ্টা শ্রম করেই জীবিকা অর্জন করতে পারবে।

জিজ্ঞাসিত উত্তর দেয়, "বর্তমানে বিজ্ঞানের দানগুলিকে তাদের শেষ শক্তি পর্যন্ত কাজে লাগালে এই সমাজেরই উৎপাদন ব্যবস্থা ঠিক কোন স্তরে উঠতে পারে বা কতখানি বিস্তৃত হ'তে পারে সেটা নিরূপণ করবার কোন ব্যবস্থা আজ নেই। ধনিকতন্ত্রের হিংস্র বর্বরতার চাপে আমাদের বুদ্ধি এমন অসাড় হ'য়ে গেছে যে, এর কাছে যৌক্তিকটা যুক্তির ওপর নির্ভর করে না; সে যাই হ'ক, বিজ্ঞানের বর্তমান শক্তি আমাদের বর্তমান যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা নিরূপিত উৎপাদনের পরিমাণকে যে বহু বহু গুণে ছাড়িয়ে যাবে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক

অনুযোক্তার বিজয়ের পর যুদ্ধ হ'বে অভাবনীয় ব্যাপার; যুদ্ধের জন্য সমগ্র সমাজকে যে-মূল্য দিতে হয় তার পরিমাণ নিরূপণ করবে কে?—একটা যুদ্ধে যে সংখ্যায় জীবন ও যে পরিমাণে প্রয়োজনীয় পণ্য নষ্ট হয়, সে হিসাব এখন তুলছি না, লক্ষ লক্ষ লোককে অলস বা উৎপাদন ব্যবস্থা হ'তে দূরে সরিয়ে রেখে দীর্ঘকাল ধরে' তাদের যুদ্ধ ও কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত করার খরচ সেও ধরছি না—ও সব ছেড়েই দিচ্ছি আমাদের হিসাব হ'তে—কিন্তু যুদ্ধোন্মাদনা, যুদ্ধ-সৃষ্ট বিভীষিকা, পাশবিকতা, অজ্ঞতা, যুদ্ধের জন্য সরকার কর্তৃক মদ ও গণিকাবৃত্তির খোলা আয়োজন, যুদ্ধের জন্য যে সব অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, শিল্পোৎপাদনে অপটুতার সৃষ্টি হয়, সমাজের যে চরম নৈতিক অধঃপতন হয় এবং এই সব কারণে সমাজের প্রাণশক্তির যে বিপুল অপচয় হয় তার পরিমাণ নিরূপণ করবে কে? এই রক্তাক্ত যুদ্ধ-দানবের আহার যোগাবার জন্য সমাজের প্রত্যেকটা সক্ষম মানুষকে দৈনিক ছ'ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয় বললে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে বলে কি মনে হয় আপনার?"

এর পর শ্রীমান প্রতিযোগিতাজাত অপচয়ের মোটামুটি একটা রেখাচিত্র দিতে আরম্ভ করেন: ঔদ্যোগিক শিল্পযুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি; বিরামহীন দুর্ভাবনা ও দ্বন্দ্ব; চারিত্রিক অধঃপতন, যেমন মদ্যপান, অর্থ-নৈতিক দুশ্চিন্তার জন্য গত বিশ বৎসরে মদ্যপানের পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ হয়েছে; সমাজের অলস ও অনুৎপাদক অক্ষয় অর্থাৎ পলকাচিত্ত ধনী ও সর্বস্ব খুইয়ে-বসা গরীব; আইন ও নির্যাতনের সমগ্র ব্যবস্থা; এমনি ধনিকের ঔদ্ধত্যবিলাসের জন্য দর্জি, নৃত্যশিক্ষক, মেয়েদের টুপী ফিতে প্রভৃতি নির্মাতা, পাচকাধ্যক্ষ, বরকন্দাজ প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় পদসৃষ্টিদ্বারা সমাজের সৃষ্টিশক্তির অপচয়। বলে, "বোঝেন নিশ্চয় যে, প্রতিযোগিতাপূর্ণ সমাজে শক্তির পরথ অর্থে, এবং শক্তির প্রকাশ অর্থের অপচয়ে; সমাজের শতকরা ত্রিশ জন সমাজের অপ্রয়োজনীয় পণ্য

উৎপাদনে নিযুক্ত আছে, আর সে পণ্য নষ্ট ([illegible] নিজস্ব ভাষায় 'ব্যবহার') করছে শতকরা একজন। এই কি পু[illegible] ! পরগাছাদের চাকরবাকর, দারোয়ান বেয়ারা বরকন্দাজ স্যাকরা মণিকার ফ্যাসানী টুপী-ফিতে প্রভৃতি প্রস্তুতকারকরাও পরগাছা—এদের ভরণপোষণের জন্যও সমাজের প্রয়োজনীয় সদস্যদের অতিরিক্ত [illegible]শ্রম করতে হয়। মনে রাখবেন, এই পৈশাচিক ব্যাধি হ'তে শুধু অল[illegible]ছা ও তাদের সেবকরাই ভোগে, এ বিষ সমগ্র সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত [illegible]। এক লক্ষ উচ্চস্তরের অভিজাত স্ত্রীলোকের নীচে আছে দশ লক্ষ ম[illegible]ত্ত স্ত্রীলোক —এদের দুঃখ এরা 'নিজেদেরকে অভিজাত বলতে পা[illegible] না, তবু সর্বসমক্ষে অভিজাত সাজবার আপ্রাণ চেষ্টা করে; ত[illegible]র নীচে আবার পঞ্চাশ লাখ বড় জোৎদারদের স্ত্রী আছে, এরা "ফ্যাসন পত্রিকা" পড়ে' টুপীর কাট-ছাট ঠিক করে; এদের পর [illegible]কানের মেয়ে, পরিচারিকা, সহকারিণী প্রভৃতি—এরা নকল ও সস্ত[illegible] হুররতের মোহে দেহবিক্রয় করে। এর সঙ্গে ধরুন, অগ্নিতে ঘৃ[illegible]হুতি [illegible]ত পণ্য বেচবার হাজারো ফন্দীফিকির, কেন না বিক্রীর বা[illegible]রও তো প্রতিযোগিতা আছে, উৎপাদক ও দোকানদারের শো-কেসে, প্রাচীরপত্রে, পত্রিকায় মেহনৎকারীর পকেট কাটবার জন্যে হরেক রকম বিজ্ঞাপন।"

[illegible] ফিসার জুড়ে দেয়, "জালিয়াতির দ্বারা সৃষ্ট অপচয়টাও ভুলবেন না।"

শ্রীমান বলে' চলে, "অতি-আধুনিক বিজ্ঞাপনের পেশায় আসা যাক, অর্থাৎ জনগণ যে পণ্য কিনতে চায় না সেই পণ্য তাদের দিয়ে কেনাবার ফন্দীবিজ্ঞান, এটা ধনিক সমাজের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পৈশাচিক লীলাক্ষেত্র; বিজ্ঞাপনের কথা ভাবতে গেলে মানুষের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়—ধনিকদের সৃষ্ট গণ্ডা গণ্ডা বিভীষিকার কোন্‌টা ধরবে, কোন্‌টা ছাড়বে। একটা পণ্যের একটামাত্র প্রকার থাকলেই যেখানে

সমাজের প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে মিটে যেত, সেখানে অলসদের অহংকার ও ন্যাকামি চরিতার্থ করবার জন্য সেই একই পণ্যের কতটা প্রকার-ভেদ করে' যে সময় ও শক্তির অপচয় করা হয় সেটাও বিবেচনা করবেন! ভাবুন একবার পণ্যের "সস্তা সংস্করণ", উৎপাদনের অপচয়টা—আসলে জিনিসটা অজ্ঞ জনগণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা ছাড়া তো কিছু নয়; জামাকাপড় খাদ্যপানীয় প্রভৃতিতে ভেজাল দিয়ে এরা সমাজের যে অপচয়টা করে তার হিসাবও এই সঙ্গে ধরে' নেবেন।"

প্রাক্‌প্রচারক যোগ দেয়, "সেই সঙ্গে এর নৈতিক দিকটাও দেখবেন।"

শ্রীমান বলে' ওঠে, "ঠিক বলেছেন; ঔদ্যোগিক প্রতিযোগিতা হ'তেই উৎপন্ন হয় নীচ দুর্বৃত্ততা, হিংস্র নিষ্ঠুরতা, ষড়যন্ত্র, মিথ্যাবাদিতা, ঘুষ, বাহ্বাস্ফোট, ঘৃণ্য আত্মপ্রচার, দৌড়োদৌড়ি হাঁকাহাকি, দুশ্চিন্তা। প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার সারমর্ম হচ্ছে নকল ও ভেজাল—"সবচেয়ে সস্তা বাজারে খরিদ করে' সবচেয়ে আক্রা বাজারে বিক্রী করা" উক্তিটা পোশাকী কথা, আসল কথা ঐ ভেজাল ও নকল। একজন সরকারী অফিসার হিসাব করে' দেখিয়েছেন যে শ্রেফ ভেজাল খাদ্যের জন্যই জাতির ২,৫০০,০০০,০০০,০০০ ডলার বছরে বরবাদ যায়, যে বস্তু মানুষের পাকস্থলীতে গিয়ে ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার করে না অথচ বাইরে থাকলে কাজে লাগত, এ খাদ্য না খেলে লোক সুস্থ থাকত কিন্তু খাবার ফলে অতিরিক্ত ডাক্তার ও ধাত্রী খরচ হয়, তা ছাড়া জাতির এক পুরুষে দশ হ'তে বিশ বৎসর আয়ু কমিয়ে দেয় এই খাদ্য অর্থাৎ একটা জাতির এতগুলি মানুষের দশ হ'তে বিশ বৎসরের উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট করা। তারপর ধরুন, যেখানে একটা দোকান মারফৎ এই জিনিসগুলো বেচলে হ'ত, প্রতিযোগিতার জন্য

ডজন ডজন দোকান খুলে সময় ও শক্তির অপব্যবহার করা হয়। দেশে দশ৷ হ'তে বিশ লক্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে, তার পাঁচ হ'তে দশগুণ কেরাণী আছে, এর ওপর প্রতিটী পণ্য এ-হাত হ'তে ও-হাত, ও-হাত হ'তে সে-হাত হ'চ্ছে, একই পণ্যের লাভ-লোকসানের বারবার হিসাব কেতাব চলছে, তার সঙ্গে চলছে প্রতিটী বিক্রেতার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা। আবার এই ব্যবসা পদ্ধতির জন্য ব্যাপক আইন যন্ত্র তৈরী করতে হয়েছে, শত শত খণ্ডযুক্ত লক্ষ লক্ষ বই নিয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার, সেই সব বইএর ব্যাখ্যা করবার জন্য আদালত বিচারক জুরী, তাদের পাশ কাটাবার জন্য উকীল, ধাপ্পা, ধোথা, মিথ্যা আর ঘৃণার মজুদ। হিসাব করুন বেহিসাবী অন্ধভাবে পণ্যোৎপাদনের অপচয়টা—কারখানা তালাবন্ধ হ'চ্ছে, মজদুররা কর্মচ্যুত হ'চ্ছে, গুদামে মাল পচছে, এর মুকুট হ'য়ে বসে' আছে ফাটকাবাজারীরা, এরা হয়তো কোন চালু ব্যবসায় পঙ্গু করে' দিচ্ছে নয় অপ্রয়োজনীয় কোন পণ্যকে আকাশে তুলছে ; পণ্যের মালিকানা, মালিকানার অছিগিরি, ব্যাংকের পতন, বাণিজ্যসংকট, আতঙ্ক, শহরের রিক্ততা, জনগণের উপবাস—সব ধরুন। অ্যাটর্ণি, ঘোষক, বেলিফ, বিজ্ঞাপন বিলিকারক, প্রাচীর-পত্র সাঁটার লোক, বিজ্ঞাপনী কোম্পানী প্রভৃতি অনুৎপাদক পেশা জুড়িয়ে বসে' আছে—এ সবে কী ভীষণ সময় ও শক্তির অপচয় হচ্ছে একবার ভাবুন ; প্রতিযোগিতা ও রেলের একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য সকলে ভিড় করছে শহরগুলোয়—এর ফলে জাতীয় আয় ও আয়ুর ক্ষয়ক্ষতিটা, হিসাব করুন ; হিসাব করুন—বস্তী, বিষাক্ত হাওয়া ও ব্যাধিজনিত জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ ; অফিসী ইমারৎগুলোর কথা ভাবুন—তলার ওপর তলা উঠছে, মাটির তলে তলার নীচে তলা নামছে—এতে সময় শক্তি ও মালমসলার কী অপচয়টা হয় একবার হিসাব করুন। তারপর সমগ্র বীমা ব্যবসায়টা ধরুন—বিপুল এর

পরিচালন ব্যবস্থা, অগণিত এর কেরাণী এবং সেই কেরাণীদের অপরিমেয় শ্রম—সমস্তটাই ব্যর্থ, অকেজো, অপচয়—"

সম্পাদক বলে, "বুঝলাম না।"

"সাম্যবাদী সাধারণতন্ত্র বিশ্বব্যাপ্ত স্বয়ংক্রিয় বীমা প্রতিষ্ঠান ও আমানতী ব্যাংক—এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সকল লোক এ প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ভোগ করবে। পুঁজি হবে সকলের সম্পত্তি, এর লোকসান সকলের লোকসান, সে ক্ষতিপূরণ করবে সকলে মিলে। উক্ত ব্যাংক হবে প্রত্যেকের সরকারী জমাখরচ রাখবার প্রতিষ্ঠান। একটী সরকারী সর্বাত্মক বুলেটিন থাকবে, তাতে সাধারণতন্ত্রের বিক্রয়যোগ্য প্রত্যেকটী পণ্যের সঠিক বিবরণী থাকবে; সে বিক্রয় হ'তে কেউ লাভ করবে না, অমিতব্যয়ী হবার জন্য বিজ্ঞাপন থাকবে না, ঝুটো মালকে সাচ্চা বলে' চালান হবে না। থাকবে না প্রবঞ্চনা, ভেজাল, নকল, ঘুষ বা 'কমিশন'।"

"দাম স্থির করা হবে কী ভাবে?"

"উৎপাদন ও বহনে যে শ্রম ব্যয়িত হবে তার মূল্য হ'তে পণ্যের মূল্য নিরূপিত হবে, সে অঙ্কটা কষা হবে গণিতের প্রথম নিয়ম দিয়ে। জাতীয় ফসল ক্ষেতে পরিশ্রম করে' কয়েক লক্ষ শ্রমিক কয়েক কোটি মণ গম উৎপাদন করবে, প্রত্যেকে মেহনৎ করছে, ধরুন, একশো দিন, কাজেই এক মণ গমের দাম হবে একজন ক্ষেতমজুরের দৈনিক আয়ের এক-দশমাংশ। ধরা যাক, একজন ক্ষেতমজুরের এক দিনের মজুরী হবে পাঁচ ডলার, তা হ'লে এক মণ গমের দাম হবে পঞ্চাশ সেন্ট।"

মিঃ মেনার্ড জিজ্ঞাসা করে, "বলছেন 'ক্ষেতমজুর ও তার মজুরী', তা হ'লে সব শ্রমিকের পারিশ্রমিক কি এক হবে না?"

"স্পষ্টতঃ না। কতকগুলো কাজ কঠিন, কতকগুলো সহজ। সব কাজের সমান মজুরী হ'লে গ্রাম্য ডাকবাহক পাওয়া যাবে লাখ লাখ,

কিন্তু কয়লার খনি মজুদুর একটাও পাওয়া যাবে না। অবশ্য অন্য ব্যবস্থা করা যায়—এক মজুরী রেখে খাটবার সময়ের তারতম্য করা যায়। বিশেষ শিল্পে বিশেষ কালে বিশেষ সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হ'লে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমসময় অবিরত কমিয়ে বাড়িয়ে চলতে হবে। এখনও এই নীতি অনুসরণ করা হয়, তফাৎ এই যে এখন নীতিটা চালু রাখা হয়েছে অন্ধ ও অসম্পূর্ণভাবে—এখন এক শিল্প হ'তে অন্য শিল্পে শ্রমিক চালনা করা হয় গুজব রটিয়ে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে, আর তখন এটা করা হবে সরকারী সর্বাত্মক বুলেটিন মারফৎ।"

"যে সব পেশার সময়ের মূল্য নিরূপণ করা কঠিন তাদের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হবে? যেমন ধরুন একখানা বইএর মূল্য ঠিক করবেন কী ভাবে?"

"কেন, কাগজ ছাপাই ও বাঁধাইএর শ্রমমূল্য হ'তে—বর্তমানের এক-পঞ্চমাংশ।"

"আর গ্রন্থকার?"

"আগেই তো বলেছি, রাষ্ট্রদ্বারা জ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কোন একখানা গ্রন্থসম্বন্ধে রাষ্ট্র বলতে পারে লিখতে একবছর লেগেছে, আর গ্রন্থকার বলতে পারে ত্রিশ বছর। গ্যেটে বলতেন, তাঁর এক একটা সুন্দর উক্তির মূল্য এক থলে স্বর্ণ মোহর। আমি এখানে যে জিনিষটা ব্যাখ্যা করছি তাকে জাতীয়—জাতীয় কেন, আন্তর্জাতিক—পণ্য সরবরাহ পদ্ধতি বলা যায়। মানুষের জ্ঞানের তৃষ্ণা আছে, এজন্য সে বেশীক্ষণ পরিশ্রম করবে, বেশী রোজগার করবে, এবং তার পরিতৃপ্তির জন্য নিজের রুচি ও সঙ্গমত ব্যবস্থা করবে। সকলের মত আমিও এই মাটিতেই বাস করি, অধিক সংখ্যকের মত একই প্রকার জুতো পরি, একই রকম বিছানায় ঘুমোই কিন্তু এই অধিক সংখ্যকের চিন্তা আমার চিন্তা নয়, এরা যাকে এদের চিন্তানায়ক ঠিক

করবে আমি তার চিন্তানেতৃত্ব মানব না, কাজেই তার জন্য খরচও করব না। আমার মতে এসব বিষয় এখনকার মত তখনও অনিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত। কোন প্রচারকের প্রচার যদি কতকগুলো লোক শুনতে চায় তাহ'লে তারা একত্র হ'য়ে খুশীমত খরচ করে তার প্রচার শুনতে পারে, ধর্মসঙ্ঘ পোষণ করতে পারে। আমি সে প্রচার শুনতে চাই না, সেখানে আমি যাব না, আমার খরচও হবে না। এখনই ধরুন, মিশরীয় মুদ্রা, খৃষ্টীয় সঙ্ঘ, উড্ডয়ন যন্ত্র, ক্রীড়া, প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পত্রিকা আছে, এদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। অপর পক্ষে, মজুরী গোলামীর উচ্ছেদ হ'লে, এবং ধনিক শোষকের কর না দিয়ে কিছু জমাতে পারলে বিবর্তনবাদের উদ্গাতা ক্রাইএভ্ বিথ নিটুসের বাণী ব্যাখ্যা ও প্রচার করবার জন্য পত্রিকা বের হবে, তেমনি পরিচ্ছন্ন আহার বিজ্ঞানের স্রষ্টা হোরেস ফ্লেচার-এর বিজ্ঞান সম্বন্ধে, হয়তো মেয়েদের গাউনের ঝুল কম করবার জন্য, বৈজ্ঞানিক প্রথায় নরনারীর জন্ম পরিচালনার জন্য বা পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য পত্রিকা থাকবে।

অল্পক্ষণ থামে ডাঃ শ্লীমান, তারপর হেসে বলে, "একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম, তবু সবে 'শুরু' করছি।"

"আর কি আছে?" জিজ্ঞাসা করে মেনার্ড।

প্রতিযোগিতা-সৃষ্ট কতকগুলো অপচয়েরই শুধু উল্লেখ করলাম, কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে প্রতিটি পণ্যের কি ভাবে সঠিক উপযোগ হবে সে তো এখনও বলিনি। ধরে নেওয়া যাক যে পাঁচজন মানুষ নিয়ে এক একটা পরিবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের দেড় কোটি পরিবার আছে, খুব কম করে ধরলেও এদের মধ্যে এক কোটি পরিবার আলাদা আলাদা বাস করে; এই সব পরিবারের ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজগুলো করে হয় গৃহিণী, নয় মাহিনে করা গোলাম। বৈজ্ঞানিক

আড্ডু বা সমবায় রান্না ব্যবস্থার কথা এখন ছেড়ে দিয়ে খালি বাসন-মাজাটা ধরা যাক ; পাঁচজনের পরিবারের বাসন মাজতে একজনের অন্ততঃ আধ ঘণ্টা লাগে, দশ ঘণ্টার রোজ ধরলে তাই এ একাজে পাঁচ লক্ষ সক্ষম ব্যক্তির—অধিকাংশই স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ; কাজটা কত নোংরা, কি ভাবে মানুষের বুদ্ধি ভোঁতা করে দেয়, খেয়াল রাখবেন ; রক্তশূন্যতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, চেহারার কদর্যতা, বদমেজাজ, গণিকাবৃত্তি, আত্মহত্যা, মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতির একটা কারণ এই কাজটী ; আবার ঐ সবের ফলে স্বামীর মাতাল হওয়া, বা ছেলেদের অধঃপতন হওয়া আশ্চর্য নয়—এসবের জন্য জাতিকে অতিরিক্ত খরচ করতে হয় ! কিন্তু আমাদের ছোট ছোট মুক্ত সঙ্ঘগুলিতে বাসন মাজবার যন্ত্র থাকবে, তাতে খালি চোখে দেখার মত সাফ ও শুকানোই হবে না, বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাসনগুলিকে বীজাণুমুক্তও করা হবে, আর তাতে সময় খরচ হবে বর্তমানের দশভাগের এক ভাগ অথচ আজকের মত তাতে স্বাস্থ্য মেজাজ বা মন খারাপ হবে না। মিঃ জিলম্যানের বই পড়ুন, এসব বিষয় আরও ভাল ভাবে জানতে পারবেন। তারপর ক্রোপোটকিনের 'ফিল্ড, ফ্যাক্টরীজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কশপস্' (ক্ষেত ও কলকারখানা) হতে নতুন কৃষি-বিজ্ঞান পড়ুন ; গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, এই পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী মাটিতে চাষ করলে বছরে একই জমিতে দশবারটি ফসল উঠবে, মাত্র এক একর (প্রায় সাড়ে তিন বিঘা) জমিতে দুশো টন ফসল জন্মাবে ; মানে বর্তমানে (১৯০৪) এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ ক্ষেতে চাষ হয় তারই উৎপাদিত ফসলে সমগ্র পৃথিবীর লোককে খাওয়ান যাবে। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত খামার ও চাষীদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের জন্য এ জিনিস এখন সম্ভব নয় ; কিন্তু কল্পনা করুন, বৈজ্ঞানিকরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সরবরাহ সমস্যাটার সমাধান করার জন্য

যৌক্তিক ও রীতিমত চেষ্টা করতে লেগেছেন; ছেলেদের খেলা, শিকারীদের শিকার ও কবিদের বাসের জন্য একটা বনভূমি বাদ রেখে সমস্ত পতিত ও পাহাড়ে জমি আবাদযোগ্য করা হ'ল; প্রতিটী ফসলের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী আবহাওয়া ও মাটি নির্ধারিত হ'ল; সমগ্র জাতির জন্য প্রয়োজনীয় ফসল ও তার যোগ্য ভূমির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপিত হ'ল এবং সর্বাপেক্ষা দক্ষ কৃষি রাসায়নিকদের তত্ত্বাবধানে সর্বাপেক্ষা উন্নত যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হ'ল—ভাবুন একবার ফলটা! আমি নিজে এক খামারে প্রতিপালিত, চাষের কাজ যে কত মারাত্মক তা আমি জানি; এইজন্যই বিপ্লবের পর কৃষিকাজ কী রূপ নেবে তার পূরো চিত্র আঁকতে চাই আমি। আলু পোঁতার যন্ত্রের কথা ধরা যাক, কলটা চালিত হবে চারটে ঘোড়া বা একটা বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে; একটা যন্ত্র একদিনে সত্তর বিঘা জমিতে গভীর ভাবে লিক কাটবে, গর্ত খুঁড়বে, আলু ছিড়বে, পুঁতবে, মাটি ঢাকা দেবে! আলু তোলা যন্ত্রের চিত্র—সাড়ে তিন হাজার বিঘা জমি হ'তে একদিনে মাটি ও আলু তুলে আলুগুলো বস্তায় ফেলবে—এও চলবে বিদ্যুতে! দেখব এমনি ভাবে সকল রকম ফসলের চাষ চলছে—গাছ হ'তে আপেল কমলা প্রভৃতি 'তোলা' হবে কলে, গাই দোয়ান হবে বিদ্যুতে—কলে গাই দোয়ানটা অবশ্য এখনি হচ্ছে। ভবিষ্যতের ফসল কাটার চিত্র!—বিশেষ ট্রেনে লক্ষ লক্ষ হর্ষোৎফুল্ল নরনারী আসছে ফসল কাটার ক্ষেতে তাদের গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ করবার জন্য—যেখানে যতগুলি নরনারী প্রয়োজন সেখানে ঠিক ততগুলিই পাঠান হচ্ছে! এর সঙ্গে তুলনা করুন বর্তমানের কষ্টপ্রদ কৃষিপদ্ধতি, ছোট ছোট ক্ষেত, ছোট খামার, চাষ করছে একটি মাত্র অপুষ্ট, কুৎসিৎ, নিরানন্দ, অজ্ঞ চাষী—তার সহধর্মিনীটী ফ্যাকাসে, রুগ্ন, দৃষ্টি তার বিষণ্ণ, দুজনে খামারে খাটছে

ভোর চারটে হ'তে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত। ছেলে মেয়েও একটু বড় হলেই লাগিয়ে দিচ্ছে খেতের কাজে, আদিম যন্ত্র নিয়ে মাটি চষে [illegible] চড়ায়, জ্ঞান ও আলোকের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ, বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কারের আশীর্বাদ হ'তে সে বঞ্চিত, সারাজীবনের সকল দিনরাত্রি তার নিরানন্দ—শ্রমিক প্রতিযোগিতায় জন্ত স্রেফ বাঁচবার তাগিদেই মেহনৎ করে চলেছে—কিন্তু এত অজ্ঞ, এত অন্ধ যে নিজের দাসত্বের শেকলটা দেখতে পায় না, অহঙ্কার করে বেড়ায় সে মুক্ত, স্বাধীন!"

ডাঃ শ্রীমান একমুহূর্ত থামে। দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করে, "এর পাশে আজকের চিত্র রাখুন—সীমাহীন খাদ্যসরবরাহ! মনস্তাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান সমাজের অধিকাংশ দুর্বৃত্ততার মূলে আছে অতিভোজন। তারপর প্রমাণিত হয়েছে যে, খাদ্যহিসাবে মাংস অপ্রয়োজনীয়, আমিষ খাদ্যের চেয়ে নিরামিষ খাদ্য উৎপাদন করা স্বভাবতঃই সহজ, আমিষ খাদ্য প্রস্তুত ও নাড়াচাড়া করা অপ্রীতিকর, এতে হ'তে অপরিচ্ছন্নতার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু যতদিন ভালু সুড় সুড় করবে, ততদিন ওসব যুক্তিতে কোন কাজ হবে না।"

ছাত্রীটি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে, "সমাজতন্ত্র ওটা উল্টে দেবে কী ভাবে?" এই সে প্রথম কথা কইল।

শ্রীমান উত্তর দেন, "যতদিন মজুরী-গোলামী থাকবে, ততদিন কাজ যত ঘৃণ্য যত নীচই হ'ক না কেন, তা করবার লোকের অভাব হবে না। শ্রমিক মুক্ত হলেই, এসব কাজের মজুরী বাড়তে থাকবে; ফলে পুরোণো নোংরা বিশ্রি অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলো ভেঙে পড়তে থাকবে—তখন নতুন কারখানা গড়তেই কম খরচ পড়বে; জাহাজে জাহাজে ইঞ্জিনে কয়লা দেবার যন্ত্র রাখা হবে, তাতে বিপজ্জনক কাজগুলো নিরাপদ হবে বা বিপজ্জনক কাজদ্বারা উৎপন্ন পণ্যের পরিবর্তে অন্য সহজ উপায়ে উৎপাদন-যোগ্য পণ্য সৃষ্টি করা হবে। আমাদের

ঔদ্যোগিক শিল্পগত প্রজাতন্ত্রের নাগরিকরা দিন দিন যেমন যেমন মার্জিত রুচি হবে, পশুহত্যার খরচও তেমনি তেমনি বাড়তে থাকবে, ক্রমে এমন দিন আসবে যখন মাংসাশীদের নিজেদেরই পশু হত্যা করে খাদ্য জোগাড় করতে হবে, এভাবে আমিষ ভোজন-প্রথা কতদিন চালু থাকতে পারে? আর একটা জিনিস ধরা যাক—পুঁজিবাদি গণতন্ত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে রাজনৈতিক দুর্নীতিপরায়ণ কুচক্রী রাজনৈতিকদের দ্বারা শাসন পরিচালনার একটা ফল হয় এই যে, সাধারণ রোগেও দেশের অর্ধেক অধিবাসী মারা পড়ে; এসব রোগ নিবারণে বিজ্ঞানকে চেষ্টা করতে দিলেও লাভ খুব বেশী হত না, কারণ আজকের মানুষ নামে পরিচিত জীবগুলির অধিকাংশই মানুষ নয়, এখন তারা অন্যের জন্য ধনসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র। আলোবাতাসহীন ঘিঞ্জি ছোট্ট ঘরে তাদের বাস করতে বা পচতে বাধ্য করা হয়, হ্যাচড়া বনে যায় তারা দারিদ্র্যে আর দুর্দশায়, এজন্য যত তাড়াতাড়ি তারা রুগ্ন হ'য়ে পড়ে তত তাড়াতাড়ি দুনিয়ার সকল ডাক্তার মিলেও তাদের আরোগ্য করতে পারবে না; ফলে এই সব দরিদ্র রোগ-বিস্তারের কেন্দ্র হ'য়ে আমাদের জীবনকেই বিষিয়ে দেয়, অতি স্বার্থপরকেও তারা জীবনের সুখ বা আনন্দ উপভোগ করতে দেয় না। এই জন্য আমি জোর করে বলব যে যেদিন দুনিয়ার সকল সর্বহারা মানুষের মত বাঁচবার অধিকার ফিরে পাবে সেদিন আজকের ভেষজ ও শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞানও পুরোপুরি কাজে লাগবে না; কেন না তার প্রয়োজন থাকবে না।"

আবার হের ডক্টর চুপ করে। ইউরখিস লক্ষ্য করে, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে জানবার প্রথম দিন ওর চোখ মুখের যে অবস্থা হ'য়েছিল আজ সুন্দরী ছাত্রীটির চোখ মুখের অবস্থাও তাই হয়েছে। ইউরখিসের ইচ্ছে করে বৈঠকের পর মেয়েটার সঙ্গে ও আলাপ আলোচনা করবে, বুঝবে না

মেয়েটী ওকে? আশা হয়, হ্যাঁ বুঝবে বৈকি। বৈঠক ভাঙবার পর ও শুনতে পায় ছাত্রীটিকে শ্রীমতি কিসার চাপাস্বরে বলছে, "এর পর আর মিঃ মেনার্ড সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আগেকার ধারায় লিখবে বলে' আমার মনে হয় না।" তরুণী উত্তর দেয়, "কী জানি, কিন্তু লিখলে বুঝব, লোকটা দুর্বৃত্ত।"

এর কয়েক ঘণ্টা পরেই আরম্ভ হ'য়ে গেল নির্বাচন দিবস—দীর্ঘদিনের নির্বাচনী প্রচারের অবসান হ'য়েছে, দেশ যেন রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধভাবে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে। ইউরষিস ও হিণ্ডসের হোটেলের অন্যান্য কর্মচারী কোন রকমে খাওয়া শেষ করে পার্টি কর্তৃক ভাড়াকরা বড় হলঘরটায় গিয়ে হাজির হয়।

কিন্তু ওদের যাবার আগেই সেখানে ভীড় জমে গেছে, মঞ্চের ওপর টেলিগ্রাফ যন্ত্র টরে-টক্কা রবে ফলাফল পাঠাতে আরম্ভ করেছে। শেষ গণনার পর দেখা গেল সমাজতন্ত্রীরা ভোট পেয়েছে কিঞ্চিদধিক চার লক্ষ—গত চার বৎসরে শতকরা সাড়ে তিনশোগুণ বেড়েছে। আজ ভাল হয়েছে বলতে হবে। পূর্ববর্তী হিসাবের জন্য পার্টি 'স্থানীয়' গুলির ওপর নির্ভরশীল; যে 'স্থানীয়' যত বেশী সফল হ'য়েছে, খবর পাঠাবার জন্য তার তত বেশী আগ্রহ; সারারাত্রি ধরে খবর আসতে থাকে; সমবেত জনতার মনে হয় ভোটের সংখ্যা ছয় সাত এমন কি আটলক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। সত্যিই এই রকম অবিশ্বাস্য সংখ্যার শিকাগো এবং ঐ রাষ্ট্রে ভোটের হার বেড়েছে। বিভিন্ন শহর হ'তে উৎসাহী ব্যক্তিরা হাজার হাজার টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে। একের পর এক সেগুলি পড়া হচ্ছে। সভায় সে কী উত্তেজনা! সে এক দেখবার জিনিষ!......

খাস শিকাগো শহরেরই বিভিন্ন মহল্লা ও কারখানা হ'তে খবরের

থামে না, বলে' চলে, "এই যে ন্যাজারেথের যিশু! এই শ্রেণীসচেতন শ্রমিক! এই শ্রমিক সঙ্ঘের সূত্রধর! এই আন্দোলনকারী, আইনভঙ্গকারী, এই অগ্নিবর্ষী অরাজকপন্থী! আজকের জগৎ তাঁর নাম ভাঙিয়ে মানুষের আত্মা ও দেহের চূর্ণে বানাচ্ছে ডলারের পর্বত, আজ যদি সেই জগৎপ্রভু একবার ফিরে এসে তাঁর নামে অনুষ্ঠিত এই অনাচার একবার প্রত্যক্ষ করতেন, তাহ'লে তাঁরও আত্মা আজ বিভীষিকার ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত! প্রেম ও দয়ার অবতার এ দৃশ্যে পাগল হ'য়ে যেতেন না? সেই ভয়াবহ রাত্রি—যেদিন তিনি গেথ্‌সেমেনের উদ্যানে অন্তরবেদনায় আর্ত, রক্তস্বেদ নিঃসৃত হচ্ছে, ভাবুন তো একবার আজকের মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা দেখলে তাঁর কী অবস্থাটা হ'ত—তাঁরই স্বর্ণমূর্তি সম্মুখে রেখে অসংখ্য মানুষ ছুটেছে ব্যাপকভাবে নরহত্যা করবার জন্যে, নরহত্যা করছে এরা কামুক নিষ্ঠুর দানবদের ঘৃণ্য মুনাফাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য—ভাবুন একবার, এ দৃশ্য দেখলে কী অবস্থা হ'ত তাঁর! বুঝতে পারছেন না, আজ তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকলে, যে চাবুক মেরে তিনি মন্দির হ'তে সুদখোরদের তাড়িয়েছিলেন, সেই চাবুক দিয়েই—"

নিশ্বাস নেবার জন্য বক্তা মুহূর্তের জন্য থামে। শ্রীমান বলে, "না বন্ধু, ভদ্রলোকের যথেষ্ট বাস্তব বুদ্ধি ছিল। আজকের দিনে তিনি কল কমলালেবু পকেটে করে' নিয়ে গিয়ে সমস্ত মন্দিরটাই উড়িয়ে দিতেন।"

সকলের হাসি থামলে লুকাস পুনরায় বলতে আরম্ভ করে: "কমরেড্‌স্‌, বাস্তব রাজনীতির দিক হ'তে বিষয়টা বিচার করুন। ইতিহাসের একটা মানুষ, অনেকে তাঁকে ভগবান বলে ভক্তি করে; আমাদেরই একজন ছিলেন তিনি, আমাদের জীবন যাপন করতেন, আমাদের মতবাদ প্রচার করতেন। আর আজ তাঁকে ছেড়ে দেব তাঁর শত্রুদের

হাতে? বিকৃত করতে দেব তাদের তাঁর আদর্শ? তাঁর বাণী আমরা পেয়েছি—এ বস্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; এই বাণী উদ্ধৃত করে' জনগণের কাছে প্রমাণ করব আমরা যে তিনি কী ছিলেন, কী শিখিয়েছিলেন, কী করেছিলেন? নিশ্চয় করব, হাজার বার করব! দুর্বৃত্ত অলস শয়তানদের তাঁর পুরোহিতের গদি হ'তে টেনে নামিয়ে, আবার আমরা জনগণকে তাঁর আদর্শে কর্মচঞ্চল করে' তুলব।"

আবার থামে লুকাস। শ্রীমান টেবিলের ওপর হ'তে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে বলে, "এই যে কমরেড, এখান হ'তে সুরু করুন আপনি। ধর্মের গুরু জনৈক বিশপ—তাঁর স্ত্রীর মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার দামের জহরৎ চুরি গেছে! বিশপদের মধ্যে ইনি বিশেষ মসৃণ তৈলচিক্কন! অত্যন্ত পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ বিশপ! দেশপ্রেমিক, মজদুরদরদী বিশপ—মজুরীজীবীদের চৈতন্য আচ্ছন্ন করবার জন্য পৌর আড়কাঠি যুক্তসঙ্ঘ!"

উল্লিখিত বাক্‌যুদ্ধে অন্যান্য সমবেতগণ নীরব ছিল। এবার মিঃ মেনার্ড বলে, একটু খোঁচা মারবার উদ্দেশ্যেই মন্তব্য করে যে, সমাজতন্ত্রীরা সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত কাঠখোট্টা আঁটসাঁট কার্যতালিকা বানিয়ে রেখেছে বলেই তো সে জানে; অথচ আজ এখানে দু'জন সক্রিয় পার্টি-সভ্যের বক্তৃতা শুনে ওর মনে হয়, অন্ততঃ ও যতদূর বুঝেছে যে, কোন বিষয়েই এরা একমত নয়। তার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এরা একটু জানাবে কি, যে কোন বিষয়ে এরা একমত এবং কীজন্য এরা একই পার্টির সভ্য? ফলে, সযত্নচয়িত শব্দসমন্বয়ে দুটী তত্ত্ব তৈরী হয়: প্রথম, জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনব্যবস্থার সাধারণ মালিকানা ও গণতন্ত্রী পরিচালনায় সকল সমাজতন্ত্রী বিশ্বাসী; দ্বিতীয়, সমাজতন্ত্রী বিশ্বাস করে যে, মজুরীজীবীদের শ্রেণীসচেতন সংগঠন সাহায্যেই উক্ত অবস্থা আনতে পারে; ব্যস, এই পর্যন্তই সকল সমাজতন্ত্রী একমত।

ধর্ম-গোঁড়া লুকাসের কাছে সমাজতন্ত্রী সমাজ মানে নব জেরুশালেম —"তোমার" অন্তরে অবস্থিত "রাজ্যের" প্রতিষ্ঠা। স্রীমানের কাছে সমাজতন্ত্র দূর লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে প্রয়োজনীয় একটা ধাপ ছাড়া আর কিছু নয়, অধৈর্য হ'য়েই এ ধাপ সহ্য করতে হবে; সে নিজেকে "দার্শনিক অরাষ্ট্রতন্ত্রী" বলে; বলে অরাষ্ট্রতন্ত্রী বলব তাকে যে বিশ্বাস করে যে, মনুষ্য সমাজের শেষ অবস্থায় প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব পুষ্ট হবার মত মুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হবে, দৈহিক নিয়মের বন্ধন ছাড়া অন্য কোন নিয়ম বা আইনকানুন দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে না। একই প্রকার দেশলাইএ সকলের আগুনই জ্বলতে পারে, একই প্রকার রুটি দিয়ে সকলেরই পেট ভরতে পারে, এইজন্য সংখ্যাগুরুর ভোটদ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা চালনা করা সম্ভব হবে। ধরিত্রী একটাই, উপযোগী পদার্থের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে জ্ঞান ও নৈতিক বস্তুর কোন সীমা নাই, যে কেউ এদের যতখানি খুশী আহরণ করতে পারে তাতে অন্যের অংশ কম পড়বার আশঙ্কা থাকে না; এইজন্য "বস্তুর ব্যাপারে সাম্যবাদ আর জ্ঞানের ব্যাপারে অরাষ্ট্রবাদ" এই সূত্রটী বর্তমান অনুহোতা চিন্তারাজ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। প্রসববেদনা চুকে গেলে এবং ক্ষত সারলেই সমাজে সরল স্বাভাবিক অবস্থা প্রবর্তিত হবে; প্রতিটী মানুষ জমা রাখবে তার শ্রম, বদলে মারফৎ জুটবে তার প্রয়োজনীয় বস্তু, তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপাদন, বিনিময় ও ব্যবহার পদ্ধতি চালু হবে, এ ব্যবস্থা তখন এত স্বাভাবিক বোধ হবে যে আজ আমরা যেমন হৃৎস্পন্দন সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, তেমনি ঐ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তখন সচেতন থাকব না। তারপর, স্রীমান ব্যাখ্যা করে, সমাজ ভেঙে একধরণের কতকগুলি সমিতি বা সম্প্রদায়ে পরিণত হবে, যেমন বর্তমানের ক্লাব বা রাজনৈতিক দল, ধর্মসঙ্ঘ; বিপ্লবের পর শিল্প সাহিত্য ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের ভার নেবে এই সব "মুক্ত সমিতি"।

রোম্যান্টিক নভেল পড়তে যারা ভালবাসে তারা রোম্যা[illegible] ঔপন্যাসিক-দের ভরণপোষণ চালাবে, এই ভাবে ইম্প্রেসিওনিষ্ট চিত্রকার, প্রচারক, সঙ্গীতজ্ঞ, নট, সম্পাদক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির ভরণপোষণ চলবে। এদের কেউ যদি দেখে তার খরচ চালাবার কেউ নেই, সে তখন তার সময়ের এক অংশ দিয়ে অন্য কাজ করে' ভরণপোষণ চালিয়ে নিতে পারবে। এ ব্যবস্থা এখনও আছে; তফাৎটা শুধু এই যে এখন জীবিকা উপার্জনের জন্যই সমস্ত সময় কেটে যায়, আর তখন সুবিধাভোগী শোষক-শ্রেণীর উচ্ছেদ হবে বলে যে-কেউ দিন মাত্র একঘণ্টা কাজ করেই নিজের জীবিকা উপার্জন করে' নিতে পারবে। আজকের চিত্রশিল্পীর শ্রোতা ও গুণগ্রাহী অত্যন্ত কম, এই কমসংখ্যক শ্রোতাও ব্যবসা জগতে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য যে প্রতিযোগিতা করেছে তার ফলে নীচ ঘৃণ্য হ'য়ে গেছে সমগ্র চিত্রশিল্প। প্রতিযোগিতার অবসান হ'য়ে সমস্ত মানুষ যখন মুক্ত হবে তখন চিন্তা ও চারুশিল্পের দিকে দিকে যে উন্নতি ও বিস্তার হবে আজ আমরা তার কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না।

তখন সম্পাদক জানতে চায়, কোন তথ্যের ওপর নির্ভর করে মিঃ মেয়ান এমন দৃঢ়নিশ্চয় হ'লেন যে, এমন সমাজ সম্ভব হবে যার সদস্যরা মাত্র একঘণ্টা শ্রম করেই জীবিকা অর্জন করতে পারবে।

জিজ্ঞাসিত উত্তর দেয়, "বর্তমানে বিজ্ঞানের দানগুলিকে তাদের শেষ শক্তি পর্যন্ত কাজে লাগালে এই সমাজেরই উৎপাদন ব্যবস্থা ঠিক কোন স্তরে উঠতে পারে বা কতখানি বিস্তৃত হ'তে পারে সেটা নিরূপণ করবার কোন ব্যবস্থা আজ নেই। ধনিকতন্ত্রের হিংস্র বর্বরতার চাপে আমাদের বুদ্ধি এমন অসাড় হ'য়ে গেছে যে, এর কাছে যৌক্তিকটা যুক্তির ওপর নির্ভর করে না। সে যাই হ'ক, বিজ্ঞানের বর্তমান শক্তি আমাদের বর্তমান যুক্তিবুদ্ধি দ্বারা নিরূপিত উৎপাদনের পরিমাণকে যে বহু বহু গুণে ছাড়িয়ে যাবে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক

অন্যোতার বিজয়ের পর যুদ্ধ হ'বে অভাবনীয় ব্যাপার; যুদ্ধের জন্ত মনুষ্য সমাজকে যে-মূল্য দিতে হয় তার পরিমাণ নিরূপণ করবে কে?—একটা যুদ্ধে যে সংখ্যায় জীবন ও যে পরিমাণে প্রয়োজনীয় পণ্য নষ্ট হয়, সে হিসাব এখন তুলছি না, লক্ষ লক্ষ লোককে অলস বা উৎপাদন ব্যবস্থা হ'তে দূরে সরিয়ে রেখে দীর্ঘকাল ধরে' তাদের যুদ্ধ ও কুচকাওয়াজের জন্ত প্রস্তুত করার খরচ সেও ধরছি না—ও সব ছেড়েই দিচ্ছি আমাদের হিসাব হ'তে—কিন্তু যুদ্ধোন্মাদনা, যুদ্ধ-সৃষ্ট বিভীষিকা, পাশবিকতা, অজ্ঞতা, যুদ্ধের জন্ত সরকার কর্তৃক মদ ও গণিকাবৃত্তির খোলা আয়োজন, যুদ্ধের জন্ত যে সব অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, শিল্পোৎপাদনে অপটুতার সৃষ্টি হয়, সমাজের যে চরম নৈতিক অধঃপতন হয় এবং এই সব কারণে সমাজের প্রাণশক্তির যে বিপুল অপচয় হয় তার পরিমাণ নিরূপণ করবে কে? এই রক্তাক্ত যুদ্ধ-দানবের আহার যোগাবার জন্ত সমাজের প্রত্যেকটী সক্ষম মানুষকে দৈনিক ছ'ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয় বললে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে বলে কি মনে হয় আপনার?"

এর পর শ্রীমান প্রতিযোগিতাজাত অপচয়ের মোটামুটি একটা রেখাচিত্র দিতে আরম্ভ করেন: ঔদ্যোগিক শিল্পযুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি; বিরামহীন, দুর্ভাবনা ও ক্ষয়; চারিত্রিক অধঃপতন, যেমন মদ্যপান, অর্ধ-নৈতিক দুশ্চিন্তার জন্ত গত বিশ বৎসরে মদ্যপানের পরিমাণ অন্ততঃ দ্বিগুণ হয়েছে; সমাজের অলস ও অনুৎপাদক অজস্র অর্থাৎ লক্ষকোটিপতি ধনী ও সর্বস্ব খুইয়ে-বসা গরীব; আইন ও নির্যাতনের সমগ্র যন্ত্রটা; এমনি ধনিকের ঔদ্ধত্যবিলাসের জন্ত দর্জি, নৃত্যশিক্ষক, মেয়েদের টুপি কিতে প্রভৃতি নির্মাতা, পাচকাধ্যক্ষ, বরকন্দাজ প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় পদসৃষ্টিদ্বারা সমাজের সৃষ্টিশক্তির অপচয়। বলে. "বোঝেন নিশ্চয় যে, প্রতিযোগিতাপূর্ণ সমাজে শক্তির পরখ অর্থে, এবং শক্তির প্রকাশ অর্থের অপচয়ে; সমাজের শতকরা ত্রিশ জন সমাজের অপ্রয়োজনীয় পাপ

উৎপাদনে নিযুক্ত আছে, আর সে পণ্য নষ্ট (তাদের [illegible] ভাষায় 'ব্যবহার') করছে শতকরা একজন। এই কি পূর্ণ চিত্র ? পরগাছাদের চাকরবাকর, জমোয়ান বেয়ারা বরকন্দাজ স্যাকরা মণিকার ফ্যাসানী টুপী-ফিতে প্রভৃতি প্রস্তুতকারকরাও পরগাছা—এদের [illegible]পোষণের জন্তও সমাজের প্রয়োজনীয় সদস্তদের অতিরিক্ত পরিশ্রম [illegible] হয়। মনে রাখবেন, এই পৈশাচিক ব্যাধি হ'তে শুধু অলস পরগাছা [illegible] তাদের সেবকরাই ভোগে, এ বিষ সমগ্র সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হয়। [illegible] লক্ষ উচ্চস্তরের অভিজাত স্ত্রীলোকের নীচে আছে দশ লক্ষ মধ্যবিত্ত স্ত্রীলোক —এদের দুঃখ এরা নিজেদেরকে অভিজাত বলতে পারে না, তবু সর্বসমক্ষে অভিজাত সাজবার আপ্রাণ চেষ্টা করে; তাদের নীচে আবার পঞ্চাশ লাখ বড় জোৎদারদের স্ত্রী আছে, এরা "ফ্যাসন পত্রিকা" পড়ে' টুপীর কাট-ছাঁট ঠিক করে; এদের পর দোকানের মেয়ে, পরিচারিকা, সহকারিণী প্রভৃতি—এরা নকল ও সস্তা জহরতের মোহে দেহবিক্রয় করে। এর সঙ্গে ধরুন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত প[illegible]; বেচবার হাজারো ফন্দীফিকির, কেন না বিক্রীর বাজারেও তা প্রতিযোগিতা আছে, উৎপাদক ও দোকানদারের শো-কেসে, প্রাচীরপত্রে, পত্রিকায় মেহনংকারীর পকেট কাটবার জন্তে হরেক রকম বিজ্ঞাপন।"

[illegible]কুমার জুড়ে দেয়, "জালিয়াতির দ্বারা সৃষ্ট অপচয়টাও ভুলবেন না।"

শ্রীমান বলে' চলে, "অতি-আধুনিক বিজ্ঞাপনের পেশায় আসা যাক, অর্থাৎ জনগণ যে পণ্য কিনতে চায় না সেই পণ্য তাদের দিয়ে কেনাবার ফন্দীবিজ্ঞান, এটা ধনিক সমাজের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পৈশাচিক লীলাক্ষেত্র; বিজ্ঞাপনের কথা ভাবতে গেলে মানুষের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়—ধনিকদের সৃষ্ট গণ্ডা গণ্ডা বিভীষিকার কোন্‌টা ধরবে, কোন্‌টা ছাড়বে। একটা পণ্যের একটামাত্র প্রকার থাকলেই যেখানে

সমাজের প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে মিটে যেত, সেখানে অসমদের অহংকার ও ন্যাকামি চরিতার্থ করবার জন্ত সেই একই পণ্যের দশটা প্রকার-ভেদ করে' যে সময় ও শক্তির অপচয় করা হয় সেটাও বিবেচনা করবেন! ভাবুন একবার পণ্যের "সস্তা সংস্করণ", উৎপাদনের অপচয়টা—আসলে জিনিসটা অজ্ঞ জনগণের সঙ্গে ঠকবাজী করা ছাড়া তো কিছু নয়; জামাকাপড় খাদ্যপানীয় প্রভৃতিতে ভেজাল দিয়ে এরা সমাজের যে অপচয়টা করে তার হিসাবও এই সঙ্গে ধরে' নেবেন।"

প্রাকৃপ্রচারক যোগ দেয়, "সেই সঙ্গে এর নৈতিক দিকটাও দেখবেন।"

শ্রীমান বলে' ওঠে, "ঠিক বলেছেন; ঔদ্যোগিক প্রতিযোগিতা হ'তেই উৎপন্ন হয় নীচ ধূর্ত্ততা, হিংস্র নিষ্ঠুরতা, ষড় যন্ত্র, মিথ্যাবাদিতা, ঘুষ, বাহ্বাস্ফোট, ঘৃণ্য আত্মপ্রচার, দৌড়োদৌড়ি হাঁকাহাঁকি, দুশ্চিন্তা। প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার সারমর্ম হচ্ছে নকল ও ভেজাল—"সবচেয়ে সস্তা বাজারে খরিদ করে' সবচেয়ে আক্রা বাজারে বিক্রী করা" উক্তিটা পোশাকী কথা, আসল কথা ঐ ভেজাল ও নকল। একজন সরকারী অফিসার হিসাব করে' দেখিয়েছেন যে স্রেফ্ ভেজাল খাদ্যের জন্তই জাতির ২,৫০০,০০০,০০০,০০০ ডলার বছরে বরবাদ যায়, যে বস্তু মানুষের পাকস্থলীতে গিয়ে ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার করে না অথচ বাইরে থাকলে কাজে লাগত, এ খাদ্য না খেলে লোক সুস্থ থাকত কিন্তু খাবার ফলে অতিরিক্ত ডাক্তার ও ধাত্রী খরচ হয়, তা ছাড়া জাতির এক পুরুষে দশ হ'তে বিশ বৎসর আয়ু কমিয়ে দেয় এই খাদ্য অর্থাৎ একটা জাতির এতগুলি মানুষের দশ হ'তে বিশ বৎসরের উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট করা। তারপর ধরুন, যেখানে একটা দোকান মারফৎ এই জিনিসগুলো বেচলে হ'ত, প্রতিযোগিতার জন্ত

ডজন ডজন দোকান খুলে সময় ও শক্তির অপব্যবহার [illegible] হয়। দেশে দশ হ'তে বিশ লক্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে, [illegible] পাঁচ হ'তে দশগুণ কেরাণী আছে, এর ওপর প্রতিটী পণ্য এ-হাত হ'তে ও-হাত, ও-হাত হ'তে সে-হাত হ'চ্ছে, একই পণ্যের লাভ-লোকসানের বারবার হিসাব কেতাব চলছে, তার সঙ্গে চলছে প্রতিটী বিক্রেতার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা। আবার এই ব্যবসা পদ্ধতির জন্ত ব্যাপক আইন যন্ত্র তৈরী করতে হয়েছে, শত শত খণ্ডযুক্ত লক্ষ লক্ষ বই নিয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থাগার, সেই সব বইএর ব্যাখ্যা করবার জন্ত আদালত বিচারক জুরী, তাদের পাশ কাটাবার জন্ত উকীল, ধাপ্পা, ধোথা, মিথ্যা আর ঘৃণার মজুদ। হিসাব করুন বেহিসাবী অন্ধভাবে পণ্যোৎপাদনের অপচয়টা—কারখানা তালাবদ্ধ হ'চ্ছে, মজদুররা কর্মচ্যুত হ'চ্ছে, গুদামে মাল পচছে, এর মুকুট হ'য়ে বসে' আছে ফাটকাবাজারীরা, এরা হয়তো কোন চালু ব্যবসায় পঙ্গু করে' দিচ্ছে নয় অপ্রয়োজনীয় কোন পণ্যকে আকাশে তুলছে; পণ্যের মালিকানা, মালিকানার অছিগিরি, ব্যাংকের পতন, বাণিজ্যসংকট, আতঙ্ক, শহরের রিক্ততা, জনগণের উপবাস—সব ধরুন। অ্যাটর্ণি, ঘোষক, বেলিফ, বিজ্ঞাপন বিলিকারক, প্রাচীর-পত্র সাঁটার লোক, বিজ্ঞাপনী কোম্পানী প্রভৃতি অনুৎপাদক পেশা নিয়ে বসে' আছে—এ সবে কী ভীষণ সময় ও শক্তির অপচয় হচ্ছে [illegible] ভাবুন; প্রতিযোগিতা ও রেলের একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্ত সকলে ভিড় করছে শহরগুলোয়—এর ফলে জাতীয় আর ও আয়ুর ক্ষয়ক্ষতিটা হিসাব করুন; হিসাব করুন—বস্তী, বিষাক্ত হাওয়া ও ব্যাধিজনিত' জাতীয় ক্ষতির পরিমাণ; অফিসী ইমারৎগুলোর কথা ভাবুন—তলার ওপর তলা উঠছে, মাটির তলে তলার নীচে তলা নামছে—এতে সময় শক্তি ও মালমসলার কী অপচয়টা হয় একবার হিসাব করুন। তারপর সমগ্র বীমা ব্যবসায়টা ধরুন—বিপুল এর

পরিচালন ব্যবস্থা, অগণিত এর কেরাণী এবং সেই কেরাণীদের অপরিমেয় শ্রম—সমস্তটাই ব্যর্থ, অকেজো, অপচয়—"

সম্পাদক বলে, "বুঝলাম না।"

"সাম্যবাদী সাধারণতন্ত্র বিশ্বব্যাপ্ত স্বয়ংক্রিয় বীমা প্রতিষ্ঠান ও আমানতী ব্যাংক—এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সকল লোক এ প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ভোগ করবে। পুঁজি হবে সকলের সম্পত্তি, এর লোকসান সকলের লোকসান, সে ক্ষতিপূরণ করবে সকলে মিলে। উক্ত ব্যাংক হবে প্রত্যেকের সরকারী জমাখরচ রাখবার প্রতিষ্ঠান। একটী সরকারী সর্বাত্মক বুলেটিন থাকবে, তাতে সাধারণতন্ত্রের বিক্রয়যোগ্য প্রত্যেকটী পণ্যের সঠিক বিবরণী থাকবে; সে বিক্রয় হ'তে কেউ লাভ করবে না, অমিতব্যয়ী হবার জন্ত বিজ্ঞাপন থাকবে না, ঝুটো মালকে সাচ্চা বলে' চালান হবে না। থাকবে না প্রবঞ্চনা, ভেজাল, নকল, ঘুষ বা 'কলম'।"

"দাম স্থির করা হবে কী ভাবে?"

"উৎপাদন ও বহনে যে শ্রম ব্যয়িত হবে তার মূল্য হ'তে পণ্যের মূল্য নিরূপিত হবে, সে অঙ্কটা কষা হবে গণিতের প্রথম নিয়ম দিয়ে। জাতীয় ফসল ক্ষেতে পরিশ্রম করে' কয়েক লক্ষ শ্রমিক কয়েক কোটি মণ গম উৎপাদন করবে, প্রত্যেকে মেহনৎ করছে, ধরুন, একশো দিন, কাজেই এক মণ গমের দাম হবে একজন ক্ষেতমজুরের দৈনিক ডলারের এক-দশমাংশ। ধরা যাক, একজন ক্ষেতমজুরের এক দিনের মজুরী হবে পাঁচ ডলার, তা হ'লে এক মণ গমের দাম হবে পঞ্চাশ সেণ্ট।"

মিঃ মেনার্ড জিজ্ঞাসা করে, "বলছেন 'ক্ষেতমজুর ও তার মজুরী', তা হ'লে সব শ্রমিকের পারিশ্রমিক কি এক হবে না?"

"স্পষ্টতঃ না। কতকগুলো কাজ কঠিন, কতকগুলো সহজ। সব কাজের সমান মজুরী হ'লে গ্রাম্য ডাকবাহক পাওয়া যাবে লাখ লাখ,

কিন্তু করলার খনি মজুর একটীও পাওয়া যাবে না। অবশ্য অন্য ব্যবস্থা করা যায়—এক মজুরী রেখে খাটবার সময়ের তারতম্য করা যায়। বিশেষ শিল্পে বিশেষ কালে বিশেষ সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হ'লে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমসময় অবিরত কমিয়ে বাড়িয়ে চলতে হবে। এখনও এই নীতি অনুসরণ করা হয়, তফাৎ এই যে এখন নীতিটা চালু রাখা হয়েছে অন্ধ ও অসম্পূর্ণভাবে—এখন এক শিল্প হ'তে অন্য শিল্পে শ্রমিক চালনা করা হয় গুজব রটিয়ে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে, আর তখন এটা করা হবে সরকারী সর্বাত্মক বুলেটিন মারফৎ।"

"যে সব পেশার সময়ের মূল্য নিরূপণ করা কঠিন তাদের মূল্য কীভাবে নির্ধারিত হবে? যেমন ধরুন একখানা বইএর মূল্য ঠিক করবেন কী ভাবে?"

"কেন, কাগজ ছাপাই ও বাঁধাইএর শ্রমমূল্য হ'তে—বর্তমানের এক-পঞ্চমাংশ।"

"আর গ্রন্থকার?"

"আগেই তো বলেছি, রাষ্ট্রদ্বারা জ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কোন একখানা গ্রন্থসম্বন্ধে রাষ্ট্র বলতে পারে লিখতে একবছর লেগেছে, আর গ্রন্থকার বলতে পারে ত্রিশ বছর। গ্যেটে বলতেন, তাঁর এক একটা সুন্দর উক্তির মূল্য এক থলে স্বর্ণ মোহর। আমি এখানে যে [illegible]টা ব্যাখ্যা করছি তাকে জাতীয়—জাতীয় কেন, আন্তর্জাতিক—পণ্য সরবরাহ পদ্ধতি বলা যায়। মানুষের জ্ঞানের তৃষ্ণা আছে, এজন্য সে বেশীক্ষণ পরিশ্রম করবে, বেশী রোজগার করবে, এবং তার পরিতৃপ্তির জন্য নিজের রুচি ও সঙ্কল্পমত ব্যবস্থা করবে। সকলের মত আমিও এই মাটীতেই বাস করি, অধিক সংখ্যকের মত একই প্রকার জুতো পরি, একই রকম বিছানায় ঘুমোই কিন্তু এই অধিক সংখ্যকের চিন্তা আমার চিন্তা নয়, এরা যাকে এদের চিন্তানায়ক ঠিক

করবে আমি তার চিন্তানেতৃত্ব মানব না, কাজেই তার জন্ত খরচও করব না। আমার মতে এসব বিষয় এখনকার মত তখনও অনিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত। কোন প্রচারকের প্রচার যদি কতকগুলো-লোক শুনতে চায় তাহ'লে তারা একত্র হ'য়ে খুশীমত খরচ করে তার প্রচার শুনতে পারে, ধর্মসজ্ঞ পোষণ করতে পারে। আমি সে প্রচার শুনতে চাই না, সেখানে আমি যাব না, আমার খরচও হবে না। এখনই ধরুন, মিশরীয় মুদ্রা, খৃষ্টীয় সন্ত, উড্ডয়ন যন্ত্র, ক্রীড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু পত্রিকা আছে, এদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। অপর পক্ষে, মজুরী গোলামীর উচ্ছেদ হ'লে, এবং ধনিক শোষকের কর না দিয়ে কিছু জমাতে পারলে বিবর্তনবাদের উদ্গাতা ফ্রাইএড্রিখ নিট্‌সের বাণী ব্যাখ্যা ও প্রচার করবার জন্ত পত্রিকা বের হবে, তেমনি পরিচ্ছন্ন আহার বিজ্ঞানের স্রষ্টা হোরেস ফ্লেচার-এর বিজ্ঞান সম্বন্ধে, হয়তো মেয়েদের গাউনের ঝুল কম করবার জন্ত, বৈজ্ঞানিক প্রথায় নরনারীর জন্ম পরিচালনার জন্ত বা পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্ত পত্রিকা থাকবে।

অল্পক্ষণ থামে ডাঃ শ্রীমান, তারপর হেসে বলে, "একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম, তবু সবে 'শুরু' করছি।"

"আর কি আছে?" জিজ্ঞাসা করে মেনার্ড।

প্রতিযোগিতা-সৃষ্ট কতকগুলো অপচয়েরই শুধু উল্লেখ করলাম, কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে প্রতিটি পণ্যের কি ভাবে সঠিক উপযোগ হবে সে তো এখনও বলিনি। ধরে নেওয়া যাক যে পাঁচজন মানুষ নিয়ে এক একটা পরিবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের দেড় কোটি পরিবার আছে, খুব কম করে ধরলেও এদের মধ্যে এক কোটি পরিবার আলাদা আলাদা বাস করে; এই সব পরিবারের ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজগুলো করে হয় গৃহিণী, নয় মাহিনে করা গোলাম। বৈজ্ঞানিক

বাস্তু বা সরবার রান্না ব্যবস্থার কথা এখন ছেড়ে দিয়ে [illegible] বাসন-মাজাটা ধরা যাক্; পাঁচজনের পরিবারের বাসন মা[illegible] একজনের অন্ততঃ আধ ঘণ্টা লাগে, দশ ঘণ্টার রোজ ধরলে তাহ'লে একাজে পাঁচ লক্ষ সক্ষম ব্যক্তির—অধিকাংশই স্ত্রীলোকের প্রয়োজন; কাজটা কত নোংরা, কি ভাবে মানুষের বুদ্ধি ভোঁতা করে দেয়, খেয়াল রাখবেন; রক্তশূন্যতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, চেহারার কদর্যতা, বদমেজাজ, গণিকাবৃত্তি, আত্মহত্যা, মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতির একটা কারণ এই কাজটী; আবার ঐ দশের ফলে স্বামীর মাতাল হওয়া, বা ছেলেদের অধঃপতন হওয়া আশ্চর্য নয়—এসবের জন্য জাতিকে অতিরিক্ত খরচ করতে হয়! কিন্তু আমাদের ছোট ছোট মুক্ত সঙ্ঘগুলিতে বাসন মাজবার যন্ত্র থাকবে, তাতে খালি চোখে দেখার মত সাফ ও শুকানোই হবে না, বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাসনগুলিকে বীজাণুমুক্তও করা হবে, আর তাতে সময় খরচ হবে বর্তমানের দশভাগের এক ভাগ অথচ আজকের মত তাতে স্বাস্থ্য মেজাজ বা মন খারাপ হবে না। মিঃ জিলম্যানের বই পড়ুন, এসব বিষয় আরও ভাল ভাবে জানতে পারবেন। তারপর ক্রোপোটকিনের 'ফিল্ড, ফ্যাক্টরীজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কশপস্' (ক্ষেত ও কলকারখানা) হ'তে নতুন কৃষি-বিজ্ঞান পড়ুন; গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ বিজ্ঞান গড়ে' উঠেছে, এই পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী মাটিতে চাষ করলে বছরে একই জমিতে দশবারটি ফসল উঠবে, মাত্র এক একর (প্রায় সাড়ে তিন বিঘা) জমিতে দুশো টন ফসল জন্মাবে; মানে বর্তমানে (১৯০৫) এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ ক্ষেতে চাষ হয় তারই উৎপাদিত ফসলে সমগ্র পৃথিবীর লোককে খাওয়ান যাবে। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত খামার ও চাষীদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের জন্য এ জিনিস এখন সম্ভব নয়; কিন্তু কল্পনা করুন, বৈজ্ঞানিকরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সরবরাহ সমস্যাটার সমাধান করার জন্য

যৌক্তিক ও রীতিমত চেষ্টা করতে লেগেছেন; ছেলেদের খেলা, শিকারীদের শিকার ও কবিদের বাসের জন্য একটা বনভূমি বাদ রেখে সমস্ত পতিত ও পাহাড়ে জমি আবাদযোগ্য করা হ'ল; প্রতিটী ফসলের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী আবহাওয়া ও মাটি নির্দ্ধারিত হ'ল; সমগ্র জাতির জন্য প্রয়োজনীয় ফসল ও তার যোগ্য ভূমির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপিত হ'ল এবং সর্বাপেক্ষা দক্ষ কৃষি রাসায়নিকদের তত্ত্বাবধানে সর্বাপেক্ষা উন্নত যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হ'ল —ভাবুন একবার ফলটা! আমি নিজে এক খামারে প্রতিপালিত, চাষের কাজ যে কত মারাত্মক তা আমি জানি; এইজন্যই বিপ্লবের পর কৃষিকাজ কী রূপ নেবে তার পূরো চিত্র আঁকতে চাই আমি। আলু পোঁতার যন্ত্রের কথা ধরা যাক, কলটা চালিত হবে কারটে ঘোড়া বা একটা বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে; একটা যন্ত্র একদিনে সত্তর বিঘা জমিতে গভীর ভাবে লিক কাটবে, গর্ত খুঁড়বে, আলু ছিড়বে, পুঁতবে, মাটি ঢাকা দেবে! আলু তোলা যন্ত্রের চিত্র—সাড়ে তিন হাজার বিঘা জমি হ'তে একদিনে মাটি ও আলু তুলে আলুগুলো বস্তায় ফেলবে—এও চলবে বিদ্যুতে! দেখব এমনি ভাবে সকল রকম ফসলের চাষ চলছে—গাছ হ'তে আপেল কমলা প্রভৃতি 'তোলা' হবে কলে, গাই দোয়ান হবে বিদ্যুতে—কলে গাই দোয়ানটা অবশ্য এখনি হচ্ছে। ভবিষ্যতের ফসল কাটার চিত্র!—বিশেষ ট্রেনে লক্ষ লক্ষ হর্ষোৎফুল্ল নরনারী আসছে ফসল কাটার ক্ষেতে তাদের গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ করবার জন্য—যেখানে যতগুলি নরনারী প্রয়োজন সেখানে ঠিক ততগুলিই পাঠান হচ্ছে! এর সঙ্গে তুলনা করুন বর্ত্তমানের কষ্টপ্রদ কৃষিপদ্ধতি, ছোট ছোট ক্ষেত, ছোট খামার, চাষ করছে একটি মাত্র অপুষ্ট, কুৎসিৎ, নিরানন্দ, অজ্ঞ চাষী—তার সহধর্মিনীটী ক্যাকাসে, রুগ্ন, বুদ্ধি তার বিকল, দুজনে খামারে খাটিয়ে

ভোর চারটে হ'তে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত। ছেলে মেয়েও একটু বড় হ'লেই লাগিয়ে দিচ্ছে খেতের কাজে, আদিম যন্ত্র নিয়ে মাটি চষে না, [illegible], জ্ঞান ও আলোকের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ, বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কারের আশীর্বাদ হ'তে সে বঞ্চিত, সারাজীবনের সকল দিনরাত্রি তার নিরানন্দ—শ্রমিক প্রতিযোগিতায় শুধু স্রেফ বাঁচবার তাগিদেই মেহনত করে চলেছে—কিন্তু এত অজ্ঞ, এত অন্ধ যে নিজের দাসত্বের শেকলটা দেখতে পায় না, অহঙ্কার করে বেড়ায় সে মুক্ত, স্বাধীন!"

ডাঃ শ্রীমান একমুহূর্ত থামে। দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করে, "এর পাশে আজকের চিত্র রাখুন—সীমাহীন "অপচয়বাদ"। স্বাস্থ্যতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান সমাজের অধিকাংশ দুর্বলতার মূলে আছে অতিভোজন। তারপর প্রমাণিত হয়েছে যে, খাদ্যহিসাবে মাংস অপ্রয়োজনীয়, আমিষ খাদ্যের চেয়ে নিরামিষ খাদ্য উৎপাদন করা স্বভাবতঃই সহজ, আমিষ খাদ্য প্রস্তুত ও নাড়াচাড়া করা অপ্রীতিকর, এতে হ'তে অপরিচ্ছন্নতার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু যতদিন তালু সুড় সুড় করবে, ততদিন ওসব যুক্তিতে কোন কাজ হবে না।"

ছাত্রীটি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে, "সমাজতন্ত্র ওটা উল্টে দেবে কী ভাবে?" এই সে প্রথম কথা কইল।

শ্রীমান উত্তর দেন, "যতদিন মজুরী-গোলামী থাকবে, ততদিন কাজ যত ঘৃণ্য যত নীচই হ'ক না কেন, তা করবার লোকের অভাব হবে না। শ্রমিক মুক্ত হলেই, এসব কাজের মজুরী বাড়তে থাকবে; ফলে পুরোনো নোংরা ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলো ভেঙে পড়তে থাকবে—তখন নতুন কারখানা গড়তেই কম খরচ পড়বে; জাহাজে জাহাজে ইঞ্জিনে কয়লা দেবার যন্ত্র রাখা হবে, তাতে বিপজ্জনক ব্যবস্থাগুলো নিরাপদ হবে বা বিপজ্জনক কাজগুলো উৎপন্ন পণ্যের পরিবর্তে অন্য সহজ উপায়ে উৎপাদন-যোগ্য পণ্য সৃষ্টি করা হবে। আমাদের